ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জগুমামা রহস্য সমগ্র ২

জগুমামা রহস্য সমগ্র ২

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জগুমামা রহস্য সমগ্র ২

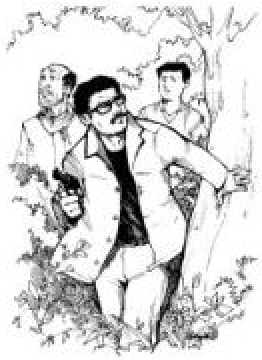

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৬ **তৃতীয় মুদ্রণ** জুলাই ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌজন্য চক্রবর্তী

অলংকরণ রাজীব পাল

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

JAGUMAMA RAHASYA SAMAGRA 2

by Tridib Kumar Chattopadhyay

Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

E-mail patrabharati@gmail.com

visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

ISBN 978-81-8374-247-4

সাতাশ বছর ধরে যিনি 'জগুমামা'র

চুলচেরা সমালোচনা করে এসেছেন, সেই

চুমকি চট্টোপাধ্যায়কে

বলতেই হয়

জগুমামার রহস্য কাহিনিদের একত্রিত করে খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশ করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেটা যে শুধু কিশোর-কিশোরী বন্ধুদের নয়, সববয়েসের পাঠকবন্ধুদের কাছে এমন আদৃত হবে, ভাবতে পারিনি।

গত বছর থেকেই জোরালো দাবি উঠতে শুরু করল, 'জগুমামা সমগ্র ২' কবে বেরুচ্ছে! এমনকী ফেসবুক খুললেই পরপর মেসেজ। ছোট-ছোট আলাদা বইয়ে জগুমামা-অনুরাগীদের আর মন ভরছে না।

যথারীতি মুশকিলে পড়লাম। নিজের লেখার ব্যাপারে আমি একটু খুঁতখুঁতে। জগুমামার দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাসগুলোকে কালানুক্রমিক সাজাতে হলে, কয়েকটি লেখাকে আগাগোড়া ঘষামাজা করা দরকার। প্রায় নতুন করে লেখা উচিত এই খণ্ডের প্রথম লেখাটাই। 'সাগর পাহাড় মৌমাছি'।

এই কঠিন কাজটা করতে প্রায় একবছর লেগে গেল। বাকি ছয়টি উপন্যাস, বিশেষত মূর্তি ও মৃত্যুফাঁদ (নামটাই পালটে গেছে), সাক্ষী ছিল ছবি, রহস্য রাতের পদ্মায়...সবক'টাকেই ভাষা, পরিচ্ছেদ, উপস্থাপনা অনেকখানি পালটেছি। চেষ্টা করেছি, ওদের আরও টানটান, আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার।

অবশেষে 'জগুমামা রহস্য সমগ্র ২'। বন্ধুদের কাছে আমি অগ্রিম আপাদমস্তক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি। আমি সত্যিই কৃতার্থ।

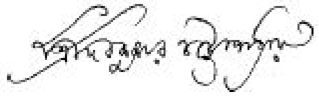

২১ নভেম্বর ২০১৩

কলকাতা ৭০০০০৯

লেখকের অন্যান্য বই

জগুমামা রহস্য সমগ্র ১

অনন্তবাবু কোথায়?

বিষাক্ত রাত

গোপন প্রেমের গল্প

তুমি, পিতামহ ভীষ্ম

ভয়ের আড়ালে ভয়

ভৌতিক অলৌকিক

রহস্যেঘেরা রাক্ষসখালি

অসি বাজে ঝনঝন

আরবি পুঁথির রহস্য

আজও রোমাঞ্চকর

রক্তরহস্য

লেখকের সম্পাদিত বই

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৫

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

কিশোর ভারতী সেরা সমগ্র

কিশোর ভারতী উপন্যাসসমগ্র

জঙ্গল অমনিবাস

সেরা জোকস ৪০১

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

সেরা পঁচিশ গোয়েন্দা গল্প

সেরা পঁচিশ হাসির গল্প

অপরূপ রূপকথা

ভয়ের গল্প ৫১

হাসির গল্প ৫১

সূচিপত্র

সাগর পাহাড় মৌমাছি

আকাশে মৃত্যুর বিষ

রহস্য রাতের পদ্মায়

মূর্তি ও মৃত্যুফাঁদ

সাক্ষী ছিল ছবি

আলেকজান্ডারের আংটি

আরবি পুঁথি রহস্য

সাগর পাহাড় মৌমাছি

১

ঢং...ঢং...ঢং...।

ঘণ্টা পড়ল। সিগন্যাল সবুজ হয়েছে। উফ! শেষ অব্দি ছাড়ল তাহলে!

ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট। গতকাল চেন্নাই থেকে রওনা হয়ে ভালোই টানছিল মাদ্রাজ মেল। এখানে এসেই বারোটা বাজিয়ে দিল।

লাইনে নাকি গড়বড় ছিল। আজকাল ট্রেনে চাপতেই বুক ঢিপঢিপ করে। কখন কোথায় নাটবল্টু খোলা থাকবে, কি বোম-ফোম গুঁজে রাখবে—ব্যস! সটান ওপরে।

দুলতে-দুলতে এগোলুম নিজের বার্থের দিকে। বেরহামপুরে আমাদের কামরার অর্ধেকের বেশি লোক নেমে গেছে। আমার কুপের সামনের তিনটে বার্থ খালি হয়েছে। দেখি, কারা উঠল! একটাই ভয়, তেমন 'রোরিং' পাবলিক যদি ওঠে তো হয়ে গেল! সারাটা রাত প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে কাটাতে হবে।

রোরিং পাবলিক?—আমি বললাম,—সেটা কী? অনন্ত সরখেল করুণামাখা হাসলেন। বললেন,—সে কী টুকলু, রোরিং মানে জানো না? নাক ডাকা! শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে নাসিকা গর্জন।

আমাদের ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল। শেষ রাজভোগটা মুখে ফেলে চোঁ-চোঁ করে গেলাস সাফ করে দিলেন অনন্ত সরখেল। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে ফের বলতে শুরু করলেন।...

স্বামী-স্ত্রী, বছর খানেকের বাচ্চা। উড়িয়া। বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে গেছে। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে বসেছে।

তিন নম্বর লোকটা বসেছে জানলার ধারে। লম্বা-চওড়া চেহারা, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সাদা ট্রাউজার সাদা শার্ট। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত, মাথায় রামমোহনের পাগড়ি। কোন দেশি রে বাবা!

তুমি তো জানো হিন্দি ইংরিজিটা চালাতে পারলেও উড়িয়া-টুড়িয়া আমার আসে না। বুঝতে অবিশ্যি পারি। ভাবলুম, আলাপ করি।

সেই কাল থেকে কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার তিন টায়ারের বাকি দুটো প্যাসেঞ্জারই ধরাছোঁয়ার বাইরে। আপারে এক মারোয়াড়ি, রোড রোলারের মতো চেহারা। সমানে ঘুমুচ্ছে। সারাদিনে বারতিনেক নেমেছে। খাওয়া আর বাথরুম সেরে আবার উঠে গেছে। মিডিলে এক বুড়ো, আনকা সাউথ ইন্ডিয়ান। হিন্দি-ইংলিশ কিস্যু বোঝে না। আমি গতকাল ইশারায় নীচের বার্থ অফার করেছিলুম, কটকট করে তাকাল।

পাগড়িকে বললুম,—আপ ক্যা ইহাসে উঠা?

পাগড়ি জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল। মুখ না ঘুরিয়ে স্পষ্ট বাংলায় বলল,—আপনার কী মনে হয়?

—আরিব্বাস! আপনি বাঙালি। বেরহামপুরেই থাকেন নাকি?

—না।

—কলকাতায়?

—না।

—তবে?

—গোপালপুর।

—বা:-বা:! গোপালপুর অন সি! কী বিউটি, বলুন?

—হুঁ।

—আপনাকে দেখে বাঙালি ভাবতেই পারিনি। বিশেষ করে আপনার পাগড়িটা খুব ইন্টারেস্টিং!

—আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

—কী যে বলেন মশাই! অসুবিধে হবে কেন? বাঙালি পেলুম। প্রাণ খুলে দুটো কথা কওয়া যাবে।

—দয়া করে অকারণ বকবেন না, বকাবেন না।

এমন দড়াম করে মুখের ওপর কথাগুলো বলল, গা জ্বলে গেল। যাচ্ছেতাই লোক!

হ্যান্ডব্যাগ থেকে হ্যান্ডরাইটিং-এর বইটা বের করে পড়তে আরম্ভ করলুম। ভাগ্নে ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করে, ও-ই দিয়েছে।

বইটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। যে-কোনও লোকের রাইটিং দেখে, লোকটা সম্বন্ধে বলে দেওয়া যায় অনেক কিছু। ছবি দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছে।

কখন যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, খেয়াল করিনি। পাগড়ি কাচ নামাচ্ছে। আমিও নামিয়ে দিলুম।

পাশে সাউথ ইন্ডিয়ান বুড়ো বোয়াল মাছের মতো হাই তুলছে। না:, রাত কম হয়নি। দশটা। মিডল বার্থ তুলে দিলুম।

বেরহামপুরেই পুরি-তরকারি ঠেসে নিয়েছিলুম। টান হয়ে পড়েছি। ট্রেন চমৎকার ছুটছে।

বেশ জমাটি স্বপ্ন। থ্রিলিং। আফ্রিকা ফরেস্টে স্যারের সঙ্গে...পা টিপে-টিপে এগুচ্ছি...স্যারের হাতে রাইফেল...লতাপাতা পা জড়িয়ে ধরছে...

হঠাৎ—সাপ! ডাল থেকে ঝুলে আমার নাকের গোড়ায়।

চোখ মেলতেই—আইব্বাপ! সত্যিকারের সাপ! কামরার নাইটল্যাম্পের নীল আলো শরীরে চকচকিয়ে উঠছে! ওপরের বার্থ থেকে ঝুলছে। দুলছে নাকের ডগায়!

স্বর বেরুচ্ছে না...সা-সাঁ-সাঁ-সাঁ—

তখনই পাগড়ি চেঁচিয়ে উঠল,—ও মশাই কী হল? চেল্লাচ্ছেন কেন? ও মশাই, বোবায় ধরল নাকি? ও মশাই...।

চোখের কোণ স্লাইট ফাঁক করলুম। যা থাকে কপালে, খপ করে ধরলুম।

যাচ্চলে! ধ্যাৎ—একটা ফিতে। ওপরের বুড়োর হোল্ডঅল থেকে ঝুলে পড়েছে। যাচ্ছেতাই ব্যাপার! আরটু হলেই মরে যেতুম।

ঘামে জবজব করছে শরীর। গলা শুকিয়ে কাঠ, ট্রেনও থেমেছে।

ভুবনেশ্বর। এই মাঝরাতেও স্টেশনে বেশ লোকজন।

দরজা খোলার শব্দ পেলুম। দু-চারজন নামল, উঠল।

আবার শুয়ে পড়লুম। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

দুলুনিতে চোখটা বেশ লেগে এসেছে, এমন সময় কার খসখসে গলা,—এই যে গোলকপতি রায়। আমি এসে গেছি।

—ক—কে?

—বা:, চমৎকার! নিজের গিনিপিগের গলা শুনেও চিনতে পারছ না? বেশ, বেশ!

—তুমি...তু-ই!

—চিনতে পেরেছ তাহলে!

—ত—তুই এখানে?

—ভাবতেই পারোনি, কী বলো? চোখে ধুলো দিয়ে পালানো কি অত সোজা গোলকপতি? রেডি হও।

—ক-কী করবি?

—বুঝতে পারোনি? তুমিই বলে দাও, কী করা উচিত।

—আ-আমায় মা-মা-প করে দে। আ-আমি বলছি, ত-তুই ভালো হয়ে যাবি।

—তাই? আমাকে কি এতটাই বোকা ভাবো?

প্রথমে এটাকেও স্বপ্ন ভেবে চোখ বুঁজে ছিলুম, চোখ মেলতে শিউরে উঠলুম। বার্থের মাঝের জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছে কালো পোশাক এক মূর্তি। এই আবছা অন্ধকারেও তার চোখে কালো চশমা, তারপর কালো কাপড়। মাথায় কালো টুপি, বাঁ-হাতে রিভলভার।

অভ্যেসবশে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলুম। সঙ্গে-সঙ্গে কালো মূর্তির ডানহাতের এক রদ্দা।

—কেউ নড়বেন না। এটা আমাদের হিসেব-নিকেশের ব্যাপার। শুধু জেনে রাখুন, এই যে লোকটাকে দেখছেন, লোকে বলে, এ নাকি মহান বিজ্ঞানী। ডাহা মিথ্যে! একটা খুনি, পিশাচ কতজনের জীবন শেষ করেছে! আজ ওকে সেই হিসেব চোকাতে হবে।

বলতে-বলতে কালো মূর্তি পাগড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গোটা কামরা চুপ।

উ: টুকলু,—কী সাংঘাতিক কয়েকটা সেকেন্ড! পাগড়ি আর চশমায় একটা টান মারল মূর্তি, তার কপালে রিভলভার ঠেকাল।

খট!

কাটা গাছের মতো পাগড়ি চিৎ হয়ে পড়ল।

কালো মূর্তি লাফ মেরে বেরিয়ে গেল কূপ থেকে। দরজার হাতল ঘোরাবার শব্দ পেলুম।

—একমিনিট অনন্তবাবু। ট্রেনের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না?

—না। মাদ্রাজ মেলে ছিল না।

—তাহলে চলন্ত ট্রেনে খুনি নামল কীভাবে?

—সেটাই তো তাজ্জব! দিব্যি হাওয়া হয়ে গেল! ব্যস, তারপর সে কী কাণ্ড! হইচই হাউমাউ। চেন টেনে গাড়ি থামানো হল। টর্চ জ্বেলে চারদিক খোঁজা হল। কিন্তু কোনও চিহ্নই নেই খুনেটার। এদিকে—

অনন্তবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন,—কটকে এসে শুরু হল আরেক হ্যাপা! পুলিশ এসে হাজির হল ডাক্তার নিয়ে। বডি চেক-আপ করে হাজার গন্ডা লেখালেখি করল; তারপর স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল। ওদের এক কর্তা পড়ল আমাকে নিয়ে।

—আপনাকে নিয়ে!

—হ্যাঁ। আমি যে আই উইটনেস। তাই সবাইকে ছেড়ে এই ব্যাটাকেই ধর! সে যে কী রগড়ানি! আপনি অত রাত অব্দি জেগেছিলেন কেন? তার মানে আপনি জানতেন ক্রিমিন্যাল আসবে! বোঝো ঠ্যালা! একে আমি তখন আধমরা হয়ে আছি, তারপর সেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

—তারপর?

—তারপর উপায় না দেখে পট্টনায়েকের নাম করলুম। তখন দেখলুম, ঠান্ডা হল। কাগজে সইটই করিয়ে ছেড়ে দিল।

—ওই পাগড়ি, ও কি—

—হ্যাঁ, সায়েন্টিস্ট। অরিজিন্যাল কলকাতার লোক, ক'বছর ধরে গোপালপুরে সেট করেছিল।

—সেট নয় অনন্তবাবু, সেটল।

ও ঠিক আছে। সব সময় ইংরিজির ভুল ধোরো না তো! মহাদিগগজ! শোনো, আজই স্পিডপোস্টে স্যারকে চিঠি পাঠাও। আমি সিওর বলছি—এ একটা ফেরোশাস ক্রিম।

ক্রিম? না ক্রাইম? অনন্ত সরখেল ইংরেজির শ্রাদ্ধ করে যাচ্ছেন।

২

জগুমামা,

জানি না, কাগজে তুমি খবরটা দেখেছ কি না। অনন্তবাবু চেন্নাই থেকে আসার সময়ে ওঁর চোখের সামনে মাদ্রাজ মেলে একটা নৃশংস খুন হয়েছে। নিহত লোকটা একজন বিজ্ঞানী, গোলকপতি রায়। তুমি কি গোলকপতি রায়কে চেনো?

তুমি কি আসতে পারবে? অনন্তবাবু বলছিলেন।

প্রণাম নিও।

ইতি

তোমার টুকলু

খামে মামার ডিমাপুরের ঠিকানা লিখে অনন্তবাবুকে বললাম,—চলুন। পোস্ট করে আসি।

দরজা খুলেছি, বের হতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

অনন্তবাবু লাফিয়ে উঠলেন,—স্যার!

জগুমামা একমুহূর্ত আমাদের দুজনকে দেখলেন। তারপর বললেন,—দুই মক্কেল কোথায় যাচ্ছিলে?

—তোমাকেই চিঠি দিতে। এই যে!

—গোলকপতি রায় খুন?

ওফ স্যার, সত্যিই আপনার তুলনা নেই। জ্যোতিষীর গ্র্যান্ডফাদার স্যার।

এতে আবার জ্যোতিষী আসছে কোথায়?

—জগুমামা হেসে বললেন,—সত্যসাধন পট্টনায়েক মাদ্রাজ মেলের পুলিশ রিপোর্ট আজ ভোরে আমার কাছে ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছে। তদন্তে সাহায্য করার জন্যে রিকোয়েস্ট করেছে। ওই রিপোর্টে ঘটনার সাক্ষী হিসাবে অনন্ত সরখেলের স্টেটমেন্ট রেকর্ডেড। তখনই মনে হয়েছিল, এই মহাপ্রভুই হবেন। তারপর ঢুকতে-ঢুকতে তোমাদের দুজনকে উত্তেজিত দেখে বুঝে ফেললাম।...আগে দিদিকে চায়ের কথা বল।

ড্রইংরুমের সোফায় এলিয়ে বসলেন।

বললেন,—অনন্তবাবু, স্টার্ট করুন।

—কী স্টার্ট স্যার?

—ঘটনাটা বলুন।

অনন্তবাবু শুরু করলেন। অবশ্য মামাকে অত লম্বাচওড়া বলার সুযোগ পাননি। কারণ একটু পরপরই মামা থামিয়ে দিয়েছেন,—কাট শর্ট। তারপর?

মামা একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। খুনিটা গেল কোথায়? চলন্ত ট্রেন! ট্রেন থামতেই তো সবাই নেমে খুঁজেছে।

—ধ্যুৎ! এটা কোনও ব্যাপার হল? যারা ট্রেনে হকারি করে, তারা যেভাবে ঝুলে ঝুলে এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে যায়, খুনিও সেভাবে বেরিয়ে গেছে। ট্রেন স্লো হতেই লাফ দিয়ে নেমে গা ঢাকা দিয়েছে। শোন, আমি আজ রাতেই রওনা দিচ্ছি।

—কোথায়?

—গোপালপুর। টুকলু, তুই কি অফিসে ছুটি পাবি?

—পেতেই হবে। আমি থাকব না, হতে পারে? অনন্তবাবু আপনি?

—কোশ্চেন ডাজ নট অ্যারাইজ।

—মানে? যাচ্ছেন না?

—না যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না!

শহর শেষ হয়ে গেল। এখন দুপাশে সবুজ মাঠ, ধানখেত।

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে গোপালপুর অন সি-র দিকে। পট্টনায়েক আঙ্কেল, জগুমামা ও আমরা। সামনে পাইলট পুলিশ জিপ। ওই জিপে জেলার এস.পি. পারিজা আছেন।

অনন্তবাবু উশখুশ করছিলেন। এবার বললেন,—স্যার, শহরে দেখলাম বেরহামপুর। কিন্তু স্টেশনে ইংরেজি, হিন্দি দুটোতেই ব্রহ্মপুর। ব্যাপারটা কী স্যার?

—কিছুই নয়, বর্ধমান বার্ডওয়ান, কিংবা মেদিনীপুর মিডনাপোর-এর মতো। জায়গাটার নাম আসলে ব্রহ্মপুর। সায়েবদের জিভে আসত না তাই ভেঙে করেছিল বেরহামপুর। এখন স্বাধীন ভারতে পুরোনো নামটা ফিরিয়ে আনা হয়েছে, তবে শহরে এখনও চালু হয়নি।

আমি বললাম,—মামা, তুমি কি গোলকপতি রায়কে চেনো?

—চিনি না বললে ভুল বলা হবে। আমার চেয়ে বছর দশেকের সিনিয়র। সায়েন্স কনফারেন্সে দু-একবার দেখা হয়েছিল। তবে বছর পাঁচেক খবর পাইনি।

—কোন সাবজেক্টের লোক?

—হিউম্যান নিউরোলজি। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বিজ্ঞান। তবে হালে কী নিয়ে রিসার্চ করছিলেন, জানি না।

আকাশ কালো, ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। আমরা গোপালপুর ঢুকে পড়েছি।

দুদিকে দোকানপাট, ছোট বাজার। ছোট ছোট খড়ের কুঁড়ে। এরপর দুদিকে নানান পাকা বাড়ি। হোটেল, হলিডে হোম।

হঠাৎ সামনে সব বাধা উধাও হয়ে গেল। কালো আকাশ দিগন্তে মিশে গেছে কালো জলের মাঝে। অসীম জলরাশি। অজস্র চলমান সাদা রেখা। বাড়ছে কমছে, আবার তৈরি হচ্ছে। ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ। মুগ্ধ চোখে দেখছি।

সাগর বাঁয়ে ফেলে গাড়ি ডাইনে মোড় নিয়েছে। এবার থেমে গেল। বাঁদিকে সাগর। ডানদিকে একটা বেশ পুরোনো আমলের বাংলো বাড়ি। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

কয়েকজন পুলিশ ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

—স্যার, আসুন।

এস.পি. বললেন,—স্যার, ইনি গোপালপুর থানার ও.সি.। সনাতন শতপথী।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

পরমুহূর্তে নাকে এসে ধাক্কা মারল ঝাঁঝালো এবং বোঁটকা গন্ধ! অনন্ত সরখেল কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন,—নিঘঘাৎ ডেডবডি।

একটু পরেই বোঝা গেল। বাঁদিকের ঘরটা ল্যাবরেটরি। সেখানে নানারকমের জীবজন্তু ভর্তি। খাঁচায় বন্দি গিরগিটি, গিনিপিগ, পায়রা। এমন কি একটা জ্যান্ত বাঁদরও শিকলে বাঁধা। আমাদের দেখে বেচারি 'উঁ-উঁ' করে করুণ ডাক ছাড়ল।

ডিসেকশন টেবিলে কিছু শুকনো মরা জীবজন্তু পড়ে আছে। পাশে নানান অ্যাসিড আর কেমিক্যালের বোতল। হলদে রঙের অ্যাসিডের বোতল খোলা। ঝাঁঝ বেরুচ্ছে।

জগুমামা বললেন,—কবে থেকে পুলিশ পোস্টিং?

—কাল থেকেই স্যার। মেসেজ পাওয়া মাত্র সিল করে দিয়েছি।

শতপথী, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,—পারিজা বললেন,—ইনি ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি, ন্যাশনাল সায়েন্টিস্ট। ইনি ওঁর ভাগ্নে অর্ণব ভট্টাচার্য, আর ইনি ওদের বন্ধু অনন্ত সরখেল। ডক্টর মুখার্জি উইথ অ্যাসিস্টেন্স অফ অর্ণব অ্যান্ড সরখেল, ভারতের নানা জায়গায় মিস্টিরিয়াস কেস সলভ করেছেন। আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে হেল্প করেছেন। এবারও পট্টনায়েক স্যার ওঁদের ডেকে এনেছেন। সুতরাং—

খুব ভালো হয়েছে স্যার।—শতপথী বললেন।

জগুমামা বললেন,—মিস্টার শতপথী, কাল থেকে আজ পর্যন্ত গোলকপতি রায় সম্পর্কে কী কী খবর পেয়েছেন?

—খবর যা পেয়েছি, সবই খুব ভালো স্যার। লোকাল লোকজন তো গোলোকবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিপদে-আপদে অভাবে-অসুখে যে গিয়ে দাঁড়াত, কাউকেই ফেরাতেন না, তবে—

—তবে?

—তবে দু-একজন বলল, উনি ইদানীং একটু ভবঘুরে টাইপের হয়ে গেছিলেন। মাঝে-মাঝে দু-তিন উইক কোথাও উধাও হয়ে যেতেন। আবার হয়তো ফিরে এসে থাকলেন কিছুদিন। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, প্রতিবারই যাওয়ার সময় কাজ দেওয়ার কথা বলে একজন লোকাল লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ফিরে এসে বলতেন, কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে লোক আর ফিরত না।

—ওদের আত্মীয়রা কিছু বলত না?

—বলত। উনি টাকা দিয়ে বলতেন, মাইনের টাকা পাঠিয়েছে। এখন ছুটি পাচ্ছে না। আসলে কী জানেন, এখানকার লোকরা খুবই গরিব। নির্বিরোধী। দু-তিনমাস তো সিজন। বাকি সময় একবেলা খেয়েই কাটায়।

টাকা পেয়ে ওরা অত মাথা ঘামাত না।

—হুঁ! তেমন কাউকে পাওয়া যাবে?

—জেলে-বস্তিতে খোঁজ করলেই হবে।

তবে হাতের কাছে আরেকজন আছে স্যার।

—কে?

—একটা বাচ্চা ছেলে। কাছেই থাকে। ওঁর কাছে ফাইফরমাশ খাটত। কাল আমরা এখানে ঢুকতেই ভীষণ চেঁচামেচি করছিল। কিছুতেই আমাদের বাড়ি বন্ধ করতে দেবে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ স্যার। ওর বাবা-মাকে জিগ্যেস করে জানলাম, কিছুদিন হল এরকম লুনাটিক হয়ে গেছে। ওকে ডাকব স্যার?

—একটু পরে।

জগুমামা এবার ডানদিকের দরজা ঠেললেন। ঘর খুলে গেল।

৩

ঘরে ঢুকতেই হালকা ঠান্ডায় শরীর জুড়িয়ে গেল। জগুমামা বললেন,—বাহ! বিজ্ঞানীর শয়ন মন্দির একেবারে এয়ারকন্ডিশনড। মেশিন চালু রেখে দিয়েছেন?

—না স্যার। এ ঘরে মেশিন-টেশিন কিছু নেই।

সে কী!—জগুমামা ভ্রু কুঁচকে বললেন,—ঠান্ডা হচ্ছে কীভাবে?

—সেটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার স্যার। গোটা ঘর তোলপাড় করেছি, কোথাও ওইরকম কিচ্ছু পাইনি। কালও এরকম ঠান্ডা-ঠান্ডা ছিল, আজও আছে।

তাই?—জগুমামা থমকে দাঁড়ালেন।

অনন্ত সরখেল ফিসফিস করে বললেন,—কী বুঝছ টুকলু? নির্ঘাৎ ঘোস্ট!

—আবার ভূত এল কোত্থেকে?

—আ:! দেখছ না, এই ভ্যাপসা গরমেও কেমন ঠান্ডা! ঠিক লাশকাটা ঘর!

অনন্তবাবুর ইম্যাজিনেশনের তুলনা নেই!

ছোট সাদামাটা ঘর। সাধারণ আসবাবপত্র। এককোণে একটা তক্তপোশ। দড়িতে ঝুলছে গামছা, গেঞ্জি লুঙি, শার্ট। বিছানার ওপর পড়ে আছে দুটো প্যান্ট। অন্য কোণে স্টিলের ছোট আলমারি। পাশে টুলের ওপর একটা ছোট টব। টবে একটা বেঁটেখাটো গাছ। আলমারির এপাশে টেবিল-চেয়ার।

জগুমামা আলমারির হ্যান্ডেলে চাপ দিলেন, শতপথী বললেন,—বন্ধ স্যার। খুলে দিচ্ছি। গতকালই চাবি বানিয়েছি।

—কী আছে দেখেছেন?

—কাগজপত্র, নানান রকম যন্ত্রপাতি।

আমি তখন টেবিলে ঝুঁকে বই, খাতাপত্র হাতড়াচ্ছি, টেবিলে ডাঁই করা একগাদা বিদেশি সায়েন্স জার্নাল, অ্যানাটমির বই। নোটশিট, নানাধরনের চার্ট, ডায়াগ্রাম। কিছু কম্পিউটার পেপার।

হঠাৎ টেবিলের মাঝখানটায় চোখ পড়ল।

—মামা, এদিকে এসো।

—কী রে?

টেবিলের চৌকোনো কাচের তলায় এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা—

মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই
ওই ফুল ফুটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

দাঁড়াতে তোমায় হবেই মৌমাছি। এত সহজে ছড়ছি না।

জগুমামা বললেন,—কার যেন ছড়াটা?

ছোটবেলায় পড়া। বিহারীলাল...হেমচন্দ্র?...উঁহু...ইয়েস! নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের। কিন্তু...এখানে লিখে রাখল কেন?

বলতে বলতে ঝটঝট করে টেবিলের দুটো ড্রয়ার টান মারলেন। কিছু খুচরো টাকাপয়সা, পেন, পেন্সিল, ছুরি...।

—না, এখানে কিছু নেই। আলমারিতে দেখি।

আলমারি হাট করে খোলা। ওপরের তাকে জামাকাপড়, চাদর এসব। পরের সবকটা সেলফে অদ্ভুত চেহারার সব যন্ত্রপাতি। তাদের মধ্যে নানানরকমের মাইক্রোস্কোপ গুলোকে শুধু চিনতে পারলাম।

লকারের ভিতরে এককোণে ব্যাঙ্কের পাশবই, চেকবই। পঞ্চাশটাকার এক বান্ডিল নোট। আর বাকি সমস্ত জায়গাটা খুদে-খুদে শিশি, টেস্টটিউব, অ্যাম্পুল। লিকুইড সব কেমিক্যালস!

জগুমামা প্রত্যেকটা শিশি বের করে দেখছেন। হঠাৎ কপালে ভাঁজ পড়ল।

—এই তো!

—মামার হাতে একটা মুখবন্ধ শিশি!

—কী পেলেন ডক্টর মুখার্জি?

—মৌমছি-মৌমাছি কোথা যাও নাচি-নাচি!

শিশির একেবারে নীচে পড়ে আছে একটা বড়সড় সাইজের মৌমাছি।

—এ যে মরা মৌমাছি মামা!

—তবেই বোঝো। এত যত্ন করে শিশিতে ভরে রেখে দিয়েছেন। ছড়া লিখেছেন। সে কি এমনি এমনি? আমি সিওর, অন্য কোনও ব্যাপার আছে।

পট্টনায়েক, এটা রাখছি।

তারপর বললেন,—চলুন, এবার বেরোনো যাক। শতপথী, ওই ছেলেটিকে এবার ডাকুন।

—আহ! ছেড়ে দাও! শুধুমুদু নিয়ে যাচ্ছ আমায়। তোমরা শয়তান! কিছু বলব না! ছেড়ে দাও—আহ!

কিছুদূর থেকে কচিগলার চিৎকার।

উঁকি মেরে দেখি, তেরো-চোদ্দো বছরের একটি ছেলেকে চারজন পুলিশ টানতে-টানতে ধরে নিয়ে আসছে। ছেলেটা ওড়িয়া ভাষায় সমানে গালিগালাজ করছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে।

মামা দ্রুত এগিয়ে গেলেন। বললেন,—ছাড়ুন। ওকে ছেড়ে দিন। জোর করে টেনে আনছেন কেন?

—কিছুতেই আসছিল না স্যার। অনেক বুঝিয়েছি, শুনতে চাইছে না।

—আহা, না হয় আমরাই যেতাম, ওর বাড়ি, বলতে-বলতে জগুমামা গিয়ে দাঁড়ালেন ছেলেটির পাশে। ওর চুলে হাত বুলিয়ে ভাঙা ওড়িয়ায় বললেন,—ভাই, কিছু মনে কোরো না। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি।

—কী কথা? আমি কোনও কথা তোমাদের বলব না।

—বোলো না। কিন্তু তোমার নামটা তো বলবে।

—ছেলেটা মামার দিকে তাকাল। একটু থেমে বলল,—শঙ্কর, ব্যস!

—শঙ্কর? বা:, ভারি সুন্দর নাম। শঙ্কর কার নাম জানো তো? দেবতাদের দেবতা শিবের।—জগুমামা মধুর হেসে বললেন,—ভাই শঙ্কর, তুমি এরকম করছ কেন? কী দু:খ তোমার?

—দু:খ? কাঁচকলা! তোমরা সব বাজে লোক। শাস্তি পাবে।

—কেন ভাই? কী খারাপ কাজ করেছি আমরা?

কী করেছ, জানো না?—শঙ্করের চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠল,—ন্যাকা! লজ্জা করে না তোমাদের? আমার ছোট বন্ধুদের জিনিস আটকে রেখেছ! তোমরা শেষ হয়ে যাবে, কেউ বাঁচবে না।

—কে তোমার ছোট বন্ধু শঙ্কর?

শঙ্কর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

ঘৃণাভরা চোখে তাকাল মামার দিকে।

—খু-ব চালাক, তাই না? আমি বলে দিই, আর তোমরা গিয়ে হামলা করো। বুঝেছি। নিজে না এসে এবার শয়তানটা তোমাদের পাঠিয়েছে।

—কে শয়তান, শঙ্কর?

—জানো না? সব মিছে কথা। কোথায় ওই পাজিটা, তপ্তপানিতে? বাঁচবে না। বন্ধুদের খবর দিয়ে দিয়েছি। ওর রেহাই নেই,

—তপ্তপানি?

—হ্যাঁ, তপ্তপানি। জানো না, তোমাদের গুরু ওই শয়তানটার ওখানেও একটা ডেরা আছে। ওখানেই যাও।

বলেই হাঁটা দিল শঙ্কর।

একদম পাগল!—এস.পি. নীচু গলায় বললেন।

না পারিজা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না।—জগুমামা বললেন,—দু:খ-কষ্টে ছেলেটা পাগলের মতো হয়ে গেছে, কোনও এক শয়তান ওর বন্ধুদের পেছনে লেগেছে। কিন্তু কে সে?

—এ তো খুব সোজা স্যার। ওই কালো পোশাকের খুনিটা।—অনন্তবাবু বললেন।

—তাই কি? দেখা যাক। মিস্টার পারিজা, তপ্তপানি কোথায়?

—এখান থেকে ঘণ্টা আড়াইয়ের জার্নি স্যার। পাহাড়ের ওপরে। বনের মাঝে একটা হট স্প্রিং আছে। টুরিস্ট স্পট। বনপাহাড়, নিরিবিলি। খুব সুন্দর জায়গা।

—ওখানে যেতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে শঙ্করের সেই শয়তানের ঘাঁটি। তবে আজকে আমরা গোপালপুরেই থাকব। এই বাড়িতে রাত কাটাব।

আইব্বাপ!—অনন্ত সরখেল তিড়িং করে উঠলেন। বললেন,—এখানে স্যার? এই লাশকাটা বাড়িতে?

জগুমামা হেসে বললেন,—না না। সবাইকে থাকতে হবে না। আপনি হোটেলেই থাকবেন। আমরা দু-একজন থাকব। সঙ্গে আর্মসও থাকবে। শতপথী, ঠিক বিকেল থেকে সমস্ত পুলিশ গার্ড তুলে দেবেন। খবরটা ছড়িয়ে দিতে হবে, বাড়ি এখন ফাঁকা। কেবল আমরা ঢোকার পর বাইরে থেকে সামনের দরজায় বড় তালা আটকে দেবেন।

—স্যর, বাথরুমের পিছনদিকে আরেকটা ঢোকার দরজা আছে।

—ওটা খোলাই থাকবে। ক্লিয়ার? আমরা কী করতে চাইছি, বুঝতে পারছেন?

—ইয়েস স্যর।

৪

এখন সন্ধে সাতটা পনেরো। প্রথম ঘরটায় আমরা তিনজন বসে আছি। জগুমামা, পট্টনায়েক ও আমি।

বলা বাহুল্য, সব আলো নেভানো। মিশকালো অন্ধকার। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু সমুদ্রের চাপা গর্জন।

এখন অন্ধকার অনেকটা চোখে সয়ে গেছে। তাছাড়া একদিকের একটা জানলা সামান্য খোলা ছিল। বাইরের একচিলতে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরের দেওয়ালে। পট্টনায়েক চোখ বুজে আছেন।

ভদ্রলোকের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা। যে-কোনও পরিবেশে যখন তখন ঘুমিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু খুব সজাগ, টোকা মারলেই উঠে পড়েন তক্ষুনি।

মামা একের পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছেন।

জগুমামার এ এক অদ্ভুত অভ্যেস। আগেও মামার সঙ্গে এরকম অবস্থায় থেকেছি। আমি উশখুশ করেছি, মামা একদম নিশ্চুপ। শুধু টেনশন কমাতে সিগারেটের পর সিগারেট।

আমার নিজেকে নিয়েই হয়েছে জ্বালা! কী যে করি? এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোবা হয়ে পথরের মতো বসে থাকা যে কী কষ্টকর!

দুপুরে মামার কথায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। এখন চোখ বুজে কোনও লাভ নেই।

ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, মামা একমনে সেই 'হ্যান্ডরাইটিং'-এর বইটা উলটে পালটে দেখছেন। আর মাঝে মাঝে বিজ্ঞানী গোলকপতির কাগজপত্রগুলো পড়ছেন।

আমি টেবিলের কাছে যেতেই বলেছেন,—ভারি ইন্টারেস্টিং!

—কোনটা? এই বইটা, নাকি ডক্টর রায়ের রিসার্চ?

—দুটোই। আগে হাতের লেখাটা দ্যাখ। T-এর মাথাটা কীভাবে কেটেছে দেখেছিস? লম্বা ছুরির মতো, একটু বেঁকা। অনন্তবাবুকে থ্যাঙ্কস দিতে হবে। ওনার ভাগনের দেওয়া বইটা পড়ে মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে বেশ খানিকটা আন্দাজ করা যায়। কত কী-ই যে জানার আছে রে!

—বইটা কি আদৌ ডিপেন্ডেবল মামা? মানে হাতের লেখা দেখে কে কেমন লোক বলে দেওয়া কি সম্ভব?

—সম্ভব। পুরোটা না হলেও অনেকটা। হ্যান্ডরাইটিং ক্রিমিনোলজি সায়েন্সের একটা বড় চ্যাপটার। লালবাজার, ভবানী ভবনের গোয়েন্দা দফতরে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট আছেন। বইটা পড়ে আমারও প্রচুর জ্ঞান হল। দেখি মিলে যায় কি না।

—কী বুঝলে? লোকটা কেমন ছিল?

—নোও টুকলু। এখনই কিছু জানতে চেয়ো না।

—ঠিক আছে। ভদ্রলোকের রিসার্চ নিয়ে অন্তত বলো।

—পুরোটা তো পড়িনি। তবে যেটুকু বুঝেছি, ইন্টারেস্টিং। আমাদের শরীরে যে নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র আছে, তারাই সমস্ত শারীরিক অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। ধর, এই যে পেনটা, এর ওপর আঙুল বুলিয়ে তোর কী মনে হচ্ছে?

—বেশ প্লেন, স্মুথ।

অর্থাৎ তোর আঙুলের ডগায় যে সেনসরি অর্গান আছে, সে স্নায়ু মারফত তোর ব্রেনে খবর পাঠাল, এটা সমান, এবড়ো খেবড়ো নয়। তুই হয়তো ব্যথা পেলি শরীরের কোনও জায়গায়, সেই ব্যাপারটাও তাই।...

—বুঝেছি।

—ধর, এই খবরটা যদি না যায় বা উলটো পালটা যায়, তখন কী হবে?

—সব গোলমাল হয়ে যাবে। ব্যথা পেলে বোঝাই যাবে না। বা মনে হবে, আরাম লাগল।

—রাইট! গোলকপতি এই ব্যাপারটা নিয়েই গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। এবং মনে হয়, মানুষের ওপরও এক্সপেরিমেন্ট করেছেন।

—বলো কী?

হ্যাঁ। যেটুকু ঘেঁটেছি, তাতে তাই মনে হচ্ছে। তবে পুরোপুরি সফল হয়েছে কি না বলতে পারব ন। যুগান্তকারী গবেষণা—বুঝলি! লোকটা অকালে খুন হয়ে গেলেন! কিন্তু কে খুন করল? কেন? গবেষণা চুরি করতে? তাহলে তো কাগজপত্রগুলো পড়ে থাকত না!

তারপর থেকে মাথার মধ্যে ঘুরছে কথাগুলো! কে? কেন?

—কীরে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

—নাহ! ভাবছিলাম।

—নটা বেজে গেছে। তার আসার সময় হয়ে গেছে।

—কার? কেন আসবে?

—তার জিনিস যদি এখানে থাকে। তবে কী জানিস, এর সবটা আমার অনুমান। ভুলও হতে পারে। তোর মনে আছে, বেতলায় তাঁবুতে বা ধর চাঁদিপুরে।

সামনের দরজার তালাটা নড়ে উঠল। আগন্তুক তালা ধরে নাড়াচাড়া করল, কড়া ধরে বারকয়েক ঝাঁকাল, মোচড়াল। তারপর থেমে গেল। পট্টনায়েক উঠে বসেছেন।

—এবার পিছনের দরজা দিয়ে চেষ্টা করবে।

—এমনি চোরও তো হতে পারে ডক্টর মুখার্জি। জানে এখানে জিনিসপত্র, টাকাকড়ি পাবে।

—হতে পারে। তবে আমি না বলা পর্যন্ত আপনারা একদম এগোবেন না।

মামার অনুমান আবার নির্ভুল প্রমাণিত হল। পিছনের দরজায় ঝনাৎ! ছিটকিনি খুলেছে।

আমরা দ্রুত ঘরের কোণে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার এক শরীর ঢুকে পড়েছে।

আমরা দম আটকে আছি।

আগন্তুক এ ঘর পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। এই বাড়ি ওর খুব পরিচিত।

মামা উঠে পড়েছেন। পা টিপে-টিপে এগোচ্ছেন।

ঘটাং! আলমারি খোলার শব্দ।

এবার চাদরের খসখস।

খুট! দপ করে শোবার ঘরের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। জগুমামার গলা,—তুমি! কী খুঁজছ?

এভাবে কেন? একবার বললেই তো—

মামার কথা শেষ হল না। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ফোঁস-ফোঁস করে তেড়ে এল শঙ্কর! ওর হাতে ভোজালি।

মামা সরে গেলেন। চকিতে পা বাড়িয়ে দিলেন, শঙ্কর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভোজালিটা দূরে ছিটকে গেল।

আমরা আগেই ঢুকে পড়েছি ঘরে। ওইটুকু ছেলেকে সামলাতে আমি একাই যথেষ্ট।

মামা কিন্তু আদৌ উত্তেজিত হননি। ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়ানো শঙ্করের কাঁধে হাত রেখে বললেন,—শঙ্কর, আবার বলছি, আমরা তোমার দুশমন নই।

—আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা শহরের লোকেরা বদমাশ। আমায় পুলিশে দেবে তো? দাও।

—না-না। পুলিশে দেব কেন? তুমি এখানে কী নিতে এসেছিলে? যা খুশি, নিয়ে যাও।

শঙ্কর মুখ তুলে তাকাল। ওর চোখে আলোছায়া। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মামার চোখের দিকে।

—যাই চাই, নিয়ে যেতে দেবে?

—হ্যাঁ।

কিন্তু....কিন্তু আসলঃজিনিসটা যে খুঁজে পাচ্ছি না। শয়তানটা কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে!

আচ্ছা...আচ্ছা, ওই গাছটা আমায় দেবে?

—স্বচ্ছন্দে। নিয়ে যাও।

শঙ্কর অবিশ্বাসী চোখে আবার দেখল আমাদের। তারপর ছোট্ট সেই টবের গাছটা জড়িয়ে ধরল।

—শঙ্কর! একটা কথা বলবে? এই গাছটা নিচ্ছ কেন?

—এটা আমার তাই! শয়তানটা ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল। কিছুতেই দিচ্ছিল না।

—গাছটা দিচ্ছিল না!

—হ্যাঁ। এটা সাধারণ গাছ নয়। যাদু গাছ। আমার ছোট্ট বন্ধুরা আমায় বিচি এনে দিয়েছিল। সেই বিচি মাটিতে পুঁতে আমিই গাছটা করেছি।

—যাদু গাছ?

—হ্যাঁ। এই গাছটা ঘর ঠান্ডা করে।

—সে কী!!!

আমরা হতভম্ব।

—বিশ্বাস করলে না তো? ওই শয়তানটাও প্রথমে করেনি। ঠিক আছে। গাছটাকে আমি এই ঘর থেকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

শঙ্কর টব নিয়ে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘরে রেখে এঘরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল।

কয়েকমিনিট যেতে না যেতেই—কী আশ্চর্য! গরম লাগতে শুরু করেছে।

একটা গাছ ঘরের গরম বাতাস টেনে নিয়ে ঠান্ডা বাতাস ছাড়ছে!

—কী, এবার বিশ্বাস হয়েছে? এ গাছ এখানকার নয়। আমার বন্ধুরা নিয়ে এসেছে অনেক অনেক দূর থেকে।

—শঙ্কর! একটা অনুরোধ করব? গাছটা তোমার। দু-একদিনের জন্যে আমায় ধার দেবে। একটু ভালো করে দেখব গাছটাকে।

শঙ্কর সন্দেহের চোখে তাকাল। বলল,—মেরে ফেলবে না তো?

—এটা কী বলছ? এমন একটা আশ্চর্য গাছ, তাকে মেরে ফেলব?

—ঠিক আছে। তারপরে কিন্তু,

—নিশ্চয়ই। তুমি গাছ নিয়ে যাবে। শঙ্কর তোমার ছোট বন্ধুরা কারা, বলবে?

—উঁ-হুঁ!...তাছাড়া আসল জিনিসটাই যে পাচ্ছি না। আমি কিন্তু দেখেছিলাম, শয়তানটা ওই আলমারিতে রেখে ছিল!

মামা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন।

৫

অ্যাই টুকলু, ওঠো। অনেক ঘুম হয়েছে। দশটা বাজতে চলল!

সামনে অনন্ত সরখেল। আকর্ণবিকশিত হাসি।

পারও বটে ঘুমোতে! কী মড়াঘুম রে বাপু!

এখনও মাথা জ্যাম হয়ে আছে। কাল ফিরতে ফিরতে রাত দুটো বেজে গেছিল।

—মামা কোথায়?

—স্যার? স্যার ভোরবেলা উঠে পট্টনায়েককে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বললেন,—ফিরতে দুপুর হবে।

—ও। কোথায় গেছেন?

—বলেননি। কাল বোধহয় আমরা তপ্তপানি যাব। স্যার বললেন।

—আপনি এতক্ষণ কী করলেন?

—আমি? আমি আর কী করব, গোটা গোপালপুর টহল দিলুম। সি-বিচ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে বহুদূর চলে গেছলুম। পুবের লাশকাটা বাড়ি পেরিয়ে জেলে-বস্তি অব্দি। সার-সার ডিঙি ছাড়ছিল। দু-একটা বড় ট্রয়ালও ছিল সেখানে—

—ট্রয়াল!

—ট্রয়াল জানো না! মাছ ধরার বড় লঞ্চ।

—উফ, অনন্তবাবু! ট্রয়াল নয়, ওটা ট্রলার।

—ওই হল গে। জেলে-বস্তিতে পাগড়ি-বিজ্ঞানীটার খোঁজখবর নিলুম, ওকে সবাই চেনে। শতপথীর খবরটা ঠিক। লোকটা বেশ অদ্ভুত গোছের।

দু-তিনজন লোককে কাজের কথা বলে নিয়ে গেছিল। তারা ফেরেনি। আর—

—আর?

—আর পাগড়ির নাকি এক সারাক্ষণের অ্যাসিস্টান্ট ছিল। এই উড়িষ্যারই লোক। দিবাকর। সে ছিল, যাকে বলে কনটাক ম্যান। মাস দেড়েক সেও আসছিল না। হপ্তাখানেক আগে একবার এসেই চলে গেছিল। বিজ্ঞানী কিন্তু আসেনি।

—বা:! প্রচুর ইনফরমেশন! কিন্তু বিজ্ঞানীর খুনটা বলে ফেলেননি তো?

—মাথা খারাপ তোমার? অনন্ত সরখেল অত কাঁচা কাজ করে না। আমি স্রেফ বললুম, ওনার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বেড়াতে এসে খোঁজ করছি। নাও, চটপট হাতমুখ ধুয়ে রেডি হও। খিদেয় নাড়ি জ্বলছে।

বাথরুম থেকে জগুমামার গলা পেলাম,—আপনি একা! টুকলু কই?

—বাথরুমে। সবে ঠেলে তুললুম।

বেরিয়ে দেখি, মামা চোখ বুঁজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ডানহাতে জ্বলন্ত সিগারেট, বাঁ-হাতে টেবিলে টোকা মারছেন।

পায়ের শব্দে তাকালেন। চোখ দেখে বুঝে গেলাম অনেকটা জট ছাড়িয়ে ফেলেছেন।

—বুঝলি, পর পর সাজাতে হবে। একটা পয়েন্টে এসে বারবার আটকে যাচ্ছি। খুনের মোটিভ কী?

—বাকি সব? যাদু গাছ, শঙ্করের বন্ধু—?

—যাদুগাছের ব্যাখ্যা পেয়ে গেছি। বাবলুকে খবর দিয়েছি, কাল ভোরেই ও এসে পড়ছে। আর 'ছোট বন্ধুর' ব্যাপারটা অনুমান করছি, এখনও কনফার্ম নই।

—বাবলু! বাবলু কে?

—সে কী রে! বাবলু মামাকে ভুলে গেলি? কৃষ্ণকুমার রাস্তোগী। বটানির প্রফেসর।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সরি। তা বাবলু মামা কিছু বললেন? গাছটার ব্যাপারে?

—হ্যাঁ। ও ফোনে কিছুটা এক্সপ্লেন করল।

কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজলেন জগুমামা। তারপর বললেন,—গাছের ব্যাপারটা জানিস তো? দিনের বেলায় সূর্যের আলোর সাহায্যে গাছ নিজের খাবার তৈরি করে। বাতাস থেকে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। ছাড়ে অক্সিজেন। সেজন্যেই গরমকালে বড় গাছের ছায়ায় বসলে শরীর জুড়িয়ে যায়। পিওর অক্সিজেন আমাদের চাঙ্গা করে তোলে। রাতে ঠিক উলটো—আমাদের মতোই গাছ শ্বাস নেয় অক্সিজেন, ছাড়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। রাতে তাই গাছের তলায় ঘুমোনো খুব খারাপ। বুঝেছিস?

—জানি। তারপর?

—ধর, যদি কোনও আশ্চর্য গাছ তার পাতায় কাণ্ডে সোলার ব্যাটারির সাহায্যে সূর্যশক্তি জমিয়ে রাখতে পারে? তাহলে সবসময়ই সে খাবার তৈরি করতে পারে, পিওর অক্সিজেন ছাড়তে পারে। তাছাড়া মরুভূমি অঞ্চলের বহু গাছ বাতাসের তাপ শুষে নিতে পারে। এই দুটো প্রপার্টি যদি কোনও প্রজাতির গাছে থাকে, তবে সে ন্যাচারাল এয়ারকন্ডিশনার হয়ে উঠবে।

—এরকম গাছ কি আদৌ আছে?

—আছে যে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছিস। এতবড় পৃথিবী, কতটুকু বা জেনেছি আমরা। কোনও রিমোট পাহাড়ি জঙ্গল বা মরুভূমির কোথাও নিশ্চয়ই রয়ে গেছিল ওই অচেনা অর্কিডজাতের গাছ। শঙ্করের বন্ধুরা এনে দিয়েছে।

—আরিব্বাস! মামা, এ তো দারুণ আবিষ্কার! চারদিকে হইহই পড়ে যাবে। ন্যাচারাল এয়ারকন্ডিশনার অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার ট্রি!

রাইট।—মামা হেসে বললেন,—টুকলু, গাছটা শেষপর্যন্ত বেঁচেবর্তে থাকবে তো?

—কেন মামা হঠাৎ একথা বলছ কেন? বিচি থেকে গাছটা হয়েছে, এখনও দিব্যি বেঁচে আছে, বাড়ছে।

—কী জনি।...যাই দেখি পট্টনায়েক ফিরল কি না। কাল তপ্তপানি যেতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললাম,—মামা, শিশি থেকে মৌমাছি বের করেছিলে? ওই ছড়া আর মৌমাছি, ওটা আরেক রহস্য, তাই না?

জগুমামা যেতে যেতে বললেন,—হুঁ।

আজ রাতে মামার ইচ্ছে, তাই শোবার ঘর বদল হয়েছে, পট্টনায়েক আঙ্কেল শুতে গেছেন অনন্তবাবুর সঙ্গে। আমি আর মামা একঘরে।

আজ সারাদিন নতুন কিছু ঘটেনি। শুধু ডক্টর গোলকপতি রায়ের মৃত্যুর ফোরেন্সিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে রিভলভার দিয়ে আততায়ী তাঁর কপালে '০' দূরত্বে গুলি করেছে, সেটা জার্মান মাউজার কোম্পানির। আজকাল ওই রিভলভার পাওয়া যায় না।

দেখা যাচ্ছে, ডক্টর রায়ের পার্সোনাল একটা লাইসেন্স রিভলভার ছিল। সেটাও ওই কোম্পানির। রিভলভারটা মিসিং। তাহলে কি ওই রিভলভার দিয়েই তাঁকে খুন করেছে আততায়ী?

জগুমামা বলেছেন,—হতেই পারে।

অনন্তবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন, আততায়ী গোলকপতির খুব পরিচিত।

আজ শঙ্কর একবার হোটেলে এসেছিল। ওকে অনেকটা সুস্থির মনে হল। চাবি নিয়ে ডক্টর রায়ের বাড়ি গেছে। সঙ্গে আমিও ছিলাম। ঘর খুলে গাছটাকে দেখেছে, হাত বুলিয়ে আদর করেছে। তারপর আবার খুঁজেছে ঘরগুলো। ও কী যে খুঁজছে কে জানে?

রাতের ডিনার সেরে আমরা ঘরে। খাটে আধশোয়া হয়ে বললাম,—মামা, হঠাৎ ঘর পালটালে কেন?

মামা হেসে বললেন,—রাতে হয়তো অলৌকিক কোনও ঘটনা ঘটবে। এখনই অন্য কাউকে দেখাতে চাই না।

—অলৌকিক?

—হ্যাঁ। তুই সকালে আমায় মৌমাছির কথা বলেছিলি না?

—হ্যাঁ।

—সারা দুপুর ধরে আমি ওটাকে পরীক্ষা করেছি। খালি-চোখে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায়, তারপর মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলেও দেখেছি। কী দেখেছি জানিস?

—কী?

—ওই মৌমাছিটা আদৌ কোনও জীবন্ত প্রাণী নয়।

—সে কী!

—ঠিক বলছি।

—ওটা তাহলে কী?

—ওটা যে ঠিক কী, এখনও ঠিক বুঝিনি। তবে এটুকু বলতে পারি, একটা খুদে যন্ত্র। মৌমাছির মতো ডানা আছে। ভিতরে অজস্র সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। শুঁড় দুটো হয়তো মেটালিক অ্যান্টেনা।

প্রবল উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। কী বলছেন মামা? এ কোন রহস্যের দিকে এগোচ্ছি?

কয়েক সেকেন্ড লাগল ঝটকা সামলাতে। তারপর—এখন কী করবে?

একটা পরীক্ষা করব।—জগুমামা বললেন,—মনে হচ্ছে, ওই যন্ত্রটা কোনও অটোমেটিক উড়ন্ত যান, যার রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে অন্য জায়গায়। কাচের শিশির মধ্যে বন্দি থাকায় সিগন্যাল রিসিভ করতে পারছে না। সুতরাং একটু পরেই উহুঁ!

—তার আগে আরেকটা কাজ আছে।

ব্রিফকেস থেকে একটা ফুলস্কেপ সাদা কাগজ বার করলেন। স্কেচ পেন দিয়ে বড়-বড় ক্যাপিটাল হরফে তাতে লিখলেন—

WE ARE FRIENDS

WE WANT TO MEET YOU

সব গুলিয়ে গেছে। আমি বেকুবের মতো মামার কাণ্ড দেখে যাচ্ছি। মামা হাসলেন। আমার পিঠে আলতো করে চাপড় মেরে বললেন,—ভাগনে! চোখকান খোলা রেখে শুধু দেখে যা।

খাটে বসে দেখলাম, মামা জানলাগুলো বন্ধ করলেন, শিশি থেকে 'মৌমাছি' বের করে রাখলেন টেবিলে, কাগজটার ওপরে। তারপর সব আলো নিভিয়ে দিলেন।

নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেছে ঘর। ফ্যানের আর ঢেউয়ের হালকা গর্জন ভেসে আসছে। উত্তেজনায় শরীরে কাঁটা ফুটছে।

নিস্পন্দ সময় চলে যাচ্ছে...পাঁচমিনিট...দশ...পনেরো...কুড়ি...পঁচিশ মিনিট...

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

টেবিলের এক জায়গায় জ্বলে উঠেছে সবুজ আলো! আলোটা স্থির নয়। আস্তে-আস্তে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

ভালো করে দেখতেই কাঁপুনি এল। এ তো সেই নির্জীব মৌমাছিটা! ওর শরীর দিয়ে আলো বেরুচ্ছে! কী তীব্র আলো, গোটা ঘর ভরে উঠেছে সবুজ আভায়।

মামা এগোলেন। আমিও।

টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়েছি।

গুড়গুড় করছে 'মৌমাছি'টা শুঁড় দুটো কাঁপছে থর থর করে।

ঈঁ-ঈঁ-ঈঁ-ঈঁ...একটানা ক্ষীণ ধাতব শব্দ।

হঠাৎ তার আলো নিভে গেল!

জগুমামা সুইচ টিপে দিলেন। নিয়নের আলো। যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এলাম বাস্তবে। এতক্ষণ যা দেখলাম, তা কি সত্যি?

মামা ফিসফিস করে বললেন,—ভাগনে!

এ ঘটনা তুই আর আমি ছাড়া কেউ জানছে না।...এই দ্যাখ!

বিস্ময়ে আবার কেঁপে উঠেছি। মামার লেখা কাগজটার তলায় একইরকম হরফে কেউ লিখে গেছে—

COME TO HOT SPRING

আমি হাঁ হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে আছি। মামা বললেন,—কীরে, বুঝতে পারছিস না? হট স্প্রিং-এর বাংলা হচ্ছে উষ্ণ প্রস্রবণ।

এখানে গরম জল কোথায় আছে?

—তপ্তপানি।

—রাইট! এতক্ষণে আমার ভাগনের বুদ্ধি খুলে গেছে। কাল ওখানে আমাদের যাওয়ার প্ল্যান তাহলে মিলে গেল।

৬

বেশ মজার নাম। ইংরেজিতে লেখা—Dighapahandi। বাংলায় স্বচ্ছন্দে দীঘাপাহাড়ি করে নেওয়া যায়। দীঘা মানে আমাদের কাছে সাগরবেলা। তার সঙ্গে পাহাড়। যদিও এখানে কোথাও সাগরের চিহ্ন নেই। গোপালপুর পিছনে ফেলে এসেছি। এ জায়গাটা সমতল হলেও দূরে-দূরে নীল পাহাড়ের আভাস দেখা যাচ্ছে।

এখান থেকে তপ্তপানি পঁচিশ কিলোমিটার। মামাকে জিগ্যেস করতে বললেন,—এই পাহাড়ের রেঞ্জ বিন্ধ্যপর্বতেরই শাখা-প্রশাখা।

দীঘা পাহাড়িতে আমাদের জিপ একটু থেমেছে। ব্রেক জার্নি, চা-টা খাওয়া হল।

বেরোতে-বেরোতে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। মাদ্রাজ মেল তিন ঘণ্টা লেট করেছে। বাবলুমামা সাড়ে দশটা নাগাদ গোপালপুরে এসে পৌঁছেছেন। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ ধরে যাদু গাছ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন।

বাবলুমামা গাছ দেখে অবাক। বলেছেন,—অ্যামেজিং! কী করে এমন গাছ থাকা সম্ভব, যা আবিষ্কার হয়নি?

জিপ আবার স্টার্ট দিল। অনন্ত সরখেল বললেন,—ড্রাইভার সাব, ক্যাসেট চালাও।

হেমন্ত গাইতে শুরু করলেন,—গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ...

অনন্ত সরখেল বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন। আজকাল সব গাড়িতেই টেপ লাগানো থাকে। আর জগুমামার সঙ্গে বেরোনো মানেই গাড়িতে যাত্রা। এতটা দূর ভেবে অনন্তবাবু কয়েকটা বাছাই রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট নিয়ে এসেছেন।

এই পুলিশ জিপটা এস.পি. সাহেবের। নতুন, ঝকঝকে। সামনে ড্রাইভার ছাড়া মামা আর পট্টনায়েক। পিছনে পরপর অনন্তবাবু, আমি, এস.পি; দুজন সশস্ত্র পুলিশ আর ডি.এস.পি.। তপ্তপানিতেও ফোর্স।

কখন কী ঘটবে, বলা যায় না। দীঘা পাহাড়ির পর পুদিমারি। জিপ ছুটে চলেছে।...পাথরের ফলকে দেখলাম, তপ্তপানি আর ৮ কিলোমিটার।

গান চলছে,—এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী...

প্রায় আড়াইটে বাজে। সকাল থেকেই বাদল-মেঘ জমে আছে আকাশে, রোদ্দুরের তত ঝাঁঝ নেই।

জিপ উঠতে শুরু করেছে চড়াইয়ে। দুপাশে আদিগন্ত সমতল ছেড়ে এসে গেল পাহাড়। ফলকে লেখা The ghat starts from here অর্থাৎ এখানে থেকে পাহাড় শুরু।

প্রথমে পট্টনায়েকের চোখেই পড়ল। সামনের দিকে আঙুল তুলে বললেন,—ডক্টর মুখার্জি! দেখেছেন কত মৌমাছি উড়ছে। বাব্বা! নিশ্চয়ই আশেপাশে মৌচাক আছে।

আমার সর্বাঙ্গে ঢেউ বয়ে গেল।

দশ-পনেরোটা বড়-বড় মৌমাছি উড়ছে, জিপের সামনে। জিপের সঙ্গে সঙ্গে ওরা উড়তে-উড়তে এগোচ্ছে।

মামা পিছনে হাত বাড়িয়ে আমার হাতে চাপ দিলেন।

অনন্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,—সর্ব্বোনাশ! অ্যায় ভাই, জিপকা পরদা জলদি নামা দো। পাহাড়কা মৌমাছি বহোৎ খতরনাক চিজ! কামড়ানেসে রক্ষা নেই।

মৌমাছিদের অবশ্য কামড়ানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

পট্টনায়েক বেশ অবাক, বললেন,—তাজ্জব ব্যাপার ডক্টর মুখার্জি! মৌমাছিগুলো পোষা পাখির মতো সমানে উড়ে চলেছে জিপের সঙ্গে। কী ব্যাপার বলুন তো?

জগুমামা আস্তে-আস্তে বললেন,—মৌমাছি-মৌমাছি, কোথা যাও নাচি-নাচি...

সঙ্গে সঙ্গে পট্টনায়েক তাকালেন মামার দিকে। ব্যস, চুপ।

ডানদিকে পান্থনিবাস ফেলে আমরা আরও ওপরে উঠছি, বাঁক খাওয়া চড়াই।

একটু এগোতেই ডানদিকে পর পর কয়েকটা দোকান। কোল্ডড্রিঙ্কস, সিগারেট, পান, লজেন্স। বাঁ-দিকে পাঁচিল, ফটক।

জিপ থেমে গেল। ড্রাইভার বলল,—সাব, আসিগলা।

মামা বললেন,—তপ্তপানি?

—হঁ বাবু। ভিতর মন্দির, পছর পানি।

নেমে পড়েছি। মৌমাছিগুলো এখন অনেকখানি ওপরে উড়ছে। ফটক পার হয়ে মন্দিরের দিকে এগোলাম।

ছোট্ট এক মন্দির। পাশাপাশি অনেক দেবদেবীর মূর্তি। একজন পাণ্ডা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসছিল। খাঁকি উর্দি দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ডাকতে সে-ই নিয়ে গেল তপ্তপানির কাছে।

বুচকুড়ি দিয়ে গরম জল উঠছে মাটির ফাটল দিয়ে। সেই জল গড়িয়ে পড়ছে দুটো আলাদা-আলাদা চৌবাচ্চায়।

আমার অবশ্য সেদিকে মন নেই। ওপরে তাকাচ্ছি। হ্যাঁ, মৌমাছিগুলো এখনও উড়ছে।

অনন্ত সরখেলের হঠাৎ উড়িয়া কথা বলার শখ চেপেছে। পাণ্ডাকে জিগ্যেস করলেন,—তুমই মন্দিরের পণ্ডা অছি?

—আপুনি বাংলায় বল, মু বাংলা বুঝি।

—কঁড়? কী হইছি? মু উড়িয়া জানিছন্তি, ভুল কউছি?

—ভাষা নিয়ে মজা করিবে না।

মামা থামিয়ে দিয়ে বললেন,—এখানে কোনও বাঙালিবাবু থাকে?

—থাকে না। আসে চলে যায়।

—থাকে কোথায়?

—তা ঠিক কহিতে পারিব না। আসে ওই জঙ্গলের দিক থেকে। দোকানবাজার করি চলে যায়।

—একা আসে?

—হঁ, কখনও সে আসে, কখনও ওর এক অ্যাসিসটেনড, মোদের স্বজাতি, সে আসে।

—এখনও আসে? মানে কাল, আজ ওদের এখানে কেউ এসেছে?

পাণ্ডা একটু ভেবে বলল,—নাহ, মু দেখি নাই। দাঁড়ান জিগ্যেস করি। অ্যাই উপা, সেই বাঙালিবাবু আজি আসিথিলা?

উপা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল,—নাহি।

মামা বললেন,—তুমি আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যেতে পারবে?

পাণ্ডা বলল,—না বাবু। উ তো জঙ্গলের বহোৎ ভিতরে থাকিত। ওখানে আমরা যাই না। জঙ্গলে ভালু আছে, চিতা আছে, হায়না আছে।

—বাঙালিবাবু থাকত যে।

—অত জানি না বাবু।

পাণ্ডা হনহন করে হাঁটা দিল।

এস.পি. পারিজা ওকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, মামা থামালেন। তারপর বললেন,—চলুন, এগোনো যাক। আমরাই খুঁজে বের করি।

পারিজা বললেন,—কিন্তু আমরা এগিয়ে কী করব? ওটা বিরাট রেঞ্জ! এমপি বর্ডার অব্দি চলে গেছে।

—আরে, চলুন না!

আমি বুঝে গেছি। মামা ঠিক আমারই মতো মাঝে মাঝে ওপরের দিকে তাকাচ্ছেন। পথ প্রদর্শকরাও বোধহয় বুঝেছে। কারণ বেশ কিছুটা ওপর দিয়ে ওরা উড়ছে।

পাহাড়ি দুর্গম জঙ্গল। পাথুরে। অনেকটা চড়াই।

আমরা হোঁচট খাচ্ছি, এগোচ্ছি।

অনন্ত সরখেল নাকমুখ কুঁচকে বললেন,—আজ কপালে গভীর দু:খ আছে! আলোর অবস্থা দেখেছ?

একে মেঘলা দিন, তার ওপর ঘড়ির কাঁটা চারটে পেরোল। বিকেলের আলো মরে এসেছে।

মামার ভ্রূক্ষেপ নেই। পট্টনায়েককে সঙ্গে নিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছেন।

জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো জমি আর লতাপাতা পা টেনে ধরছে। অনন্তবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেলেন।

টানা আধঘণ্টা পর মামা থামলেন। বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেলেন, বললেন,— ফাইভ মিনিটস ব্রেক।

—আর কদ্দূর যাব স্যার?

—যতক্ষণ না আপনার পাগড়ির ডেরা খুঁজে পাই! আরে মশাই, আপনিই তো সেই খুনিটাকে আইডেন্টিফাই করবেন।

—অ-আমি! স্যার! এবার তালে স্যার আমার পালা?

—ধুর মশাই! এত ভয় পেলে আসেন কেন?

—না- না, স্যার। ভয় আমি পাইনি। এ ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়!

অনন্ত সরখেল তেতে গিয়ে বীরদর্পে হাঁটতে শুরু করলেন।

আবার হাঁটা—আবার চড়াই।

আচমকা মামা থমকে দাঁড়ালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওপরদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সামনের ঝাঁকড়া গাছটায় মৌমাছিগুলো ভনভন করছে।

মামা বললেন,—ওই যে, ওটাই মনে হচ্ছে!

দূর থেকে সাদা ত্রিভুজের মাথা দেখা যাচ্ছে।

পট্টনায়েক ঝট করে এগোতে যাচ্ছিলেন।

জগুমামা থামিয়ে দিলেন,—প্লিজ ওয়েট। উই শুড বি প্রিপেয়ারড। এনি কনসিকোয়েন্স মে হ্যাপেনস।

অনন্তবাবু, টুকলু, তোমরা কর্ডনের ভিতরে চলে এসো।

মামার হাতে রিভলভার উঠে এসেছে। আমরা দুজন ছাড়া প্রত্যেকেই আগ্নেয়াস্ত্র বের করেছেন।

হালকা পায়ে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু শব্দ হচ্ছেই। নিথর জঙ্গলে লতাপাতার ওপর ভারী বুটের শব্দ।

বিরাট তাঁবু। কম করে বিশ বাই বিশফুট। ধবধবে সাদা।

ভিতরে ঢুকে আমরা হাঁ। তাজ্জব ব্যাপার! এরকম জনমানবহীন জঙ্গলে সাজানো-গোছানো তাঁবু বাড়ি। সবরকম ব্যবস্থা আছে। কাপড়ের দেয়ালে পরপর ব্যাটারি লাইট ঝোলানো। টেবিল-চেয়ার, ছোট্ট ক্যাম্পখাট। তাঁবুঘরের ঠিক মাঝখানে আধুনিক অপারেশন থিয়েটার। বেড, অক্সিজেন, স্যালাইন, অ্যানাস্থেসিয়া, মাস্ক, নানারকম স্ট্যান্ডলাইট-ফ্যান, ছুরি-কাঁচির ট্রে—কী নেই!

কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

মামা খরদৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখছেন। একটু পরে জোরে জোরে বলে উঠলেন,—চলুন, ফেরা যাক। সন্ধে হয়ে আসছে। কাল সকালে আসব।

তারপর আস্তে-আস্তে আমায় বললেন,—লুঙ্গি, গামছাটা দেখেছিস? ওই দ্যাখ।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। এবার উতরাই, নামার পালা।

মিনিট পাঁচেক হেঁটেছি। মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন,—আপনারা ফিরে যান। পান্থনিবাসে ওয়েট করুন। শুধু পট্টনায়েক,টুকলু আর আমি থেকে যাচ্ছি। না-না, চিন্তা করবেন না। মিস্টার পারিজা, বড় টর্চদুটো আর হ্যান্ড মাইকটা লাগবে। আর হ্যাঁ, একটা ওয়াকিটকিও দিয়ে যান। একটু অ্যালার্ট থাকবেন।

৭

সবাই চলে গেছে। হিংস্র জন্তুজানোয়ার অধ্যুষিত এই গভীর জঙ্গলে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি।

শেষ আলো মুছে গেছে আকাশের বুক থেকে। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করেছে চরাচর। ঝোপেঝাড়ে জোনাকির মেলা, ঝিঁঝির ডাক। বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ। কোনও শ্বাপদ...কোনও অচেনা ভয়ংকর কিছু...জগুমামা বারবার ঘড়ি দেখছেন।

প্রায় আধঘন্টা কেটে গেছে। মামা বললেন,—এবার চলুন।

পট্টনায়েক বললেন,—তাঁবুটা যে হারিয়ে ফেলেছি ডক্টর মুখার্জি।

—অসুবিধে নেই। গাইড আছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

—গাইড!

—হ্যাঁ! ওই দেখুন।

মামা ওপরদিকে আঙুল তুললেন। সবুজ আলোর তিন-চারটে বড়-বড় ফুলকি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পট্টনায়েক বললেন,—ওগুলো কী? জোনাকি?

—জোনাকি কি অতবড় হয়? মিস্টার পট্টনায়েক, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন। আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হবেন। প্লিজ, যা দেখবেন-শুনবেন, নিজের মধ্যে রাখবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করাতে গেলে আবার অন্য বিপদ।...দেখুন, ওরা কোনদিকে যাচ্ছে।...

আলোগুলো উড়তে-উড়তে যাচ্ছে, আমরা পা টিপে টিপে ওদের অনুসরণ করছি।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব ডাক শোনা যাচ্ছে । রাতের জঙ্গল জীবন্ত, শব্দময়। মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ ডাক ছাড়তে-ছাড়তে একটা রাতের পাখি উড়ে গেল।

পট্টনায়েক বললেন,—এ যেন সেই বাইবেলের মতো। যিশুর জন্মমুহূর্তে তিন জ্ঞানী পণ্ডিত এসেছিলেন না দূর দেশ থেকে? এক নক্ষত্র ওঁদের পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল!

আমি বললাম,—ঠিক বলেছেন আঙ্কল! ওখানে একটা তারা ছিল, এখানে অনেক।

একটু পরেই তাঁবুর আবছা মাথা আবার দেখা গেল। কাছেই বড় গাছটা। ঠিক মনে হচ্ছে যেন টুনি বাল্ব দিয়ে ডালপালাগুলো সাজানো। অজস্র সবুজ আলোর বিন্দু নড়াচড়া করছে। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে...ম-ম-ম-ম-।

মামা বললেন,—একমিনিট। সব সাজিয়ে ফেলতে হবে। তাঁবুর সামনে যেমন ঢোকার পথ আছে, পিছনেও বেরোবার পথ আছে। তখন পরদা ফেলা ছিল। পট্টনায়েক, আপনি ঘুরে পিছন দিক দিয়ে ঢুকুন। ঢুকে টর্চ আর রিভলভার নিয়ে রেডি থাকবেন। কেউ বেরোবার চেষ্টা করলেই ধরতে হবে। আমার ধারণা, একজনই আছে। টুকলুকে নিয়ে আমি সামনে দিয়ে ঢুকছি। বি কশাস। যে-ই থাকুক, সম্ভবত সে গোলকপতির খুনি।

পট্টনায়েক ডানদিকে ঘুরে গেলেন। আমরা সোজা এগোলাম।

তখনই আবার আশ্চর্য ব্যাপার! গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এসে মৌমাছিরা ঘুরতে লাগল। আমাদের ঠিক মাথার ওপর।

মামা হাত দিয়ে তাঁবুর পরর্দা সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মৌমাছিগুলো ঢুকে গেল ভিতরে।

ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

মৌমাছিগুলো তাঁবুর মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে বনবন করে ঘুরছে। মামা গলা খাদে নামিয়ে বললেন,—ওখানেই মনে হয় সে আছে। তুই একটু আড়ালে সরে যা!

মুহূর্তে একপাশে সরে গেছি। আমার হাতে হ্যান্ডমাইক। মামার বাঁ-হাতে টর্চ, ডানহাতে রিভলভার।

গভীর নৈশব্দ্যের মাঝে মামা হঠাৎ বলে উঠলেন,—দয়া করে শুনবেন। আমরা আবার এসেছি। আমরা আপনার শত্রু নই, আপনার উপকার করতেই এসেছি। আলোটা জ্বালান, আমাদের সামনে আসুন।...

কোনও উত্তর এল না।

একটু বিরতি। মামা আবার বললেন,—দয়া করে শুনুন। আবার বলছি, আমরা আপনাকে ধরতে চাই না। আপনি নিজেই আসুন, দেখা দিন। শুধু-শুধু—

—হঃ...হঃ...হঃ...হঃ...

অমানুষিক খসখসে হাসি মামার কথা শেষ করতে দিল না!

তারপর একটা ফ্যাঁসফেঁসে গলা বলে উঠল,—তোমরা আমায় ধরতে এসেছ? হঃ হঃ হঃ—।

আমি অন্ধকারের রাজা। তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ? পাচ্ছ না। আমি কিন্তু পাচ্ছি। তোমার একহাতে রিভলভার, অন্য হাতে টর্চ। চোখে মোটা চশমা, ব্যাকব্রাশ চুল, গোঁফ—তোমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ইচ্ছে করলে একসেকেন্ডে তোমায়—কিন্তু না। আমি তোমাদের মারতে চাই না। আমি জানি, তোমরা ওই শয়তানটার খুনিকে ধরতে এসেছ। হ্যাঁ, আমিই খুনি! ওকে মেরে আরও অনেককে বাঁচিয়ে দিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে আমার দুশমনি নেই। চলে যাও, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

মামা বললেন,—বেশ, কিন্তু গোলকপতি রায়কে কেন মেরেছ? সে কথা তো জানতে হবে। কী করেছে সে?

কী করেছে?— ফ্যাঁসফেঁসে গলা ঘড়ঘড় করে উঠল,—বলো, কী করেনি! বহু লোককে গিনিপিগ বানিয়ে খুন করেছে। আর, আর শেষে আমাকেও—ওকে মেরেছি ব্যস! কাউকে কৈফিয়ত দেব না! তুমি কেন, কেউই আমায় বিশ্বাস করবে না। তুমি চলে যাও।

—যদি না যাই?

—না গেলে আমি নিরুপায়। বাধ্য হয়ে—

মামার টর্চ আচমকা জ্বলে উঠল শব্দ লক্ষ্য করে।

সঙ্গে-সঙ্গে অপরপক্ষ গুলি ছুড়ল—টিউস-স!

নিস্তব্ধ বনরাজ্য কেঁপে উঠেছে।

মামা নিমেষে সরে গেছেন। জ্বলন্ত টর্চ জমিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে মামা এগোচ্ছেন। সামনেই জ্বলন্ত টর্চ—তাঁবুর একদিক জুড়ে আলো। মামা বাঁহাত বাড়িয়ে টর্চটা তুললেন। আলতোভাবে টর্চটা তুলতেই—

টি-উ-স-স! ঝ-ন-ন-ন!

আবার গুলি। গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল টর্চটা। ততক্ষণে ফের মামার রিভলভার গর্জে উঠেছে—টি-উ-স-স! ঝনঝনাৎ! তাঁবুর কোনও জিনিস ভেঙে পড়ল।

শব্দভেদী লড়াই। আমি পর্দার আড়ালে উবু হয়ে কাঁপছি।

যে-কোনও মুহূর্তে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

কয়েক সেকেন্ড...

হঠাৎ পেছন থেকে জ্বলে উঠল আলো। জ্বলেই নিভে গেল। প্রতিপক্ষ ঘুরেই গুলি চালাল। কিন্তু ওই সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই মামা নির্ভুল লক্ষ্যে ফায়ার করলেন।

প্রতিপক্ষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

পিছনের আলো জ্বলে উঠেছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, একটা লোক মেঝেতে বসে পড়েছে।

লাফ দিলাম তার দিকে। ওদিক থেকে পট্টনায়েক ছুটে এসেছেন।

লোকটার বাঁ-গোড়ালির ওপর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর রিভলভার একটু দূরেই পড়ে আছে।

আমি প্রাণপণে ওকে জাপটে ধরেছি। পট্টনায়েক পকেট থেকে দড়ি বের করে দ্রুত বাঁধতে লাগলেন ওর হাত-পা।

মামা পটাপট তাঁবুর সব আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা আর্তনাদ করে উঠল,—উ:! আ:! নিভিয়ে দাও! আলো নিভিয়ে দাও! উ:—আমার চশমা...।

মামা টেবিলের ওপর থেকে কালো চশমা এগিয়ে দিলেন। লোকটা চোখে দিয়েই শান্ত হয়ে গেল। কী অদ্ভুত ব্যাপার, গোড়ালি দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে, তাতে লোকটার ভ্রুক্ষেপ নেই। একবারও 'উ: আ:' করছে না। অসম্ভব সহ্যশক্তি!

মামা ঠান্ডা গলায় বললেন,—দিবাকর, কী করলে তুমি? এসবের দরকার ছিল?

লোকটা বলল,—তুমি আমার নাম জানো?

—জানব না? গোলকপতি রায়ের ছায়াসঙ্গী দিবাকর গিরি কেন তার শত্রু হয়ে উঠল, কেন সে নিজের হাতে খুন করল তার প্রভুকে। সেটাই শুনতে এসেছি তো।

—না-না, ওসব কিছুতেই বলতে পারব না। আমায় মেরে ফেলো! আমি বাঁচতে চাই না! অবশ্য যা রক্ত বেরোচ্ছে....বেরোক! বেরোক! সব পাপ, পাপ! সাফ হয়ে যাক।

তাই তো!—উত্তেজিত হয়ে মামা বলে উঠলেন,—টুকলু, পট্টনায়েক শিগগির আসুন। দিবাকরকে অপারেশন বেডে তুলে ফেলি। এখনই ওর রক্ত বন্ধ হওয়া দরকার। গুলিটা ভেতরে নেই, মাংস ছিঁড়ে হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেছে। বন্ধুদের কাছে শখ করে যেটুকু কাটাছেঁড়া শিখেছিলাম, তাতে মনে হয় পেরে যাব।

তিনজনে ধরাধরি করে দিবাকরকে বেডে শুইয়ে দিলাম। পট্টনায়েক বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, লোকাল অ্যানেসথেসিয়া?

—দরকার হবে না।

মামা ছুরি-কাঁচি নিয়ে কাজে লেগে গেলেন।

দিবাকর নড়েচড়ে উঠেছে।

ঘণ্টাতিনেক কেটে গেছে। রাত দুটো কুড়ি। কাজটা সহজ ছিল না। আমরা হাঁ করে দেখেছি, কী নিপুণ হাতে ছুরি ফরসেপ ধরেছেন জগুমামা। সূচ-সুতো দিয়ে স্টিচ করেছেন ক্ষতস্থান। তারপর তুলোতে লোশন ঢেলে গজ ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর সেলফ থেকে একটা লাল পানীয়ের বোতল বের করে জোর করেই ঢেলে দিয়েছেন দিবাকরের গলায়। দিবাকর ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেই থেকে তিন-তিনটে ঘণ্টা ঠায় বসে আছি। পট্টনায়েক আঙ্কেল বসে-বসেই ঘুমিয়েছেন। আমারও তন্দ্রা এসে গেছিল।

মাঝে পট্টনায়েক একবার শুধু বলেছিলেন,—ডক্টর মুখার্জি, আপনি তো অনেকটাই জেনে ফেলেছেন, একটু বলুন না।

জগুমামা হেসে বলেছেন,—অধৈর্য হবেন না। আর একটু ওয়েট করুন।

অর্থাৎ মামা নিজের মুখে কিছু বলবেন না। উত্তেজনায় মৌমাছিদের কথা ভুলে গেছিলাম। খেয়াল হতে দেখি, দশ-বারোটা মৌমাছি চুপ করে একটা তাকে বসে আছে। ওদের শরীরে আর আলো জ্বলছে না। কাছে গিয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম, মামা হাত ধরে আমায় থামিয়ে দিয়েছেন,—উঁহু! আগে দিবাকর।

দিবাকরের শরীর নড়াচড়া করছে। অর্থাৎ জ্ঞান ফিরে আসছে। মামা এগিয়ে গেলেন, দিবাকর, সেন্স এসেছে?

দিবাকর ঘাড় নাড়ল। মামা বেডের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে মাথার দিক তুলে দিলেন। বললেন,—হ্যাঁ, এইবার তোমার কথা বলতে সুবিধে হবে। লাইট নিভিয়ে দিলে তোমার জন্য হয়ত ভালো হত, কিন্তু আমাদের খুব অসুবিধে হবে। তাছাড়া তুমি গগলস পরে দেখতে পাচ্ছ।

দিবাকর কথা বলল না।

জগুমামা ফের বললেন,—আমার বন্ধুরা শুনতে চাইছে তোমার কথা। প্লিজ দিবাকর, তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ, আমরা তোমার ভালো চাই।

কী বলব?—ক্লান্ত গলায় দিবাকর বলল,—মানুষ নিয়ে এক শয়তানের খেলা করার গল্প?

—তা-ই বলো দিবাকর। বিশ্বাস করো, তোমার জন্য আমরা সবরকম চেষ্টা করব।

দিবাকর হাত তুলল,—একটু জল!

ছুটে গিয়ে জার থেকে একগেলাস জল ঢেলে ওর হাতে দিলাম। দিবাকর চায়ের মতো অল্প-অল্প চুমুক দিতে লাগল!

দেখেছ?—দিবাকর কাতরে উঠল,—পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, তবু জলও খেতে পারি না। গলা জ্বলে যায়। ওই শয়তানটা আমায় শেষ করে দিয়েছে।

কিছু ভেবো না দিবাকর, তুমি ঠিক হয়ে যাবে। আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব। আগে সবটা বলো, অন্তত: যেটুকু দেখেছ।

গোলকপতি রায়ের সঙ্গে আমার বিশ বছরের সম্পর্ক। আমার এক দেশের লোক কলকাতায় ওর কাছে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। তোমরা জান কি না জানি না, ওর তিনকুলে কেউ নেই, একা মানুষ, সারাদিন পড়ে থাকত পরীক্ষা-টরীক্ষা নিয়ে। আমি ছিলাম ওর ছায়ার মতো। ওর যা কিছু দেখাশুনা তো বটেই, এমন কী কোনও কাজ ঠিক হলে আমার কাছেই গল্প করত। তেমন কিছুই বুঝতাম না। কোনও বন্ধুটন্ধু ছিল না।

বছর কয়েক আগে, একদিন বলল, দিবাকর, নিরিবিলি একটা জায়গায় যাই চল, যেখানে গোপনে আমার রিসার্চটা করব। একটা দারুণ কাজ হবে।

আমি বলেছিলাম, তবে চলো আমাদের বালেশ্বরের গ্রামে। বাড়ি বানিয়ে দুজনা থাকব।

ও বলেছিল,—নারে। জানাজানি হয়ে যাবে। এমন জায়গা ভাব দিকি, যেখানে আমাদের কেউ চেনে না।

শেষপর্যন্ত ঠিক হল এই গোপালপুর। নিরিবিলি। সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর ভালো থাকে।

একটু ফাঁকার দিকে একটা বাড়ি কেনা হল। আমরা চলে গেলাম। ভাবলাম, ভালো হল। নিজের দেশে স্বজাতিদের সঙ্গে থাকা যাবে। তখন কি জানতাম!

দিবাকর বড়-বড় শ্বাস ফেলল। আবার শুরু করল।...

গোপালপুর এসে সারাদিন কাজে ডুবে থাকে লোকটা। গিনিপিগ, পায়রা, এমনকী দুটো বাঁদরও নিয়ে এল। এন্তার গিনিপিগ অজ্ঞান করে কাটে, ছেঁড়ে। কী সব লেখে।...

হঠাৎ একদিন মাঝরাতে উঠে নাচতে-নাচতে আমায় টেনে তুলল ঘুম থেকে। কী ব্যাপার? ওর মুখে শুধু একটাই কথা, পেরেছি রে! পালটে দিতে পেরেছি।

আমাকে নিয়ে এল অপারেশন ঘরে। দেখি, একটা বাঁদরকে বেঁধে শুইয়ে রাখা আছে টেবিলে। ও বলল, —দেখবি, একে আগুনের ছ্যাঁকা দেব। কিচ্ছু করবে না! কিন্তু জল ছেটালেই চিৎকার করবে! আলো নেভালে চেঁচাবে, এখন আলো জ্বলছে তাই অন্ধ। ওর সব হ্যাবিট এক্কেবারে পালটে দিয়েছি।

আমি বললাম,—বাবু, এসব কী করছ? ভগবানের ওপর হাত চালিও না।

ও ধমকে উঠল,—রাখ তোর ভগবান।

সে-ই শুরু।...বাঁদরটা মরে গেল। ওর সঙ্গীটা এখনও আছে!...এরপর আর বাঁদর নয়, ওর মানুষ চাই। ও অপারেশন করবে মানুষের ওপর। আমায় নিয়ে এল এখানে এই তপ্তপানির জঙ্গলে। তাঁবু খাটিয়ে যন্ত্রপাতি বসাল। বলল,—তুই এখানে থেকে যা। আমি লোক ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসব।

তাই আনতে লাগল। টাকার লোভ দেখিয়ে। গরিব-গুর্বো মানুষ সব। আর একের পর এক মানুষ মারা চলল। একটাও বাঁচল না। মারছে, শুধু মানুষ মারছে। লোকগুলো মরে যায়, জঙ্গলে ফেলে আসি। শেয়াল শকুনে খেয়ে যায়। আমি শেষে বললাম,—আমি আর থাকব না। এত পাপ আর সইতে পারছি না।

শয়তানটা হেসে বলে,—থাকতে তোকে হবেই রে। নইলে তুইও ফাঁসিকাঠে ঝুলবি। আমার এই কাজ শেষ করতেই হবে। আরে বাবা, বড়-বড় কাজের জন্য এরকম কত প্রাণ যায় রে! তাছাড়া ওই হাভাতে গরিব-গুলোর বেঁচে থেকে কী লাভ বল তো। আমি তো ওদের ঘরে টাকা দিয়ে যাচ্ছি। টাকা পেলেই ওদের বাড়ির শান্তি।

এরমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

শঙ্কর বলে একটা ছেলেকে রেখেছিলাম ফাইফরমাশ খাটার জন্যে। ছেলেটা বড় ভালো। একদিন ও মৌমাছির মতো দেখতে কী একটা নিয়ে এল। ওকে দেখিয়ে বলল, ওর ছোট বন্ধুরা দিয়েছে। তাদের গাড়ি ওটা। রাখতে দিয়েছে। তারপর নিয়ে এল একটা গাছ। সেটাও নাকি বন্ধুরা দিয়েছে। গাছটা কী অদ্ভুত ঠান্ডা বাতাস ছাড়ে।

ব্যস! শয়তানটা ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুটোই নিয়ে রাখল। ফেরত দেয় না।...শঙ্কর চাইলেই বলে, আগে বন্ধুদের নিয়ে আয়। কথা বলে দেখি।

শঙ্করের বন্ধুরা বোকা নাকি? তারা বুঝে ফেলেছে, ওরা এলে তাদেরও আটকে রাখবে। শঙ্কর একদিন খুব চেঁচামেচি করল। লোক জড়ো হয়ে গেল। লোকাল ছেলে। বদমাশটা পালিয়ে চলে এল এখানে। তালা বন্ধ করে দিল ওই বাড়ির। গোপালপুর আর যেতে পারে না। আর নতুন লোকও আনতে পারে না।

শেষমেশ আমায় পাঠাল লোক ধরে আনতে। আমি গিয়ে যেই বাড়ির দরজা খুলেছি শঙ্কর কোত্থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর তখনি ফেরত চাই ওর জিনিস দুটো। পড়লাম মহাবিপদে। ওর চেঁচানি শুনে লোক জড়ো হচ্ছে। কোনওভাবে ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম,—বাবুকে আসতে দে। নিশ্চয়ই ফেরত দেবে।...বলে তড়িঘড়ি বাড়ি বন্ধ করে পালিয়ে এলাম।

—এ কবেকার কথা দিবাকর?

হপ্তাখানেকও হয়নি—দিবাকর বলল,—তারপরেই শয়তানটা আমার সর্বনাশ করল! শেষ করে দিল।

ঘড়ঘড়ে গলায়, ফুঁপিয়ে উঠল দিবাকর।

জগুমামা ওর কাঁধে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল,—উঃ! ছুঁচ বিঁধছে।

সরি দিবাকর। ভুলে গেছিলাম। জগুমামা হাত তুলে নিলেন, তারপর?

—তারপর আর কী! একদিন রাতে খাওয়ার পর ভীষণ ঘুম পেয়ে গেল। এখন বুঝি, পিচাশটা খাবারে ঘুমের বড়ি মিশিয়ে দিয়েছিল। ব্যস, আর কিছু মনে নেই!

ঘুম যখন ভাঙল, উঃ! ঘাড়ে কী যন্ত্রণা! সব অন্ধকার। আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আস্তে-আস্তে সব মনে পড়ল। ডাকলাম, বাবু, বাবু! কোনও সাড়া নেই। আসলে ও ভেবেছিল, আমি মরে গেছি। তাই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছিল।

—কেন পালাল দিবাকর? গোলকপতি তো এই রিসার্চ করতে গিয়ে আগে কত মানুষ মেরেছে।

—সে মেরেছে। তবে সেসব আনকা লোক। আর আমি হাজার হলেও এতদিন সাথে আছি। হয়তো সেজন্যই সহ্য করতে পারেনি।

—তারপর?

মড়ার মতো পড়ে রইলাম। ওঠার শক্তি নেই। যেখানে হাত দিই, ছুঁচের মতো বিঁধছে। খুব পিপাসা পাচ্ছিল, কিন্তু কোথায় যাব? কোথায় জল পাব?

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর ওরা এল। ওরা—শঙ্করের ছোট্ট বন্ধুরা। তোমাদের বলছি, ওরা আমারও বন্ধু। ওদের জন্যেই এখনও বেঁচে আছি। শয়তানটাকে মেরে অনেককে বাঁচাতে পেরেছি।

আমি তো বুঝতে পারছিলাম না, সকাল না সন্ধে। হঠাৎ কানের কাছে কে ফিসফিস করে বলল,—এখন দিন। অন্ধকার নামুক, তুমি সব দেখতে পারবে। তোমার সব অনুভূতি, তোমার চোখ, কান, নাক, জিভ,

চামড়া সবকিছুর ক্ষমতা একদম বদলে গেছে। সেটা করেছে তোমারই মনিব।

একসময় দেখি, আশ্চর্য! আবার সব দেখতে পাচ্ছি। কোনও রকমে উঠে গিয়ে কুঁজোয় হাত দিয়েছি, খচখচ করে বিঁধল তখন খসখসে চট দিয়ে ধরলাম। কোনও অসুবিধে হল না।

বুঝলাম, সত্যিই আমার সব বদলে গেছে। ঠান্ডা জল গলায় দিতেই চা খাবার মতো ছ্যাঁকা লাগল। তখন স্টোভে জল গরম করলাম। সেই জল ঢকঢক করে খেয়ে নিলাম।

—তুমি গন্ধ পাও?

—পাই, তোমাদের কাছে যেসব খুব মিস্টি গন্ধ, সেসব আমার নাকে খুব ঝাঁঝ লাগে। আবার আগের যেসব ঝাঁঝালো গন্ধ, সেসব আমার খুব মিস্টি লাগে।

—আর কান? আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ তো।

হ্যাঁ পাচ্ছি। আস্তে বল বলে। তোমরা যত আস্তে বলবে, তত জোরে শুনব। জোরে বললে শুনতেই পাই না।

আমরা নির্বাক শ্রোতা।

মামা বললেন,—তার মানে আঘাত লাগলে ব্যথা লাগে না?

—নাহ! দেখছ না, গুলি হাড় ভেঙে দিল, আমার খুব আরাম হচ্ছিল। অথচ তুমি আমার গায়ে হাত রাখলে, মনে হল যেন পিন ফুটল।

মামা বললেন,—পট্টনায়েক, শুনছেন?

পট্টনায়েক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মামা বললেন,—দিবাকর, তারপর?

তার আর পর নেই।—দিবাকর থেমে-থেমে বলল,—ওই বন্ধুরা আমায় বোঝাল, ওই শয়তানটা একটা কেউটে সাপ। ও বেঁচে থাকলে পৃথিবীর ক্ষতি। ওকে এখনই মেরে ফেলা দরকার।

আমি বন্ধুদের জিগ্যেস করলাম, সে এখন কোথায়? ওরা বলল, বেরহামপুরের একটা হোটেলে। নামও বলে দিল। আমি খুঁজে বের করলাম ওর পিস্তল। রাতভর হেঁটেহেঁটে সকালবেলা পৌঁছোলাম বেরহামপুর। সকাল হতেই আমি অন্ধ। কোনও রকমে একটা কালো চশমা কিনলাম, কালো জ্যামাপ্যান্ট কিনলাম। তারপর সূর্য ডুবতে হানা দিলাম হোটেলটায়।

কিন্তু হোটেলে গিয়ে শুনি, পালিয়ে গেছে, সন্ধের ট্রেনে ও কলকাতা যাবে বলে বেরিয়েছে।

ছুটতে ছুটতে এলাম স্টেশনে। আমার ভাগ্য ভালো। লাইনে গোলমাল। তখনও ট্রেন ছাড়েনি। কামরার সামনে ঝোলানো চার্ট দেখে ওর নাম খুঁজে বের করলাম।

...তারপরের ঘটনা তো তোমরা জানো।

হুম!—মামা অস্ফুটে বললেন, ভাবা যায় না!

বলেই একদম চুপ করে গেলেন।

মিনিটখানেক পরে বললেন,—তুমি চিন্তা কোরো না দিবাকর। যতটুকু বুঝেছি, জটিল অপারেশন করে তোমার স্নায়ু বা নার্ভ, এদিক-ওদিক করে দেওয়া হয়েছে। পট্টনায়েক, টুকলু, আপনারাও জেনে রাখুন, আমাদের ব্রেন থেকে নার্ভগুলো বেরিয়েছে। ঠিক যেমন পাহাড় থেকে বেরোয় নদী। নার্ভগুলো উলটেপালটে দেওয়ার ফলে একদম ওলটপালট হয়ে গেছে দিবাকরের ইন্দ্রিয়গুলো, ইংরেজিতে যাদের বলে Sensory organs। অবশ্যই ইনভেনশন।

একটু থেমে বললেন,—তবে গোলকপতি তার জন্যে যে পথ বেছে নিয়েছিল, তার চেয়ে নোংরা বোধহয় হয় না। বিজ্ঞানকে বোধহয় ও কাজে লাগাতে চেয়েছিল নিজের কোনও মতলবে। এরকম অন্ধকারের জীব তৈরি করে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, যারা ওর কথা শুনে চলবে, ভাবুন তো কী ঘটবে! শহরকে শহর, গ্রামকে গ্রাম ক্রিমিন্যালে ছেয়ে যাবে। আর তাদের কান্ট্রোল করবে গোলকপতি! ওর ডাইরি প্রথম পড়েই আমি এর একটা আভাস পেয়েছিলাম। তা ছাড়া—

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—ওর হাতের লেখাও সেই কথাই বলে! অনন্তবাবুর দেওয়া হ্যান্ডরাইটিং সায়েন্সের বইটায় এরকম হাতের লেখার লোক সম্পর্কে বলা আছে—circustic self contradictory, dominating। ও অবশ্য এর চেয়েও খারাপ। ঠিক শাস্তিই পেয়েছে।

—মামা, এখনও কিন্তু বন্ধুদের সম্পর্কে আমরা জানতে পারিনি। ওরা কারা? ওই যন্ত্র মৌমাছিরা?

ওরা ছোট্ট মানুষ!—দিবাকর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল।

—ক-কী!! আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—হ্যাঁ। ওই দেখো, ওরা চুপ করে বসে আছে। আমাদের কথা শুনছে, বুঝছে। আমাদের চেয়ে ওদের অনেক ক্ষমতা, অনেক বেশি বুদ্ধি। ওদের কাছ থেকেই ওদের কথা শোনো। বাঁদিকের কোণে রেডিওর মতো একটা যন্ত্র আছে। ওতে খুব আস্তে কথা বললেই জোরে শোনা যায়। ওটা নিয়ে ওই তাকের ওপর রেখে এসো। ওদের সামনে।

আমরা বাকরুদ্ধ!

অ্যামপ্লিফায়ার থেকে পরিষ্কার বাংলায় একজন বলে উঠল—

বন্ধুরা, প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার!

আমরাও তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা আমাদের ভাই। তবে তোমাদের শরীরের তুলনায় আমরা আয়তনে পোকার মতো। কিন্তু সায়েন্স টেকনোলজিতে তোমাদের চেয়ে কয়েকশো বছর এগিয়ে আছি। হ্যাঁ বন্ধু, এটা বাস্তব; যাদের তোমরা মৌমাছি ভাবছ, ওগুলো আমাদের মহাকাশযান। ওইরকম মহাকাশ গাড়িতে চেপে আমরা কয়েকজন মাঝে-মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে বেরোই।

তোমাদের এই পৃথিবীতে এর আগেও বেশ কয়েকবার আমরা এসেছি। দেখে ফিরে গেছি। তখন তোমরা আরও পিছিয়ে ছিলে। এবার এসে দেখছি, বিজ্ঞানে এগিয়েছ তোমরা। কিন্তু বন্ধু, তোমাদের স্বভাব পালটায়নি। তোমাদের রাগ, হিংসা, লোভ সব আগের মতোই রয়ে গেছে।

তোমাদের স্বভাব দেখে আমরা বড় কষ্ট পেয়েছি বন্ধু। আমাদের দুনিয়ায় চিন্তাবিদ বিজ্ঞানী, লেখক-কবি এঁরা মুনিঋষির মতো মানুষ। আমরা তাঁদের মাথায় করে রাখি। তাঁরা সব সময় কাজ করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যে।

তোমাদের এখানে উলটো। বুদ্ধিমানদের বেশির ভাগই সবসময় চায় বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অন্যের ক্ষতি করতে।

বন্ধু, দু:খ পেয়ো না। যা মনে হয়েছে, তাই বলছি। পৃথিবীতে বারবার এসেও তাই কারও সঙ্গে দেখাও করি না।

এবারই হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল শঙ্করের সঙ্গে। জানো, তোমাদের পৃথিবীর সাধারণ মানুষরাই সবচেয়ে ভালো।

আমাদের এক বন্ধুর গাড়ি হঠাৎ অকেজো হয়ে গেছিল। দেখলাম, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়া তো ফিরতে পারব না। তখন খবর পাঠালাম আমাদের দুনিয়ায়। ব্যাটারি পাঠাতে।

এইসময় একদিন আমরা গোপালপুরে একটা গাছের ওপর ছিলাম। নীচে ওই শঙ্কর বসে পোষা বেড়ালকে আদর করছিল। অসাবধানতায় ওই অকেজো গাড়িটা ডাল থেকে পিছলে ওর পাশে গিয়ে পড়ে। ও মৌমাছি ভেবে তুলে নেয়, নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। এবার কী হবে? গাড়ি ফেরত না পেলে ফিরব কী করে? এই ভেবে শঙ্করের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।

শঙ্করকে আমরা রাখতে দিলাম গাড়িটা।

রোজ ও আসত গাছের নীচে। আমরা নেমে আসতাম। গল্প হত। ও গান শোনাত।

একদিন ও এসে বলল,—ওর মনিব মৌমাছির মতো গাড়িটা নিয়ে রেখে দিয়েছে। ও দেখতে দিয়েছিল। এখন ফেরত দিচ্ছে না। বলছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলবে।

লোকটাকে দূর থেকে লক্ষ করি। একটু পরেই বুঝতে পারি, লোকটা খুব বাজে। তখন শঙ্করের কাছে একটা বীজ দিয়ে বললাম,—পুঁতে দাও। কালই গাছ বেরুবে। সেই গাছ ঘর ঠান্ডা করে দেয়। তোমার মালিককে গাছটা দিয়ে গাড়িটা ফেরত নিয়ে এসো।

এত পাজি লোক, গাছ নিয়ে নিল, আমাদের গাড়িটা ফেরত দিল না।...

অথচ আমরা ওকে মুহূর্তে ধুলো করে দিতে পারতাম। কিন্তু পারিনি। আমাদের মানবিকতা আমাদের থামিয়ে দিল।

তবে ওর মানুষের খুনের রিসার্চ দেখতে-দেখতে সিদ্ধান্ত নিলাম, না:। ওর এই পৃথিবীতে না থাকাই মঙ্গল।

বন্ধু, আমাদের সেই মহাকাশগাড়িটা তোমাদের কাছে। ফেরত পেতে পারি?

অ্যামপ্লিফায়ার থামল। আমরা সব বোবা। মামা যে মামা, তাঁরও চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

এরাও মানুষ! খুদে মানুষ!

মামা বুক পকেট থেকে মৌমাছি-যানটা বের করে এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে,—এই নাও বন্ধু।

ধন্যবাদ বন্ধু, অসংখ্য ধন্যবাদ!—

অ্যামপ্লিফায়ার আবার বেজে উঠল,—তোমাদের মতো মানুষ আছে বলেই পৃথিবীটা এখনও সুন্দর।

তোমাদের একটু দেখতে চাই।—মামা অস্ফুটে বললেন,—

নিশ্চয়ই বন্ধু, এগিয়ে এসো। এই যে আমরা। দেখতে পাচ্ছ?

আমরা তিনজন ঝুঁকে পড়লাম।

তাকের ওপর ডেয়ো পিঁপড়ের মতো একদল 'মানুষ'। অবিকল আমাদের মতো দেখতে। পোশাক-আশাক খুব উজ্জ্বল রঙের। একটু অদ্ভুত ধরনের, প্রাচীনকালের মতো। ছেলেদের পোশাক হল, ওপরে ঢোলা জোব্বা, নীচে আটোসাঁটো প্যান্ট। মেয়েদের শাড়ির মতো কাপড় সর্বাঙ্গে জড়ানো। ছেলে-মেয়ে সবারই মাথায় শিরস্ত্রাণ।

মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল,—এ যে গালিভার্স ট্রাভেলস-এর গপ্পোই সত্যি হল!

সঙ্গে-সঙ্গে অ্যামপ্লিফায়ার বলে উঠল,—গপ্পো নয়, গপ্পো নয়। ব্যাপারটা আমরাও জানি। তোমাদের জোনাথন সুইফট, যে ওই অভিযানগুলো লিখেছিল, সেবার তার বাগানে এসেই ডেরা বেঁধেছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। জোনাথন-এর ছোট ছেলের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের খুব ভাব হয়ে যায়। ছেলে বাবাকে বলে দেয় ব্যাপারটা। বাবা বিশ্বাস করেই না। উলটে ছেলেকে বানিয়ে-বানিয়ে বলার জন্য বকাবকি করেছিল। ছেলে তখন বাবার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাগানে। বিপদ দেখে আমাদের দাদুরা উড়ে পালিয়ে

যায়।...পরেরবার পৃথিবীতে এসে আমাদের বাবা-কাকারা জানতে পারে, জোনথন সুইফট আমাদের নিয়ে বই লিখে ফেলেছেন। সে বই নাকি খুব নামও করেছে। তবে ওর গালিভারের যে দানব-মানুষের দেশে যাওয়ার কথা লিখেছেন, সে বোধহয় পুরোটাই কল্পনা। ওরকম কোনও মানুষ আমরা কোনও গ্রহ-তারাতে খুঁজে পাইনি। মানুষজাতের প্রাণীদের মধ্যে তোমরাই চেহারায় সবচেয়ে বড় মাপের।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়!

জগুমামা অস্ফুটে বললেন,—তোমরা কোন জগত থেকে এসেছ বন্ধু? কোন নক্ষত্র থেকে?

—নক্ষত্র হবে কেন, আমরা তোমাদের মতোই সূর্যের সন্তান। নাতিও বলতে পারো।

তোমাদের পৃথিবীর যেমন চাঁদ, তোমাদের দেওয়া নাম বৃহস্পতিরও তেমনি চোদ্দোটা উপগ্রহ। তোমরা তাদের সবচেয়ে বড়টার নাম দিয়েছ গ্যানিমিড। আমরা গ্যানিমিডের বাসিন্দা। আমরা অবশ্য বলি 'ডারথি'। বৃহস্পতিকে আমরা ডাকি ফিতর। মানে বাবা। সূর্যকে বলি জিফিতর। মানে ঠাকুরদা।

—পৃথিবীকে কী নামে ডাকো?

—জান্টিস। মানে সবুজ দেশ।...

—কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপরই আবার বলে উঠল অ্যামপ্লিফায়ার,—ধন্যবাদ বন্ধু, ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগল। আবার আসব। আবার আসব! বিদায় বন্ধু, গুডবাই।...

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শুনতে পেলাম মৌমাছির গুঞ্জন। চোখের সামনে দেখলাম, ঝাঁক বেঁধে মৌমাছি-যান উড়ে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

ছুটে এলাম বাইরে। আলো ফুটছে, হালকা হয়ে আসছে অন্ধকার। নীলাভ আলোয় ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছি উড়ে গেল সুদূর আকাশের দিকে। মিলিয়ে গেল কোন নীলিমায়।...

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখলাম কি না, জানি না!

কিন্তু এর পরেই যে ঘটনা ঘটল, তার জন্যে আমরা মোটেই তৈরি ছিলাম না।

তাঁবুর মধ্যে থেকে একটা শব্দ শোনা গেল—খট!

বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে দিবাকর। একটু দূরে মাউজার রিভলভার। মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

আইসক্রিমের তলানি গলায় ঢেলে কাপ নামিয়ে রাখলেন অনন্ত সরখেল।

—মুছে ফেলুন।

—মুছব? কোথায় পড়ল?

অনন্তবাবু ব্যস্ত হয়ে জামাকাপড় দেখতে শুরু করলেন।

—ওখানে নয়, মুখে। দাড়ি গোঁফের রং পালটে গেছে।

যাগ্যে!—অনন্তবাবু পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে দাড়ি ঘসে ফেললেন,—শিল্পীদের ওরকম হয়েই থাকে।

—শিল্পী! কে? আপনি?

—হ্যাঁ, শিল্পী। হইনি, হব। যা সব লিখছে আজকাল, আমাকেই অসি ছেড়ে মসি ধরতে হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম দিদি—

—কী? অসি ছেড়ে মসি? অসিটা ধরলেন কবে?

—তখন তুমি জন্মাওনি হে! ইন দি ইয়ার নাইনটি ফরটি সেভেন। কদম কদম বাড়িয়ে যা, খুশির গীত গাইয়ে যা...নেতাজি, আজাদ হিন্দ ফৌজ, বুঝলে!

—ভাট বকবেন না তো!

—একশোবার বকব। উফ, কথাটা শেষ করতে দেবে না? শুনুন দিদি, এবার যা ঘটল, ভাবা যায় না! সে জঙ্গল, সে সমুদ্র, সে মৌমাছি—

—কী সে জঙ্গল, সে পাহাড় শুরু করলেন! সারাক্ষণ তো হোটেলে কাটালেন।

জগুমামা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকলেন। মায়ের মুখে আঁচল।

অনন্ত সরখেল ভয়ানক খেপে গেলেন,—স্যার, আপনাকে বলে দিচ্ছি, টুকলু কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আমি কিন্তু...আমি কিন্তু...

—অ্যাই টুকলু, চুপ কর।

—হ্যাঁ, যা বলছিলুম দিদি, এবারের গোটা ঘটনার স্পেশালিটি কী বলুন তো? গোড়ায় আমি, শেষে স্যার! প্রথমে ক্রিমিন্যালটা পড়ল আমার খপ্পরে, তারপর স্যারের সামনে। ব্যস! নিজেই ফিনিশ। দু-দুটো হেভিওয়েটকে কখনও সামলাতে পারে?

—কিন্তু অনন্তবাবু, আপনারা কিছুই তো প্রমাণ করতে পারবেন না। ওই গাছটাও মরে গেল।

হ্যাঁ-অ্যাঁ, যা বলেছেন।—অনন্তবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন,—ভালো কিস্যু আমাদের সহ্য হয় না। বাঙালি তো, ধাতে নেই। তবে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে—

ব্যস, অনন্তবাবু চুপ করে গেলেন, বিড়বিড় করছেন।

—অনন্তবাবু, কী হল? কী স্বীকার করব?

বলছি দিদি—অনন্ত সরখেল দুম করে বলেই ফেললেন,—ট্রুথ ইজ ডেনজার দ্যান ফিকশন!

শারদীয়া ১৯৯৭

আকাশে মৃত্যুর বিষ

১

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস?

—কী?

—দুটো শহরেরই নাম শুরু P আর A দিয়ে। আজকের কাগজে আরেকটা খবর বেরিয়েছে ছোট করে। সেই দেশের নামের মধ্যেও ওই দুটো অক্ষর রয়েছে। ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং, তাই না?

ডিসকভারি চ্যানেলে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি দেখাচ্ছিল। মিশমিশে আকাশে বিশাল তুবড়ির মতো লাল-হলুদ লাভা ছিটকে-ছিটকে উঠছিল। মেঘের মতো গর্জন। দুর্দান্ত ফোটোগ্রাফি, একেবারে জীবন্ত।

অফিস থেকে ফিরে চায়ের কাপ নিয়ে তাতেই বুঁদ হয়ে ছিলাম। জগুমামার কথায় রহস্যের গন্ধ ছিল। টিভি বন্ধ করে মামার দিকে ফিরলাম,—বলো।

জগুমামা হাসলেন,—না, তেমন কিছু নয়। ইটস নট আওয়ার কাপ অব টি। যাদের ভাবার কথা, তারা এতক্ষণে কাগজ-পেনসিল নিয়ে ছক কষতে বসে গেছে।

—কাদের কথা বলছ?

—নিউমারোলজিস্টদের কথা।

অধৈর্য গলায় বললাম,—কী যে বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—পারবি না তো! বুদ্ধির চর্চা না করে-করে তোর আই-কিউ লেভেল একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। সকাল থেকে অফিস, কেবল ফল্ট, ওভারলোড, টেস্টিং—ব্রেনের কম্পিউটার একেবারে জ্যাম করে রেখেছিস। বইপত্রও পড়া ছেড়ে দিয়েছিস। বাড়ি ফিরে খালি টিভি। বুদ্ধিতে—

—আ: মামা, প্লিজ।

—আরে বাপু, এমাসেই পরপর দুটো প্লেন ক্র্যাশ হল, কাগজে পড়েছিস তো, নাকি? শয়ে-শয়ে মানুষ মরল। একটা বোয়িং ভেঙে পড়ল পাটনায়, তার ক'দিন পরেই আস্ত একখানা কনকর্ড আছড়ে পড়ল খোদ প্যারিস শহরে। পাটনা প্যারিস দুটো শহরেরই প্রথম দুটো লেটার P আর A । আজকে আবার দেখলাম, নেপালের জঙ্গলে ছোট্ট একখানা বিমান ভেঙে পড়ছে। যাত্রীবোঝাই। নেপাল-এর মধ্যেও ওই দুটো অক্ষর রয়েছে।

আশ্চর্য!—আমি সোজা হয়ে বসেছি,—কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ নিউমারোলজিস্ট আসছে কোত্থেকে?

এটা ওদেরই বিষয়।—জগুমামা বললেন,—কিছুদিন হল এদের কাজকর্ম বাজারে খুব চলছে। নিউমারোলজি হল একধরনের ভবিষ্যৎ গণনা। জ্যোতিষচর্চা, হাত বা কোষ্ঠীর বদলে ওরা সংখ্যা নিয়ে চর্চা করে, ছক কষে, ভবিষ্যৎ বলে দেয়। প্রত্যেক আলফাবেটের একেকটা নাম্বার আছে। যেমন A হচ্ছে এক, B হচ্ছে দুই, C তিন...শেষ অ্যালফাবেট Z ছাব্বিশ। পরপর এই প্লেন দুর্ঘটনা নিয়ে ওরা নির্ঘাত হিসেব কষে দেখিয়ে দেবে, এবছরের জুলাই মাসে P এবং A এই দুটো অ্যালফাবেটের যা অবস্থান ছিল, দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য।

—এর পিছনে সত্যি কোনও বিজ্ঞান আছে নাকি?

—টোটালি রাবিশ! ওরা বলে পরা-বিজ্ঞান বা অকাল্টসায়েন্স। অর্থাৎ বাস্তব বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ব্যাপার। আসলে কিছু কাকতালীয় ব্যাপার, কোইনসিডেন্স, অনেকসময়ে মিলে যায়। আমরা ভাবি, দেখেছ জ্যোতিষীর কী অদ্ভুত ক্ষমতা! সব মিলিয়ে দিল।

—মামা, তুমি বললে আর আমার মাথায়ও আরেকটা ব্যাপার এসে গেল।

—কীরে?

—এখন যেসব অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, সবই প্লেন অ্যাকসিডেন্ট। আমি দেখেছি, যখন যে ধরনের দুর্ঘটনা শুরু হয়, তাই চলতে থাকে। প্রথমে একটা বাড়ি ভেঙে পড়ল তো পরপর বাড়িই ভাঙতে থাকল। ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট শুরু হল তো একের-পর-এক ট্রেন কলিশন, বে-লাইন...চলছেই।

—রাইট! ঠিক বলেছিস। এদিকটা আমি ভাবিনি। আসলে কী জানিস, এইসব কাকতালীয় ব্যাপার নিয়ে যত ভাববি, মন তত দুর্বল হয়ে পড়বে। মনে হবে, আমরা এই পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতকিছু এখনও জানি

না। হয়তো সেসবের পিছনেও কোনও যুক্তি আছে।...আসুন, আসুন!

জগুমামার কথায় আমি দরজার দিকে তাকিয়েছি। দুটো পাল্লার ফাঁকে উঁকি দিয়েছে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা অতি পরিচিত মুখ। আকর্ণ হাসিতে সে মুখ আলোকিত।

অনন্ত সরখেল।

আমি বলে ফেললাম,—আপনি কি মামার গন্ধ পান নাকি মশাই? মাসের-পর-মাস কোনও সাড়াশব্দ নেই। একটা ফোন পর্যন্ত করেন না। মামা গত পরশু শহরে এলেন আর আপনিও হাজির। ব্যাপারটা কী বলুন তো?

হুঁ-হুঁ বাবা, এর নাম হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি। জ্যোতির্বিজ্ঞান।—অনন্ত সরখেল চোখ সরু করে হাসলেন,—তোমায় বলা হয়নি টুকলু, মাসকয়েক হল আমি 'কিরো' নিয়ে ঘাঁটাঘাটি শুরু করেছি। স্যারের জন্ম-তারিখ লাগিয়ে একটা ছকও বানিয়ে ফেলেছি। সেই ছক ঘেঁটে পেয়ে গেলুম, স্যার এসময় কলকাতায় থাকবেন। বুঝলে! এক কাজ করো। দিদিকে বলো তোমার জন্ম তারিখ-সময় দিয়ে দিতে। তোমারটাও বানিয়ে দোবো! খুব সুবিধে হবে।

—গুল মারার আর জায়গা পাননি! যেই একটু ঢিল ছেড়েছি, অমনি চড়চড় করে হাওয়ায় ঘুড়ি ভাসিয়ে দিয়েছেন। বাজে কথা ছাড়ুন। মাকে ফোন করেননি আপনি?

আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিলাম, লেগে গেল। অনন্ত সরখেল তোতলাতে শুরু করেছেন, হেঁ-হেঁ...যাগ্যে...ওসব বাদ দাও, বাদ দাও। স্যার, বলছিলুম কি...

—দাঁড়ান, দাঁড়ান অনন্তবাবু! আপনার স্বভাব আর বদলাবে না। কিছু বলার আগে সে সম্পর্কে একটু আধটু জেনে নেবেন তো। অ্যাস্ট্রোলজির বাংলা জ্যোতিষচর্চা, জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়। সেটা হল অ্যাস্ট্রোনমি।

জগুমামা হাসতে-হাসতে বললেন,—টুকলু অনেক হয়েছে। এবার থাম।

ঠিক বলেছিস জগু। টুকলুটা দিনকে-দিন বড্ড বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে।—মা যে কখন ড্রইংরুমে ঢুকে পড়েছেন খেয়াল করিনি। মা বললেন,—অনন্তবাবু, কী খাবেন? চা, না কফি?

—হেঁ-হেঁ দিদি, সে একটা হলেই হল। আপনার হাত অমৃত! সেই কবে লুচি-বেগুনভাজা খেয়েছিলুম, এখনও মুখে লেগে আছে।

এই রে! বুড়োটা ভালোই মাসকা লাগাচ্ছে। বেচারি মা অবধারিতভাবে এই সন্ধেবেলায় লুচি ভাজতে বসে যাবে।

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—নমস্কার, আমি লালবাজার থেকে বলছি। ডক্টর জেবি মুখার্জিকে একটু পাওয়া যাবে? ডেপুটি কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট একটু কথা বলতে চান।

আমি রিসিভার জগুমামার দিকে এগিয়ে দিলাম,—লালবাজার থেকে ডিসিডিডি।

জগুমামার ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

—হ্যালো! হ্যাঁ বলছি। বলুন।...কী? ডক্টর এ. পালচৌধুরী, মানে অজিত মারা গেছে? কোথায়? কখন?...আশ্চর্য।...আচ্ছা।...ডাক্তার কী বলছেন? ...আচ্ছা।...হ্যাঁ হ্যাঁ দিন।...হ্যালো।...হ্যাঁ মা, তোমায় চিনতে পারছি। অনেক ছোট দেখেছিলাম।...কেঁদো না মা, মন শক্ত করো...!...তাই নাকি?...হুঁ..। নিশ্চয়ই...এখনই যাচ্ছি। তুমি কোথায় ছিলে?...ও..।...এখনও ফ্ল্যাটেই আছে তো?...ডিসি সায়েবকে বলো, যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই রাখতে।...বাকিটা গিয়ে শুনছি।...অ্যাড্রেস?...এক মিনিট—।

মামা আমার দিকে ফিরলেন,—লিখে নে।...হ্যাঁ বলো। তিন বাই দুই হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা দশ।.....আচ্ছা। ফুলবাগান দিয়ে ঢুকব...ঠিক আছে।...

জগুমামা ফোন রাখার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছি। গাড়ি গ্যারাজ থেকে বের করতে হবে।

একটু আগে অনন্ত সরখেলের আকস্মিক আবির্ভাবের পর থেকেই আমার মন বলছিল, এরপরেই কিছু একটা শুরু হতে চলেছে। কারণ আমাদের ত্র্যহস্পর্শযোগ বড় মারাত্মক। জ্যোতিষ মানি চাই না মানি, দেখা গেছে মামা আমি অনন্তবাবু যে ক'বার একজায়গায় হয়েছি, সে ক'বারই অদ্ভুত সব ব্যাপারস্যাপার ঘটেছে। এবার কপালে কী আছে, কে জানে। মনে-মনে গুনছি, অফিসে আর ক'টা ছুটি পাওনা আছে।

অনন্তবাবু নির্বিকার। শুধু চোখদুটো চকচক করছে।

জগুমামা ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললেন,—দিদি, আমরা বেরোচ্ছি। অনন্তবাবু, আপনি? যাবেন, না লুচি-বেগুনভাজা?

অনন্ত সরখেল মুখ করুণ করে বললেন,— কেন আর মনে দাগা দিচ্ছেন স্যার?..

২

—তোমার কাছে অজিতবাবুর নাম শুনিনি তো?

—না। তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। তবে ভালো কাজ করত অজিত। একটু ইনট্রোভার্ট টাইপ, নিজের মনে কাজ করে যেত। ওর সঙ্গে পরিচয় অবশ্য অনেকদিনের। সেই কলেজলাইফ থেকে। কখনও-সখনও সভা-সম্মেলনে দেখা হত, একটু গল্পগুজব এই আর কি।...হ্যাঁ...এবার বাঁ-দিকে। ফুলবাগানে পড়ব।

—ফোনে যা বুঝলাম, আচমকা মারা গেছেন। মেয়ে কী বলল?

—ডাক্তার বলেছে, মৃত্যুর কারণ সিভিয়ার সেরিব্রাল অ্যাটাক। অন্যকিছু বোঝা যাচ্ছে না। মেয়ের বক্তব্য, বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাকে খুন করা হয়েছে। সেই কমপ্লেন নিয়েই সে দেখা করেছে লালবাজারে। তারপর সেখান থেকে ফোন করেছে আমায়।

—তোমার ফোন নম্বর পেল কীভাবে?

—পাওয়া শক্ত নয়। আমার কলকাতার ঠিকানা যে তোদের বাড়ি, সরকারি লেভেলে প্রায় সকলেই জানে। কিন্তু রহস্যটা হল অন্যজায়গায়। খুন, অথচ কোনও ওয়েপন নেই, ক্লু নেই—এ কীভাবে সম্ভব?

—খুন করবেই বা কেন?

—রাইট। মোটিভ চাই। ওর মেয়ে ঠিক এই লাইনেই ভাবছে। মোটিভ একটা পেতে হবে। মনে হচ্ছে এসে গেছি। জোড়ামন্দিরের উলটোদিকে গলি। ঢুকে পড়।

—অজিতবাবুর স্ত্রী জীবিত?

—না। মেয়ে ছোট থাকতে স্ত্রী মারা গেছিল। ওই যে। পুলিশের গাড়ি। কিছু লোকজনও আছে।

গাড়ি থেকে নামতেই বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ানো একজন ইউনিফর্মড অফিসার এগিয়ে এলেন। জগুমামা বললেন,—ডক্টর অজিত পালচৌধুরী কোন তলায় থাকতেন?

—তিনতলায় সার। আপনিই কি ডক্টর মুখার্জি?

—হ্যাঁ।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। পাশে পুলিশ অফিসার!

মামা বললেন,—আপনি লোকাল থানা-থেকে?

—হ্যাঁ সার। আমি ও.সি., বেলেঘাটা।

—ও। ডাক্তার এখনও আছেন? ফোটোগ্রাফার?

—হ্যাঁ সার। সবাই ওয়েট করছে। ডিসি বলে দিয়েছেন, আপনি না আসা পর্যন্ত কোনও কিছুতে হাত না দিতে।

ফ্ল্যাটের বাইরে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল।

বেশ বড় ফ্ল্যাট। খোলামেলা। প্রথম ঘরটা ডাইনিং কাম ড্রইংরুম। ছড়ানো-ছেটানো সোফা, টিভি। তবে অগোছালো। বোঝা যায়, এ ফ্ল্যাটে বাড়ি গোছানোর কেউ থাকতেন না।

সোফাতে কয়েকজন বসে ছিলেন। আমরা ঢুকতে উঠে দাঁড়ালেন। জগুমামা বললেন,—বডি কোথায়?

—শোওয়ার ঘরে। আসুন সার।

—মেয়ে?

—ওখানেই সার।

দরজা দিয়েই ঘরের ভিতরটা দেখা গেল। অজিত পালচৌধুরী সোফায় এলিয়ে পড়ে আছেন। পাশেই খাট। ডানহাতটা বিছানায়। আঙুলগুলো কুঁকড়ে আছে। ওই জায়গার চাদর কুঁচকোনো। হঠাৎ খুব যন্ত্রণা পেয়ে চাদরটা খিমচে ধরেছিলেন। পাশের ছোট টেবিলে আধ খাওয়া চা। প্লেটে খাবারের দু-চার টুকরো। জলের গ্লাস। জানলার সামনে একজন মহিলা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। কয়েকমুহূর্ত আমাদের দেখল। তারপরেই জগুমামার দিকে এগিয়ে এল,—আঙ্কল।

মহিলা না বলে মেয়ে বলাই ভালো। বয়েস বাইশ-তেইশের মধ্যে। সুশ্রী চেহারা। এই মুহূর্তে বিপর্যস্ত। জল এখনও টলটল করছে চোখের কোণে।

জগুমামা মেয়েটির মাথায় হাত রাখলেন,—মা শান্ত হও। আবার বলছি, মন শক্ত করো। আমি গোয়েন্দা, পুলিশ কোনওটাই নই। তোমার বাবার মতোই বিজ্ঞানচর্চা করি। তবু তোমায় কথা দিচ্ছি, অজিতের মৃত্যু যদি স্বাভাবিক না হয়, আমি শেষপর্যন্ত চেষ্টা করব।...

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জগুমামা বললেন,— ঠান্ডা হয়ে বোসো মা। আমায় পরপর সব খুলে বলো।...

পাশ থেকে ওসি বলে উঠলেন,—সার, ডাক্তার-ফটোগ্রাফার সবাই বসে আছেন।

—ও হ্যাঁ। আপনি ফোটোগ্রাফারকে বলুন, এই ঘরের সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে বিছানা এবং ডেডবডির ক্লোজ-আপ ছবি তুলে নিতে। ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলছি।...এসো অহনা, আমরা ড্রইংরুমে বসি।...

আমরা সকলে সোফায় এসে বসলাম। সামনে যুবক ডাক্তার।

—আপনি ভালোভাবে ডেডবডি পরীক্ষা করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার কী-কী মনে হয়েছে?

—মৃত্যু হয়েছে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। মৃত্যুর কারণ সিভিয়ার সেরিব্রাল অ্যাটাক, যার ফল থ্রম্বোসিস। এঁদের ফ্যামিলি ডাক্তারও ডেথ সার্টিফিকেটে একই কথা লিখে গেছেন।

—কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার ধরা পড়েনি?

—দেখুন, আমরা আউটওয়ার্ডলি বডি চেকআপ করেছি। ক্লিনিকাল অবজারভেশনে আনন্যাচারাল কিছু দেখতে পাইনি।

—মৃতের ডানহাতের আঙুলগুলো দেখেছেন?

—হ্যাঁ দেখেছি। সেরিব্রাল অ্যাটাকে ওটাই হয়। মৃত্যু যন্ত্রণায় মানুষ কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়।

—পয়জনিং বা বিষপ্রয়োগে কি এই অ্যাটাক হতে পারে?

—আমার জানা নেই। তেমন কিছু হলে পোস্টমর্টেমে জানা যাবে।

—থ্যাঙ্কিউ ডক্টর। ওসি, আপনি বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, তার সঙ্গে গ্লাস, কাপ, ডিস, চা-খাবারের টুকরো যা কিছু বডির কাছাকাছি ছিল, সব ফোরেনসিক টেস্টে দেবেন।

—ঠিক আছে সার।

—কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাইকে চলে যেতে বলুন। শুধু আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে।

পরপর কাজগুলো দ্রুত হয়ে গেল। অজিত পালচৌধুরীর নিষ্প্রাণ দেহ স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশের লোকজন।

জগুমামা বসে নেই। হাতে সিগারেট, ঘুরে বেড়াচ্ছেন ফ্ল্যাটের এঘর-ওঘর। মাঝে-মাঝে জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

একজন পুলিশ অফিসার শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জগুমামাকে বললেন,—সার, বড়বাবু জিগ্যেস করছেন বিছানার চাদরটাও কি নেব?

—অবশ্যই। যাওয়ার আগে ঘর সিল করে দিয়ে যাবেন।

শোওয়ার ঘরের আলো নিভে গেল। বিছানার চাদর হাতে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বাঁ-হাতে একটা ফোন।

—সার, এটা রাখুন। বিছানায় ছিল।

অহনা বলে উঠল,—ওটা বাবার সেলফোন। আমায় দিন।

জগুমামা বললেন,—না মা। আপাতত পুলিশের জিম্মায় থাক।...ওসি সাবধানে রেখে দেবেন।

এখন ফ্ল্যাট ফাঁকা। আমরা তিনজন। পুলিশের ওসি ছাড়া অহনা এবং আরেকজন বুড়োমতো লোক। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরনে। ঘরের এককোণে মেঝেতে মুখ গুঁজে বসে আছে। জগুমামা বললেন,—ও তো কাজের লোক, তাই না?

অহনা ঘাড় নাড়ল। বলল,—নিবারণকাকু আমাদের কাছে একসটেন্ডেড ফ্যামিলি। আমার ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে। আমায় কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। সংসারটা ও-ই চালাত। আমার বিয়ের পর থেকে—

জগুমামা মাঝপথে বললেন,—এখন তুমি কোথায় থাকো?

—কাছেই। সল্টলেকে। হাজব্যান্ড আর আমি, দুজনের সংসার। আমার হাজব্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। ছ'মাস এখানে, ছ'মাস জাহাজে। ছুটি কাটিয়ে ক'দিন আগেই ভয়েজে গেল।

—এখন তুমি একাই থাকছ?

—প্রায় তাই। একজন কাজের মেয়ে আছে। সে আর আমি। বাবা থাকলে মাঝেমধ্যে এখানে এসে থাকি। শ্বশুর-শাশুড়ি কাটোয়ায়, দেশের বাড়িতে। দু-চারদিনের জন্যে সেখানেও চলে যাই।

—আজ খবরটা কখন পেলে?

—সন্ধে ছ'টা নাগাদ। নিবারণকাকু ফোন করেছিল। তবে আসার আগেই বাবা...চলে গেছে!

অহনা আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

জগুমামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন,—একটা কথা অহনা। অ্যাপারেন্টলি অজিতের মৃত্যুতে অস্বাভাবিক কিছু কিন্তু চোখে পড়ছে না। আমাদের যা বয়েস, তাতে যে-কোনও সময় ব্রেন বা হার্ট অ্যাটাক হতেই পারে। তোমার কাছে মৃত্যুটা আনন্যাচারাল লাগছে কেন?

সেটাই তো আপনাকে বলতে চাইছি।—চোখ মুছে অহনা বলল,—বাবা কী নিয়ে রিসার্চ করছিলেন, জানি না। বলেননি কখনও। তবে একটা কথা বলতেন, রিসার্চ সাকসেসফুল হলে সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। কিছুদিন আগে হঠাৎ আমায় বললেন, উনি ভয় পাচ্ছেন। কেউ বা কারা ফোনে শাসাচ্ছিল। রিসার্চের পেপারস চাইছিল। না দিলে খুন করার হুমকি দিচ্ছিল।

—উনি কোথায় রিসার্চ করতেন? এই ফ্ল্যাটে?

—না-না। সে বেশ দূরের রাস্তা। সিকিমে। গ্যাংটক থেকে যেতে হয়। বাবার কাছে শুনেছি, খুব দুর্গম জায়গা। সেখানেই ল্যাবরেটরি বানিয়ে....আসলে বাবার রিসার্চ মেটিরিয়াল বোধহয় ওই ক্লাইমেট ছাড়া পাওয়া যায় না।

—রিসার্চের সাবজেক্ট সম্পর্কে বাবা তোমায় একটুও বলেননি?

—না:। বাবা বলতেন, খুব কনফিডেন্সিয়াল। বলা যাবে না। নিবারণকাকু অবশ্য বাবার সঙ্গেই থাকত। কাকু, তুমি কি জানো কিছু?

নিবারণ হাঁ করে আমাদের কথা শুনছিল। আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়ল,—নারে খুকি। বাবু শুদু কইতেন, এ এক আশ্চযযি ওষুধ বার করছি রে। মানষের বড় উবকারে লাগবে।

জগুমামা বললেন,—তুমি তো জায়গাটা চেনো নিবারণ। আমাদের নিয়ে যেতে পারবে না?

—হ্যাঁ বাবু। গ্যাংটক থেকে আরও উত্তুরে যাতি হয়। ভজকট সব নাম। ওইরকম এক গেরাম পেরিয়ে—গহীন জঙ্গলের মধ্যি। জনপেরানি নাই ও তল্লাটে।

ইতিমধ্যে বাইরের কনস্টেবলদের একজন এসে ওসির কানে-কানে কী বলল। ও.সি. বললেন,—একজন লোক ভিতরে আসতে চাইছে। বলছে, এদের খুব পরিচিত।

—আসতে দিন।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে একজন গোলগাল চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন। মাথায় চকচকে টাক, কামানো তেলতেলে মুখ, নাকের ওপর ছোট্ট একটা জড়ুল। চোখে রিমলেস সোনালি চশমা, দামি প্যান্টশার্ট, হাতে বিদেশি কোম্পানির ব্রিফকেস। চোখেমুখে উদ্বেগ। আমাদের দেখে আরও থতমত খেয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তার চোখ পড়ল অহনার ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে অহনা ফুঁপিয়ে উঠল,—নোপানি আঙ্কেল! আপনি এত দেরি করে ফেললেন?

—হামি তো কুছু খোপরই পায়নি। এইখান সে ঘর যাচ্ছিলম, শোচলাম আজ কুছু বাত হোয় নি। দাদার সোঙ্গে কথা করে যাই। হাতে টাইম ভি ছিল। নীচে পুছতে হামি তো ইকদম...ইসব আচানক ক্যায়সে হোয়ে গেল বেটি?

ভদ্রলোক রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগলেন।

জগুমামা বললেন,—বসুন, বসুন। আপনার পরিচয়?

ভদ্রলোক পার্স থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন। অহনা বলল,—আঙ্কল, ইনিই হচ্ছেন বাবার রিসার্চ পার্টনার। নোপানি আঙ্কেল।

—পার্টনার! উনিও কি সায়েন্টিস্ট?

নেহি। নেহি।—নোপানি বলে উঠলেন,—হামি একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বোলতে পারেন দাদার রিসার্চের হামি প্রোমোটার ছিল। হামিই ফিনান্স করত, রিসার্চের খোরোচখরচা দিত।

আমাদের চোখ গিয়ে পড়েছে নেমকার্ডটার ওপর। অরুণ নোপানি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তলায় গোটাচারেক কোম্পানির নাম।

—তাহলে তো আপনি অজিতের রিসার্চের সবটাই জানেন। কী নিয়ে রিসার্চ করছিল, কতদিন ধরে করছিল, একটু বলবেন?

নোপানি বললেন,—জরুর। দাদার সোঙ্গে হামি দশবছর অ্যাসোসিয়েটেড। দাদা রিসার্চ করছিল—

একটু থামলেন। আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। মামা বললেন,—আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন মিস্টার নোপানি। আমি অজিতের বন্ধু, সায়েন্টিস্ট। জগবন্ধু মুখার্জি। অহনাই আমায় ফোন করে ডেকে এনেছে। ওর ধারণা, ওর বাবাকে খুন করা হয়েছে। আর আমার ভাগ্নে অর্ণব ভট্টাচার্য। ইনিও আমাদের নিজেদের লোক, অনন্ত সরখেল। আর ইনি লোকাল থানার ওসি। আপনার কথা পাঁচকান হবে না।

নোপানি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন জগুমামার দিকে। বললেন,—হাঁ জি। উটাই হামাদের বহোত বড়া ডর ছিল। ইখন দেশের যা সিচুয়েশান, স্পাইতে ভরতি হয়ে গেসে। কুনো বাত চাপা থাকসে না। দাদার রিসার্চ ছিল কেনসার ড্রাগের ওপর। ওনেক কাজ হইয়ে গেসিল। আর দু-এক মাহিনা কাম চালাইলে, আমার বিশোয়াস, সাকসেস হত। লেকিন—

—আপনি কি জানেন, অজিতকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল? রিসার্চ পেপার চাওয়া হচ্ছিল? না দিলে প্রাণের ভয় দেখানো হচ্ছিল?

—না:! হামাকে তো দাদা ইসোব কুছু বোলে নাই। হাঁ বেটি, তুমাকে কভি কুছ বোলিয়েছিল?

অহনা ঘাড় হেলাল।

নোপানির মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠল। বললেন,—দেখিয়ে! ক্যায়সা দাদার দিমাক। হামাকে বোললে সোঙ্গে-সোঙ্গে সিকিউরিটির ইন্তেজাম হোয়ে যেত। বেপারটা সেন্ট্রালের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেকটর, আর্মির টপমোস্ট অফিসাররা সব জানত। জানাতেই হোবে। যেখানে হামাদের ল্যাবরেটরি, উ জাগা তো রেস্ট্রিকটেড প্লেস।

মামা বললেন,—রাইট যু আর। এই আশঙ্কার কথাটা অজিত চেপে গেল কেন? একটা কথা বলি মিস্টার নোপানি?

—বোলিয়ে।

—আপনি অজিতের রিসার্চ প্রোমোট করছিলেন। ফিনান্স করছিলেন। এই দশ বছরে নিশ্চয়ই আপনার বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচও হয়েছে। আপনার ইন্টারেস্ট?

অরুণ নোপানি ম্লান হাসলেন,—উসোব শুনে ইখন কী ফায়দা মুখার্জিবাবু? লস্ট কেস।...হামাদের হিসাব খুব সিধা ছিল। দাদার সোঙ্গে হামার রিটন এগ্রিমেন্ট ভি ছিল। ফিফটি-ফিফটি। সাকসেস হোলে পেমেন্ট লিয়ে দাওয়াইয়ের ফরমুলা সেল করতাম। কোটি-কোটি টাকা প্রফিট একদম পাক্কা ছিল।....নসিব! মেরা নসিব! দাদাই চোলে গেল, তো টাকা!

—জগুমামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর থেমে বললেন,—মিস্টার নোপানি, আপনাকে ধন্যবাদ। ওসি, আপনি ফ্ল্যাট লক করে দিন। অহনা, তুমি নিবারণকে আপাতত সল্টলেকে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও।...

রাত কম হয়নি। ঘড়িতে সাড়ে দশটা। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা। গাড়ি চলছিল বাড়ির দিকে। আমি বললাম, —তুমি নীচে ওসি-র সঙ্গে কী কথা বলছিলে?

মামা বললেন,—আবার ফিরে আসতে হবে। রাত বারোটার পরে। ফ্ল্যাট সার্চ করতে হবে।

অনন্ত সরখেল প্রায় দু-ঘণ্টা বাকশূন্য ছিলেন। এতক্ষণ পরে হঠাৎ ঝুঁকে বললেন, —স্যার, ওই লোকটা খুব গোলমেলে।

—কে?

—ওই যে নোপানি।

—কেন?

—দেখলেন না, কীরকম টাকার লোভ? ওর কথা থেকে বেরিয়ে এল লাখ-লাখ টাকা লোকসানের আপশোস?

—খুব স্বাভাবিক। ব্যবসাদার লোক, টাকা লাগিয়েছে। লাভ কিচ্ছু হলই না, সবটা জলে গেল। দু:খ হবে না?

—আহা, আপনি বুঝছেন না স্যার, চোখের চামড়া থাকবে তো! সবাই দু:খে কাতর, সদ্য মারা গেছে লোকটা, এটা কি এসব বলার সময়? স্যার, আমার এক বন্ধু বলেছিল, আনি-দুয়ানি দেখলেই সাবধান থাকবি। ওরা সিন্ধি, খতরনাক জাত। মুখে মিষ্টি হাসি, পিছনে ছুরি মারে।

—ধ্যুৎ মশাই! জাতটাত নিয়ে কী বাজে বকছেন? বাঙালিদের মধ্যে বাজে লোক নেই? অল বোগাস। টুকলু, এসটিডি বুথ দেখে গাড়ি থামা। দিল্লিতে ফোন করব।

৩

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। একহাত দূরেরও কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমার টর্চ একমাত্র ভরসা। জ্বলন্ত আলোর বৃত্ত আস্তে-আস্তে ঘুরছে। মামা ফিসফিস করে বলছেন,—আরেকটু...আরেকটু বাঁ-দিকে...একটু নীচে...পেয়ে গেছি।

খু-ট! শব্দ হল। নিয়নের আলোয় ঝলমল করে উঠল ঘরটা। জগুমামা পিছনের পুলিশ প্রহরীকে নিচু গলায় বললেন,—আপনারা বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে চলে যান। কাল ভোরে খুলে দেবেন। রাতে একটু অ্যালার্ট থাকবেন।...

ঠিক আছে স্যার।—বাইরে থেকে তালা বন্ধ করার শব্দ হল।

আমি বললাম,—তুমি কি কাউকে একসপেক্ট করছ?...

—অবশ্যই। যদি অহনার সন্দেহ সত্যি হয়, তাহলে অপরাধী দেরি করবে না। আজই এই ফ্ল্যাটে হানা দেবে।

—কেন? রিসার্চ ল্যাবরেটরি তো সিকিমের জঙ্গলে।

—ওফ টুকলু, বুদ্ধিতে একটু শান দে! ওখানে রিসার্চ হত, তো কী হয়েছে? অজিত কি ওখানে সব কাগজপত্র রেখে এসেছে নাকি? সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এই ফ্ল্যাটেই আছে। অপরাধী চেষ্টা করবে সেসব আজই সরিয়ে ফেলতে। কারণ, কাল সকালে পুলিশ-গোয়েন্দারা আসবে, আবার সব খুঁজবে।

—অর্থাৎ, আজ রাতে যদি কেউ এখানে হানা দেয়, তবে ধরে নিতে হবে, অজিতবাবুর মেয়ের ধারণা ঠিক?

—সিওর।...চল এবার কাজে নেমে পড়ি।...

বাঁ-দিকে শোওয়ার ঘর। ডানদিকে আরেকটা বড় ঘর। ছোট একটা খাট পাতা, টেবিল-চেয়ার, বইয়ের আলমারি। এককোণে আরেকটা ছোট টেবিলের ওপর একটা কম্পিউটার।

মামা দ্রুত কম্পিউটারের সামনে বসে পড়লেন। সুইচ অন করলেন। একটুপরেই খুশির সুরে বলে উঠলেন,—বা:! ইন্টারনেট কানেকশনও রয়েছে। আমি অবশ্য কম্পিউটার খুব একটা জানি না। দেখি, যদি খুলতে পারি।

—খুলবে কী করে? পাসওয়ার্ড লাগবে যে!

—অটো ডায়ালার আইকনটা রয়েছে। তার মানে মেশিনে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। ক্লিক করলে আপনা থেকেই কানেকশন হয়ে যাবে। তবে এখন দরকার নেই। আগে কম্পিউটারে দেখি, কী-কী পাওয়া যায়।

জগুমামা মাউস নিয়ে পুটপুট করে ক্লিক করে যাচ্ছেন। আমি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছি।

একটু পরে মাউস ছেড়ে দিয়ে হতাশ গলায় মামা বললেন,—নাহ। এম এস ডস লক করা রয়েছে। অর্থাৎ যা কিছু ইনফর্মেশন ওর মধ্যে আছে।

আমি বললাম,—তা হলে উপায়?

—খুঁজতে হবে। এই ফ্ল্যাটেই কোথাও না কোথাও লেখা আছে। চল শোওয়ার ঘরেই ভালো করে খুঁজতে হবে।

ড্রইংরুম পেরিয়ে আবার শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। আলো জ্বাললাম। বুক ধড়াস করে উঠল। ফাঁকা বিছানা। বেডকভারও নেই। এখানেই কিছুক্ষণ আগে পড়ে ছিল বিজ্ঞানীর নিস্পন্দ দেহ।

মামা চলে গেছেন স্টিলের আলমারির সামনে। চাবি দেওয়া ছিল না। হাতলে চাপ দিতে খুলে গেল। ভিতরের লকারের বাইরে চাবি ঝুলছে। টান দিতে লকারের পাল্লা হাট হয়ে গেল। ভিতরে ব্যাঙ্কের পাস বই,

চেকবই, কিছু খুচরো টাকা। মামা হাত ঢুকিয়ে দিলেন। একশো টাকার একটা সিল করা বান্ডিল। সরিয়ে রেখে আবার হাত ঢোকালেন।

একটা চ্যাপ্টা ওয়ালেট। মানিব্যাগের চেয়ে আকারে বড়। একদিকে নোট প্যাড, অন্যদিকে চেন টানা।

চেনটা টানতেই অদ্ভুত দেখতে একটা চাবি নীচে পড়ে গেল। মামা কুড়িয়ে নিলেন।

চাবিটার একদিকে পরপর কয়েকটা বোতাম। গোড়ার দিকটা অন্য চাবির মতো খাঁচকাটা নয়, থ্যাবড়া।

মামা মাথা দোলাতে শুরু করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—এটা কী জানিস? ইলেকট্রনিক চাবি। যদ্দূর মনে হয়, ল্যাবরেটরি খুলবার ছাড়পত্র।

আমি থ হয়ে দেখছি।

—এই যে বোতামগুলো দেখছিস, এখানে পাসওয়ার্ড আছে। সাংকেতিক নম্বর। এই চাবি ঢুকিয়ে ওই পাসওয়ার্ড টিপলে তবেই ল্যাবরেটরিতে ঢোকা যাবে। তার মানে—

—তার মানে উনি রিসার্চের ব্যাপারে চূড়ান্ত গোপনীয়তা জারি রেখেছিলেন।

—ইয়েস। দাঁড়া, এই নোটপ্যাডটা খুলে পড়া যাক।

—আচ্ছা মামা, এত গোপন ব্যাপার, অথচ আলমারিটাই খোলা?

—বন্ধ করার সময় পাননি, তাই। বাইরে থেকে ফিরে লকারে কাগজপত্র টাকাপয়সা ঢুকিয়েছেন। নিবারণ চা-জলখাবার এনে দিয়েছে। খেতে-খেতে হঠাৎ মগজে রক্তক্ষরণ—সেরিব্রাল অ্যাটাক! সব শেষ।

মামা বলছেন আর নোটপ্যাডটার পৃষ্ঠা উলটে যাচ্ছেন।

—হুঁ। এই যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর,... ফোন নম্বরগুলো...এল.আই.সি. পলিসি নম্বর, মেয়ের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট স্পেসিমেন সিগনেচার...আরে! এই তো! পেয়ে গেছি। কম্পিউটারের প্রাইমারি পাসওয়ার্ড? তার মানে নিশ্চয়ই লাস্ট বা সেকেন্ডারি পাসওয়ার্ড আছে?...দেখি...নাহ!

মামার মুখের রং ঘনঘন বদলাল।

আমি বললাম,—ওই ইলেকট্রনিক চাবির পাসওয়ার্ড? ওটাও নেই।

জগুমামা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ালেন,—হুঁ, দেখা যাক। চল, প্রাইমারি পাসওয়ার্ড দিয়েই আগে খুলি।

পাসওয়ার্ড টাইপ করতেই কম্পিউটার খুলে গেল। পরপর ফাইল সাজানো। মামা ক্লিক করছেন, পড়ছেন, আবার নতুন ফাইলে যাচ্ছেন।

রাত কত হল? বাপরে, তিনটে বাজে। আমার চোখ জুড়ে আসছে ঘুমে। কম্পিউটারের সামনে বসে ফাইল পড়ার ধৈর্য আমার নেই। খাটে লম্বা হয়ে পড়েছি।

—কীরে, ঘুমিয়ে পড়লি?

অনেক দূর থেকে যেন মামার গলা। আমি ধড়মড় করে উঠে বসে ঘুমের তাড়সে চেঁচিয়ে উঠেছি,—কী? কী বলছ?

স্থানকাল ভুলে আমার এই চেঁচিয়ে ওঠায় সর্বনাশ হয়ে গেল!

নিস্তব্ধ ফ্ল্যাটের বাইরে দুদ্দাড় পায়ের শব্দ! কেউ ছুটে পালাচ্ছে।

ততক্ষণে আমি সংবিৎ ফিরে পেয়েছি। মামার আগেই আমি ছুটে গেলাম ফ্ল্যাটের দরজার কাছে। পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলতে গেলাম। তারপরেই মনে পড়ল, দরজায় তো বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

মামা ছুটে গেছেন শোওয়ার ঘরের জানলার কাছে। জানলা খুলে দুজনেই ঝুঁকে পড়লাম নীচের রাস্তায়।

একটি মারুতি ভ্যান। স্টার্ট হয়ে গেছে। নিমেষে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

জগুমামা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন,—এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই রে। আমারই দোষ। দেখছি, তুই ঘুমোচ্ছিস। না ডাকলেই পারতাম। আর আসল দোষী পুলিশের সেপাই দুটো। পইপই করে ওদের বলে দিলাম। যাকগে! গতস্য শোচনা নাস্তি। আয় আমার সঙ্গে।

কম্পিউটার চালু আছে। মামা ক্লিক করে দেখালেন,—এই দ্যাখ, চাবির পাসওয়ার্ড পেয়ে গেছি।

আমি দেখলাম, স্ক্রিনে পরপর চারটে সংখ্যা ফুটে উঠেছে।

—কিন্তু রিসার্চের মূল ফাইলে ঢুকতে পারিনি। এই যে লেখা আছে, সিক্রেট ফোল্ডার ১,২,৩...এগুলোর মধ্যেই সব ডাটা ঢোকানো আছে। তবে যা পেয়েছি, তাও কিছু কম নয়।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

—ক্যানসার ড্রাগ নিয়ে রিসার্চ করছিল, তা তো ওর প্রোমোটার নোপানির কাছেই শুনেছিস। কতকগুলো গাছের নাম এখানে আছে। তবে কোন গাছের নির্যাস নিয়ে কাজ করছিল, সেটা লেখেনি। তা ছাড়া—

মামা একটু থেমে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন,—তা ছাড়া কম্পিউটারে ওর লেখা ডায়েরি পেয়েছি। প্রায় রোজই লেখার অভ্যেস ছিল। গোড়ার দিকে ডায়েরিতে—কীভাবে কাজ শুরু করছে...সরকারি অনুমতি...নোপানির সঙ্গে যোগাযোগে ওই দুর্গম জায়গায় কীভাবে ল্যাবরেটরি তৈরি হল...অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনল বিদেশ থেকে...এইসব আছে। মেয়ের কথাও আছে। সময় দিতে পারেনি...মেয়েটি একটু বেয়াড়া স্বভাবের হয়ে গেছে...তার জন্যে দু:খ। নিবারণের কথাও লিখেছে মাঝে-মাঝে। ডায়েরির শেষদিকে কাজ প্রায় শেষের মুখে...সাফল্যের আনন্দ-উত্তেজনার পারদ চড়ছে...অন্যদিকে

আবার আতঙ্ক ঘিরে ধরছে...কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। যেমন লিখেছে—'নিবারণ কি টাকার গন্ধ পেয়েছে? ওর চোখমুখ কেমন বদলে গেছে'। আবার লিখছে—'উড়ো ফোন পাচ্ছি। টাকা দিতে চাইছে। কোটি-কোটি টাকা। কী করব? শুধু সিডিতে দিয়ে দিলেই হবে। অরুণকে বলতে ও বলছে, অন্য কাউকে দেওয়ার আগে আমায় দিন। আমি টাকা খরচ করেছি। আমায় খুন করবে না তো?'

—এই দু-একদিনের মধ্যে উনি ডায়েরি লেখেননি?

—হ্যাঁ। পরশু লিখেছে। আমার সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দিলাম। যা আছে, ওই কম্পিউটারে। সেকেন্ডারি পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করে দিয়েছি। আমি ছাড়া কেউ খুলতে পারবে না। যদি ভুলে যাই?....নিজের সন্তানের চেয়ে প্রিয় আর কী আছে?

জগুমামা এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তারপর বললেন,—আমি ভাবলাম, মেয়ের নাম দিয়ে পাসওয়ার্ড করেছে। নামটা ইংরেজিতে টাইপ করলাম। হল না। পাসওয়ার্ড সিক্স ডিজিট—ছয় অক্ষরের। অহনা পাঁচ অক্ষরের!

—এখন কী করবে, ভেবেছ?

—আর কী করব, কীই বা করার আছে? কপালে ছোটা লেখা আছে! বুঝলি, দেরি করা যাবে না। কাল গ্যাংটক রওনা হতে হবে।

৪

চতুর্দিক ধুলোয়-ধুলোয় ঝাপসা। ঘর...র...র...র...করতে-করতে হেলিকপ্টার পায়ে ভর দিয়ে মাটিতে নামল। আস্তে-আস্তে মাথার ব্লেডদুটো থেমে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ হল। ধুলো থিতিয়ে আবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

গ্যাংটকে এর আগেও এসেছি। সেই 'বড় পায়ের খোঁজে'। সেবার জগুমামার সঙ্গে গেছিলাম পশ্চিমে রাবাংলার দিকে।

তবে আকাশপথে এই প্রথম। এবারের যাত্রার সবটা আকাশে। দমদম থেকে বাগডোগরা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে, সেখান থেকে এই পাঁচ সিটের হেলিকপ্টারে।

হেলিকপ্টার মাটি স্পর্শ করতেই পাশ থেকে অনন্ত সরখেল ফোঁওস করে নিশ্বাস ছাড়লেন,—ও:!

ঘুরে তাকালাম,—কী হল?

—কিছু না। হোয়াট এ থ্রিল!

—থ্রিল মানে?

—ছি: টুকলু! তুমি ফ্রিল মানে জানো না? উত্তেজনার অনুভূতি।

—সে তো থ্রিল। ফ্রিল নাকি?

অনন্ত সরখেল স্মার্টলি বললেন,—হয়, হয়। ফিলিং আর থ্রিল পাঞ্চ করো। ব্যস, ফ্রিল ভেরি সিম্পল। বুঝলে। এসব মড ইংলিশ। যাগ্যে, তুমি এর আগে কখনও হেলিকপ্টার চড়েছ?

—না। আপনি?

—আমিও না। উরিব্বাপ! খালি ভাবছিলুম, এইরে! পাখা দুটো বন্ধ হয়ে গেল, সবসুদ্ধু ভেঙে পড়ল। চারপাশ খোলা,...উঁচু-উঁচু পাহাড়গুলোর মাথা টপকাবার সময়ে তো মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ধাক্কা লাগল। বাপরে বাপ, আধঘণ্টা যা কাটালুম!

—তার মানে, আপনি কিছুই এনজয় করেননি! আকাশ থেকে এমন অসাধারণ প্রকৃতি, পাহাড় জঙ্গল নদী কিছুই দেখতে পাননি?

—দেখব না কেন? দেখেছি, আলবাত দেখেছি। তবে হ্যাঁ, সত্যি কথা, ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলুম। মাঝে-মাঝে অবিশ্যি একটু অন্যরকমও ভাবছিলুম। আমি যদি মন্ত্রী হতুম। হ্যাঁ, মন্ত্রী-টন্ত্রীরা তো দেখি যখন-তখন হেলিকপ্টারে ওড়ে। এদিক-ওদিক যায় বক্তিমে দিতে। তখন মনে বেশ সাহস—

অনন্তবাবুর কথা শেষ হল না। হেলিকপ্টারের দরজা খুলে গেছে। একজন মিলিটারি অফিসার এগিয়ে এসেছেন,—হ্যালো! ডক্টর মুখার্জি?

—ইয়েস!

অফিসার হাত বাড়িয়ে দিলেন,—সার, গ্ল্যাড টু মিট য়ু। আই'ম কর্নেল মনপ্রীত সিং।

জগুমামা হ্যান্ডশেক করলেন। কর্নেল সিং বললেন,—আপনাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছি। আসুন। দিল্লি থেকে দুজন অফিসারও এসেছেন। গেস্ট হাউসে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

চারজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আর্মির জিপে উঠে বসলাম। নিবারণ আমাদের সঙ্গেই এসেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জগুমামা বললেন,—কর্নেল সিং, আপনি তো ডক্টর পালচৌধুরীকে খুব ক্লোজলি দেখেছেন। আপনার সঙ্গে ওনার প্রায় রেগুলার যোগাযোগ ছিল। আপনিই বলুন।

—হ্যাঁ, ভেরি স্যাড ইনসিডেন্ট। আমি তো শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। চমৎকার মানুষ ছিলেন। আমি প্রায়ই ওনার ফরেস্টের ডেরায় যেতাম। অনেক গল্প করতেন। বলতেন, মেডিক্যাল সায়েন্সে ভারতবর্ষে যা রিসোর্স আছে, অন্য কোথাও নেই। কিন্তু আমাদের অপদার্থতার জন্যে সবই চলে যাচ্ছে বাইরে।

—ওর ফিনান্সিয়াল প্রমোটার অরুণ নোপানিকে চিনতেন?

—চিনতাম। উনি বেশি আসতেন না। তাছাড়া সেন্ট্রাল গবমেন্ট থেকে আমাকে ইনসট্রাকশন ছিল ডক্টর পালচৌধুরীকে ফুল সিকিওরিটি দেওয়ার। চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের ফোর্স পাহারায় থাকত। এখনও আছে।

—ফোর্স কি বাইরে থাকত?

—হ্যাঁ। ল্যাবরেটরির মেন গেটে উনি ইলেকট্রনিক্স চাবি লাগিয়েছিলেন। তার নম্বর উনিই জানতেন। অন্য কেউ ওর অ্যাবসেন্সে ঢুকতে পারত না ভিতরে।

—চাবির ডুপ্লিকেট নোপানি বা আর কারও কাছে ছিল কি?

—মনে হয় না। উনি আমায় সেরকমই বলেছিলেন। এখন সেটাই সমস্যা। কী করে যে ল্যাবরেটরিতে—

অসুবিধে হবে না।—মামা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন,—চাবিটা আমার সঙ্গেই আছে। অজিতের ফ্ল্যাটে ছিল। গোপন নম্বরটাও উদ্ধার করা গেছে। একটা কথা কর্নেল, অজিত কি ওখানে একা থাকত?

কর্নেল বললেন,—না। আপনাদের সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, সে বেশিরভাগ সময় সঙ্গে আসত। তাছাড়া লোকাল একটি ছেলেও সবসময় ওখানে থাকত।

—লোকাল মানে গ্যাংটকের ছেলে?

—না সার। ওই এলাকার বাসিন্দা। তিব্বতি। এখানে বলে লাচুংবা। লাচুং গ্রামেই ওর বাড়ি। ডক্টর এলে আমরা খবর পাঠাতাম। ও চলে আসত।

—ছেলেটা কেমন?

—খুব সাদাসিধে। পাহাড়ি আদিবাসীরা ওরকমই হয়। আপনি নিজে কথা বলে দেখবেন। যাবেন নিশ্চয়ই?

সিওর।—জগুমামা তাকালেন দিল্লির দুই অফিসারের দিকে,—এবার আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলি। অজিত কাজ শুরু করার আগে আপনাদের দপ্তরে নিশ্চয়ই প্রোজেক্ট প্রোফাইল জমা দিয়েছিল। সেই ফাইলটা সঙ্গে এনেছেন?

সুরেশ যাদব ও সঞ্জীব মালহোত্রা মামার কথায় একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর মালহোত্রা আমতা-আমতা করে বললেন,—হ্যাঁ, সার। এনেছি। তবে—

জগুমামা স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন।

মালহোত্রা মুখ নিচু করলেন। কুণ্ঠিত গলায় বললেন,—একসট্রিমলি স্যরি সার। শুরুর ইনট্রোডাকশন ছাড়া বাকি পৃষ্ঠাগুলো নেই। অথচ আপনি ফোন করার পরদিন আমরা ভল্ট থেকে ফাইলটা বের করি। সব ইনট্যাক্ট ছিল। নিয়ে আসব বলে চাবি দিয়ে আলমারিতে রেখেছিলাম। কী করে—

জগুমামা সহসা যেন জ্ঞান হারালেন। প্রবল রাগে চেঁচিয়ে বললেন,—নো-নো! নো একসকিউজ। ওয়র্থলেস পিপল! দিন, যেটা আছে সেটাই দিন। হয়তো ওটুকুও—

এইসময় চোখে পড়ল, জানলার সার্সির ওপারে অনন্ত সরখেল। হাত নেড়ে আমায় ডাকছেন।

সরকারি গেস্ট হাউস চমৎকার। একটা টিলার ওপর বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। দারুণ সাজানো গোছানো। বাইরে অনেকখানি সবুজ লন। চারটে শোওয়ার ঘর। ঠিক মাঝখানে বেশ বড় ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। ওখানেই কথাবার্তা চলছিল। অনন্ত সরখেল অবশ্য প্রথম থেকেই বাইরে।

—কী ব্যাপার?

অনন্তবাবু মুখে তর্জনি ঠেকিয়ে বললেন,—এসো।

লন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছোট গ্রিল গেট। তারপর সিঁড়ির ধাপ নীচের রাস্তা পর্যন্ত। ধাপে বসে দুজন লোক। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ওই দ্যাখো! স্পাই! আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার জন্যে এসেছিল। আমায় দেখে এখানে এসে অপেক্ষা করছে। নির্ঘাত চিনে!

—চিনা! কী করে বুঝলেন?

—ভাষা শুনে। শোনো, বুঝতে পারবে।

কান খাড়া করলাম। চিনা ভাষার বিন্দুবিসর্গ জানি না। তবে মনে হল, অনন্তবাবু ঠিক বলছেন।

ব্যস! অনন্ত সরখেল তেতে গেলেন। বেশ জোরে-জোরে বললেন,—বুঝলে টুকলু, এই চিনেগুলোকে দেখলেই আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়। জাত খচ্চর। মুখচোখ দেখে কিস্যু বোঝার উপায় নেই। ইচ্ছে করে, সবক'টাকে লাথি মেরে দূর করে দিই।

আমি হকচকিয়ে গেছি। এ কী কাণ্ড!

হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে চিনাদের একজন উঠে দাঁড়াল। বলল,—একসকিউজ মি! আমাদের কিছু বলছেন?

সর্বনাশ! এ যে বাংলা জানে।

আমি তো-তো করতে-করতে বলি,—না, আমরা-মানে...ঠিক...

—দেখুন মিস্তার, আমি শান্তিনিকেতনে পড়তি। ইনি আমার ফাদার, হোমল্যান্ত থেকে এসেতেন। এখানে বেড়াতে এসেতি। তখন থেকে দেখতি, এই লোকতা আমাদের ওয়াত করতে। তারপর আপনাকে এনে—

—স্যরি, একসট্রিমলি স্যরি। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আসলে ওনার মাথায় ইয়ে—

আমি ইশারায় দেখালাম। অমনি অনন্ত সরখেল রেগে উঠলেন,—অ্যাই টুকলু! কী যা-তা বলছ?

—ঠিকই বলছি।...চলুন, ভিতরে চলুন।

প্রায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলাম। এরকম অবস্থায় আগে কখনও পড়িনি। আরেকটু হলে কেলেঙ্কারি বেধে যেত।

করিডর দিয়ে ঢোকার মুখে দেখা গেল ওদের সঙ্গে। গম্ভীর মুখে অফিসার দুজন বেরোচ্ছেন। পিছনে কর্নেল আর জগুমামা।

কর্নেল বললেন,—এখন চলি ডক্টর। কাল শার্প ছ'টায় গাড়ি নিয়ে আসছি। বা-ই।

জগুমামা মৃদু হেসে হাত নাড়লেন। তিনজন এগিয়ে গেলেন বাইরের দিকে। আমরা ঘরে ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ কর্নেলের গলা,—স্যর!

মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কর্নেল প্রায় ছুটতে-ছুটতে কাছে চলে এলেন। বললেন,—জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি স্যর। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী পাওয়া গেল?

—যা সন্দেহ হয়েছিল, তাই। সেরিব্রাল অ্যাটাক। ব্রেনে একটা টিউমার হয়েছিল। সেটা ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। বায়োপসিতে দেখা গেছে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। ব্রেন ক্যান্সারও বলতে পারেন।

—ক্যান্সার! বড়ি তাজ্জুব কি বাত! ব্রেনে টিউমার হল, সেটা ম্যালিগন্যান্ট, উনি কিছু বুঝলেন না? অ্যাট লিস্ট মাথায় তো মাঝে-মাঝে যন্ত্রণা হবে। তখন সিটি স্ক্যান করালে ধরা পড়ত। উনি অকারণে এতদিন চেপে রাখলেন! টিউমার তো রাতারাতি গজায়নি।

ঠিকই বলছেন কর্নেল!—জগুমামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—অজিতের মৃত্যু ইস আ বিগ পাজল!

৫

—এই তো ভালো লেগেছিল হাওয়ার মাতন লতায়পাতায়...এই তো...

আমরা ফোদং এসে গেছি। এখানেই আমরা লাঞ্চব্রেক নেব। তাই তো কর্নেল?—অনন্তবাবু নতুন গান জুড়তেই আমি তড়িঘড়ি বলে উঠলাম।

ওফ! আর পারা যাচ্ছে না। সেই সকালে গ্যাংটক ছাড়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে অনন্ত সরখেলের 'নন-স্টপ ধামাকা'। সব 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'! তবে কোনওটাই পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের নয়, অনন্ত সরখেলের নিজস্ব ভাষা-সুর জুড়ে এক জগাখিচুড়ি।

কিছু বলারও উপায় নেই। বরাব্বর দেখেছি, প্রকৃতির কাছে এলেই অনন্তবাবুর সাংস্কৃতিক ভাব এসে যায়। আমি প্রথম চোটে থামাতে গেছিলাম। উনি সিধে জগুমামাকে বলেছেন,—স্যার, টুকলুটা বড্ড ইয়ে করছে। মন খুলে গাইতে দিচ্ছে না। আমি কি খুব খারাপ গাইছি স্যার?

জগুমামা সামনে থেকে বলেছেন,—না-না, গান, গান। মন্দ কী! টুকলু, ভালো না লাগলে কানে তুলো গুঁজে থাক।

তারপর থেকে দাঁতমুখ এঁটে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যি, তুলনাহীন নিসর্গ। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে পথ। কতরকম পাহাড়, কত সবুজ, কতরকম ঝরনা নদী, খাদের মধ্য দিয়ে পাক খেয়ে-খেয়ে উঠছে কুয়াশার কুণ্ডলী, মেঘ ঘিরে ধরছে পাহাড়কে ...কোথাও মেঘলা ছায়া, কোথাও হলুদ রোদ্দুর।

পাক খেতে-খেতে ফোর-হুইলার মাহিন্দ্রা জিপ উঠছে, নামছে। ঝনঝন শব্দ তুলে লোহার সেতু পার হচ্ছে। নীচে সগর্জনে বয়ে যাচ্ছে তিস্তারই কোনও শাখা।

কখনও পার হচ্ছি জলপ্রপাতের গা-ঘেঁষে। ফেনিল জলবিন্দু আমাদের গায়ে উড়ে আসছে। পথের ধারে রক্ষীবাহিনীর সাবধানবাণী, 'আস্তে গাড়ি চালাও'।

আজ সকালে বেরোতে কিছু দেরি হয়ে গেছে। কর্নেল সিং এলেন সাতটায়। তখনও আমরা রেডি হতে পারিনি।

সব গোছগাছ করে আমরা রওনা হয়েছি আটটায়। পিছনের জিপে রয়েছেন ফৌজি নিরাপত্তারক্ষীরা। এই জিপে আমরা, নিবারণ এবং কর্নেল মনপ্রীত সিং।

মাঝে ফেনসিং-এ একটু চা খেয়েছি। তখন ঠিক ছিল, সোজা মঙ্গনে গিয়ে লাঞ্চ সারব। কিন্তু মাঝে-মাঝে ধস নেমে রাস্তা এত খারাপ হয়ে গেছে, ফোদং পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। সুতরাং আমাদের স্কেডিউল চেঞ্জ করতে হয়েছে।

ছোট্ট জায়গা ফোদং। পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা কিছু কাঠের বাড়ি। বাঁ-দিকে সমতল একটু জায়গা জুড়ে পরপর খাওয়ার হোটেল, পানবিড়ি, স্টেশনারি দোকান।

আমাদের আগে কয়েকটা গাড়ি। মারুতিভ্যান, টাটা সুমো, মাহিন্দ্রা জিপ। টুরিস্ট বোঝাই। কর্নেল বললেন, —ইয়ুমথাং বা লাচেন বেড়াতে যাচ্ছে। চুংথাং থেকে এই পথটা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে লাচেনের দিকে, অন্যটা লাচুং। আমরা দ্বিতীয়টা ধরব।

কর্নেল মনপ্রীত সিং শেষ হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুগাড়ি মিলিয়ে আমরা এগারোজন। মালিক যেভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল, বুঝলাম এই হোটেলের খুব পরিচিত খদ্দের।

খাবারের মান এবং স্বাদ দুটোই খারাপ। শুঁটকো চিকেনের পেঁয়াজ-জিরে বাটা ঝোল দিয়ে ভাত মাখছি। পাশে অনন্ত সরখেল নাকমুখ সিঁটকোচ্ছেন। ওনার অবস্থা দেখে কর্নেল হেসে ফেললেন,—সব হোটেলের খাওয়া এক। একই বাবুর্চি।

বাইরে আরেকটা গাড়ির শব্দ। তিনজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকল,—কুছ জাগা খালি হ্যায়?

—হাঁ-হাঁ, উধর বৈঠ যাইয়ে।

পাশ থেকে অনন্ত সারখেল 'খচ' করে আমার চেপে ধরলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, কালকের সেই চিনা দুজন। তৃতীয়জন মনে হয় ভারতীয়। মোটাসোটা, ফরসা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে সানগ্লাস। মাথায় সায়েবি টুপি।

তিনজন বাঁদিকে বেসিনের দিকে এগোচ্ছে। হাত ধোবে। হঠাৎ মোটামতন লোকটি ঘুরে আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। জগুমামার সামনে দাঁড়িয়ে চোস্ত ইংরেজিতে বলল,—একসকিউজ মি। আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে।

লাগবেই তো, লাগবেই তো।—অনন্তবাবু বিগলিতভাবে বলে উঠলেন,—উনি কী যেসে—উহ!

মোক্ষম চিমটি কেটেছি।

—সরি। আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আপনার পরিচয়?

—হর্ষ বাগলা।

—নাহ! এই নামে আমি কাউকে চিনি না।

হর্ষ মাথা নাড়তে-নাড়তে বেসিনের দিকে চলে গেলেন।

খেতে-খেতে বললাম,—কর্নেল, লাচেনে কোন টুরিস্ট স্পট?

—ছোপতা ভ্যালি। লাচুং থেকে যেমন ইয়ুমথাং বা ইয়ুমেসাডং। সবক'টা জায়গাই গ্র্যান্ড! আমি কাশ্মীরেও পোস্টেড ছিলাম। সিকিমের সিনসিনারি কাশ্মীরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

অনন্তবাবু ম্লানকণ্ঠে বললেন,—আমাদের কি আর যাওয়া হবে?

জগুমামা বললেন,—মনে হয়, এ যাত্রায় হবে না। তবে এখনও পর্যন্ত যা দেখলেন, তাই বা—আরে:!

এঁটোহাতে লাফ মেরে উঠে গেলেন বাইরে। কী হল? আমরা পিছন-পিছন। মামা চতুর্দিকে তাকাচ্ছেন আর বিড়বিড় করছেন,—কোথায়...কোথায় গেল?

রাস্তার ওপারে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সাদা টাটা সুমো স্টার্ট দিচ্ছে। বলে উঠলাম,—ওই যে! ওই যে!

গাড়িটা পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হওয়ার আগেই তিনজনকে স্পষ্ট দেখা গেছে। দুই চিনা এবং হর্ষ বাগলা।

মামা ছুটে গেছেন আমাদের জিপের দিকে। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠেছেন,—কর্নেল! সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আমরা সবাই পাশে এসে দাঁড়িয়েছি,—কী হয়েছে? কী হয়েছে?

—আমার সাইডব্যাগ নেই! ও-শিট! আপনার লোকজন এত ইরেসপন্সিবল! গাড়ির দরজা লক ছিল না। ওই ব্যাগেই, ওই ব্যাগেই আমার সর্বস্ব ছিল। ওই চাবিটা ছিল।

—চাবি?

—হ্যাঁ চাবি। ইলেকট্রনিক্স কি। সেইসঙ্গে ফাইল, আমার ল্যাপটপ কম্পিউটার, ফ্লপি...সব। লোকগুলোকে দেখেই তখন সন্দেহ হয়েছিল। কেন যে...

কেউ মারা যাওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। ফৌজি ড্রাইভার এবং অন্যরা সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

কর্নেলই সবচেয়ে আগে সামলে নিলেন কয়েক মুহূর্তে । বললেন,—ওকে, ওকে! হারি আপ স্যর। হারি আপ ব্যাটেলিয়ান। উই'ল ফলো দেম। হারি আপ।

আমাদের যাত্রার পরের অংশের বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। এতক্ষণে কতদূরে চলে গেছে সাদা টাটা সুমো, কে জানে! তারই উদ্দেশে ধাওয়া করল আমাদের জিপদুটো।

আকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই পাহাড়ি পথ বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে জিপ। একচুল এদিক-ওদিক হলেই আমরা ছবি হয়ে যাব। অনন্ত সরখেল চোখ বুঁজে সামনের রড চেপে ধরেছেন।

কারও মুখে কথা নেই। মামা একের-পর-এক সিগারেট টান দিচ্ছেন।...ওদিক থেকে হঠাৎ-হঠাৎ ছুটে আসছে গাড়ি। ঝাঁকুনি দিয়ে জিপ ব্রেক কষছে। আবার ছুটছে।...

ওদের ধরতেই হবে।

ওই যে, ওই যে! ওটাই—তো মামা আঙুল তুললেন।

পাকদণ্ডী পথ। অনেকখানি উঁচুতে ফিতের মতো দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট খেলনার মতো সাদা সুমো।

একটু-একটু করে গাড়িটা বড় হচ্ছে। মাঝে-মাঝে হারিয়েও যাচ্ছে পাহাড়ের বাঁকে। আবার দেখা যাচ্ছে।

চোয়াল শক্ত করে ড্রাইভার। জিপ ছুটছে ঝড়ের গতিতে। পারব, ওদের ধরতে পারব।

ঠিক এইসময়েই বিপর্যয়। কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন,—ব্রেক! ব্রেক!

দূর থেকেই দেখা গেল, রাস্তার ওপর পাথরের বড়-বড় চাঁই গড়িয়ে পড়েছে। পাহাড় থেকে ধস নেমেছে। ধোঁয়া উঠছে অল্প-অল্প। রাস্তা বন্ধ।

মাই গড! ওরা জিলোটিন স্টিক চার্জ করেছে পাহাড়ে। ল্যান্ডস্লাইড করে দিয়েছে।—কর্নেল বললেন।

—সার।

ড্রাইভারের কথায় তাকালাম।

—সার, অওর এক রাস্তা ভি হ্যায়। এমার্জেন্সি রোড। লেকিন বহোৎ খারাব। যায়েঙ্গে?

মামা হতাশভাবে বললেন,—কী লাভ? সে তো ঘুরপথ হবে।

—নেহি সাব। শর্টকাট। লেকিন পুরা চড়াই। ঠিকঠাক চলনেসে পহলে পৌঁছ সকতে হ্যায়। ট্রাই করেগা সাব?

—চলো।

কিন্তু এ রাস্তা? এ কোনও রাস্তাই নয়। ঘন জঙ্গলের মধ্যে পায়ে হাঁটার শুঁড়িপথ দিয়ে চড়চড় করে উঠছে জিপ। আলগা মাটিতে চাকা হড়কাচ্ছে, জিপ টলমল করে উঠছে। যে-কোনও মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে! নিশ্বাস বন্ধ করে প্রহর গুনছি।

প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেছে। সর্বাঙ্গ টনটন করছে, মাথা ঝিমঝিম করছে! আর কতক্ষণ? কোথায় রাস্তা?

অনেকটা উঁচুতে পাথরের বাঁধানো স্ল্যাব উঁকি মারছে। জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। এসে গেলাম?

গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে জিপদুটো উঠে এল একটা রাস্তায়। ওহ! এই কনকনে শীতেও শরীর ঘামে জবজব করছে। অবশ লাগছে।

এ পথটা পাহাড়ি হাইওয়ের মতোই, তবে আদৌ মসৃণ নয়। পিচ পড়েনি। পাথরের নুড়ি ছড়ানো।

জিগ্যেস করলাম। ড্রাইভার উত্তর দিল,—হাঁ সাব। ইয়ে নয়া রাস্তা। আর্মিকে লিয়ে বনরহা হ্যায়। অওর থোড়াসা আগে যাকে উহ রাস্তেসে মিল যায়েগা।

এতক্ষণ অনন্ত সরখেলের দিকে নজর দিতে পারিনি। সামনের রড চেপে চোখ বুঁজে আছেন। ঘুমোচ্ছেন নাকি? কানে-কানে বললাম,—একটা গান হবে নাকি?

—ভ্যাট। চ্যাংড়ামি! পৌঁছলে বোলো।

এই পথটাও কম বিপজ্জনক নয়। হঠাৎ-হঠাৎ এত সরু হয়ে গেছে আর এমন বড়-বড় গর্ত, জিপ হেলে পড়ছে। বাঁ-দিকে কয়েকহাজার ফুট খাদ।

হঠাৎ শরীর হিম হয়ে গেল। ডানদিকের পাহাড়ের খানিকটা অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে এসেছে। ঝরনার জলের সঙ্গে কালো থকথকে কাদা নেমে এসে পথের ওপর পুরু হয়ে জমেছে। ঠিক ওই জায়গাতেই রাস্তা নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে।

আমাদের গাড়ির গতি কমে গেল। ড্রাইভারের চোয়াল আরও কঠিন।

'ফচ-ফচ' করে কাদা ছিটকোচ্ছে...টায়ার পিছলে যাচ্ছে...স্টিয়ারিং কাজ করছে না...ও:! বাঁ-দিকে অতলস্পর্শী খাদ।

প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল ওটুকু জায়গা পেরোতে। এবার রাস্তা ঢালু। জিপ ছুটল ঝড়ের বেগে। অল্প সময়েই দেখা গেল, পাশ দিয়ে এসে মিলেছে হাইওয়ে। মূল সড়কে এসে পড়লাম।

এখনও সেই সাদা টাটা সুমো চোখে পড়েনি। ড্রাইভার আবার ভয়ানক স্পিড তুলে দিয়েছে...পরপর পেরিয়ে যাচ্ছি ছোট-ছোট জনপদ...সিংঘিক...রংরং...। এসে পড়লাম মঙ্গন। উত্তর সিকিমের জেলা সদর। দোকান-বাজার-অফিস জমজমাট। ড্রাইভার বলল,—এহি রুকেগা সাব?

মামা বললেন,—নেহি। চলো।

অনেকগুলো চোখ আতিপাতি করে খুঁজছে সেই সাদা টাটা সুমোকে। নাহ, নেই।

৬

একেই বলে 'তীরে এসে তরী ডোবা'।

বেলা তিনটে। সূর্য পশ্চিমদিকে ছুটছে। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমরা নির্বাক দাঁড়িয়ে আছি 'চুংথাং' থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে।

ডানদিকের খাড়া পাহাড় থেকে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলপ্রপাত। খরস্রোতা বয়ে যাচ্ছে হাইওয়ের ওপর দিয়ে। ওই স্রোতের ওপর দিয়ে যাওয়া মানে চাকা পিছলে যাবে, গাড়ি ছিটকে পড়বে নীচে।

কর্নেলের ধারণা, এই পরিস্থিতি তারাই তৈরি করেছে, যাদের পিছনে আমরা ধাওয়া করে চলেছি। জলের সেই উৎসমুখ এবং যেখানে এসে পড়ছে, সেই দুই জায়গার পাথর বোল্ডার ফাটিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ঝরনা রূপ নিয়েছে জলপ্রপাতের, তোড়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—তার মানে ওরা রীতিমতো প্রিপেয়ারড?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট—জগুমামা বললেন,—ওরা এখন ফেরোসাস। বুঝতে পেরেছে, আমরা বিষয়টা বুঝে ফেলেছি।

কর্নেল, অনন্তবাবু আর আমি বসে আছি একটা পাথরের স্ল্যাবের ওপর। মামা অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। জিপের মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নিবারণ। ফৌজিরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। লাচুং-এর দিক থেকে আসা গাড়িগুলো ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেছে চুংথাং-এ। বাকিরাও যাবে।

—আমরা কী করব?

কর্নেল মাথা হেলিয়েছেন। ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেছেন আর্মির বেসক্যাম্পে। আর্মি আসছে। রাস্তা ঠিক হতে ঘণ্টাখানেক।

—কীভাবে ঠিক করবে?

—যেখানে প্রচণ্ড তোড়ে জল এসে পড়ছে, তার আশপাশের পাথরগুলো ফাটিয়ে স্তূপ করে ফেলবে জলের ওপর। জলের গতি কমে যাবে।

কয়েকটা ফৌজি গাড়ি সাঁ-সাঁ করতে-করতে এসে পড়ল। গাঁইতি, শাবল, কোদাল, লম্বা-লম্বা স্টিক নিয়ে দলে-দলে জওয়ান নেমে পড়ল। ওদের চিফ স্যালুট দিয়ে বললেন,—সার, আমি ক্যাপ্টেন রাজশেখর। কাজ শুরু করছি।

হঠাৎ জগুমামা এগিয়ে এলেন। বললেন,—চটপট আপনার ফোন বের করুন।

কর্নেল ফোন বের করলেন। বললেন,—এটা ঠিক সাধারণ মোবাইল নয়। শহরে থাকলে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করি। বাইরে চলে এলে এটা স্যাটেলাইট টেলিফোন হিসেবে কাজ করে।

—একই কথা। অজিতের ল্যাবরেটরি যেখানে, তার সবচেয়ে কাছে আর্মি বেস কোথায়?

—পেডং-এ।

—গুড। আপনি ফোন করে বলুন, এখনই যেন আর্মড ফোর্স পাঠায়। আমরা না পৌঁছনো পর্যন্ত অজিতের ল্যাবরেটরিতে কাউকে অ্যালাও করবে না।

কর্নেল । মামার কথামতো নির্দেশ দিলেন। তারপর ফোন কেটে দিয়ে বললেন,—সার, ওরা তো ল্যাবরেটরি খুলতে পারবে না। ইলেকট্রনিক্স কি-র পাসওয়ার্ড পাবে কোত্থেকে?

—কেন? আমার ল্যাপটপ কম্পিউটারে ওই নম্বর স্টোর করা আছে। আমার কম্পিউটারও পাসওয়ার্ড চাইবে। ওদের কাছে পাসওয়ার্ড ব্রেক করা কোনও ব্যাপার নয়।

কর্নেল গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গোধূলিবেলা। পাহাড়ে ছায়া ঘনিয়ে আসছে। আকাশে রং। একটানা জলের শব্দ। কিচির-কিচির করতে-করতে পাখপাখালি বাসায় ফিরছে।

দুম-ম! দু-ম-ম-ম! ব্লাস্টিং শুরু হয়ে গেল। পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। পাখিরা ঝটপট করে আকাশে ঘুরছে।

বললাম,—কর্নেল, এরকম শব্দ কিন্তু আসার পথে পেয়েছি।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। পাহাড় কাটার জন্যে, রাস্তা তৈরির জন্যে হরদমই নানা ব্লাস্টিং চলে পাহাড়ে। মিনারেল রিসার্চ টিম কাজ করে। আমাদের অপোনেন্টরাও করেছে। কোনটা কাদের, কে বুঝবে?

কু-রু-ক-কু-উ—কর্নেলের সেলফোন বাজছে।

—হ্যালো। ইয়েস। কী?...কখন? ফোর্সরা কী করছিল?...তারপর?...নম্বর নিয়েছ?...এখনই জানিয়ে দাও। —

ফোন বন্ধ করেই উনি ছুটে এলেন জগুমামার কাছে,—স্যর!

—কী?

—ওরা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়েছিল। পিছনের জঙ্গল দিয়ে। সিকিওরিটি দেখতে পায়নি। পরে পায়ের শব্দ পেয়ে পালিয়ে যায়। গাড়িটা দেখা গেছে। তবে নাম্বার নোট করা যায়নি।

—কোনদিকে গেছে?

—আরও উত্তরে।

—তার মানে লাচুং হয়ে ইয়ুমথাং-এর দিকে। ওখানকার আর্মি ক্যাম্পে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে?

—ইয়েস স্যর।

মামা অস্ফুটে বললেন,—আমারই আগে ভাবা উচিত ছিল। হাতেনাতে ধরতে না পারলে স্বীকার করবে না। কোনও প্রমাণ নেই।

দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক আর্মি জিপ স্টার্ট দিল। আস্তে-আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন,—কুইক! রাস্তা হয়ে গেছে। সামনের জিপটাকে দিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের জিপদুটো গর্জন করে উঠল। সত্যি, এবারের মতো রাস্তার বীভৎস অভিজ্ঞতা আগে হয়নি!

তলায় গর্জন করে জলস্রোত বইছে....তার ওপরে বিছোনো নুড়ি পাথরে টলমল করছে জিপ। জলের তোড়ে পাথর আলগা হতেই পিছলে যাচ্ছে চাকা, জিপের মুখ ঘুরে যাচ্ছে। ফার্স্ট গিয়ারে 'গোঁ-গোঁ' করতে পার হচ্ছি জলপ্রপাতের ওপর দিয়ে।

ফোঁ-স-স! একই সঙ্গে অনেকগুলো নিশ্বাস পড়ল। আমরা ওপারে পৌঁছেছি।

হেডলাইট জ্বেলে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জিপ।...

জেনারেটরের শব্দ বহুদূর থেকেই শোনা গেছে। শব্দহীন পাহাড়-জঙ্গল গমগম করছে। গবেষণাগারের এরিয়ার বাইরে আমরা থেমেছি। গহন অন্ধকারের মধ্যে হিরের মতো জ্বলছে ছোট্ট বাংলো বাড়িটা।

কর্নেল সিং সামনে। আমরা পিছনে। ল্যাবরেটরির দরজা খোলা। বাইরে প্রচুর ফোর্স। থিকথিক করছে। দরজায় দুজন। একজন অফিসার এগিয়ে এসেছেন। কর্নেল তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

তারপরেই থমকে দাঁড়িয়েছি।

এ কী অবস্থা! একপাল মত্ত হাতি যেন প্রবল আক্রোশে তাণ্ডব চালিয়েছে ঘরখানায়। টেবিল-চেয়ার-র‍্যাক উলটে আছে, কাচের বিকার-ফানেল-টেস্টটিউব সব অ্যাপারেটাস ভেঙে চুরে তছনছ। কাগজপত্র, কাচের টুকরো, নানারঙের তরল পদার্থ মেঝেয় ছড়িয়ে।

মামা কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের এতদূর, এত কষ্ট করে ছুটে আসা সব বৃথা হয়ে গেল।

কর্নেল বললেন,—স্যর, ওই ছেলেটা এসেছে।

—কে?

—ডক্টর পালচৌধুরীর সঙ্গে যে থাকত। লোকাল ছেলে।

—কোথায়? ডাকুন।

জগুমামা ভালো করে দেখলেন ছেলেটিকে। চোদ্দো-পনেরোর বেশি নয়। থ্যাবড়া চোখ-নাক। কানঢাকা উলের টুপি, মলিন প্যান্ট-সোয়েটার, চাদর গায়ে।

—ও হিন্দি জানে?

—জি সার।

—নাম কী তোমার?

—ডেনজং নোরগে।

—কোথায় থাকো?

—লাচুং গ্রামে। প্রফেসর এলে চলে আসতাম।

—কতদিন কাজ করছ?

—অনেকদিন। উনি এখানে মকান বানাবার আগে থেকেই আসতেন। আমাদের গ্রামে থাকতেন। তখনই চিনতাম। গাছগাছড়া নিয়ে যেতেন।

—কী করতেন জানো?

—জানি। ওষুধ বানাতেন। আমাদের এখানে একজাতের গাছ আছে। ঠান্ডায় গা-হাত-পা ফেটে গেলে, কেটে-ছড়ে ঘা হয়ে গেলে ওর পাতা বেটে লাগিয়ে দিলে সেরে যায়। উনি ওই গাছ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন।

জগুমামার মুখ আলো হয়ে উঠল। বললেন,—ফোঁড়া-পুঁজ হলেও কি ওই গাছের পাতা তোমরা লাগাও?

— জি। এখানে কুছু দাওয়াই পাওয়া যায় না। গাছগাছড়ার রস লাগিয়ে, গাছপাতা খেয়ে আমরা সবাই বেঁচে থাকি।

—তুমি ওই গাছ আমাদের চেনাতে পারবে?

নোরগে চুপ করে গেল।

—কী? চুপ করে আছ কেন?

—জি, উনি মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, শহরের লোকরা বদমাশ হয়, সব গাছ কেটে লিয়ে যাবে। উনি বহোৎ আচ্ছা ইনসান ছিলেন। পাহাড়িদের পেয়ার করতেন।

—নোরগে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমরা খারাপ লোক নই। আমি প্রফেসরের বন্ধু। উনি অচানক মারা গেছেন, তুমি শুনেছ। সেই তদন্ত করতে আমরা এসেছি। আমিও প্রফেসর। বিশ্বাস না হয়, তুমি কর্নেলসায়েবকে জিগ্যেস করে দেখো।

নোরগে কর্নেল সিং-এর দিকে একবার তাকাল। মামাকে ভালো করে দেখল। তারপর বলল,—ঠিক আছে। চলুন। এই বাগানেই আছে। উনি লাগিয়েছিলেন।...

অন্ধকারের মধ্যে বেরোলাম। কনকনে শীত। জ্যাকেট ভেদ করে সুচের মতো ফুটছে। অনন্ত সরখেল শক্ত করে আমার বাঁহাত ধরে আছেন।

ল্যাবরেটরির ঠিক বাইরে বাগান। ভূতের মতো কালো-কালো ঢ্যাঙা গাছেরা দাঁড়িয়ে। সবই পাইনজাতের। লম্বা-লম্বা কাণ্ড উঠে গেছে, মাথার কাছে ঝুপসি ডাল-পাতা।

নোরগে টর্চ জ্বেলে গাছগুলো দেখছে। একটা গাছের সামনে এসে বলল,—এই গাছ।

একজন জওয়ান সঙ্গে-সঙ্গে বেয়নেট দিয়ে তার গায়ে 'X' চিহ্ন এঁকে দিল। মামা বললেন,—ডালশুদ্ধ কয়েকটা পাতা নেব। কাল সকালে পুরো গাছটার ছবি তুলতে হবে।

একগুচ্ছ পাতা-ডাল এসে গেল। মামা বললেন,—এবার ফেরা যাক।

—স্যর, আজ রাতে আপনাদের জন্যে পেডং মিলিটারি ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

ঠিক আছে।—তবে কর্নেল, দুটো খুব জরুরি বিষয় মাথায় নিন। নাম্বার ওয়ান, ওই টাটা সুমোকে খুঁজে বের করতে হবে। সব জায়গায় মেসেজ পাঠিয়ে দিন। লোকগুলোকেও ধরতে হবে। ডেসক্রিপশন দিয়ে পাঠান। হয়তো গাড়ি ফেলে পালাবে। ভোল পালটে ভিড়ে মিশে যাবে। তবু—। নাম্বার টু নোরগেকে সামনের ক'দিন আপনাদের ক্যাম্পেই রেখে দিন। ওকে ক্রিমিন্যালরা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে।

হঠাৎ আমাদের ড্রাইভার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল,—সাব, আপকে সাথ অওর এক আদমি যো আয়াথা, উ আভি আপকে সাথ নাহি হ্যায়?

আদমি, মানে নিবারণ? আমরা আকাশ থেকে পড়লাম!

—সে তো গাড়িতেই ছিল। পিছনে ঘুমোচ্ছিল।

—নহি সাব। আপলোগোকো যানেকে বাদ উনহোনে উতরকে মকান কি তরফ গয়া। হামনে শোচা, আপকে পাসই শায়দ গয়া।

তার মানে কি নিবারণকে ক্রিমিন্যালরা হাপিস করল?

৭

—টুকলু! টুকলু!

অনন্ত সরখেলের মুখ।

—কী? কী হয়েছে?

—কিস্যু হয়নি। আস্তে কথা বলো। চলো, একটু বাইরে ঘুরে আসি।

এখন?—আমি বাঁ-হাত টেনে বের করলাম,—সবে পাঁচটা বাজে। বাইরে অন্ধকার। কোথায় যাবেন?

—কোথায় আর যাব? এদিক-ওদিক একটু হেঁটে আসব। আরে ভাই, কিছুই তো দেখা হল না। দেখতে-দেখতে ফরসা হয়ে যাবে। অত ভয়ের কী আছে? চলো।

—ঘণ্টাখানেক পরে বেরোলে হত না?

—সময় পাচ্ছ কোথায়? শোনোনি, আজ সকালেই আমরা ব্যাক করছি? স্যার কাল কর্নেলকে বলছিলেন। আবার ছাতুর ওই হেলিকপটারে—উ:! চলো তো।

ওনাকে আর রোখা গেল না। অবশ্য ইচ্ছে যে আমারও ছিল না, তা নয়। গরম পোশাক চাপিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলাম।

কালোর ওপর সবে হালকা সাদার আঁচড় পড়েছে। অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে নিস্তব্ধ চরাচর। বহুদূরে কোনও ঝরনার ঝরঝর কলতান। আকাশে এখনও নক্ষত্রের আবছা দীপমালা। ক্যাম্পের পিচরাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গেটের কাছে এসে পড়লাম। গেট বন্ধ।

অনন্ত সরখেল ইশারায় বাঁ-দিকের ছোট্ট ফাঁকা জায়গা দেখালেন। রাইফেলধারী দুই ঘুমন্ত প্রহরীকে সন্তর্পণে ডিঙিয়ে আমরা কুঁজো হয়ে বেরোলাম। হাঁটছি রাস্তা দিয়ে। এই পথই এঁকেবেঁকে হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে।

—বেশ অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার লাগছে, কী বলো?

—তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। জওয়ানরা উঠে পড়ার আগেই। যেভাবে আমরা চোরের মতো বেরিয়ে এলাম, এটা পুরোপুরি বেআইনি। মামার কানে গেলে কী হবে, বুঝতে পারছেন?

আরে, ছাড়ো তো!—অনন্ত সরখেল 'ফু' করে উড়িয়ে দিলেন,—সবসময় খালি আইনি-বেআইনি! প্রাণখুলে একটু এনজয় করতেও দেবে না।

হাইওয়ে ধরে হাঁটছি। আশপাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে।

দু-একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। সড়কের পাশে পাথরের স্ল্যাব দেখে বুঝলাম, লাচুং এখান থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার।

অনন্তবাবু বললেন,—একটা ব্যাপার বুঝলুম না হে। বিজ্ঞানীর পুরাতন ভৃত্য নিবারণ হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল, স্যারের কোনও হেলদোল নেই? আজই ব্যাক করে যাচ্ছি আমরা! কী ব্যাপার বলো তো?

আমি বললাম,—বুঝতে পারছি না। মামা কাল থেকে চুপ। এটাও ভাবুন, নিবারণকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে যাবেই বা কেন?

—নিশ্চয়ই কারণ আছে। হয়তো ভেবেছে—

কথা শেষ হল না। কানের গোড়ায় ঠান্ডা নলের স্পর্শ। ফ্যাসফেসে একটা গলা বলল,—হ্যান্ডস আপ!

মুহূর্তে আমাদের হাত শূন্যে উঠে গেছে। হৃদপিণ্ডের ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেই গলা ইংরেজিতে বলছে,—পিছনে তাকাবার চেষ্টা কোরো না। খুলি উড়ে যাবে। সোজা সামনে চলো।

কোনও অনুভূতি নেই। মাথা কাজ করছে না। কথা বলছে একজন। কিন্তু পায়ের শব্দ পাচ্ছি একাধিক লোকের।

একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে একটা শুঁড়িপথ। গলাটা বলল,—ওই রাস্তা দিয়ে নামো। কোনওদিকে তাকাবে না। চলো!

এবার বুঝতে পারছি আমরা প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি। ওরা এই মুহূর্তে আমাদের মেরে ফেলতে পারে। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ জানতেও পারবে না!

ভাবতেই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। অসহ্য রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। আমি কেন রাজি হলাম?

এবড়ো-খেবড়ো চড়াই রাস্তা। কানের গোড়ায় রিভলভারের নল। মাঝে-মাঝে পাথরে, ঝোপে পা আটকে যাচ্ছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। সঙ্গে-সঙ্গে পিছন থেকে বুটের লাথি,—সোজা হও! বেচাল দেখলেই ট্রিগার টিপব!

বুকটা ধুকপুক করছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের? মা-বাবা-ছোটভাই পিকলুর মুখ ভেসে উঠেছে। পিকলু এখন জার্মানিতে। ও হয়তো জানতেও পারবে না। মামা কোথায়? এখনও ঘুমোচ্ছেন?

অনেকটা ওঠার পর চাতালের মতো সমান জায়গা। জঙ্গল এখানে পাতলা। আমাদের আরও কিছুটা হাঁটিয়ে আনা হল। সেই গলা বলল,—এবার চুপ করে দাঁড়াও।

অনন্তবাবুর অবস্থা কেমন জানি না। আমার অবস্থা ভয়াবহ। খুব কষ্ট হচ্ছে। জামাকাপড় ঘামে ভিজে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মৃত্যুকে কোনওদিন এত কাছ থেকে দেখিনি। একটা শব্দ হবে 'খট'। ব্যস, পৃথিবী মুছে যাবে।

দাঁড়িয়ে আছি। পিছন থেকে সেই গলা আবার বলে উঠল,—তোমাদের মুক্তিপণ কী জানো?

আমরা নিরুত্তর।

—ওই গাছ। গাছের পাতা। যদি না দেয় বা আমাদের ধরার কোনও চেষ্টা করে, সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের মেরে ফেলব! হা:-হা:-হা:—।

খলখল করে আচমকা হেসে উঠল।

—ভয় পেয়ো না। এখনই তোমাদের মারছি না। তোমার আঙ্কেল লক্ষ্মী ছেলের মতো গাছের পাতা দিয়ে দিক, তোমাদের ছেড়ে দেব।

অস্ফুটে বললাম,—ও গাছ তো অনেক আছে। ল্যাবরেটরির বাইরে। নিয়ে নিন না।

—বাজে বোকো না। সে কথা আমরাও জানি। তুমি গাছটা চেনো? আমায় চিনিয়ে দিতে পারবে?

—না।

—তবে? চালাকি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? একটা গুলি, ব্যস! তুমি ফিনিশ। শোনো। তোমায় কাগজ-কলম দিচ্ছি। তুমি তোমার আঙ্কলকে চিঠি লেখো। আমাদের দুটো শর্ত। গাছের পাতা দিতে হবে। আর বর্ডার পর্যন্ত নিরাপদে চলে যেতে দিতে হবে। বর্ডারে পৌঁছে তোমাদের ছাড়ব। বুঝেছ?

আমি ঘাড় কাত করলাম। বেঁচে ফেরার আশা নেই।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিছন থেকে একটা হাত আমার সামনে কাগজ-পেন বাড়িয়ে দিল,—ধরো!

তারপরেই পাশ থেকে 'উ:-আ:'! অনন্ত সরখেলের গোঙানি।

ঘাড় ঘুরতে চাইছিল। পিছনের গলা বলে উঠল,—উঁহু! নড়ো না। বুড়োটাকে স্রেফ বাঁধা হচ্ছে। অ্যাই, চুপ কর, নইলে গুলি করব।

সঙ্গে সঙ্গে কাতরানি থেমে গেল। অনন্তবাবু জ্ঞান হারালেন? স্বাভাবিক। তবে আমি একটু-একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছি। মনে পড়ছে, মামা বলেন, 'সাহসীরা একবার মরে, ভিতুরা মরে বারবার'। ঠিকই। মরি মরব, এত সহজে হেরে যাব না। মামা আরেকটা কথাও বলেন, 'ক্রিমিন্যালস আর বেসিক্যালি কাওয়ার্ড'। চেষ্টা করতেই হবে। একটা কথা এখন বুঝতে পারছি, লোকগুলো সহজে আমাদের মারবে না। আমরাই ওদের সশরীরে পালানোর শিখণ্ডি।

কাগজ আর পেন হাতে। বললাম,—লিখব কী করে? দাঁড়িয়ে লেখা যায়? কীসের ওপর রেখে লিখব?

—বোসো। এইটার ওপর রেখে লেখো।

বসলাম। এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে যে লোকটা পিছন থেকে একটা মোটামতন বই নিয়ে এসে আমায় বাড়িয়ে দিল, একটু আগে হলে হয়ত আমি মূর্ছা যেতাম।

নিবারণ! অজিত পালচৌধুরীর পঁচিশ বছরের পুরোনো কাজের লোক।

আমায় হাঁ হয়ে থাকতে দেখে নিবারণ খুক-খুক করে হাসল,—অমন করে দেখতিছ কী? ট্যাকা, বোঝলে অনেক ট্যাকা। ট্যাকার চে বড় কিছু নাই। নাও, বাপু নক্ষীছেলের মতো লিখে ফেলো দিকি। দেরি করলি সায়েব আবার দুমদাম গুলি চালায়ে দেবে। বড্ড রাগী লোক কিনা।

আমি লিখছি—

জগুমামা, বন্দি অবস্থায় তোমায় চিঠি লিখছি। আমাদের যারা আটকে রেখেছে তাদের দুটো শর্ত।...

এইটুকু লিখে বললাম,—কানের গোড়া থেকে রিভলভারের নলটা সরান! বড্ড খোঁচা মারচে। কোথায় পালাব? আপনারা আর্মড, আমি খালিহাত। আমার সঙ্গীকে বেঁধে রেখেছেন। আমি পালাতে গেলেই তো গুলি করে দেবেন।

কোনও জবাব নেই। তবে কাজ হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের নল আর কানে লাগছে না।

চিঠিটা শেষ করে ফেলেছি। কিছু করার নেই।

—এই নিন। হয়ে গেছে।

পিছন থেকে ফ্যাসফেসে গলা ভাঙা হিন্দিতে বলল,—নিবারণ। পড়ে দ্যাখো, ঠিক আছে কিনা।

নিবারণ ভালো করে পড়ল। বলল,—হ্যাঁ, সায়েব। ঠিক আছে।

—তুমি এখন এই চিঠিটা নিয়ে সো—অঁ-ক-ক!

ওপর থেকে ভারী কিছু ধড়াস করে এসে পড়ল। চিতাবাঘের মতো শূন্য দিয়ে উড়ে এসে আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল নিবারণের ওপর।

টি-সু-উ-ম-!

শব্দটা কানে প্রবেশের আগেই আমার বাঁ-কাঁধ ছুঁয়ে আগুনের হলকা ছুটে গেল। উহ!

আমার সামনে কর্নেল মনপ্রীত সিং। চেপে ধরেছেন নিবারণকে। বাঁ-কাঁধ চেপে পিছন ফিরতে দেখলাম, জগুমামা চেপে বসেছেন লোকটার ওপর। ডান হাতে রিভলভার। বাঁ-হাতে লোকটার গলা টিপে ধরেছেন। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে গর্জন করছেন,—এতবড় সাহস! আমার ভাগ্নেকে গুলি করলে।

লোকটা দুই চিনার মধ্যে বয়স্কজন। এরমধ্যেই তার চোখ ঠেলে উঠেছে, জিভ বেরিয়ে গেছে, গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। আরে! মরে যাবে যে!

—মামা! ছাড়ো, ছাড়ো! মরে যাবে!

জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছেন জগুমামা। চোখদুটো লাল। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল। তারপর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললেন,—এদিকে আয় তো টুকলু, দেখি।

চেপে ধরতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। মামা ক্ষতস্থান খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন,—তোর কিছু হয়ে গেলে আমি—উহ! অল্পের ওপর দিয়ে গেছে! ক্যাম্পে ফিরে ফার্স্ট এড দিতে হবে।

কর্নেল ইতিমধ্যে নিবারণকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছেন। উঠে গিয়ে অনন্তবাবুকে খুলে দিয়েছেন। বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতে জ্ঞান ফিরে এসেছে অনন্ত সরখেলের। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন তিনি, এখনও মাথায় কিছু ঢুকছে না।

মামা বললেন,—ওই যে! বদমাশটার রিভলভার দুটো পড়ে আছে। টুকলু, পকেটে রাখ। অ্যাই, ওঠ।

চিনে লোকটা উঠে দাঁড়াল। কর্নেল তার সর্বাঙ্গ তল্লাশি করতে লাগলেন। পাওয়া গেল পাসপোর্ট, ডায়েরি, ক্যালকুলেটর। আর বেশ কিছু কাগজপত্র।

হংকং-এর লোক।—কর্নেল পাসপোর্ট দেখে বললেন,—নেপাল দিয়ে ঢুকেছে।

মামা ঠোঁট কামড়ালেন। বললেন,—নিবারণ! বাঁচতে চাও তো সত্যি জবাব দাও! নিশ্চয়ই বুঝছ, তোমাদের মারলে আমাদের কোনও জবাবদিহি করতে হবে না। বাকি দুজন কই?

—জ-জানি না সায়েব।

—ফের মিথ্যে কথা!

জগুমামার রিভলভার শব্দ করে উঠল। নিবারণের পায়ের পাশ দিয়ে ধুলো উড়ল।

—ব-বলছি সায়েব। ও-ওই দিকে আছে।

সামনে দুজন, পিছনে আমরা চারজন। বুড়ো চিনেটার কানের গোড়ায় রিভলভার ধরে জগুমামা বলছেন,—একটু বেচাল দেখলে কুকুরের মতো মারব। ওদের কাছে নিয়ে চল।

সমতল জায়গা পেরিয়ে আবার ঢালু জঙ্গল। সাবধানে নামছি। একটু পরেই দেখা গেল পাকা সড়ক, হাইওয়ে। ওদিক দিয়ে এসে পাহাড়কে বেড় দিয়ে উঠেছে।

ওই যে! সেই সাদা টাটা সুমো! হাইওয়ে যেখানে পাহাড়ের খাঁজে ঢুকে গেছে, সেখানেই নি:শব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক তখনই আবার দুর্ঘটনা।

হঠাৎ চিনা লোকটা মাতৃভাষায় বিকট চিৎকার ছেড়ে লাফ মারল ঢালুর দিকে। মামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—স্টপ! স্টপ!

কে শোনে? গড়াতে-গড়াতে সে সড়কের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। রাস্তা ধরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে গাড়ির দিকে।

ঠি-উ-স! ঠি-উ-স!

পরপর দুটো গুলি ছুটে গেল। গাড়ির কিছু আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা।

মামা এবং কর্নেল দুজনেই লাফ মেরেছেন। গুলি ছুটল টাটা সুমো লক্ষ করে। কিন্তু গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ঢুকে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

নিবারণকে নিয়ে আমি আর অনন্তবাবু নেমে এসে দাঁড়ালাম রাস্তায়। মামা মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকমুহূর্ত। আপশোসের সুরে বললেন,—নিজের জীবন বাজি রেখে সাথীদের বাঁচিয়ে গেল।...চলুন।

চতুর্দিক দিয়ে চার-পাঁচটা আর্মির জিপ এসে পড়েছে। ঝুপঝুপ করে জওয়ানরা রাইফেল হাতে নেমে দাঁড়িয়েছে। কর্নেল অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে মামাকে বললেন,—সার, ওদের বলে দিলাম গাড়িটাকে ফলো করতে।

নিবারণকে একটা জিপে তুলে দেওয়া হল। জিপটা আমাদের পাশ দিয়ে নেমে গেল পেডং মিলিটারি ক্যাম্পের দিকে। আমরা হেঁটেই ফিরছি। মামা আমায় জিপে উঠতে বলেছিলেন। রাজি হইনি। যন্ত্রণার কোনও অনুভূতিই এখন নেই। একটু সময়ের হেরফের হলে আমারও ওই অবস্থা হতে পারত!

—মামা, তুমি কখন জানতে পারলে, আমরা নেই?

—যখন তোরা উঠেছিস, তখনই। পিছন-পিছন কর্নেল আর আমি বেরিয়েছি। ইচ্ছে করেই তোদের থামাইনি। জানতাম, ওরা আশেপাশেই আছে। তোদের ধরবে, মুক্তিপণ চাইবে, এসব হচ্ছে চেনা ছক। তোরা টোপ-এর মতো কাজ করলি। আমাদের ধরতে সুবিধে হল। কিন্তু—

মামা বললেন,—কিন্তু মুশকিল হচ্ছিল, শয়তানটা দুহাতে এমনভাবে রিভলভার দুটো তোর কানের গোড়ায় ধরে রেখেছিল, ওদের ধরতে সাহস পাচ্ছিলাম না! যদি ট্রিগার টিপে দেয়? শেষে চিঠি লেখার সময় তুই নল সরাতে বললি, ও সরাল। আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। তবুও কী ভয়ানক লোক দ্যাখ, আমি গলায় চেপে বসেছি, তারমধ্যেই রিভলভার চালিয়ে দিল!

গোটা একখানা লুচিতে ডালনা মাখিয়ে তার মধ্যে আলু, ডিমের টুকরো সযত্নে মুড়ে মুখের মধ্যে চালান করলেন অনন্ত সরখেল। তৃপ্তিতে তাঁর চোখ বুঁজে এসেছে। একটু পরে চোখ খুলে বললেন,—অমৃত!...টুকলু, তুমি তো সবই বলছ, আমার ভূমিকাটা একটু বলো।

আমাদের ড্রইংরুমে বাবা, মা, লালবাজারের ডিসি ডিডি সবাই বসে আছেন। —আপনার ভূমিকা? সে তো বারেবারে ফিট হয়ে যাওয়া।

ফুচ!—অদ্ভুত একটা শব্দ করে অনন্তবাবু হাসলেন,—না:! বয়েস বাড়লেও বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার মোটেই বাড়েনি হে। আমার উঁচুদরের অ্যাক্টিংটাই তুমি বুঝতে পারোনি!

—অ্যাক্টিং? আপনাকে যখন বাঁধছিল, তখন ধড়াস করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন! ওটা অ্যাক্টিং?

—হ্যাঁ, অ্যাক্টিং-ই তো। অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে রইলুম বলেই না ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। চিনেটা তোমার কানের গোড়া থেকে পিস্তল সরাল। স্যার ঝাঁপ মারার সুযোগ পেলেন।

—অনন্তবাবু, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! কর্নেল সিং—বাড়াবাড়ি!—অনন্ত সরখেল বলে উঠলেন,—আমি গোড়া থেকেই বলিনি, ওই চিনেদুটো স্পাই? বলো? আমি তোমায় নিয়ে ওই ভোরে না বেরুলে ওদের ধরা যেত?

অনন্ত সরখেলের সঙ্গে তর্কাতর্কি আর এগোল না। জগুমামা পাশের ঘর থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন,—টুকলু, যেভাবেই হোক, আমাদের এবারের ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে অনন্তবাবুর বেশ বড় ভূমিকা আছে।...এখন চল। আমাদের গাড়ি এসে গেছে?

—অনেকক্ষণ।

হাতের এখনও যা অবস্থা, তাতে আরও বেশ কয়েকদিন গাড়ি চালানো যাবে না। পুলিশের অ্যাম্বাসাডারে উঠে বসলাম।

বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ।....

তিনতলায় বোটানি ডিপার্টমেন্ট। ডানদিকে করিডোরের কোনায় ঘরটা। নেমপ্লেটে লেখা ড. কৃষ্ণকুমার রাস্তোগী। জগুমামার ছোটবেলার বন্ধু। বাবলুমামা।

জগু? আয়, আয়। বাবলুমামা তারপরেই আমায় দেখে হাসলেন,—কী খবর টুকলু? হাত এখন ঠিক আছে?

—হ্যাঁ। স্লাইট ব্যথা আছে।

মামা ব্রিফকেস খুলে সেই গাছটার কিছু ডালপাতা টেবিলের ওপর রাখলেন।

বাবলুমামা অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে দেখলেন। কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। তারপর বললেন,—একজাতের পাইন গাছ। জিমনোসপার্ম।...মনে হচ্ছে অ্যাবিস ওয়েবিয়ানা। সুগন্ধী তেল বেরোয়। সাবান, পারফিউম তৈরিতে খুব লাগে।

মামা ভ্রূ কুঁচকে বললেন,—গন্ধতেল। কী বলছিস বাবলু? ঠিক করে দ্যাখ।

ঠিকই বলছি জগু। এসব গাছের মেইন একসট্রাক্ট হচ্ছে অ্যারোমেটিক অয়েল। অয়েল কনটেন্ট ভেরি হাই।—বলতে-বলতে প্রফেসর পারিয়া পাশের আলমারি থেকে ঢাউস একখানা বই নিয়ে এলেন। বললেন,—তবু তুই যখন বলছিস, টু বি সিওর, দেখছি।...হুঁ এই তো! ছবি দ্যাখ। মিলছে? অ্যাবিস ওয়েবিয়ানা। হ্যাবিটাট—ডেন্স ফরেস্ট অব টেম্পারেট রিজিয়ন। ঠান্ডা জায়গার জঙ্গল। ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়—অরুণাচল,...সিকিম...তুই নিজে পড়।

মামা তবু বললেন,—উঁ-হুঁ। কোথাও ভুল হচ্ছে। বাবলু, প্লিজ ভালো করে আরেকটু স্টাডি কর। এ গাছের অন্য মেডিসিন্যাল ভ্যালু আছে। থাকতেই হবে।

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন,—এখন চলি রে। রাতে ফোনে কথা হবে।

—এবার কোথায় মামা?

—বেলেঘাটায়। অজিতের ফ্ল্যাটে।

—ওখানে কী আছে?

—কম্পিউটার খুলব। গাছের ঠিক নাম জানব।

—কী করে পাবে? প্রাইমারি পাসওয়ার্ড দিয়ে তো ডক্টর পালচৌধুরীর রিসার্চের মূল ফোল্ডারে ঢুকতে পারোনি। লক করা আছে।

—মনে হচ্ছে, সেকেন্ডারি পাসওয়ার্ড পেয়ে গেছি।

—পেয়ে গেছ! কী করে?

—চল না। নিজেই দেখবি।

ফাঁকা বাইপাস ধরে মিনিট কুড়ির মধ্যেই হরমোহন ঘোষ লেন। বাইরে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

দরজা খুলতেই ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল। পুলিশ দুজন ফটাফট সুইচ টিপল, জানলা খুলে দিল। আলো-বাতাস হা-হা করতে লাগল ফ্ল্যাটের মধ্যে।

সোজা গিয়ে বসে পড়েছেন কম্পিউটারের সামনে। সুইচ অন করলেন। কি-বোর্ড টিপে যাচ্ছেন। প্রাইমারি পাসওয়ার্ড...প্রাইভেট ডায়েরি...এবার কম্পিউটার সেকেন্ডারি পাসওয়ার্ড চাইছে।

জগুমামা ধীরে-ধীরে কয়েকটা সংখ্যা টাইপ করলেন। স্ক্রিনে ভেসে উঠল কয়েকটা ফুটকি। কম্পিউটার জিগ্যেস করল,—are you sure? তলায় Y/N অর্থাৎ Yes/No লেখা। মামা Y-তে মাউস ক্লিক করলেন।

অমনি জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি বাজনা বেজে উঠল। স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে—

Congratulations !

Welcome to the wonder Research of Dr. PalChowdhury.

মামা চিৎকার করে আমায় জড়িয়ে ধরলেন,—ইউরেকা! পেয়ে গেছি রে, টুকলু!

জগুমামার চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

আমারও দারুণ আনন্দ হচ্ছে।—কী করে পাসওয়ার্ডটা বের করলে?

—বলছি। এখনই একবার বাড়িতে ফোন করা দরকার। কর্নেলের ফোন আসতে পারে।

মামা ড্রইংরুমে গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করলেন।

—হ্যালো দিদি? আমি জগু বলছি। আমরা এখন বেলেঘাটায়।...হ্যাঁ-হ্যাঁ।...তুমি নাম্বারটা নোট করে নাও। টু থ্রি সেভেন জিরো ওয়ান নাইন ফোর থ্রি। কর্নেল সিং এসটিডি করতে পারেন। এই নাম্বার দিয়ে দিও। ঘণ্টাখানেক আছি।

ফোন ছেড়ে মামা ফিরে এলেন কম্পিউটারের ঘরে। আমি উদগ্রীব।

মামা বললেন,—নিউমারোলজি!

—মানে?

—এরমধ্যেই ভুলে গেলি? যেদিন অজিতের মৃত্যুর খবর এল, সেদিনই আমরা সন্ধেবেলায় আলোচনা করছিলাম। মনে পড়ছে? পরপর প্লেন অ্যাকসিডেন্ট, যেখানে প্লেন ভেঙে পড়ছে সেখানে P আর A আছে! গত পরশু রাতে পেডং আর্মি ক্যাম্পে কর্নেল আর আমি টিভির সামনে বসেছিলাম। বিবিসি নিউজ চ্যানেলে দেখাল, বাহারিনের একটা প্লেন পারস্য উপসাগরে ভেঙে পড়েছে। পার্সিয়ান সি! সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথায় স্ট্রাইক করল, এখানেও সেই P আর A। আর ভাবনাটা আসতেই হঠাৎ মনে হল কম্পিউটারের সেকেন্ডারি পাসওয়ার্ড অজিত মেয়ের নামের অক্ষরগুলোকে ইংরেজির অ্যালফাবেটের সিরিয়াল নাম্বারে লেখেনি তো? ওর মেয়ের নাম অহনা। সংখ্যায় লিখলে কী দাঁড়াচ্ছে? তখনই কর্নেলের কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে লিখে ফেললাম।

বলতে-বলতে বুকপকেট থেকে একটা টুকরো কাগজ বের করে সামনে ধরলেন মামা। তাতে এইভাবে লেখা আছে—

A H A N A

1 8 1 14 1

আমি লাফিয়ে উঠলাম,—আরিব্বাস!

জগুমামা বললেন,—তখনই আমি ডিসিশন নিলাম, পরদিন ব্যাক করব। কারণ অপরাধী কে, গোড়াতেই বুঝে গেছি। ধাঁধা দুটো। এক—কীভাবে মারল অজিতকে? দুই—কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড। আমার মন বলছিল, আমার ধারণা ঠিক। কম্পিউটারের ডায়েরিতে অজিত লিখেছিল, নিজের মেয়ের চেয়ে প্রিয় কী আছে? নাম দিয়ে হচ্ছে না। জন্ম সাল তারিখ ধরে করলে ছয় অক্ষর হয়। কিন্তু অত সহজ ধাঁধা অজিতের মতো বুদ্ধিমান মানুষ করে রাখবে না।

কম্পিউটারে এখন তিনটে ছবি ও লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। Secret folder 1,2,3। মামা 1 নম্বরে মাউস ক্লিক করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা গাছের সম্পূর্ণ রঙিন ছবি ফুটে উঠল। তলায় লেখা The wonder plant।

এই সেই গাছ, যাকে ওই অন্ধকার রাতেও চিনতে ভুল করেনি নোরগে। আমরা ডাল-পাতা কেটে নিয়ে এসেছি।

পরের পৃষ্ঠা। এখানে অবিকল ওইরকম গাছের একটা ছবি। তলায় ইংরেজিতে লেখা, সাধারণ মানুষের চোখে ভুল হয়। এ অন্য গাছ। এর নাম অ্যাবিস ওয়েবিয়ানা।

—দেখেছ মামা, দেখেছ? তোমার প্রফেসর বন্ধু এই ভুলটাই করেছেন।

মামা হাসলেন। ক্লিক করলেন পরের পৃষ্ঠায়। এবার লেখা শুরু হয়েছে...আশ্চর্য গাছের নাম 'ট্যাক্সাস বাকাটা'। ফ্যামিলি ট্যাক্সেসি। এই গাছ অন্য পাহাড়ি ঠান্ডার দেশেও হয়। তবে সিকিমের 'পেডং' গ্রামের Taxus-এর যে আশ্চর্য গুণ আছে, অন্য কোথাও তা নেই।

'ট্যাক্সাস বাকাটা' সম্পর্কে প্রথম আমার কৌতূহল হয়, যখন একটা বিদেশি জার্নালে পড়ি, এই গাছ থেকে অ্যান্টিসেপ্টিক মেডিসিন তৈরি হতে পারে। খুঁজতে-খুঁজতে লাচুং-এর কাছে পেডং-এ এসে পেলাম এই গাছকে। এখানে এসে আরও অবাক হয়ে যাই। পাহাড়ি আদিবাসীদের টিউমার, ঘা, কাটাছেঁড়া সব সেরে যাচ্ছে এর পাতায়। তবে কি বিশেষ কোনও গুণ আছে ওই পাতার মধ্যে?

দেরি না করে শুরু করে দিলাম রিসার্চ। এই বিশেষ গাছের সায়েন্টিফিক নাম দিয়েছি Taxus Baccata ver. Pedong।

চাষ শুরু করেছি স্থানীয় লোকদের দিয়ে। আমার ল্যাবরেটরির বাগানে। লোভী শকুনদের গুলিয়ে দিতে Abbies Webbeiana-ও লাগিয়ে দিয়েছি। জহুরির চোখ না হলে ভুল করবে। সেটাই আমি চাই।

এবার Taxus-এর পাতা থেকে alkaloid extraction করতে হবে। দ্রব্যগুণ একটুও নষ্ট না করে। এটাই সবচেয়ে কঠিন।

পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা লেখা রয়েছে কম্পিউটারে...

...আজ সকালেই খবর পেলাম, নোরগেদের গ্রামের এক বুড়িমহিলার গলার নীচে একটা বড় টিউমার ফেটে গেছে। আমি ছুটে গেলাম। দেখে বুঝলাম, মৃত্যু নিশ্চিত। শেপ দেখে খালিচোখে বোঝা যায় ম্যালিগনান্ট টিউমার। ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নোরগেরা কনফিডেন্ট। বলল, ওই গাছের পাতার রস লাগিয়ে দেবে পুলটিস করে। আর একবাটি রস খাইয়ে দেবে। বুড়ি ঠিক সেরে উঠবে।

আমি সারাদিন ওদের গ্রামে ছিলাম। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বিকেলের মধ্যে বুড়ির কাতরানি বন্ধ হয়ে গেল।...

মামা বললেন,—হোয়াট আ রিভিলিং স্টোরি! সব পড়ে উঠতে সারাদিন লেগে যাবে। আরও দুটো ফোল্ডার রয়েছে।

পাশের ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।...হ্যাঁ।...করেছিল?...পাচ্ছে না?...কখন করবে?...আচ্ছা আমরা যাচ্ছি।

ফোন নামিয়ে জগুমামা বললেন,—দিদির ফোন। কর্নেল সিং ওখান থেকে নাম্বার নিয়ে এই ফোনে চেষ্টা করেছিল। পাচ্ছে না। দিদিকে ফোন করে জানিয়েছে। আবার একঘণ্টা পর ফোন করবে। অনেক খবর আছে। তা ছাড়া জরুরি কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। —চল, ফিরে যাই। চান-খাওয়া করে দুপুরের পর আবার আসব।

৯

বাথরুমে সবে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়েছি। একটানা রিং—ক্র -উ-উ-উ..., ক্র -উ-উ-উ! নির্ঘাত কর্নেলের এসটিডি ফোন।

মামার গলা শুনতে পাচ্ছি আর উত্তেজনায় ফুটছি। কোনওরকমে মাথা ভিজিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মা চেঁচিয়ে উঠলেন,—অ্যাই টুকলু, ভালো করে গা মোছ। টপটপ করে জল পড়ছে।

গা মুছতে-মুছতে জগুমামার ঘরে পৌঁছবার আগেই ফোন শেষ। মামা সিগারেট ধরাচ্ছেন।

—মামা, কর্নেল কী বললেন?

মামা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—আমার কাছে নতুন খবর নয়। জানা ছিল, ধরা ওরা পড়বেই। আর্মি ঘিরে রয়েছে, পালাবে কোথায়? তবে ক্রিমিন্যাল দুজনের একজন সুইসাইড করেছে। ওর জিভের নীচে সায়ানাইড ক্যাপসুল রাখা ছিল। আমার জন্যে ভালো খবর একটাই। আমার ল্যাপটপ কম্পিউটারটা ওদের কাছে পাওয়া

গেছে। গাড়িটা খাদে ফেলে দিয়েছে। মনে হয়, ওখানেও কিছু ছিল। গাড়িতে আগুন ধরে গেছে। এখন সমস্যা হল, ডেডবডির কী ব্যবস্থা হবে?

—মানে?

—সুইসাইড করেছে যুবক চিনে ছেলেটা। তার শরীর থেকে পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। সে এদেশে এসেছিল। হংকং থেকে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে। দুদেশের বিদেশ দপ্তরে তার নাম-ঠিকানা নথিবদ্ধ আছে। তাই ওর সঙ্গী মাঝবয়েসি চিনেটার সময়ে যা বলেছিলাম—

—কী বলেছিলে?

—বলেছিলাম, লাশ পাহাড়ে পুঁতে দাও। বেআইনিভাবে এদেশে ঢুকেছে। কোথাও রেকর্ড নেই।

—এর বেলায় কী করবে?

—সেটাই ভাবছি। কর্নেলকে বললাম, আপাতত গোপনে বরফচাপা দিয়ে রাখো। পরে দেখা যাবে।

—জীবিত ক্রিমিন্যালটা কে? হর্ষ বাগলা?

—হ্যাঁ। তবে মেক-আপ খুলে ফেলতে আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে।

—আসল রূপ!

—সে কী রে টুকলু! ওকে চিনতে পারিসনি? আমি তো ফোদং-এর খাওয়ার হোটেলে দেখে দু-মিনিটের মধ্যে চিনে ফেলেছিলাম। সেজন্যেই তো ছুটে বেরোলাম। নাকের ওপর জড়ুলটা দাড়িগোঁফে চাপা দেওয়া যায়নি।

—অরুণ নোপানি?

—ভেরি গুড! এই তো, বুদ্ধি খুলেছে। অরুণ স্বীকার করেছে, অজিতকে ওরা খুন করেছে। কিন্তু কীভাবে করেছে, ও নাকি জানে না। এনটায়ার প্ল্যান ওয়জ চকড বাই চাইনিজ পিপল। ওই পর্যন্ত এসে আটকে গেছি।

—আমার মনে হয়, নোপানি মিথ্যে বলছে। ওকে ভালোমতো জেরা করলে সব বেরিয়ে পড়বে।

মামা একটু হাসলেন। বললেন,—মনে হয় না। আর্মির ইনটারোগেশন সাংঘাতিক। ওদের জেরায় ভেঙে পড়েনি, এমন ক্রিমিন্যাল হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

—তাহলে?

—তাহলে কী? না জানলে বলবে কী? নোপানি শুধু একটাই কথা বলছে। হ্যাঁ, খুন করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে হয়েছে, ও জানে না। যারা জানত, তারা বেঁচে নেই।

—স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু মামা, ডক্টর পালচৌধুরীকে মারল কেন?

মামা বললেন,—নোপানি চেয়েছিল, গভমেন্টকে লুকিয়ে অজিতের রিসার্চ কোটি-কোটি ডলারে বিদেশে বেচে দিতে। সেই মতলব নিয়েই রিসার্চের পেছনে সে লাখ-লাখ টাকা খরচ করে। অজিতকে তখন বিন্দুবিসর্গ বলেনি। পরে রিসার্চ যখন শেষ পর্যায়ে, সেই সময় বলে। অজিত রাজি হয় না। এদিকে ইতিমধ্যে নোপানি সিঙ্গাপুর-হংকং-এর মিডলম্যানদের সঙ্গে কথা বলে ডিল ফাইনাল করে ফেলেছে। হয়তো কিছু অ্যাডভান্সও নিয়ে থাকবে। সুতরাং পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। নিবারণকেও টাকার লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলল নোপানি। ঠিক হল, এরা অজিতকে খুন করবে ঠিকই, কিন্তু এমনভাবে করবে যাতে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয়। তারপর অজিতের ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঢুকে সব সরিয়ে ফেলবে। এই উদ্দেশ্য সফল হল না। অহনা সব ওলটপালট করে দিল। কর্নেলকে অবশ্য আমি বলছি, জেরা চালিয়ে যেতে।

—কর্নেল আবার কখন যোগাযোগ করবেন?

মামা বললেন,—বলেছি, খবর থাকলে তিনটের মধ্যে ফোন করতে। তারপর তো আমরা থাকব অজিতের ফ্ল্যাটে। ওখানে যদি লাইন না পায়, বলেছি রাত এগারোটার পর এখানে।

—এই সময় আমাদের একটা মোবাইল থাকলে কীরকম সুবিধে হত বলো তো?

—সে তো হতই। তোর নিজেরই একটা মোবাইল রাখা খুব দরকার। রাতবিরেতে বেরোতে হয়। একটা মোবাইল থাকলে বাড়ির লোক নিশ্চিন্ত থাকে। এখন তো মোবাইল সস্তা। একটা নিয়ে নে।

—আর বোলো না মামা! মাকে নিয়ে মুশকিল। কোথায় পড়েছে, সেলফোনে শরীরের ক্ষতি হয়। ব্যস! তারপর থেকে এক কথা, না বাবা, দরকার নেই। পিকলু জার্মানি থেকে ফোনে বলল, দাদা এখানে ফুটপাতে মোবাইল ফোন পাওয়া যায়। খুব সস্তা। নিয়ে যাই। মাকে কত বোঝাচ্ছি...

বলতে-বলতে থেমে গেছি। মামা আমার কোনও কথাই শুনছেন না। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

থামতেই বললেন,—টুকলু! তোদের ইন্টারনেট কানেকশন আছে?

—না।

—তাহলে এখনই আমাদের বেরোতে হবে।

—এখন?

—হ্যাঁ, রাইট নাউ। অজিতের ফ্ল্যাটে যাব।...দিদি, আমাদের ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো।

পুলিশ দুজন টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল। ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে জগুমামা নিজেই ঝপাঝপ ঘর খুলে ফেললেন। বসে গেলেন কম্পিউটারের সামনে।

আমি এর মধ্যে বেশ কয়েকবার জিগ্যেস করেছি।—মামা, কী ব্যাপার?

মামা বিরক্ত গলায় বলেছেন,—টুকলু, প্লিজ! আমায় কাজ করতে দে। সব জানতে পারবি।

একচান্সেই পেয়ে গেলেন কানেকশন। কম্পিউটার জিগ্যেস করল, কী জানতে চাও?

মামা টাইপ করলেন,—মোবাইল ফোন।

Website searching...ইন্টারনেট খুঁজে চলেছে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই কম্পিউটারের বালিঘড়ি তিরচিহ্ন হয়ে গেল। Website found।

তারপর রঙিন পৃষ্ঠা ভেসে উঠল স্ক্রিনে। শিরোনাম মোবাইল ফোন। জগুমামা PRINT কম্যান্ড দিলেন।

পাশেই ছোট্ট প্রিন্টার। আলো জ্বলে উঠল। একের-পর-এক পৃষ্ঠা ছেপে বেরোচ্ছে। মোবাইল ফোন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। খুদে-খুদে ইংরেজি টাইপে ছাপা। সঙ্গে অজস্র ছবি। মোট সাত পৃষ্ঠা প্রিন্ট আউট।

মামা পড়ে চলেছেন। মাঝে-মাঝে মাথা নাড়ছেন। এমন ঝড়ের বেগে পড়ছেন, আমি দেখার সুযোগই পাচ্ছি না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে পড়া শেষ। উঠে দাঁড়ালেন। কাগজগুলো ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন। বললেন,—চল।

—কোথায়?

—বেলেঘাটা থানায়। দাঁড়া, একবার ফোন করে জেনে নিই, ওসি আছে কিনা।...এ কী রে! ফোনটা খারাপ হয়ে গেল?

—ও : মামা! তুমি পাগলের মতো করছ! লাইনে ইন্টারনেট চালু আছে।

—ওহো! সত্যিই আমি পাগল হয়ে গেছি রে টুকলু!

কথা বলতে-বলতে কম্পিউটার বন্ধ করলেন জগুমামা। তরপরেই আবার টেলিফোন তুললেন,—হ্যালো, ওসি প্লিজ। আমার নাম জগবন্ধু মুখার্জি।...আপনি আছেন তো?...পাঁচমিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।

থানার সামনে গাড়ি পার্ক করার সঙ্গে-সঙ্গে জগুমামা প্রায় ছুটে ঢুকে পড়লেন ও.সি.-র চেম্বারে।

—আসুন সার! বসুন, বসুন।

—মোবাইল ফোনটা দিন।

—মোবাইল? এই নিন। কিন্তু স্যর, আমাদের ল্যান্ডলাইন কিন্তু ঠিক আছে। মানে যদি ফোন করতে চান —

ধ্যুর মশাই!—জগুমামা উত্তেজনায় ধৈর্য হারাচ্ছেন। খিঁচিয়ে উঠে বললেন,—আপনার মোবাইল কে চাইছে? ডক্টর অজিত পালচৌধুরীর মোবাইল ফোনটা চাইছি।

—দিচ্ছি স্যর।

একজন পুলিশ অফিসার রুমালে মোড়া সেলফোনটা টেবিলে রেখে গেলেন। —ফোরেনসিক টেস্ট হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্যর। ডক্টর পালচৌধুরীর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।

জগুমামা সেলফোন হাতে নিলেন। স্ক্রিন কালো। 'অন' করলেন। একবার আলো জ্বলেই নিভে গেল। আবার অন করলেন। আবার নিভে গেল। মামা বললেন,—যাচ্চলে! ব্যাটারির চার্জ নেই। পড়ে ছিল। চার্জ দিতে হবে! চার্জার চাই! ফ্ল্যাটে আবার গিয়ে—

—মামা, ওসি সায়েবের মোবাইল সেট বোধহয় একই মডেলের।

রাইট।...বড়বাবু, আপনার ফোনের চার্জার এখানে আছে?

—আছে স্যর।

—দিন।

যন্ত্রটার পিছনে চার্জার গুঁজে প্লাগ পয়েন্টে কানেকশন দিতেই স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল। নেটওয়ার্কের নাম ফুটে উঠেছে। মামা হাতে নিয়ে পুটপুট করে বোতম টিপছেন।

একটুপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন,—পেয়েছি! পেয়েছি!

—কী? কী পেলেন স্যর?

জগুমামা গম্ভীর গলায় বললেন,—শেষ যে ফোন এসেছিল জীবিত অজিতের কাছে, তার নম্বর।...মোবাইলে এই এক সুবিধে, কোত্থেকে ফোন এসেছে, জানা যায়। মেমরিতে স্টোর থাকে।

—কোত্থেকে ফোন এসেছিল মামা?

মামা বললেন,—সেটাই জানতে হবে। তবে এদেশের নয়। বড়বাবু, এই ইনফর্মেশনটা এখখুনি চাই। ৮৫২ কোন দেশের কোড নম্বর?

ও.সি. এক সেকেন্ড ভাবলেন। তারপর রিসিভার তুললেন,—হ্যালো, পরেশ তোমাদের বুথের এসটিডি আইএসডি ডিরেক্টরি বইটা নিয়ে চট করে চলে এসো। হ্যাঁ, থানায়।

মামা সিগারেটে হুস-হুস করে টান দিচ্ছেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পরেশ নামের ছেলেটি চওড়া একখানা বই নিয়ে ঘরে ঢুকল। নিন স্যর।

সঙ্গে-সঙ্গে বইটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মামা। আঙুল দিয়ে-দিয়ে আই এসডি-র মধ্যে সব দেশের কোড নম্বর দেখে চলেছেন। এত খুদে-খুদে টাইপ, মাঝে-মাঝে চশমা তুলে চোখের কাছে এনে দেখতে হচ্ছে। তিন পৃষ্ঠা উলটে গেলেন।

চতুর্থ পৃষ্ঠার একজায়গায় এসে জগুমামার আঙুল থেমে গেল। বিড়বিড় করে উঠলেন,—যা ভেবেছি তাই।

পাশ থেকে ঝুঁকে দেখলাম—হংকং।

একটু গোড়া থেকে বললে আপনাদের বোধ হয় সুবিধে হবে।—জগুমামা কফির কাপ কাছে টেনে নিলেন।

আমাদের ড্রইংরুমে উদগ্রীব হয়ে বসে আছি তাঁকে ঘিরে। আছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার, অজিতবাবুর মেয়ে অহনা, অনন্ত সরখেল, বেলেঘাটা থানার ওসি, আমার বাবা-মা। মামা বলতে শুরু করলেন।

আমার বন্ধু ডক্টর অজিত পালচৌধুরী হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল নিজের ফ্ল্যাটে। বিকেলবেলা চা-জলখাবার খেতে-খেতে। আমাদের যা বয়েস আর যেরকম টেনশনের মধ্যে থাকি, তাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু আকছার ঘটছে।

কিন্তু ওর মেয়ে অহনা জেদ ধরল, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, খুন। আমরা তার অনুরোধে তদন্তে এলাম। হ্যাঁ, পরিস্থিতি আমাদের বুঝিয়ে দিল, অজিত সত্যিই মারা যায়নি। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনারাও ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, কেন অজিতকে খুন করা হয়েছিল। কী গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল । কারা-কারা অপরাধী, তাও আপনারা জেনেছেন।

এ সব আমরা, ঘটনাস্রোত যেমন-যেমন এগিয়েছে, তেমন-তেমন জেনে গেছি। জানতে পারিনি কেবল গোড়াটুকু, অজিতকে কীভাবে মারা হল? মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, বিষপ্রয়োগ হয়নি। তাহলে? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলল, ব্রেনে টিউমার হয়েছিল। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, অর্থাৎ ক্যান্সার। সেটা ফেটে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু হয়।

ব্রেনে টিউমার কি এক দিনে তৈরি হয়ে গেল? নিশ্চয়ই নয়। টিউমার থাকলে তো অজিতের মাথায় মাঝে-মাঝে যন্ত্রণা হত। একজন বিজ্ঞানী হয়ে সে মাথার ব্যথায় আমল দেবে না, স্ক্যান করাবে না, তাই বা কীভাবে হয়?

রহস্যের অকূল সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। কোনও কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের তদন্ত-অভিযানের শেষ পর্যায়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল নিবারণ এবং অরুণ নোপানি। অদ্ভুত ব্যাপার হল, তারা কেউ জানে না, কীভাবে অজিতকে মারা হয়েছে। ওদের কথায়, জানত যারা, তারা মারা গেছে। হংকং-এর বাসিন্দা দুই চিনা। একজন পালাতে গিয়ে গুলিতে মারা যায়, অন্যজন সুইসাইড করে।

ঠিক এইসময়, টুকলু আমায় না জেনে দারুণ সাহায্য করে ফেলল। বলল, সে একটা মোবাইল ফোন কিনতে চাইছে। অথচ মা রাজি হচ্ছে না। কোথায় নাকি মা দেখেছে না পড়েছে, মোবাইল ফোন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল! আমি সঙ্গে-সঙ্গে অজিতের বাড়ি এসে ইন্টারনেট খুলে মোবাইল ফোন সংক্রান্ত লেটেস্ট ইনফর্মেশন পড়ে ফেললাম।

মোবাইল ফোন নিয়ে এই দু-হাজার সালে যা গবেষণা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, যারা সবসময় মোবাইল ব্যবহার করেন, তাদের মগজের কোষগুলো উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার ফলে অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন বা ইরেগুলার সেল ডিভিশন হতে পারে। ইরেগুলার সেল ডিভিশন মানেই ক্যান্সার। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টি হতেই পারে সেই জায়গায়।

কেন এমন হয়? দু-হাজার সালের ষোলোই জুলাই সর্বশেষ রিসার্চে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মোবাইল নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগ যার মাধ্যমে হয়, সেই মাইক্রোওয়েভ এরজন্যে দায়ী।

সুতরাং,—এই পর্যন্ত বলে জগুমামা একটু থামলেন। আমাদের সকলের গোলগোল চোখে চোখ বুলিয়ে বললেন,—সুতরাং বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে যদি কেউ মোবাইল ফোনে পাঠানো মাইক্রোওয়েভের তীব্রতা বা ইনটেনসিটি বাড়িয়ে দেয় এমন উঁচুমাত্রায়, যিনি ফোন ধরবেন বা কথা বলবেন, বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে-বলতে তাঁর ব্রেনের ওই অংশে তাহলে তখনি হ্যাপাজার্ড সেল ডিভিশন শুরু হয়ে যাবে! তারপর? খুব দ্রুত ওখানে গজিয়ে উঠবে ক্যান্সারাস টিউমার...শুরু হবে ইনটার্নাল হেমারেজ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। সেলফোনধারী বেচারি সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যাবেন।

—সে কী! ভাবা যায় না!

ভাবা তো যায়ই না।—জগুমামা বললেন,—আমরাও কি ভাবতে পেরেছিলাম? মোবাইলে অজিতের কাছে শেষ টেলিফোন এসেছিল হংকং থেকে। আপনারা জানেন, মোবাইল ফোনের বিলে কোথা থেকে টেলিফোন আসছে, কোথায় করছেন সব নোট থাকে। প্রত্যেক নাম্বারের জন্যে ওদের কম্পিউটারে আলাদা-আলাদা ফাইল আছে। আমরা অজিতের মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কোম্পানির সঙ্গে পুলিশের মাধ্যমে কালকেই যোগাযোগ করি। অজিতের নাম্বারের রেকর্ড দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। শুধু শেষ কলটা নয়, ওইদিন সকাল থেকে অজিত রিসিভ করেছিল হংকং-এর একই নাম্বার থেকে মোট ছ'টা কল।

মাই গড।—অহনা অস্ফুটে বলল।

জগুমামা আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, হংকং থেকে যে বা যারা ফোন করেছিল তারা এই কনসপিরেসির মাথায় এবং কম্যুনিকেশন সায়েন্সে আমাদের চেয়ে বেশ কয়েকবছর এগিয়ে আছে। কোন পদ্ধতিতে তারা মাইক্রোওয়েভের তীব্রতা অতটা বাড়িয়েছিল, আমাদের জানা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এই পর্যন্ত যা বললাম, সবটাই অনুমান। আমার নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ। বলতে পারেন, দুয়ে-দুয়ে চার

মেলানো। কোনও প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। জানি না, পৃথিবীর ক্রাইম হিস্ট্রিতে এরকম মার্ডার আজ পর্যন্ত ঘটেছে কিনা!

জগুমামা তাকালেন গোয়েন্দা প্রধানের দিকে। তিনি ঠোঁট উলটোলেন,—নাহ! আমারও জানা নেই। একটা কথা ডক্টর মুখার্জি, যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উনি সেলফোন অপারেট করতেন, তাদের কেউ এই চক্রান্তে যুক্ত ছিল না তো?

ঠিক বলেছেন।—জগুমামা বললেন, গোপনে তদন্ত করে দেখতে পারেন। তবে কেউ যদি যুক্তও থেকে থাকে, এখন আর তাকে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—মামা, হংকং-এর ওই নম্বরে ফোন করলেই তো জানা যেতে পারে নাটের গুরু কে।

—দুর বোকা! ক্যাশকার্ড কিনে নম্বর নিয়েছে, পরে সিমকার্ড মেশিন থেকে বের করে ফেলে দিয়েছে।

—তাহলে? নোপানি?

জগুমামা বললেন,—লাভ হবে বলে মনে না । নোপানি যাদের চিনত, তারা কেউ বেঁচে নেই। এই ধরনের আন্ডার ওয়ার্লড ডিল-এ যারা 'টপ বস' বা ডন, তারা সবসময় পরদার আড়ালে থাকে।

—কিন্তু মামা, গভমেন্টের দুই অফিসার, যাদের কাছ থেকে ফাইলের পৃষ্ঠা লোপাট হল—

—ঠিক বলেছিস। লক্ষ-লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। দে ওয়্যার অ্যারেস্টেড। ঘুষের টাকাও পাওয়া গেছে দিল্লির বাড়িতে।

গোয়েন্দাপ্রধান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, উইদ ইয়োর পারমিশন, আজ তাহলে আসি? বিজ্ঞানী আপনি যা করলেন, অভিনন্দন জানাবার ভাষা নেই!

জগুমামা তাঁকে থামিয়ে দিলেন,—সবটা যখন শুনলেন, শেষের খারাপ খবরটুকু জেনে যান। অজিতের রিসার্চের ফল জানার আর কোনও উপায় নেই।

—মানে!! কেন?

—অজিতের কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক কোরাপ্ট করেছে। অন করলেই 'হ্যাং' করে যাচ্ছে। আমার ধারণা, ইন্টারনেট সার্ফিং করে যখন 'মোবাইল ফোন' সম্পর্কে ইনফর্মেশন নিচ্ছিলাম, তখনই 'ভাইরাস' ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো সেই হংকং-এর কিংকংই ঢুকিয়েছেন!

—হোয়াট?

—ইয়েস। আরেকটা খবর। পেডং-এর কাছে অজিতের ল্যাবরেটরির চারপাশের প্রায় এক বর্গকিলোমিটার এলাকা গতকাল রাতে বিধ্বংসী বিস্ফোরণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই গাছ-বাড়ি কিছুই নেই। একটু আগে কর্নেল ফোন করেছিলেন। ওর ধারণা, আগে থেকেই ল্যান্ডমাইন পোঁতা ছিল।

—তাহলে?

তাহলে আর কী?—জগুমামা বুড়ো আঙুল তুলে বললেন,—আমাদের কপালে এই মর্তমানই বর্তমান! অজিতের সঙ্গে-সঙ্গে ওর এতবড় কাজটাও হারিয়ে গেল। এর জন্যে আমিও কিছুটা দায়ী। গতকাল দুপুরে ইন্টারনেট খুললাম বলেই না এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল!

ঘর নিস্তব্ধ।

অনন্ত সরখেল বিড়বিড় করে বললেন,—শেষ অব্দি আকাশ থেকে মৃত্যু! ইচ্ছে করছে, নেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাই।

শারদীয়া ২০০০

রহস্য রাতের পদ্মায়

মিশমিশে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। হা-হা করে বাতাস বইছিল, মরা চাঁদের আলোয় জল চিকচিক করে উঠছিল, একটানা ইঞ্জিনের গর্জন। আমি ডেকে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছি 'সুনীলদা, সুনীলদা'।...রঞ্জনদা চারিদিক দেখে এসেছে, সুনীলদা কোথাও নেই। এক্কেবারে ভ্যানিশ।...এইসময় সুনীলদা, হ্যাঁ সুনীলদাই নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। আমরা ছুটে গেলাম। সুনীলদা একটু হাসল, কথা বলল না।...তারপর একসঙ্গে বাসে। সুনীলদা চুপচাপ।...আবার এখানে পৌঁছে কোথায় যে হারিয়ে গেল!...আমি কিছু ভাবতেই পারছি না, এখন যে কী করব?

সুধাংশুবাবুর কথা কান্নায় জড়িয়ে গেল।

জগুমামা ওর পিঠে হাত রাখলেন। আস্তে-আস্তে বললেন,—ভাই, কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু শান্ত হোন। সবটা বলুন।

সুধাংশুবাবু মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বললেন,—আমি পারব না। আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রঞ্জনদা, তুমি বলো।...

এই মুহূর্তে বসে আছি রমনা হোটেলের ৬০৭ নম্বর রুমে। জগুমামা বসে আছেন সুধাংশুবাবুর পাশে, আমার পাশে রঞ্জনবাবু।

গতকাল রাতে এঁরা দুজন এসে উঠেছেন এই হোটেলে। আমরাও কাকতালীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছি এঁদের অদ্ভুত সমস্যার সঙ্গে।

পুরো ব্যাপারটা এইরকম—

বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মেছবাউদ্দিন আমেদ জগুমামার অনেকদিনের বন্ধু। একই সময়ে দুজন একই য়ুনিভার্সিটি থেকে পোস্ট ডক্টরেট করেন।

ড. আমেদ বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় এলেও জগুমামার ওদেশে যাওয়া হয়নি। ড. আমেদ অনেকবার মামাকে ওদেশে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। কখনও কনফারেন্স, কখনও বা নিছকই বেড়াতে যাওয়ার। 'যাচ্ছিযাব' করেও কাজের চাপে জগুমামার যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে।

সম্প্রতি ড. আমেদ কক্সবাজার সাগর সৈকতে একটা বাড়ি করেছেন। আর তার পর থেকে প্রায় রোজই চট্টগ্রামের বাড়ি থেকে টেলিফোন। শেষপর্যন্ত হঠাৎ তিন-চারদিন আগে স্পেশাল ক্যুরিয়ারে টেলিগ্রামের ভাষায় এক মোক্ষম চিঠি।

'ডক্টর মুখার্জি, আপনি না আসা ইস্তক আমার কক্সবাজারের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করতে পারছি না। এবার আপনি যা ভালো বোঝেন, করবেন।'

—মেছবাউদ্দিন আমেদ

চিঠিটা এল সন্ধেবেলায়। দিন পনেরো জগুমামা কলকাতায় আমাদের বাড়িতে। খামটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মামা বললেন,—নাহ! এবার যেতেই হবে। আমেদ বেজায় চটেছে। ক'দিন ছুটি নিয়ে নে অফিস থেকে।

—আমি?

—না তো কি? আমি একা যাব নাকি? আরে বাপু, চল-চল। নিজের শিকড়টা চিনে আসবি।

আমি চুপ করে গেলাম। বাংলাদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছোটবেলা থেকে। বাবার দেশ ছিল ময়মনসিংহে, মা যশোরের মেয়ে। তাঁদের কাছে সে-দেশের এত গল্প শুনেছি, মনের মধ্যে একটা ছবি আঁকা হয়ে গেছে।

জগুমামা আবার বললেন,—শোন, আমেদ যদি এরমধ্যে ফোন করে, ধর আমি নেই, তুই ফোন ধরলি, খবর্দার বলবি না কিন্তু, আমরা যাচ্ছি।

—কেন?

—একনম্বর, ওকে সারপ্রাইজ দিতে হবে। দুনম্বর, আমরা নিজেদের খুশিমতন দু-চারদিন ঘুরে নেব। তুই তো জানিস না, আমি জানি ওপার বাংলার লোকেদের আতিথেয়তা কী সাংঘাতিক। আদরে, যত্নে পাগল করে দেয়। তারপরে আমি যাচ্ছি শুনলে আমেদ হয়তো এখানে-ওখানে সেমিনার ডেকে নেবে। যাচ্ছি বেড়াতে, তার বদলে বক্তিমে দিয়ে বেড়াতে হবে।

হাসলাম। বাবা-মায়ের মধ্যে এই আতিথেয়তার রোগ বিলক্ষণ জানি। অনেক আত্মীয় সেই ভয়ে আসতেই চান না আমাদের বাড়ি।

জগুমামা বললেন,—বুঝলি, ঢাকা পৌঁছে আমেদকে ফোন করব।

অতএব অফিসে ছুটির ব্যবস্থা করে গতকাল বিকেলে আমরা এসে পৌঁছেছি ঢাকায়। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এই রমনা হোটেল। জগুমামা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলেন, মাঝারি মানের হোটেল হলেও জায়গাটা শহরের কেন্দ্রে। আমাদের ঘরটা সাততলায়। নীচে নামলেই দোকান-বাজার, অফিস, অটো-ট্যাক্সি। ঝকঝকে তকতকে জনবহুল রাস্তায় অজস্র বিদেশি গাড়ি, বাস ছুটে যাচ্ছে।

কাল কোথাও প্রোগ্রাম ছিল না। একটু ফ্রেশ হয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেরিয়ে ছিলাম। পাশেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। একটু দূরে চোখধাঁধানো বায়তুল মোকারম, বাজার, টেলিফোন একসচেঞ্জ।

রাজধানী হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে হোটেলের লাউঞ্জে ঘরের চাবি নিতে এসেছি। দুজন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। সঙ্গে লাগেজ। উসকোখুসকো চেহারা। আরে! একে তো আমি চিনি! কোথায় দেখেছি? কোথায়? ভদ্রলোকও বারবার তাকাচ্ছেন।

হ্যাঁ-হ্যাঁ। এরা ছোটমামার বন্ধু। কলকাতার নামকরা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত।

—আপনি...আপনি কি রঞ্জন সরকার?

ভদ্রলোকের মুখে একচিলতে হাসি ফুটল। বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। তুমি অর্ণব। গত বইমেলায়—

—হ্যাঁ, আমার ছোটমামার সঙ্গে আপনি—

—ঠিক, ঠিক। তুমি এখানে?

—আজই এসেছি। ওই যে উনি, আমার জগুমামা।

জগুমামা!—রঞ্জনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—মানে বিজ্ঞানী জগবন্ধু মুখার্জি? যিনি রহস্য সলভ করেন? ভাই অর্ণব, আমরা খুব বিপদে পড়ে গেছি। ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেবে?

এই রে! এলাম বেড়াতে, আর অমনি সমস্যা জুটে গেল?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন।...জগুমামা, এনারা ছোটমামার বন্ধু। ইনি—

—নমস্কার। আমার নাম রঞ্জন সরকার, ইনি সুধাংশু দে। আমরা কলকাতা থেকে বাই রোড এসেছি। বাসের মধ্যে একটা মারাত্মক বিপদ ঘটে গেছে। কী যে করব, বুঝতে পারছি না। আপনার কথা অনেক শুনেছি। এভাবে যে দেখা হয়ে যাবে, ভাবিনি। যদি একটু হেল্প করেন—!

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এখন প্রায় দশটা। এরপর সব বন্ধ হয়ে যাবে। যাই ঘটে থাকুক, এত রাতে কিছুই করা যাবে না। আফটার অল, এটা বিদেশ। আগে আপনারা ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিন। কাল সকালে আমাদের ঘরে চলে আসুন। রুম নম্বর ৬০৭। চা খেতে-খেতে সব শুনব।

*

চায়ে চুমুক দিয়ে রঞ্জন সরকার বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, প্রথমেই বলে নিই, কাল রাতে আমরা চোখের পাতা এক করতে পারিনি। খাওয়া তো আউট অব দ্য কোশ্চেন। সুধাংশু নরম মনের ছেলে। সারারাত বেচারি গুমরেছে। মাঝে-মাঝে ধড়ফড় করে খাটে উঠে বসেছে।

জগুমামা অপলকে তাকিয়ে আছেন।

—তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি?

মামা ঘাড় নাড়লেন।

—অর্ণবের কাছে আমাদের পরিচয় বোধহয় পেয়ে গেছেন। আমরা প্রকাশক এবং কলকাতার বইমেলার সঙ্গে যুক্ত। ক'দিন পরে শুরু হচ্ছে এদেশের 'ঢাকা বইমেলা'। ওই মেলায় ভারতীয় বাংলা বইয়ের প্যাভেলিয়ন সাজাতে আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।

কাল ভোরে সল্ট লেকের করুণাময়ী থেকে আমরা তিনজন বাসে উঠি। সুধাংশু, আমি আর আমাদের বন্ধু সুনীল—সুনীল আচার্য। বর্ডারে দু-দিকের চেকপোস্টেই বাস আগাপাস্তলা চেকিং এবং মাঝরাস্তাতেও বেশ কয়েকবার চেকিং হয়। ফলে যেখানে দুপুর পেরিয়ে বিকেলের মধ্যে গোয়ালন্দ ঘাটে বাসের পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেখানে বাস এসে পৌঁছয় সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ।

—এক মিনিট। বারবার চেকিং হল কেন?

রঞ্জনবাবু বললেন,—হ্যাঁ, সুনীল এই প্রশ্ন করেছিল। বাংলাদেশ কাস্টমস অফিসারদেরও জিগ্যেস করেছিল। তাদের কথা, ডেফিনিট ইনফর্মেশান ছিল, চোরাই মাল বে-আইনিভাবে যাচ্ছে।

—কিছু ধরা পড়ল না?

—বলতে পারব না। তবে পেট্রাপোল বর্ডারে ভারতীয় কাস্টমস অফিসারদের সঙ্গে কয়েকজন বাংলাদেশি মানুষকে গুজগুজ করতে দেখেছি। আরও দেখেছি—

জগুমামা জিজ্ঞাসু-চোখে তাকালেন।

—দুজন পিছনের সিটের প্যাসেঞ্জার পেট্রাপোল বর্ডার আসার আগেই নেমে গেল। আবার বেনাপোল বর্ডার পেরিয়ে বাস যখন যশোরের মাগুরার কাছে এসে পড়েছে, সেখানে হাত দেখিয়ে বাস থামিয়ে উঠে পড়ল। বুঝলাম, বাসের ড্রাইভার, লিয়াজ অফিসারের সঙ্গে এদের অন্যরকম ঘনিষ্ঠতা আছে। আমরা এসব নিয়ে কোনও মন্তব্য করিনি। তবে সুনীল চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বেশ বলছিল। দু-একবার সুধাংশু ইশারায় ওকে বারণ করেছিল, কান দেয়নি।

—তারপর?

—হ্যাঁ। তারপর গোয়ালন্দ ঘাটে এসে আমাদের বাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল বেশ কিছুক্ষণ। ওদিকের বার্জ এসে ঘাটে ভিড়েছে। পরপর গাড়ি নামছে। আমরা তখন নেমে দাঁড়িয়েছিলাম। পাশের চায়ের দোকান থেকে চা-বিস্কুট খেলাম। বসে-বসে কোমর ধরে গেছিল।

ঘাট খালি হয়ে গেল। আমাদের বাস উঠে গেল বার্জে। তিনতলা বিশাল স্টিমার। পদ্মার বুকে স্টিমার ছেড়ে দিল।

আমাদের মধ্যে সুনীলের এর আগে বাসে বাংলাদেশ আসার অভিজ্ঞতা আছে। বলল,—চল, ওপরের রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে আসি। কত রাতে ঢাকা পৌঁছব, কে জানে!

স্টিমারের রেলিং-এর পাশে ছোট বাজার বসে গেছে। পাঙাশ মাছ, কলা, বাদাম, মুড়ি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা তিনজনে দোতলায় জানলার ধারে সিটে বসলাম। সুধাংশু বলল,—শুনেছি এখানে দারুণ ইলিশ মাছ-ভাত পাওয়া যায়।

তাই অর্ডার দেওয়া হল। তারপর চা। রেস্টুরেন্টের কোণের দিকে হাতমুখ ধোওয়ার বেসিন। ফাঁকা জায়গা। হু-হু হাওয়া। সুধাংশু, আমি গেলাম। সুনীল তখনও চা-সিগারেট খাচ্ছিল।

ফিরে এসে দেখি, সুনীল নেই!

তন্নতন্ন করে হলঘরটা খুঁজলাম। কোথাও সুনীল নেই। আমি বললাম,—দ্যাখো, গেলাসের জলে হাত ধুয়ে হয়তো নেমে গেছে।

দুজনে নেমে এলাম। বাসে নেই। তারপরে স্টিমারটার এপ্রান্ত, ওপ্রান্ত চষে ফেললাম। কোথাও সুনীল নেই। কর্পূরের মতো উবে গেছে। আবার উঠলাম ওপরে। রেস্টুরেন্টে খুঁজলাম। তারপর লোহার সিঁড়ি বেয়ে তেতলায়। ওঠার পথে কয়েকটা খুপরি, ভেতরে লোকজন আছে। কোথাও নেই। তিনতলা ফাঁকা, অন্ধকার।

দু-তিনজন লোক বসে ছিল ছায়ামূর্তি হয়ে। একদম সামনে সারেঙের ঘেরা জায়গা। সেখান থেকে সার্চলাইটের তীব্র ফোকাস পদ্মায় পড়ছে। 'সুনীল সুনীল' করে ডাক দিলাম। কোনও সাড়া পেলাম না।

তখন আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। ডেকের ধারে রেলিং-এর কাছে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। সুনীল অন্ধকারে পা হড়কে—

নাহ, ভাবতে পারছি না!

আমায় একা নামতে দেখে সুধাংশু হাউমাউ করে উঠল,—কী হবে রঞ্জনদা? সুনীলদা কোথায় গেল?

কী হবে? কী করব?

হঠাৎ সুধাংশু চেঁচিয়ে উঠল,—ওই যে! ওই তো সুনীলদা!

হ্যাঁ, সুনীল! কিন্তু ওকে এরকম লাগছে কেন? কেমন বিধ্বস্ত, ক্লান্ত! সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে নামছে।

—ও সুনীলদা! কোথায় গেছিলে? আমরা এদিকে খুঁজে মরছি।

সুনীল সুধাংশুকে জবাব দিল না। বাসে উঠে পড়ল। আমরাও ওর পিছন-পিছন উঠলাম।

এরপর ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। আশ্চর্যের ব্যাপার, এর মধ্যে সুনীল একবারও বাসের বাইরে যায়নি। এমনকী এ.সি-র বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেটও খায়নি। ঠিক পিছনে জানালার ধারে ওর সিট ছিল। একনাগাড়ে ঘুমিয়েছে।

—আপনারা ডাকেননি?

—হ্যাঁ। ও ইশারায় হাত নেড়ে আবার চোখ বুজে ফেলেছে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, কোনও কারণে ওর শরীর খারাপ হয়েছে।

—তারপর?

শেষপর্যন্ত সোয়া নটা নাগাদ আমাদের বাস এসে ঢুকল ঢাকা বাস টার্মিনাসে। আমরা দুজন যখন নামছি, সুনীল তখনও ঘুমোচ্ছে। সুধাংশু বারদুয়েক ঠেলা দিয়ে বলেছে,—তুমি এখানে থাকো। আমরা সব ব্যবস্থা করে আসছি। লাগেজ নামিয়ে, পাসপোর্ট দেখিয়ে সব ছাড় করিয়ে ফের সুধাংশু বাসে উঠল। তারপরেই পাগলের মতো লাফাতে-লাফাতে নেমে এল। 'সুনীলদা বাসে নেই'!

বললাম,—কী বলছ তুমি?

যান, দেখে আসুন!—সুধাংশু কথা বলতে পারছে না।

আমরা দুজন গোটা বাস টার্মিনাসে সর্বত্র খুঁজলাম। একজন দাঁড়িয়ে রইলাম গেটে। নাহ, সুনীল ফের অদৃশ্য।

দুজনে গেলাম টার্মিনাসের অফিসে। দায়িত্বে যিনি, অমায়িক ভদ্রলোক। আমাদের পরিচয় পেয়ে খাতিরযত্ন করে বসালেন, চা খাওয়ালেন। তারপর প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করলেন, গেটের সিকিওরিটিকে ডেকে আনলেন।

সুনীলের সিট নাম্বার ছিল পাঁচ। দেখা গেল, পাঁচ নম্বর সিটের মালিক অনেক আগে টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে গেছে!

২

জগুমামা সিগারেটের শেষটুকু অ্যাশট্রেতে গুঁজলেন। বললেন,—তারপর? আপনারা বেরিয়ে চলে এলেন? সুনীলবাবুকে আর খোঁজেননি?

খুঁজিনি আবার?—সুধাংশুবাবু বলে উঠলেন,—মালপত্র নিয়ে টার্মিনাসের বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার প্রত্যেকটা অটো-ট্যাক্সিতে খুঁজেছি। অবশ্য জানতাম, পাব না।

—জানতেন, পাবেন না! কী করে জানতেন?

সুধাংশুবাবু একটু থমকে গেলেন। তারপর বললেন,—এটা তো জলের মতো পরিষ্কার। পদ্মা পেরোনোর সময়ে যে সুনীলদা হারিয়ে গেছিল, ফিরে আসার পরে সে হাবেভাবে পুরো অন্য লোক। আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছিল... মাল নামানোর পর এসে যখন তাকে পেলাম না, শুনলাম সে বেরিয়ে গেছে—তখন কী বুঝব বলুন? নিজের ইচ্ছেতেই চলে গেছে!

—কিন্তু কেন? এ ব্যাপারে আপনাদের কী ধারণা?

—কোনও ধারণা নেই। আমাদের কাছে গোটা ব্যাপারটা অলৌকিক মনে হচ্ছে। সুনীলদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজকের নয়। সে এমনটা করবে কেন? আমাদের ছেড়ে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাবেই বা কোথায়?

জগুমামা মাথা ওপর-নীচ করলেন। বললেন,—কয়েকটা ব্যাপার জানার আছে। টুকলু, নোট করে নে।

—একনম্বর প্রশ্ন, আপনারা কি গ্রুপ বিজনেস ভিসায় এসেছেন? বইমেলার টিম হিসেবে?

রঞ্জন সরকার বললেন,—না। প্রত্যেকের পাসপোর্টে আলাদা-আলাদা ভিসা হয়েছে। পনেরো দিনের ট্যুরিস্ট ভিসা।

—ওকে। তার মানে বাংলাদেশে ঢোকার পনেরো দিনের মধ্যে চেকপোস্টে সুনীলবাবু ভিসা এনডোর্স করিয়ে ইমিগ্রেশন নিয়ে ভারতে ব্যাক করতে পারেন।

দুজন ঘাড় নাড়লেন।

—দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনাদের ফেরার টিকিট কি একই বাসে? ওপন টিকিট, না তারিখ দেওয়া আছে?

—একই বাসে। তবে ওপন টিকিট।

—তাহলে কোনও জায়গায় আটকানোর ব্যাপার নেই! তৃতীয় প্রশ্ন, গোয়ালন্দে যে বার্জে আপনাদের বাস উঠেছিল, সেই স্টিমারটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন?

পারব। সুধাংশু চেঁচিয়ে উঠলেন,—একটা নাম ছিল। 'শাজাহান'। আমি দেখেছি।

—গুড। কলকাতা থেকে প্রতিদিন দুটো বাস ছাড়ে। দুটোই একরকম দেখতে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—কোন বাসটায় উঠেছিলেন, দেখে চিনতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই। বাসের গায়ে ১,২ নম্বর দেওয়া আছে। আমাদের ১ নম্বর বাসের টিকিট ছিল। এই যে!

সুধাংশু পকেট থেকে টিকিট বের করে দিলেন। জগুমামা বললেন,—টিকিটটা আমার কাছে রাখলে আপনার আপত্তি আছে?

মোটেই না—বলেই সুধাংশুবাবু জগুমামার হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—মুখার্জিসায়েব, আপনি আমাদের সুনীলদাকে ফিরিয়ে দিন। ওকে না নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব না।

জগুমামা সান্ত্বনার সুরে বললেন,—শান্ত হোন সুধাংশুবাবু। আমি ম্যাজিশিয়ান নই। চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। সুনীলবাবু যে আপনাদের সঙ্গে ঢাকায় আসছিলেন, এটা কি এখানকার বই জগতের লোকজন জানেন?

রঞ্জনবাবু, সুধাংশুবাবু একটু ভাবলেন। মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। রঞ্জন বললেন,—জানে।... মানে অশোক, করিমবাবু, এখলাসভাই আর...

সুধাংশু বললেন,—আর পনিরসায়েব, আমিনুল...

বুঝেছি।—জগুমামা থামিয়ে দিয়ে বললেন,—অনেকেই জানে। এদের কাছে সত্যিটা আপাতত গোপন করে যেতে হবে আপনাদের। বলবেন, সুনীলবাবু আপনাদের সঙ্গে আসেননি। তবে যে-কোনওদিন চলে আসতে পারেন। আর আজকেই যত তাড়াতাড়ি পারেন, কলকাতায় আপনাদের অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিন, এখান থেকে কেউ ফোন করলে বলবে, আপনারা দুজন এসেছেন। তিনজন নয়। বুঝলেন?

রঞ্জনবাবু ঘাড় নাড়লেন।

এইসময় বেল বেজে উঠল। রুম সার্ভিসের লোক। বলল,—আপনাদের ঘরে রঞ্জন সরকার আর সুধাংশু দে আছেন?

—হ্যাঁ। কেন?

—গেস্ট আইসে। এই যে সায়েব, আসেন।

আমি দরজা ফাঁক করে দাঁড়ালাম। ছোটখাটো চেহারার টাকমাথা একজন মানুষ হাসিমুখে উঁকি মারলেন।

রঞ্জন সরকার বলে উঠলেন,—করিমভাই! আপনার কথাই ভাবছিলাম।

করিমভাই কপট ঝঙ্কার দিয়ে বললেন,—হ! বাজে কথা কোয়েন না! সেই কখন থেকে আপনাগো খুঁজতাছি, আর আপনারা নিজের ঘরে তালা দিয়া এইখানে দিব্যি বইসা আছেন।

—কী যে বলেন! পুরোনো কলকাতার পরিচয়, সকালে দেখা হয়ে গেল তাই একটু আড্ডা মারছিলুম। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি করিমসায়েব, এখানকার নামকরা বইয়ের দোকানের অল-ইন-ওয়ান। আর ইনি ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি, আর ওনার ভাগ্নে অর্ণব। ওঁরা বেড়াতে এসেছেন।

—আদাব! তা রঞ্জনবাবু, আপনাগো আরেকজনা কই?

—সুনীলের কথা বলছেন? হঠাৎ বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছিল। পরে আসছে।... চলুন করিমভাই, আমাদের ঘরে গিয়ে বসি।...ডক্টর মুখার্জি, পরে কথা হবে।

করিমসায়েবকে নিয়ে দুজন এগোলেন। রঞ্জনবাবুর উপস্থিতবুদ্ধি তারিফ করার মতো।

আধমিনিটের মধ্যে রঞ্জনবাবু ফিরে এলেন। বললেন,—সুধাংশুর সঙ্গে বসিয়ে এসেছি। ডক্টর মুখার্জি, এবার বলুন কী করব?

এখন কিছুই করার নেই। —জগুমামা বললেন,—এখানকার বইমেলার স্টলের ব্যাপারে যা-যা করার করুন। তবে যতটা সম্ভব কম ঘোরাঘুরি করবেন। চেষ্টা করুন, ফোনে-ফোনে লোকাল বন্ধুদের দিয়ে বইমেলার কাজগুলো করে ফেলতে। একটু পরে আমরা বেরোচ্ছি। ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে যাব। ওদেরকে বিষয়টা জানাতে হবে। কেমন?

রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। জগুমামা ব্রিফকেস খুলে টেলিফোন ইনডেক্স বের করে ওলটাচ্ছেন। বললেন,—টুকলু, রিসেপশনে বল, দিল্লির এই নাম্বারটা ধরে দিতে।

*

আসুন, আসুন। —দুহাত জড়ো করে যে ভদ্রলোক আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁকে দেখে আমার পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ড. নুরুল হাসানের কথা মনে পড়ে গেল। পাহাড়ের মতো শরীর, মাথায় দু-চারগাছি চুল। ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ড. মানব ত্রিপাঠী।

ত্রিপাঠী বললেন,—এইমাত্র সত্য ফোন করেছিল। আরে মশাই, আপনি তো ফেমাস লোক। আমাদের গর্ব! একবারও জানাননি, আসছেন? সত্য বলল, ও-ও জানত না!

বুঝলাম ইতিমধ্যেই মামার বন্ধু সি.বি.আই-এর কর্তা সত্যসাধন পট্টনায়েক মামা সম্পর্কে সব ইনফর্মেশন দিয়ে দিয়েছেন।

জগুমামা বললেন,—এবারে কিন্তু সত্যি-সত্যি বেড়াতেই এসেছি আমরা। গভমেন্ট লেভেলে জানাজানি হলে ফ্রিলি ঘোরা যায় না। হাজারো প্রোটোকল। আপনি ডক্টর মেছবাউদ্দিন আমেদের নাম শুনেছেন?

—সিওর। এদেশের ভেরি রেসপেকটেবল সায়েন্টিস্ট।

—আমেদ আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড। অনেকদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছিল। প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

—আই সি! বলুন, কী সমস্যা হয়েছে।

পিছনে দরজা খোলার শব্দ এবং উর্দিপরা একজন আর্দালির প্রবেশ। ট্রেতে তিন কাপ কফি, কাজুর প্লেট।

জগুমামা বললেন,—সমস্যা ঠিক আমাদের নয়। আমাদের বন্ধুরা কলকাতা থেকে এসেছেন। নামকরা প্রকাশক, বইমেলার সব কর্তা। ঢাকা বইমেলায় যোগ দিতে তিনজন বাই রোড সরকারি বাসে আসছিলেন। একজন মিসিং!

—ওয়াট? হাউ ডিড ইট হ্যাপেন?

জগুমামা ধীরে-ধীরে রঞ্জন সরকারের জবানিতে বলে গেলেন।

সব শুনে প্রায় মিনিটখানেক নিশ্চুপ হয়ে গেলেন ত্রিপাঠী। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে অস্ফুটে বললেন, —স্ট্রেঞ্জ! এরকম কোনওদিন শুনিনি। অবশ্য আমার কানে এসেছিল, এই বাসগুলো স্মাগলারদের ডেন, তবে প্যাসেঞ্জারদের সমস্যার কথা কখনও শুনিনি।

জগুমামা বললেন,—হয়তো সুনীলবাবু এমন কিছু দেখে ফেলেছিলেন, যেটা ওদের পক্ষে মারাত্মক।

—হতে পারে। এখন কিছু ভেবেছেন?

—সেভাবে কিছু ভাবিনি। আপনার অ্যাডভাইস নিতে এসেছি। এদেশের গোয়েন্দা পুলিশকে ইনভলভ না করতে পারলে কিছুই করা যাবে না। আর সেটা করতে আপনিই পারেন। ব্যাপারটা টপমোস্ট কনফিডেন্সিয়াল রাখতে হবে। নইলে সুনীলবাবুর জীবন নিয়ে টানাটানি হতে পারে। তবে একটা খটকা—

—কী?

—গোয়ালন্দের স্টিমারে প্রথমবার হারিয়ে যাওয়ার পরে উনি যখন ফিরে এলেন, তারপর থেকেই, সুনীলবাবুর বিহেভিয়ার ডিফারেন্ট হয়ে গেছিল। উনি হঠাৎ এই দুজনকে অ্যাভয়েড করতে শুরু করে ছিলেন। কথা বললে উত্তর দেন না। ইভন, শুনলাম, হি ইজ আ রেগুলার স্মোকার। মানিকগঞ্জ টু ঢাকা

অ্যানাদার টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার জার্নি। এর মধ্যে একবারও সুনীলবাবু এ.সি-র বাইরে বেরিয়ে সিগারেট খাননি। হাও ইস ইট পসিবল? মোর ওভার, ঢাকায় এসে এই দুজন যখন লাগেজ নামাতে নামেন, তখন উনি বাসে ছিলেন। ফিরে দেখেন, সুনীলবাবু বাসে নেই। পরে দেখেন উনি গেটপাস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। এ থেকে দুরকম ধারণা করা যেতে পারে।

—কীরকম?

—একটা হতে পারে, সুনীলবাবু এই স্মাগলারদের সঙ্গে গোপনে জড়িত। উনি নিজের ইচ্ছেতে সরে পড়েছেন। সময়-সুযোগমতো ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবেন।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছি,—অসম্ভব! সুনীলবাবু বইমেলার সঙ্গে যুক্ত, বিশিষ্ট মানুষ। পেশায় অধ্যাপক।

জগুমামা সামান্য হাসলেন,—তোকে আগেও বলেছি, কোনও রহস্য সলভ করতে বসলে বায়াস হবি না। মনে রাখবি, প্রদীপের নীচেই সবচেয়ে অন্ধকার। দেখিসনি বড়-বড় বিজ্ঞানীদের কীর্তি? যাকগে, এবার দ্বিতীয় ধারণাটা শুনুন।

—বলুন।

—পদ্মায় লোকটা পালটে গেছিল! অর্থাৎ যে সুনীল, সুধাংশুবাবু, রঞ্জনবাবুর সঙ্গে স্টিমারের ক্যান্টিনে খেতে উঠেছিল, সে আর কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা লোকটা দুজন আলাদা মানুষ। আসল সুনীলবাবুকে ক্রিমিন্যালরা গুম করে রেখে নকল সুনীলবাবুকে নীচে পাঠিয়ে দেয়।

—ধ্যুৎ! ইমপসিবল। সাত তাড়াতাড়ি সুনীলবাবুর মতো দেখতে একজনকে কোথায় পাবে? তা ছাড়া রঞ্জনবাবু সুধাংশুবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা?

জগুমামা হেসে বললেন,—আবার তুই বায়াস হয়ে যাচ্ছিস টুকলু। পরিবেশটা ভেবে দ্যাখ। মনে রাখতে হবে স্টিমারের টিমটিমে আলো, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাসেও অন্ধকার। একটা ব্যাপার ভুল হয়ে গেছে। সুনীল আচার্যকে কেমন দেখতে? তুই কি দেখেছিস তাকে?

—নাহ। রঞ্জনবাবুদের বলে তার একটা ফোটো...ওদের কাছে কি থাকবে? নইলে ভারত থেকে—

আমার কথা শেষ হল না। দড়াম করে খুলে গেল ত্রিপাঠীজির চেম্বারের দরজা। আর্দালির সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে ঘরে ঢুকে এলেন রঞ্জন।

হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি বলে উঠলেন,—ডক্টর মুখার্জি। শিগগির চলুন! সুধাংশু ইনজিওরড।

উঠে দাঁড়িয়েছি। জগুমামা বললেন,—কোথায়?

—এখন হোটেলের ঘরে।

—উনি কি একা?

—না। এখলাসভাই, অশোক আছে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। বোধহয় এতক্ষণে এসেও গেছেন। আমি ওদের বসিয়েই ছুটে এসেছি।

—দাঁড়ান। দাঁড়ান। এখনই যাচ্ছি। কী হয়েছিল?

—দোষটা সুধাংশুর। আপনারা বেরিয়ে আসার পরে ফোন করে আপনার কথামতো লোকাল বন্ধুদের ডাকি। করিমভাইয়ের পর অশোক, এখলাসভাই সবাই আমাদের রুমে আসে। কথা চলতে-চলতে করিমভাই উঠে পড়েন। ওনার দোকান খুলতে হবে। সুধাংশু ওঁকে এগিয়ে দিতে নীচে নামে। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রিসেপশনে ফিরে দেখে, একজন স্থানীয় লোক আমাদের নাম জিগ্যেস করছে। সুধাংশু নিজের পরিচয় দিতে সে একখানা মুখবন্ধ সাদা খাম ওর হাতে তুলে দেয়।

সুধাংশু জিগ্যেস করে, 'কার চিঠি?' লোকটি বলে, 'খুলেই দেখুন না'। চলে যাচ্ছিল। সুধাংশু তার হাত ধরে বলে, 'কী হল? চলে যাচ্ছেন কেন?'

লোকটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সুধাংশুকে দমাদ্দম ঘুষি মারতে শুরু করে। এমন জোরে লাথি কষায়, যে সুধাংশু চিৎ হয়ে পড়ে যায়। হোটেলের দু-একজন লোকও এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাদের ধাক্কা মেরে লোকটা নিমেষে হাওয়া হয়ে যায়। বাইরে নাকি গাড়ি দাঁড় করানো ছিল।

জগুমামা চুপ করে গেলেন। বেশ কয়েকমুহূর্ত পরে বললেন,—চিঠিটা কোথায়?

—হোটেলেই আছে।

—কার চিঠি?

—সুনীলের। হ্যাঁ, ওরই হাতের লেখা।

৩

একে কি আদৌ চিঠি বলা যায়? একটুকরো কাগজে ঠিক তিনটে শব্দ।

'আমি ভালো আছি।'

প্রেরকের নাম নেই! এটাই দিয়ে গেছে সেই লোকটা, যার মারের চোটে সুধাংশুবাবু আমাদের সামনে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। চিবুকে কপালে গলায় কালশিটে। তাঁর বিছানার পাশে সম্ভবত ওঁদের লোকাল দুই বন্ধু। ওঁদের একজন কাপড়ে জড়িয়ে বরফ ঘষছেন সুধাংশুবাবুর মুখে, গলায়।

স্থানীয় ডাক্তার এসেছিলেন। চেক আপ করে গেছেন। কোনও ভাইটাল ইনজুরি হয়নি। ব্যথার ট্যাবলেট দিয়ে গেছেন।

টুকরো কাগজটা বারকয়েক উলটে-পালটে দেখলেন জগুমামা। চশমা তুলে একেবারে চোখের কাছে নিয়ে কী দেখলেন। তারপর বললেন,—খাম ছিল না?

—হ্যাঁ। এই যে।

ছোট সাদা খাম। খামের ওপর পরপর দুটো নাম লেখা। রঞ্জন সরকার, সুধাংশু দে।

জগুমামা বললেন,—এই লেখাটা অন্য লোকের।

—হ্যাঁ, দেখেছি। কিডন্যাপারদের কেউ লিখেছে।

হুঁ।—জগুমামা টুকরো কাগজটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে সবসুদ্ধু বুকপকেটে রাখলেন। বললেন,—এটা আমার কাছেই থাক, কেমন? রঞ্জনবাবু, আপনাদের সুটকেস চটপট গুছিয়ে নিন। আমার সঙ্গে হাইকমিশনারের কথা হয়ে গেছে। আজকেই সবাই শিফট করব।

—কোথায়?

—ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের গেস্ট হাউসে। এখানে থাকা যাবে না।

—কিন্তু...সবাইকে যে রমনা হোটেলের ঠিকানা ফোন নম্বর দেওয়া আছে। আমরা কলকাতা থেকে বুকিং করে এসেছি। তাছাড়া ঢাকা বইমেলা অ্যাটেন্ড করতে কলকাতা থেকে আরও কয়েকজন বন্ধু আসছেন। দু-একদিনের মধ্যে।

—সে আসুক। তাঁরা এখানে থাকুন। মনে রাখবেন, আপনারা এখন টার্গেট হয়ে গেছেন। এখানে বরং বলে যাচ্ছি, কেউ খোঁজ করলে হাইকমিশনারের ঠিকানা দিয়ে দেবেন।

রঞ্জন সরকার কম কথার মানুষ। দুজনেরই জামাকাপড় গোছাতে শুরু করলেন। সুধাংশুবাবু ওই অবস্থাতেও উঠতে যাচ্ছিলেন, থামিয়ে দিলেন।

আমরাও গুছিয়ে নিই।—কয়েকপা এগিয়ে জগুমামা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বললেন,—আপনারা সিওর, টুকরো চিঠিটা সুনীলবাবুর লেখা?

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট। সুনীলের হাতের লেখা আমি চিনি।

—আমি যদি বলি, না?

—মানে?

মানে?—জগুমামা একটু থামলেন। তারপর যেটা বললেন, সেটা বোমার মতো ফাটল।

—ওই কাগজের টুকরোটা কোনও চিঠি নয়। একটা জেরক্স।

মুহূর্তে সবাই বোবা।

সামলে উঠতে প্রায় মিনিটখানেক লাগল। তারপর রঞ্জন সরকার বললেন,—একটু দেখি।

টুকরো কাগজটা দেখতে-দেখতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

—আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না ডক্টর মুখার্জি।

বুঝতে তো আমিও পারছি না রঞ্জনবাবু। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। —জগুমামার গলা হঠাৎ পালটে গেল। কাটা-কাটাভাবে বললেন,—কয়েকটা কথা সোজাসুজি জিগ্যেস করছি। সত্যি বলবেন। সুনীলবাবু আপনাদের সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত এসেছিলেন?

—হ্যাঁ। তবে স্টিমারে প্রথমবার হারিয়ে যাবার পর—

মামা থামিয়ে দিলেন,—মনে আছে। আপনারা কলকাতা থেকে একসঙ্গে বাসে উঠেছিলেন?

—না। ও বেলেঘাটায় থাকে। আমি আর সুধাংশু বাড়ি থেকে টার্মিনাস পর্যন্ত একসঙ্গে এসে একই সময়ে বাসে উঠে বসি। সুনীল একটু পরে।

—পাশাপাশি বসেছিলেন?

—ঠিক পাশাপাশি নয়। আমাদের সিট নম্বর ১, ২—ওর ৫। কোনাকুনি পিছনের সিট।

—বর্ডারে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে আপনারা একসঙ্গে পাসপোর্ট এনডোর্স করিয়েছিলেন? হরিদেবপুর বা বেনাপোলে?

রঞ্জন সরকার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,—না। হরিদেবপুরে ও সিগারেট মুখে বাথরুমে গেল। বেনাপোলে আমরা ডাকলাম। ও তখন বাসের লিয়াজ অফিসারের সঙ্গে আড্ডা মারছিল। আমাদের বলল, করিয়ে নিতে।

—এবার লাস্ট কোয়েশ্চেন।—সুনীলবাবুর কি আপনাদের সঙ্গেই আসার কথা ছিল?

রঞ্জনবাবু কেমন হকচকিয়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন,—হ্যাঁ—ইয়ে, ঠিক—

—ঠিকঠাক বলুন।

—ব-বলছি। ঘটনাটা হল এই, সুনীল বলেছিল, দু-একদিনের মধ্যে নিজের কাজে ঢাকা আসছে। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। বইমেলার টিমে ওর নাম ছিল না। হঠাৎ পরশু সন্ধেবেলা আমায় ফোনে জানাল, আমাদের সঙ্গেই ও আসছে। টিকিট হয়ে গেছে। একই বাসে। শুনে খুব আনন্দ হল। সেদিন রাতে যারা ঢাকা থেকে ফোন করেছিল, সবাইকেই সুনীলের কথা বলি। সুনীল এর আগে কয়েকবার ঢাকা এসেছে।

বুঝলাম। এ কথাগুলো আপনারা কিন্তু আগে বলেননি।—জগুমামা কেটে-কেটে বললেন,—একটা কথা মনে রাখবেন রঞ্জনবাবু। সাপ্রেশন অব ফ্যাক্ট ইজ অলসো আ ক্রাইম। তাতে লাভ হয় না, আলটিমেটলি ক্ষতি

হয়।

রঞ্জন সরকার মামার তীব্রদৃষ্টির সামনে কেমন কুঁকড়ে গেলেন। আস্তে-আস্তে চোখ নামিয়ে নিলেন।

বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলো কম করে ২৪ পৃষ্ঠার। খুদে-খুদে হরফে অজস্র সংবাদ। খবর সাজানোর কায়দাও অদ্ভুত। শেষ পৃষ্ঠার খবরের শেষ অংশ মাঝের পৃষ্ঠায় চলে এসেছে। তাছাড়া টাইপ, লে-আউট এমন জবরজং, পড়তে বেশ অসুবিধে।

সেদিনের জনকণ্ঠ কাগজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। সারা দিন কাগজ দেখার ফুরসত হয়নি। একটু পরে রাতের খাওয়া সারতে যাব।

আশ্চর্য ব্যাপার, কোথাও ঢাকা বইমেলার কোনও খবর নেই। আমাদের কলকাতায় বইমেলা শুরুর মাসখানেক আগে থেকে কাগজে-টিভিতে বাজনা বাজতে শুরু করে। অনেকটা পুজোর মতো। এখানে কি লোকের বইমেলায় আগ্রহ নেই?

তবে যে রঞ্জনবাবু বললেন, পশ্চিমবঙ্গের নামকরা লেখকদের বই বাংলাদেশেই প্রচুর বিক্রি হয়। তবে এখন রপ্তানি কমে গেছে, এখানকার প্রকাশকরা নাকি হুবহু বইগুলো ছেপে দেয়।

ওলটাতে-ওলটাতে চোখ আটকে গেল একটা ছোট্ট খবরে। কক্সবাজার থেকে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কিছুদূরে অকস্মাৎ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রের পাড়ের বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রায় ২৫ জন মৎস্যজীবী প্রাণ হারিয়েছেন।

—মামা, তোমার বন্ধু তো কক্সবাজারে বাড়ি করেছেন?

কোনও উত্তর নেই। মামা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

এর অর্থ জগুমামা ডুবে আছেন গভীর চিন্তায়। মনে-মনে কিছু অঙ্ক কষছেন। এখন জবাব মিলবে না।

এই সময় আমাদের ঘরের বেল বেজে উঠল।

পরিচিত মুখ, বিকেলে রঞ্জনবাবুদের ঘরে দেখেছি।

—সুধাংশুবাবুদের খুঁজছেন?

—জি। সুধাংশুবাবু ভালো আসেন?

—হ্যাঁ। পাশের ঘরে।

পাশের ঘরের বেল বেজে উঠল।

আজ বিকেলেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুর্ঘটনা যখন ঘটে, তখন উনি সুধাংশুবাবুদের ঘরে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বই আমদানি করেন। নাম আবু তোয়েব।

জগুমামারও বোধহয় চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেছিল। তাই নিজে থেকেই বললেন, —কে যে সত্যি বলছে, কে যে মিথ্যে বলছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মিথ্যে বলছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলছে? কী ইন্টারেস্ট?

—মিথ্যে বলছে, তুমি সিওর?

—হ্যাঁ। আধঘণ্টা আগে একটা ফোন এসেছিল। হাইকমিশনার ত্রিপাঠী নিজে করেছিলেন। উনি চেকপোস্টের ইমিগ্রেশান থেকে কালকের ইনকামিং ফরেনার লিস্ট আনিয়েছেন। তার সঙ্গে কলকাতা-ঢাকা বাসের প্যাসেঞ্জার লিস্টও। কোথাও সুনীল আচার্যের নাম নেই।

—সে কী!

—হ্যাঁ। পাসপোর্ট-ভিসা এনডোর্স করিয়ে আসতে হয়। অন্যের নামে চলে আসবে, এ তো হয় না। ছবি থাকে, ঠিকানা থাকে।

—তাহলে?

—তাহলে সুধাংশু দে এবং রঞ্জন সরকার সত্যি বলছে না। আমার কাছে কিছু গোপন করে যাচ্ছে। কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে কেন? নিজেরাই এসে আমাদের ধরল! আমাদের বেড়ানোর বারোটা বাজাল। কেন, কেন, কেন? 'কেন'র ঠ্যালায় পাগল হয়ে যাব, নাকি রে!

জগুমামা ঠিকই বলছেন। এরকম অদ্ভুত রহস্যের ধাঁধায় পড়িনি। আসার পথে একজন হারিয়ে গেলেন। তাকে জীবনে দেখিনি। তার বন্ধুরা এসে আমাদের ধরলেন। তার হাতে লেখা চিঠি বা জেরক্স এল। সুধাংশুবাবু মারও খেলেন বাহককে ধরতে গিয়ে। এগুলো সব বাস্তব। তাহলে?

—মামা, ওই বার্জটার খোঁজ নেওয়া হয়েছে? পদ্মায় বাস যার ওপর চেপেছিল?

—রাইট! শাজাহান। এখনই জানছি।

জগুমামা ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। তার আগে ফোনটা নিজেই বেজে উঠল।

—হ্যালো, হ্যাঁ বলছি। দিন।...সালাম। কে বলছেন? হ্যাঁ-হ্যাঁ বলুন।...আমরা গতকাল এসেছি।...কী! কী বলছেন? কবে থেকে?...এতদিন কী করছিলেন?...আজ পেয়েছেন? কী লিখেছেন?... আমরা কালই যাচ্ছি।...হ্যাঁ হ্যাঁ...আর একটা কথা, পুলিশ-সিকিওরিটি?...আচ্ছা...ব্যাপারটা গোপন তো?...আচ্ছা...।

আমি লক্ষ করছি, জগুমামার দৃষ্টি, মুখের রং ঘন-ঘন পালটাচ্ছে।

মামা রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। বাঁহাত কপালে ঘষছেন, চোখ আধবোঁজা। আবার রিসিভার তুললেন,—হ্যালো। হ্যাঁ। একটু ত্রিপাঠী সাহেবকে দেবেন?...হ্যালো। সরি, রাতে বিরক্ত করলাম।... আপনি কি ডক্টর

আমেদকে ফোন করেছিলেন?...শুনুন, এইমাত্র আমেদের ভাই কামালুদ্দিন ফোন করেছিল। চট্টগ্রাম থেকে। আমেদ প্রায় একসপ্তা নিখোঁজ। ওরা এতদিন গুরুত্ব দেয়নি। কারণ এর আগেও কাউকে না জানিয়ে আমেদ হুটহাট এদিক-ওদিক চলে গেছেন। একা মানুষ। এবারেও ওরা তাই ভেবেছিল। কিন্তু আজই একটা চিঠি এসেছে। আমেদের হাতের লেখা। তাতে লিখেছে, সে ঠিক আছে। তার খোঁজ করার চেষ্টা না করতে। তাতে ওর জান...ঠিক বলেছেন। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সব গায়েব হয়ে যাচ্ছে।...শুনুন, কাল আমরা চট্টগ্রাম যাচ্ছি। আপনি একটু বলে দেবেন।...এরা থাকছে। হ্যাঁ, বলে যাব। আর একটা কথা, ওই বার্জটার খোঁজ নিয়েছিলেন? শাজাহান?...ওকে, পরে ফোনে জেনে নেব।...

৪

বন লাং! কথাটার মানে জানিস?

জগুমামা বললেন।

আমার দৃষ্টি ছিল বাইরের দিকে। মনও তাই। দুদিকে সবুজ, এত সবুজ। সবুজেও কতরকম শেড—গাঢ়, ঝলমলে, নরম। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট গ্রাম, হাটবাজার। তেলতেলে কালো ফিতের মতো হাইওয়ে চলে গেছে এঁকেবেঁকে। সৌদিয়া কোম্পানির ঝকঝকে বাস ছুটছে ঝড়ের গতিতে। রাস্তা মসৃণ। একটুও ঝাঁকুনি নেই।

মনে-মনে ভাবছিলাম, নদীনালা গাছপালায় ঘেরা আসল ব-দ্বীপ বাংলার এই পুব অংশটাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সে তুলনায় রুক্ষ। বাইরে তাকিয়ে থাকলেও আপনা থেকে মন জুড়িয়ে যায়। মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ।

আচমকা মামার কথায় বেশ থতমত খেয়ে গেছি।

—কী বললে? কী ল্যাং?

—বন লাং।

—বন লাং! কোন দেশের ভাষা? চিনে?

—এখানকার। এদেশের।

—কী হাবিজাবি বকছ? আমায় কি মুরগি পেয়েছ নাকি?

নারে।—জগুমামা হেসে বললেন,—বনলাং থেকেই কালে-কালে পালটে হয়েছে বঙ্গাল বা বাংলা কিংবা বঙ্গ। আজ থেকে আন্দাজ তিন হাজার বছর আগে—ধ্যুৎ! কথাই বলা যাচ্ছে না। যেমন গান, তেমনি

জগঝম্প বাজনা। উফ!

আমার অবশ্য কোনও গানই খারাপ লাগে না। তবে এত জোরে শুনলে মনে হয় এখনই মাথা ধরে যাবে। সবচেয়ে মজার কথা হল, যে গানগুলো একের পর এক বেজে চলেছে, একটাও বাংলাদেশের বাংলা গান নয়। ভারতের হালফিল সিনেমার হিন্দি গান।

বাস রওনা হওয়ার সময় মিনিট তিনেক আরবি ভাষায় বেজেছিল ইসলামি ধর্মসঙ্গীত। একবর্ণও তার মানে বুঝিনি। অনেকটা আজানের মতো সুর তারপর থেকে টানা হিন্দি সিনেমার গান।

জগুমামা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে কন্ডাকটরকে অনুরোধ করেছিলেন,রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতি চালাতে। সে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, তার কাছে কোনও বাংলা গানের ক্যাসেট নেই। সকলেই নাকি এই গান শুনতে চায়। তারপর হেসে বলেছিল,—আপনেরা ইন্ডিয়া থিকে আইছেন তো? হে তো আপনাগো দ্যাশেরই গান! আমাদের দ্যাশের লোকও পাগল। কয়, বাংলা প্যানপ্যানানি ভাল্লাগে না, হিন্দি গান অনেক সোন্দর।

জগুমামা চুপ করে গেছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলাভাষার রাষ্ট্রে যে এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে, ভাবতে পারেননি।

—টুকলু, একটু কষ্ট করে উঠবি? একটু বলে আসবি ভল্যুমটা কমিয়ে দিতে?

একটা সাউন্ড বক্স আমাদের সিটের ঠিক ওপরে। তিন সিটের জানলার ধারে আমি, শেষে অন্য এক ভদ্রলোক। মাঝখানে মামা।

কন্ডাক্টর অনুরোধটা রাখল। হিন্দি গানের ভলিউম কমে গেল।

—বাঁ-চা গেল!

—হ্যাঁ মামা, এবার বাকিটুকু বলো।

—দ্যাখ, এটা মোটেই আমার সাবজেক্ট নয়। তবে তুই জানিস, আমি যা পাই, পড়ি। বিশেষ করে 'আমরা কোত্থেকে এসেছি' এই কৌতূহল আমার ছোটবেলা থেকে। যেটুকু পড়েছি, তাতে মনে হয় বনলাং থেকে বাংলা বা বঙ্গ কথাটা এসেছে। এদেশের বাসিন্দাদের বলত বন বা বং। কালে-কালে বং থেকে হল বাঙালি।

—অ্যামেজিং! বংরা কি এদেশের লোক?

—ঠিক এদেশের নয়। তবে ভারতের লোক, দ্রাবিড়। তখন আর্যরা ঘোড়ায় চেপে দাপিয়ে ঢুকছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। তাদের তাড়া খেয়ে দ্রাবিড়দের একটা শাখা পালিয়ে আসে। এদেশে বাস করতে শুরু করে। এদেশে তখন ছিল কালোকুলো, বেটেখাটো অস্ট্রিক জনজাতির লোকজন। ওদের সঙ্গে মিশে গেল বং জাতি। আবার আরও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল মঙ্গোলীয় মগদের বাস। তাদের সঙ্গেও বংদের রক্ত মিশে গেল।

—দ্রাবিড়! মানে আমরা অনার্য?

—বেশিরভাগটা তাই। আর্য-অনার্য ভাগ পরে আর রইল না। আরও ভালো জায়গার খোঁজে আর্যরা ঢেউয়ের মতো এসে পড়ল এই পাণ্ডববর্জিত জলজঙ্গলের দেশেও। রবীন্দ্রনাথের ওই ভারততীর্থ পড়িসনি?...কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা...তাই ঘটল। আর্য-অনার্য-মঙ্গোলীয় সব রক্ত মিলেমিশে আমাদের বাঙালি জাতি। লক্ষ করলে দেখবি, বাঙালিদের মধ্যে লম্বা-বেঁটে, কালো-সাদা সবরকম মানুষ আছে। অনেককে আবার ঘষামাজা করলে দিব্যি চিনে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

—মঙ্গোলীয় রক্ত!

—রাইট। তবে বাঙালিদের মধ্যে এখনও অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়দের বৈশিষ্ট্যই বেশি। চেহারায়, স্বভাবে।

—হ্যাঁ মামা। বেশিরভাগ গ্রামের মানুষদের চেহারা বেঁটেখাটো, গোলগাল, শ্যামলা রং। স্বভাবেও তারা ঠান্ডা।

—ঠিক। শুধু চেহারা বা স্বভাব কেন, বাংলা ভাষাতেও অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার ছাপ রয়ে গেছে। কুকুরকে অনেক গ্রাম দেশে আদর করে ডাকে—ছু-ছু বা তু-তু। অস্ট্রিক ভাষায় কুকুরকে বলত ছুছু। আর্যভাষা সংস্কৃতে জলকে বলা হয় পানি। সারা উত্তর-মধ্য ভারতে পানি, শুধু বাংলা আর দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা জায়গায় জল বা জলম।

—না মামা। বাঙালিরা সবাই জল বলে না। বাঙালিদের মধ্যে হিন্দুরা বলে জল, মুসলমানেরা বলে পানি।

—ঠিক বলেছিস। এরও অদ্ভুত কারণ আছে। মোগল আমলে হিন্দুস্তানের বাদশা আকবর ফার্সির সঙ্গে হিন্দি মিশিয়ে এক নতুন ভাষা তৈরি করলেন। উর্দু ভাষা। হিন্দিতে পানি, উর্দুতেও পানি। বাংলা প্রদেশে যখন মোগলরা ঢুকে পড়লেন, সেসময় হিন্দুধর্মের অবস্থা খুব খারাপ। নিচুজাতের মানুষ উঁচুজাতের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। বাংলার পুব অংশে দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক জাতের মানুষ ছিলেন বেশি। তারাই বাইরে থেকে আসা আর্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের শিকার। তাঁদের বলা হত নিচুজাত, অস্পৃশ্য। রাগে দু:খে তাঁরা ইসলাম ধর্ম নিলেন। পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলমান তাই অনেক বেশি। উর্দুভাষী মৌলবিদের সংস্পর্শে এসে তাদের চলতি ভাষায় ঢুকে পড়ল নতুন-নতুন শব্দ। শুধু পানি কেন, নাস্তা, গোসল, ফৌজ, বাবুর্চি—এরকম সব শব্দ।

—সার, একটা কথা কমু?

পাশের ভদ্রলোকের কথায় মামা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। আমাদের তৃতীয় সিটের মালিক। ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরিষ্কার কামানো গাল, শ্যামলা রং, সাদামাটা চেহারা, চোখদুটো খুব সুন্দর। এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তবে নি:শব্দে আমাদের কথাবার্তা যে শুনছিলেন, সেটা বোঝা গেল।

—আপনি কলকাতার কুন কলেজে পড়ান সার? পেরসিডেন্সি?

—না-না। কোনও কলেজে পড়াই না। কেন বলুন তো?

—এমন চোমোৎকার বুঝাইলেন, তাই মনে হইল।

—ধন্যবাদ। আপনি কোথায় থাকেন? ঢাকা?

—জি। কক্সবাজার যামু।

ঠিক এইসময় বাস ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। কী ব্যাপার? সৌদিয়া চেয়ার-কারের তো যেখানে-সেখানে দাঁড়াবার কথা নয়। প্রথম স্টপ ফেনি, তারপর চট্টগ্রাম, তারপর কক্সবাজার।

ড্রাইভার, কন্ডাক্টর বাস থেকে নেমে গেল। সকলেই একে একে নামছেন।

বাসের সামনে অন্তত শ-খানেক ট্রাক, বাস, গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে গেছে। জায়গাটা পুরো গ্রাম। বনবাদাড়, ধানখেত। হাইওয়ে ধরে হাঁটছি। একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে এল।

গাড়ির লাইনের গোড়ার দিকে পৌঁছতে রহস্যভেদ হল।

বড়সড় একটা রাজনৈতিক মিছিল। প্রচুর লোক। সবার হাতে একটা করে প্ল্যাকার্ড। চিৎকার করতে-করতে তারা চলেছে,—শহিদ আনসারের খুনিকে ধরা হল না কেন, জবাব চাই! সরকার জবাব দাও। খুনের প্রতিবাদে আগামীকাল বারো ঘণ্টার বনধ সফল করেন, সফল করেন!...

সামনে একটা চৌমাথা। মিছিল এগিয়ে এসে বাঁ-দিকের রাস্তায় ঢুকে যাচ্ছে।

দুজন ভদ্রলোক পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—দ্যাশডা জাহান্নমে গেসে গিয়া। খুন-জখম-বনধ লাইগাই আছে। কামধান্দা সব শ্যাষ।

পিড়িং...পিড়িং...পিড়িং...

বুকপকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠেছে। বলতে ভুলে গেছি, আজ সকালে ঢাকা ছাড়ার আগে এই ফোনটা হাইকমিশনার ত্রিপাঠী সায়েব জগুমামাকে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন হাইকমিশনের কয়েকটা গোপন মোবাইল নম্বরও।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ আমাদের দেশের চেয়ে এগিয়ে। এই দুহাজার সালে মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামে। এদেশের চাষিদের কাছেও মোবাইল টেলিফোন। খরচ খুব কম।

ফোনটা অন করে জগুমামার হাতে তুলে দিলাম।

—হ্যালো, বলছি।...হ্যাঁ হ্যাঁ শাজাহান। কনসিলড রুম?...দুজনকে অ্যারেস্ট করেছেন?...আচ্ছা। ওকে।...আমরা এখন মিছিলে আটকে পড়েছি।...হ্যাঁ, পৌঁছে জানাব।

ফোন বন্ধ করে আমায় দিয়ে মামা নিচুগলায় বললেন,—ভালো খবর। পদ্মার বুকে যে বার্জটায় সুনীল আচার্য হারিয়ে গেছিলেন, সেই 'শাজাহান'-কে আজ সার্চ করা হয়েছে। একটা গোপন কুঠুরি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, নিষিদ্ধ জিনিসে ঠাসা। সারেংকে অ্যারেস্ট করে ঢাকায় আনা হয়েছে। মালিক হাওয়া। ইনটারোগেশন চলছে।...এ-এই! চল-চল! বাস ছেড়ে দিচ্ছে যে।

গাড়িগুলো স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। প্রায় ছুটতে-ছুটতে বাসে উঠে পড়লাম।

প্রথম চারটে রো ছেড়ে পাঁচে আমাদের সিট। আমি বসতে যাচ্ছি, কী ওটা? একখানা ভাঁজ করা সাদা কাগজ।

আমি কাগজের ভাঁজ খুললাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

সাদা কাগজে সুন্দর গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা :

'তোমরা ভুল করছ! এটা ইন্ডিয়া নয়! শুধু-শুধু সাপের গর্তে হাত ঢোকাচ্ছ। আল্লাও তোমাদের বাঁচাতে পারবেন না। ফিরে যাও।'

মামা ঝুঁকে বললেন,—কীরে, কী হয়েছে?

কাগজটা বাড়িয়ে দিলাম। মামারও মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। অস্ফুটে বললেন,—বুঝলাম। ওরা আমাদের ফলো করছে। বাসেই আছে।

বাস ছুটছে প্রচণ্ড গতিতে, কাচের ওদিকে সরে-সরে যাচ্ছে গ্রাম-গঞ্জ-খালবিল-নদী-মাঠ...

কোনও কথা নেই। একঘেয়ে হিন্দি গান বেজেই চলেছে...এখন আর কিছুই ভালো লাগছে না! ...সত্যিই তো, আমরা মাত্র দুজন...এটা ভারত নয়...মামার ফোন পেলে কেউ ছুটে আসবে না...

কখন ঝিমুনি এসে গেছিল, জানি না। কন্ডাকটরের চিৎকারে কেটে গেল,—ফেনি! ফেনি! দশ মিনিট। যারা চা-নাস্তা-বাথরুম করবেন, কইর‍্যা লন।

যাত্রীরা হুড়মুড় করে নামছেন। মামা বললেন,—টুকলু, চল একটু চা খেয়ে আসি। মাথা ধরে গেছে।

চা-খাবারের দোকান। দোকানিরা খদ্দের ডাকছে। সবচেয়ে কাছেরটায় ঢুকে পড়লাম।

চা-বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে মামা সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—হুমকির মানেটা বুঝলি?

—কী?

—আমরা ঠিকঠাক এগোচ্ছি। ক্রিমিন্যালরা ওয়্যারিড। আমাদের থামাতে চাইছে।

—বুঝলাম। কিন্তু মামা, আমরা এখন বিদেশে। যা কিছু করতে হবে, হাইকমিশন অফিস ছাড়া গতি নেই। কোনও হেল্প পাব না। তোমার নিজস্ব কোনও কানেকশন নেই।

জগুমামার মুখের রেখাগুলো একটু কঠিন হয়ে উঠল।

—তুই কী করতে বলিস? ফিরে যাব?

—আমি কিছুই বলছি না। বলছি, যা করো, ভেবেচিন্তে করো।

—টুকলু, তোর যদি আমার ওপর কনফিডেন্স থাকে, তবেই এগোব। নতুবা—দাঁড়া, একমিনিট আসছি।

বলতে-বলতে জগুমামা একজনের কাছে এগিয়ে গেলেন,—ভাইজান। টয়লেটটা কোথায়?

—অ্যাক্কেরে সিধা পিছনে চইলা যান। বামে রসুইঘর, ডাইনসাইডে ঘুইরা বামে ফিরলেই বাথরুম। চৌবাচ্চায় পানি আছে, ঢাইলা নিবেন।...

মামা গটগট করে পিছনে চলে গেলেন। আমি বিস্কুট ডুবিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছি।

ফেনি সুন্দর জায়গা। ছবির মতো ছোট্ট পাহাড়ি শহর। ছোট-ছোট পাহাড়, দূরে আকাশের গায়ে আবছা পাহাড়শ্রেণি। একটা নদী আছে। তার নাম ফেনি। এখান থেকেই শুরু হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা। চলে গেছে পুবে মায়ানমার পর্যন্ত। ফেনি নদীর ওপারেই ভারত, ত্রিপুরা রাজ্য।

কিছুদিন আগে কাগজে ফেনির কথা পড়েছিলাম। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী চাকমা উপজাতি। তারা আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে তারা স্বদেশে ফিরে আসে। সেই উপলক্ষে এখানে অনুষ্ঠান হয়েছিল, খুব হইচই হয়েছিল।

হঠাৎ খেয়াল হল, কী ব্যাপার? জগুমামা ফিরছেন না কেন?

দোকানের ভিতর দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটলাম। ডানদিকে ঘুরে বাঁদিকে মোড় নিলে একটা খোলা জায়গা। পরপর টিনের পার্টিশনের বাথরুম। বাইরে বদনা রাখা। ডানদিকে একটা চৌবাচ্চা।

—মামা! মামা!

কোনও জবাব নেই। বাথরুমগুলোর দরজায় টান মারছি, খুলে যাচ্ছে। কেউ নেই!

আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব! মামা কোনদিক দিয়ে বাইরে গেলেন?

বাথরুমগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে টিনের বেড়া। বেড়ার গায়ে একটা খোলা দরজা। সেই দরজা পেরিয়ে ডানদিকের কাঁচা রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

রাস্তাটা এসে উঠেছে পাকা সড়কে। একটু দূরে আমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে।

সড়কের ওপর উঠে হতবুদ্ধির মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। ইঞ্জিনের শব্দ! কোনও গাড়ি স্টার্ট দিল!

তাকিয়ে দেখি, একটু দূরেই হাইওয়ের পাশে গাছপালার আড়ালে একটা সাদা সুজুকি দাঁড়িয়ে আছে।

যান্ত্রিক গর্জন করে জিপসি উঠে পড়ল হাইওয়েতে। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে উঠল, মামা ওতেই আছেন। ওঁকে কিডন্যাপ করছে!

—মামা! মামা!

জিপসি হাইওয়েতে উঠেই প্রচণ্ড স্পিড নিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডে মিলিয়ে গেল।

ধপ করে বসে পড়লাম। আমার চোখের সামনে কালো পর্দা নেমে আসছে।

৫

জগুমামা আস্তে-আস্তে চোখ খুললেন। মাথা পাথরের মতো ভারী। গলা শুকিয়ে কাঠ।

প্রথমেই চোখ গেল ঘরের ছাদে। কাঠের বরগার ওপর টিনের চাল। ডানদিকে একটাই জানলা। সেখান দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আলো ঢুকছে।

এটা কোন জায়গা? এখানে এলেন কী করে?

ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন। উহ! নিম্নাঙ্গ ঝিনঝিন করে উঠল। বাঁ-পা শিকল দিয়ে বাঁধা।

এতক্ষণে সব মনে পড়ে গেল জগুমামার। ফেনিতে সেই চায়ের দোকান। টুকলুকে বসিয়ে তিনি বাথরুমে গেছিলেন। বাথরুম সেরে বেরোতেই কোত্থেকে তিন-চারটে ষণ্ডামার্কা লোক তাঁকে জাপটে ধরেছিল। তাদের একজনের হাতে কালো মুখোশের মতো জিনিস ছিল। সেটা ঠেসে ধরেছিল জগুমামার নাকের ওপর। নড়াচড়া তো দূরের কথা, একটা আওয়াজ করার সুযোগও তিনি পাননি। কয়েক মুহূর্তে সব অন্ধকার।

এর মানে পরিষ্কার। ওরা তাঁকে কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে এসেছে। ওরা বুঝেছে, জগবন্ধু মুখার্জিকে থামাতে না পারলে সবাইকে ফেঁসে যেতে হবে। সেইজন্যেই বাসের সিটে ওই হুমকি-চিঠি। তাতেও যখন বুঝেছে, উনি শেষ না দেখে ছাড়বেন না, তখন এটাই একমাত্র পথ। কিডন্যাপাররা বাসে ছিল। ওদের কথাবার্তাও শুনেছে। তারপর গাড়ির ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু টুকলু? সে কোথায়?

বিকেল গড়িয়ে গেছে। আলো দ্রুত মুছে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমছে। যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই জায়গাটা গন্ডগ্রাম। গাছপালা, ঝোপঝাড়। পাখিদের ঘরে ফেরার কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে।

জগুমামা শুয়ে আছেন একটা তক্তাপোশে। পাশে একটা পুরোনো রদ্দি টেবিল, একটা নড়বড়ে চেয়ার। চেয়ারে একখানা গামছা ঝুলছে। ঘরে আর কোনও আসবাব নেই। তক্তাপোশের পায়ার সঙ্গে তাঁর পা বাঁধা। শরীরের আর কোথাও বাঁধন নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, রিভলভার! তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী খুদে আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথায়? ভারত থেকে আসার সময় বিশেষ অনুমতি করাতে হয়েছিল। নেই। স্বাভাবিক। অচেতন অবস্থায় তাঁকে সার্চ করেছে

অপহরণকারীরা। আর সেজন্যেই শুধু পা-টুকু বেঁধে ফেলে রেখে গেছে এই গ্রামের কুটিরে। বিদেশি, রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না। তার ওপর নিরস্ত্র।

দুলতে-দুলতে একটা হলুদ আলো এগিয়ে আসছে। হ্যারিকেন হাতে একজন ঘরে ঢুকছে। বেশ ঢ্যাঙা লোক। লুঙি আর জামা গায়ে।

জগুমামা চট করে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বাঁ-চোখ একটু ফাঁক। লোকটা হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রাখল। তারপর জগুমামার দিকে তাকিয়ে বলল,—বাব্বা! এহনো ঘুমাইত্যাছে।... কত্তা, ও কত্তা! শোনছেন?

জগুমামা মটকা মেরে আছেন। নিরুত্তর।

—না:! ন্যাশা কাটে নাই। ডোজ বেশি পইড়া গ্যাছে।...কত্তা, ছা খাবেননি?

জগুমামা চোখ খুলে ফেললেন। একটু নাটক করে বললেন,—কে-কে? আ-আমি কো-থায়? জ-জল!

—আপনি আমাগো কাছে। আইজ রাতটা কষ্ট করেন। কাল সায়েবরা আইসা নিয়া যাব।... খাড়ান, পানি দিই।

লোকটা অন্ধকারে মিশে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে প্লাস্টিকের জগভরতি জল নিয়ে এল। জগুমামা আদ্ধেকটা উঠে বসে ঢকঢক করে জল খেলেন। আ:, শরীর জুড়িয়ে গেল।

—আপনি কে?

আমি?—লোকটা একগাল হেসে বলল,—আমি ইব্রাহিম। এহানে থাকি। সায়েবের কামকাজ দেখাশুনা করি।

—আপনার সায়েব কে?

—হেডা তো কওন যাইব না কত্তা। আপনে তো ইন্ডিয়ান?

—হ্যাঁ।

—বুঝি না, কীসের লাইগা ঝুটঝামেলি করেন। হেরা খুব ডেঞ্জারাস। যহোন-তহোন মানষেরে খতম কইরা দ্যায়। আপনের দ্যাশ হইলে নয় অন্য কথা। এহানে তো পুলিশ-অফসর সব হ্যাদের হাতে।

—আমাকেও কি মেরে ফেলবে?

—কইতে পারুম না। অই তো, আরেকজনরেও আটকায়ে রাখছে। তার নসিবে কী আছে, আল্লা জানে।

আরেকজন!—মুহূর্তে জগুমামার মুখে আলো ফুটল,—কীরকম দেখতে ভাই? বয়েস কত?

—শুইনা কী করবেন! ছা খাবেন কিনা কন।

জগুমামা ঘাড় নেড়ে বললেন,—আসলে আমার ভাগ্নেও আমার সঙ্গে ছিল।

—ফতিমা, দুইডা ছা বানাও। দুইডা বাটিতে মুড়ি-মরিচ দিও।... কত্তা, আপনার ভাইগ্নার বয়স কত?

—কত আর? কুড়ি-একুশ।

—কত্তা। হেডা আধবুড়া। দাড়ি-গোঁফে পাক ধরছে। কত্তা, আপনে হিন্দু?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—হে মোসলমান। আমাগো জাত।

মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক মহিলা ঘরে ঢুকল। একটা থালায় দুটো কলাই-করা কাপে চা, আর বড়-বড় দুটো বাটিতে মুড়ি। টেবিলের ওপর রেখে সে চলে গেল।

—নেন কত্তা, ছা খান।... ইন্ডিয়ায় কোথায় থাকেন?

খুবই নীচু কোয়ালিটির চা। তার সঙ্গে আদা মিশিয়ে অদ্ভুত স্বাদ হয়েছে। তাকেই এখন মনে হচ্ছে অমৃত। খুব খিদে পেয়েছিল। গোগ্রাসে মুড়ি-কাঁচালঙ্কা খেতে-খেতে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন জগুমামা। বললেন,—কলকাতা।

ইব্রাহিম চোখ বড়-বড় করল,—কইলকাতা? হে তো শুনছি খুব বড় শহর। আপনেগো রাজধানী, তাই না?

—হ্যাঁ। পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডিয়ার একটা রাজ্য। তার রাজধানী। আপনাদের ঢাকা শহরের মতো, খুব কিছু বড় নয়। ঢাকা আরও সুন্দর।

ইব্রাহিম বেশ খুশি হল। বিড়বিড় করল,—হবে না? আমাগো দ্যাশের রাজধানী।

জগুমামার মুড়ি শেষ হয়ে গেছে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে তিনি পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন। এতক্ষণে পেট ঠান্ডা হয়েছে। তারপর বললেন,—আপনি চা খেয়ে নিন। তারপর একটু বাথরুমে যাব।

ইব্রাহিমের মুখের চেহারা পালটে গেল।—বড় না ছুটো?

—ছোট।

—অ। তাইলে ঠিক আছে। সামনেই কইর‍্যা নিবেন।... যাই, যন্তরটা নিয়া আসি।

কাপ-বাটিগুলো থালায় চাপিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। হাতে বন্দুক।

—এসব কেন ইব্রাহিম ভাই?

—হেডা তো লাগেই। আপনে বন্দি, পলাইবার চেষ্টা করলে গুলি করতে লাগব। দ্যাখেন কত্তা, সায়েবের লবণ খাই, বেইমানি করতে পারুম না।... এই লন, তালা খুলেন।

কোমর থেকে একটা চাবি বের করে জগুমামার দিকে ছুঁড়ে দিল। জগুমামা চাবি ঘুরিয়ে পায়ের বেড়ির তালা খুললেন।

—চলুন। কোনদিকে?

—বাতিডা ধরেন। হাঁ, সামনেই চলেন।...

যতটা সাধাসিধে ভেবেছিলেন ইব্রাহিমকে, মোটেই নয়।

কুচকুচে অন্ধকার। একটানা ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। মাঝে-মাঝে শেয়ালের ডাক। জগুমামার একহাতে হ্যারিকেন। পিছনে উদ্যত বন্দুক হাতে ইব্রাহিম। বলে চলেছে,—একবার সায়েব একজনরে নিয়া আসছিল। লোকটা নিজেরে বড় চালাক ভাবে। যেই দিছে দৌড়, আমি গুলি চালাইছি। কী করব কন, বেইমানি করতে পারুম না।

—কী হল?

—হইব আর কী। এক গুলিতে শ্যাষ। আমার টিপ ভুল হয় না কত্তা। আকাশে উড়ন্ত পাখিরে গুলি কইরা নামাইয়া দিতে পারি। এমনি এমনি কি সায়েব পুষছে আমারে? ...হইছে কত্তা?

—হ্যাঁ। চলুন।

নিজেকেই আবার খাটের পায়ার সঙ্গে জুড়ে তালা লাগাতে হল। ইব্রাহিম চাবি নিয়ে চলে গেল।

নিশুতি রাত। পাশে টিমটিম করছে হ্যারিকেন। জগুমামা একা-একা শুয়ে উথালপাথাল ভাবছেন। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। টুকলুকে এরা ধরেনি। কিন্তু অন্য বন্দি লোকটি কে? বলছে, মুসলমান। ডক্টর আমেদ কি?

একবার পকেটে হাত ঢোকালেন। চমকে উঠলেন। টাকাকড়ি সব রয়েছে। ..অবশ্য ওই ক'টা টাকা নিয়ে ওরা করবেই বা কী? আসল লোকটাকেই শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ইব্রাহিম যথেষ্ট সেয়ানা এবং বলশালী লোক। তার ওপর সঙ্গে গুলিভরা বন্দুক রয়েছে। ওর হাত থেকে পালাবেন কী করে? এটা কোন জায়গা? কক্সবাজার কতদূর?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইব্রাহিমের ডাকে ঘুম ভাঙল,—কত্তা, খানা আনছি।

থালায় মোটা-মোটা লালচে ভাত। মধ্যে ডাল, একটু ঘ্যাঁট, একটা মুরগির ডিম। থালার কলাই উঠে কালচে দাগ পড়ে গেছে। অন্যসময় হলে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না। এখন পেটে বড় জ্বালা! ভাত মেখে মুখে তুললেন। সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। বাপস, কী ঝাল!

কোনওরকমে খাওয়া শেষ হল। থালাতেই হাত ধুয়ে জগুমামা বললেন,—এবার শুয়ে পড়ব?

—জি। পড়েন।

—ইব্রাহিম ভাই, মশারি টানাবেন না? মশা তো ছেঁকে ধরছে। গা-হাত-পা ফুলে উঠছে।

মশারি।—ইব্রাহিম হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল,—বড় মজার কথা কন কত্তা। এহানে মশারি কই পাইবেন? এ কি শহর পাইছেন? আমরা তেমন হইলে ক্যারাসিন মাইখা ঘুমাই। একডা কাম করেন, কাপড়

মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন।... ফতেমা, তুমার একখান পুরান কাপড় দিবা?

একটু পরে বগলে জড়ানো একটা পুঁটলি আর একখানা শতচ্ছিন্ন শাড়ি নিয়ে ইব্রাহিম ঘরে ঢুকল। শাড়িটা জগুমামার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল,—এডারে জড়ায়ে আল্লার নাম কইরা ঘুমায়ে পড়েন।

বলতে-বলতে পুঁটলি খুলে ফেলছে। ছেঁড়া শতরঞ্চি, নোংরা একটা বালিশ। ওটাই বিছানা। সে লম্বা হয়ে পড়ল।

জগুমামা বললেন,—তুমি এখানেই শোবে?

—জি কত্তা। আপনারে পাহারা দেওয়া আমার কত্তব্য। সায়েবের লবণ খাইছি...

আবার সেই পুরোনো রেকর্ড বাজাতে শুরু করেছে। জগুমামা ছেঁড়া শাড়ি মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। ঘুমিয়েও পড়লেন। এখনও বোধহয় ক্লোরোফর্মের নেশা যায়নি।

ঘুম ভাঙল পাখিদের কলরবে। ভোর হচ্ছে। এখনও আবছা আলো। কুয়াশার ঘন চাদরে সব ঝাপসা। পাশে ইব্রাহিম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

জগুমামা ডাকলেন,—ইব্রাহিম! ইব্রাহিম ভাই?

জি, জি।—তড়াক করে উঠে বসল ইব্রাহিম,—কী হইছে কত্তা?

—কিছু হয়নি। আমি বাথরুমে যাব।

—বড় না ছুটো?

—বড়।

—যাইতে পারবেন? এহানে সব কাঁচা খাটা পায়খানা।

—চলুন, দেখি।

ইব্রাহিম বন্দুক বাগিয়ে সেই একই পদ্ধতিতে জগুমামাকে নিয়ে চলল বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে। জগুমামা দেখতে-দেখতে চলেছেন। একটু দূর থেকে 'ছপ-ছপ' শব্দ শোনা যাচ্ছে। নদী বা খাল আছে নাকি? জায়গাটা পুরো জংলি! বাঁশঝাড়-গাছপালায় ঝুপসি।

বাগানের একদিকে বাঁশের দরমার বেড়া দিয়ে শৌচকর্মের জায়গা। ইব্রাহিম চোখ রগড়ে বলল,—যান কত্তা। ওইডা।...হ্যাঁ, খেয়ালে রাখবেন। পলাইবার মতলব করলে কিন্তু আমারে গুলি করতে লাগব।...

জগুমামা বেড়ার ওদিকে ঢুকে পড়লেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য, পুরো এলাকাটা যতটা সম্ভব বুঝে নেওয়া। পশ্চিমদিক দিয়ে একটা শুঁড়িপথ আছে। কিন্তু এখানে আর একটাও বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। সেজন্যেই শয়তানরা জায়গাটা বেছেছে। মিছিমিছি জল ঢেলে, গায়ে জল ছিটিয়ে জগুমামা বেরিয়ে এলেন।

বিছানায় বসার আগে জগুমামা ধীরে-সুস্থে গামছায় হাত-পা মুছলেন। তক্তাপোশে বসতে বসতে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন,—এবার একটু চা হলে ভালো হত। কী বলেন ইব্রাহিমভাই?

—জি কত্তা। বিবি এট্টু পরে উইঠ্যা পড়ব।

বাঁ-পায়ের বেড়িতে তালা ঢুকিয়ে বন্ধ করলেন জগুমামা। চাবিটা বাড়িয়ে দিলেন ইব্রাহিমের দিকে।

ইব্রাহিম বাঁ-হাত বাড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে জগুমামা দুহাত দিয়ে তার হাতে হ্যাঁচকা টান মারলেন। বন্দুক ছিটকে পড়ল। ইব্রাহিম হুমড়ি খেয়ে পড়ল জগুমামার বুকের ওপর।

মুহূর্তের মধ্যে জগুমামার ডানহাত শূন্যে উঠে গেছে। সজোরে আঘাত করল ইব্রাহিমের ঘাড়ে। পরপর দুবার।

ইব্রাহিমের গলা দিয়ে একটাও শব্দ বেরোল না। অতবড় শরীরটা কলাগাছের মতো ভেঙেচুরে নেতিয়ে পড়ল। সে জ্ঞান হারিয়েছে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটল তিরিশ সেকেন্ডে।

জগুমামা ইব্রাহিমের নাকের কাছে হাত দিলেন। নিশ্বাস মোটামুটি স্বাভাবিক। ঘণ্টাখানেকের আগে তার জ্ঞান ফিরবে না। ডাক্তার-বন্ধুর কাছে অজ্ঞান করার এই হাতুড়ে পদ্ধতি শুনেছিলেন। ঘাড়ের একটা বিশেষ জায়গায়, বিশেষ নার্ভ টিপে ধরলে বা তার ওপর আঘাত করলে জ্ঞান লোপ পায়। যখন ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান আবিষ্কার হয়নি, তখন এইভাবে অজ্ঞান করে করা হত ছোটখাটো অপারেশন...আজ সেই জানা কাজে লেগে গেল।

চাবি দিয়ে বেড়ি খুলে ফেললেন। তিনি মুক্ত। বন্দুকটা কাছে এনে রাখলেন। নিজের প্যান্ট-জামা খুলতে লাগলেন।

আরও মিনিটখানেক লাগল। জগুমামার পোশাক পালটে গেছে। পরণে লুঙি, জামা। ইব্রাহিম মামার প্যান্টশার্ট পরে খাটে পড়ে আছে। তার পা বেড়ি দিয়ে বাঁধা। চাবি জগুমামার লুঙির কষিতে। ওখানেই টাকাকড়িও।

চশমা খুলে পকেটে ঢুকিয়ে জগুমামা পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে এলেন। ইব্রাহিমের বিবি ফতেমা মেঝেয় কাপড়চোপড় জড়িয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর দড়ির খাটিয়ায়? জগুমামার হৃদপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আমেদ! তাঁর বন্ধু নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানী, মেছবাউদ্দিন আমেদ।

জগুমামার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। এত সহজে আমেদকে ফিরে পাওয়া যাবে, ভাবতে পারেননি।

ঘরের মধ্যে এখনও আবছা অন্ধকার। জগুমামা আমেদের কাছে এগিয়ে গেলেন। আর কেউ নয়, নির্ঘাত আমেদ। মাথার সামনের চুল বেশ পাতলা হয়ে প্রায় টাক পড়ে গেছে। দাড়ি প্রায় সব পেকে গেছে। জগুমামা অবাক। ন'মাস আগে দেখা হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। এর মধ্যে আমেদের এত বয়েসের ছাপ পড়ে গেছে!

কিন্তু ওরও তো পা বেড়িতে তালা দেওয়া। চাবি কোথায়? লুঙির কষি থেকে চাবির রিং বের করলেন। দুটো চাবি আছে। এর একটা হতে পারে।

দুবার চেষ্টা করলেন। নাহ, খুলল না। তা হলে ফতেমার কাছে নিশ্চয়ই হবে। ভয় দেখিয়ে নিতে হবে। তবে তার আগে...আস্তে-আস্তে ঠেলা দিলেন ঘুমন্ত আমেদকে। আমেদ চোখ মেলে তাকাল।

জগুমামার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। অন্য অচেনা দৃষ্টি। ফ্যালফ্যাল করে লোকটি তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। তবে কি আমেদকে নেশার জিনিস খাওয়ানো হচ্ছে? স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে?

জগুমামা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন,—আমেদ, আমেদ... আমি জগবন্ধু...চলো, ওঠো...

লোকটি কোনও কথা না বলে ইশারায় হাত নাড়ছে। বোঝাতে চাইছে, সে যাবে না! জগুমামাকে চিনতেই পারছে না।

জগুমামা বিভ্রান্ত। কী করবেন? আবার ফিসফিস করে বললেন,—তুমি আমায় চিনতে পারছ না?

লোকটি দুদিকে মাথা নাড়ল।

—তুমি আমার সঙ্গে চলো। পালিয়ে যাই।

লোকটি আবার সজোরে মাথা নাড়ল। সে যেতে চাইছে না।

এ অদ্ভুত অবস্থায় পড়া গেল। মেঝেয় ফতেমা দুবার আড়মোড়া ভাঙল। ওর বোধহয় ওঠার সময় হয়ে গেছে। এই লোকটা, হয়তো আমেদ বা আমেদ নয়। যদি যেতে না চায়, তবে জোর করে তো নেওয়া যাবে না। মাঝখান থেকে সব কেঁচে যাবে।

নাহ! যেতে না চায়, থাক। টুকলুটা একা কোথায় পড়ে আছে, কে জানে! আচ্ছা, ওর মোবাইল নম্বরটা? হাই কমিশন থেকে যখন দিয়েছিল, দু-তিনবার দেখে ছিলেন। দশটা নম্বর।

জগুমামা বেরিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে। মক্কার কাবা মসজিদের ছবির পাশে একটা নামাজি টুপি ছিল। দেখামাত্র মাথায় পরে নিয়েছেন।

এখন ছুটছেন জঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে। পায়ে ইব্রাহিমের ছেঁড়া চটি। মাথায় টুপি। গালে দুদিনের না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চশমা নেই। জগুমামা পুরোপুরি গ্রামের চাষী লোক!

ছুটছেন আর ভেবে চলেছেন ফোনের দশটা নম্বর। ৮, ৩, ১...তারপর ৪...৫...তারপর কি ২ না ৩? শেষের চারটে সংখ্যা মনে পড়ে গেছে। ১০০১। যাই হোক, দুটোতেই করে দেখতে হবে। যেটায় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কোথায় ফোনের বুথ?

জলের 'ছলাৎ-ছলাৎ' শব্দ বেশ স্পষ্ট। একটু এগোতে জঙ্গল পাতলা হয়ে গেল। সামনে বেশ চওড়া খাল। জোয়ারের জল ঢুকছে। তারই স্রোতের শব্দ।

খালের কিনারে আসতে দেখলেন, একটু ঢালু পাড়ের মতো। একটা খুঁটিতে বাঁধা একখানা ছোট ডিঙি নৌকো। জলের ঢেউয়ে নাচছে। চমৎকার! জোয়ারের টানে ভেসে যাওয়া যাবে এ এলাকা ছেড়ে। দুখানা দাঁড়ও রয়েছে ডিঙির ভেতরে।

জগুমামা নৌকো চালাবেন? মনে পড়ে গেল, সেই কলেজ জীবনে একবার কেষ্টপুর খালে বন্ধুদের সঙ্গে নৌকোয় দাঁড় টেনেছিলেন। আর একবার বম্বের মহাবালেশ্বরে। দেখা যাক, যা থাকে কপালে। থিয়োরিটা জানেন।

জগুমামা ডিঙিতে উঠে খুঁটি থেকে দড়িটা টেনে নিলেন। নৌকো জোয়ারের টানে হু-হু করে ভেসে চলল। লম্বা দাঁড়, সোজা করে জগুমামা সামনের দিকে বসেছেন। নৌকো বেঁকে গেলেই ওটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে।

দুপাশে বেশ আলো ফুটে গেছে। তবে এখনও বিশেষ লোকালয় চোখে পড়ছে না। কচ্চিৎ-কখনও এক-আধটা কুঁড়ে।

ক্রমশ দু-চারটে গ্রাম দেখা দিতে লাগল। বসতি ঘন হচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেছে। স্রোতের টানে হু-হু করে ভেসে চলেছে নৌকো। হঠাৎ অনেকটা দূরে দুদিকের পাড় দেখা যাচ্ছে না। অথৈ জল নাকি? সাগরে এসে পড়লেন নাকি?

একটু পরেই ভুল ভাঙল। ওটা বেশ বড় নদী। এই খাল গিয়ে পড়েছে। বড়-বড় স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। নদী দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যাতায়াত করছে। ভারি মনোরম লাগছে।

কিন্তু এসব দেখার সময় নেই। বাঁদিকে কোথাও চটপট নৌকোকে ভেড়াতেই হবে।

দাঁড়কে নানান কায়দায় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে জগুমামা নৌকোকে কোনওক্রমে পাড়ের কাছে নিয়ে এলেন। তারপর দাঁড়কে কাদায় গেঁথে লাফ দিলেন।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এলেন পাড়ে। সামলে নিয়ে হনহন করে উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করলেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই স্টিমারগুলোর কাছে পৌঁছতে হবে।

ঝোপঝাড়, চোরকাঁটা, আশ শ্যাওড়ার জঙ্গল। তার মধ্যে দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে।

কিছুটা হাঁটার পর পাকা সড়ক দেখা গেল। জগুমামা হাঁফ ছাড়লেন। এরমধ্যেই লুঙি এবং পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

হঠাৎ মাথার মধ্যে পাক খেল আসন্ন সমস্যার মেঘ।...এই কথাটা তো আগে ভাবেননি। ঘামতে শুরু করলেন।...

যদি কোনও স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তিনি বাঙাল ভাষায় কথা বলেন না। চেহারা যেমনই হোক, কথা বললেই যে-কেউ ধরে ফেলবে, তিনি এদেশের লোক নন।

যা হবে, দেখা যাবে। জগুমামা বেশ জোরে-জোরেই হাঁটতে লাগলেন স্টিমারঘাটার দিকে।

কথায় বলে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়'। যেখানে পথ দুভাগ হয়েছে, সেখানে একজন স্থানীয় মানুষ দেখা গেল। এদিকেই এগিয়ে আসছে।

জগুমামার হার্টবিট বেড়ে গেছে। এবারে পরীক্ষা দিতে হবে। সত্যিকার অভিনয়ের পরীক্ষা।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই দুজন প্রায় মুখোমুখি। আগন্তুক বয়স্ক মানুষ, ষাটের ওপর। চোখে চশমা, মুখে লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে পাঞ্জাবি, লুঙি।

সে বলল,—ছালাম আলেইকুম। যান কই?

—ওয়ালেকুম আছছালাম। ইস্টিমার ঘাটা কুন দিক?

—সুজা গিয়া বামদিক ধরেন। নূতন বুঝি?

—জি।

আগন্তুক আর কিছু বলল না। পেরিয়ে চলে গেল।

লম্বা-লম্বা শ্বাস পড়ল জগুমামার। উফ, শেষপর্যন্ত তিনি কোনওরকমে পাশ করে গেছেন!

কিন্তু বারবার তো এরকম হবে না। স্টিমারঘাটে নিশ্চয়ই অনেক লোকজন থাকবে। অনেকে অনেকরকম কথা বলবে, প্রশ্ন করবে। মুহূর্তের ভুলে যদি বিজাতীয় শব্দ বেরিয়ে যায়? তাঁর কাছে পাসপোর্ট-কাগজপত্র কিছুই নেই। স্পাই ভেবে সোজা পুলিশের হাতে তুলে দেবে। তারপর বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর শাস্তি। জেলে পচতে হবে। এ দেশ তিনি কিছুই চেনেন না। এ জায়গাটা কোথায়, চট্টগ্রাম এখান থেকে কতদূর, সবটাই অজানা।

জগুমামা হাঁটছেন, ভাবছেন। ডানদিকে পাকা বাড়ি শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ জায়গাটা শহর। বেশ বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। পাশ দিয়ে দু-একটা গাড়ি হুস-হুস করে চলে গেল। রাস্তায় লোকজন। কেউ দাঁত মাজছে, কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ভাগ্য ভালো, কেউ তাঁর দিকে নজর দিচ্ছে না।

মাথা একটু ঝুঁকিয়ে হাঁটছেন। কারও সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয়ে যায়।

এবারে বাজার-এলাকা। সার-সার দোকানঘর। সাইনবোর্ড দেখে জায়গাটার নাম পড়ে ফেললেন। ভোলা। জেলা বরিশাল।

কী ভয়ংকর! ফেনি পার্বত্য চট্টগ্রামে। আর এ তো জলজঙ্গলের দেশ বরিশাল। ক্রিমিন্যালরা তাঁকে এতটা দূরে এনে ফেলেছে!

জগুমামা নিজের মনেই ভাবেন টুকলু ঠিকই বলেছিল, তাঁরা বিদেশি। এবারে প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেক সুবিধেজনক জায়গায়।

টুকলুর কথা মনে পড়তেই মন ছটফট করে উঠল। কেমন আছে? একেবারে একা। অচেনা-অজানা বিদেশ-বিভুঁই, কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? কাউকেই পাবে না।

যেতে-যেতে উলটোদিকে একটা দোকান। ভারি সুন্দর নাম। আলাপ। পাশে টেলিফোনের ছবি। তলায় লেখা—দেশে-বিদেশে সস্তায় কল করা যায়। কিন্তু এখনও শাটার নামানো।

একটু দাঁড়িয়ে যাবেন? ফোনে ধরতে চেষ্টা করবেন টুকলুকে? একমুহূর্ত ভাবলেন। উহুঁ, ঠিক হবে না। এখানে দাঁড়ানো মানেই বিপদ ডেকে আনা। হয়তো খুনের দল এতক্ষণে হাজির হয়ে গেছে তাদের ডেরায়। সেখানে ইব্রাহিমকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নির্ঘাত ছুটে বেরোবে। এবং খালের কাছে এসে নৌকোটা না দেখে ধরে নেবে তিনি জোয়ারের টানে এইদিকেই এসেছেন।

যারা কয়েকঘণ্টার মধ্যে ফেনি থেকে তাঁকে 'ভোলা'য় এনে ফেলতে পারে, তারা সবদিক দিয়েই অন্যজাতের জীব।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যেভাবে হোক এই তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। জগুমামা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন।

পথটা সামনে আরও চওড়া পিচঢালা সড়কে পড়েছে। ডানদিক, না বাঁদিক? কাকে জিগ্যেস করবেন?

কাছাকাছি পৌঁছতে-পৌঁছতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

সড়কের বাঁদিক থেকে পরপর মালবোঝাই লরি-ট্রাক এসে ছুটে যাচ্ছে ডানদিকে। ডানদিক দিয়ে বাঁদিকে যাওয়া লরিগুলো খালি।

স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে দিচ্ছে স্টিমার ঘাটা বাঁদিকে। মাল বোঝাই হয়ে ট্রাকে চেপে ছুটছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

জগুমামা বাঁদিকের পথ ধরলেন। কিন্তু তখনই একটা বাজে ব্যাপার ঘটে গেল।

প্যান্টশার্ট পরা, ফিটফাট এক যুবক হনহনিয়ে আসছিল উলটোদিক দিয়ে। ধড়াম করে এসে ঘাড়ে পড়ল। শেষমুহূর্তে জগুমামা সরে গিয়ে ধাক্কা বাঁচালেন। কিন্তু ছেলেটা ছাড়ল না। কটমট করে তাঁর আপাদমস্তক দেখে ঝাঁঝালো গলায় বলল,—অ মিঁয়া! চুখে দেখ না?

আচ্ছা অভদ্র তো! নিজেই দোষ করেছে, অথচ কেমন চোটপাট করছে। অন্যসময় হলে এতক্ষণে...! মুখে ক্যাবলা-ক্যাবলা হাসি ফুটিয়ে নিরুত্তর রইলেন জগুমামা।

ছেলেটা আরও রেগে উঠল। জগুমামার কাঁধ ধরে সে জোরে-জোরে ঝাঁকাতে লাগল,—কী হইল? জবাব দাও না যে?

মাথায় আলো জ্বলে উঠল! জগুমামা ডানহাতে আদাবের ভঙ্গি করে দুইকানে ও মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করতে লাগলেন।

ছেলেটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,—অ। কইতেও পার না, শুনতেও পার না! চোমোৎকার! ত চুখে কী হইছে, হাঁ?

জগুমামা অসহায়ের ভঙ্গি করলেন। যুবকটি মুখ দিয়ে বিরক্তির শব্দ করে হাত সরিয়ে নিল। রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল।

কী মারাত্মক ফাঁড়া কাটল। আরেকটু হলেই হয়তো সর্বনাশ ঘটে যেত।

জগুমামা ঠিক করে ফেললেন, এই বুদ্ধিটাই আপাতত: কাজে লাগাতে হবে। বোবা-কালার অভিনয় করে যেতে হবে।

দেখতে-দেখতে নদীর কাছে পৌঁছে গেলেন জগুমামা। বিশাল নদী। ওপার দেখা যাচ্ছে না। এ স্টিমারঘাটা কই, এ তো পুরোদস্তুর বন্দর। মস্ত বড়-বড় জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। স্টিমার লঞ্চ গিজগিজ করছে। চা-নাস্তার দোকান, হই-হট্টগোলে জায়গাটা সরগরম।

জগুমামা কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখলেন। একদিকে খালাসিরা সামনের বড় জেটি দিয়ে জাহাজ থেকে মাল নামাচ্ছে, উলটোদিকে ছোট-ছোট কাঠের গুমটি। তার সামনে লোকজন। সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

গুমটিঘরগুলো টিকিট ঘর। বাইরে ছোট-ছোট সাইনবোর্ড। কোনওটায় লেখা—বরিশাল। কোনওটায় ঢাকা বা চট্টগ্রাম। 'চট্টগ্রাম' লেখা গুমটির লাইনে দাঁড়ালেন জগুমামা।

সামনের লোকটা একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল,—এট্টা চাটগাঁ দিবেন।

—একসপ্রেস তো?

—জি।

জগুমামা লুঙির খুঁট থেকে একশো টাকা বার করলেন। লোকটা সরতে সেটা ঢুকিয়ে দিলেন।

—কন।

জগুমামা ইশারায় আগের লোকটাকে দেখালেন। ভিতরের লোকটা হাসল,—অ। আপনে বয়রা। এই নেন।

টিকিট আর টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে ছুটলেন জগুমামা। ওই যে আগের লোক! ওর পিছন-পিছন ছুটলে ঠিক জায়গায় পৌঁছোন যাবে।...

স্টিমারটা বেশ বড়। দোতলা। চওড়া ডেক। লোক উঠছে। জগুমামা কথাবার্তায় বুঝে গেছেন, আর আধঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে।

ডেকের শেষপ্রান্তে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন জগুমামা। অন্যদের থেকে একটু তফাতে। জোয়ারে টলমল নদী। কুয়াশা ছিঁড়ে হলুদ আলো ঝিলমিল করছে জলে। সোনার অসংখ্য কুঁচি কাঁপছে।

স্টিমার হুইসল দিয়ে ছেড়ে দিল। জগুমামার সর্বাঙ্গ আরামে জুড়িয়ে গেল। আর দুশ্চিন্তা নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি পেরেছেন। এখন ঘুম পাচ্ছে। লম্বা হয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

ঠিক তখনই পিঠে কারও হাত। জগুমামা চমকে ফিরলেন।

দশাসই চেহারার একজন লোক। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। মোটা গোঁফ। পুরুষ্টু জুলফি। প্যান্টশার্ট পরা। একদৃষ্টে জগুমামার দিকে তাকিয়ে আছে। কে লোকটা? জগুমামা কিছুতেই চিনতে পারছেন না।

কয়েকমুহূর্ত পরে লোকটা বলল,—বড় চিনা-চিনা মনে হয়। কই যান?

জগুমামা নিরুত্তর। লোকটার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছেন।

লোকটা আবার বলল,—হাঁ-হাঁ, মনে পড়ছে। আপনারে... গত বৎসর কইলকাতায়... আপনে ইন্ডিয়ান তো? কিন্তু... তাইনের চুখে চশমা... কি ঠিক কইছি?

সর্বনাশ! লোকটা কে? তাঁকে চিনে ফেলছে! তিনি মুখে হাসি টেনে বোবা-কালার ভঙ্গি করলেন।

লোকটা অমনি কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল,—অ। আপনি বুবা-কালা! হইল না! তাইনে বড় বিজ্ঞানী। আলাপ হইছিল আমেদছারের সঙ্গে তাইনের বাসায় গিয়া। আমারই ভুল হইছে। এই বেশভূষা... কিন্তু সেই চোখ সেই মুখ... অ্যাক্কেরে তাইনের মতন! যাউগা, কিছু মনে লইবেন না...

লোকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করতে-করতে চলে গেল অন্যদিকে।

জগুমামার ভীষণ আপশোস হচ্ছে! ওই লোকটা নির্ঘাৎ তার বন্ধুর ছাত্র। ইসস! সব ভুলভাল হয়ে গেল। হাতের কাছে যেচে সুযোগ এসেছিল। পরিচয় দিলে কত সুবিধে হত।

দেখা যাক, চট্টগ্রামে পৌঁছে যদি লোকটাকে ধরা যায়।

স্টিমার মাঝে-মাঝে হুইসল ছাড়ছে...জলে ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে...

৭

ভাইডি...। ভাইডি, শোনছ... অ ভাইডি?

আমি চোখ মেলে তাকালাম। এক অচেনা মুখ আমার ওপর। মৃদুস্বরে ডেকে চলেছে।

প্রথমে সব গুলিয়ে গেল। আমি কোথায়, কে এই লোকটি? কয়েক সেকেন্ড! চিনে ফেলেছি। বাসে আমাদের সহযাত্রী, তৃতীয় সিটে যিনি বসেছিলেন। মামার মুখে বাংলা-বাঙালির ইতিহাস শুনে মামার ভক্ত হয়ে গেছিলেন।

ভদ্রলোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বললেন,—যাক, তোমার জ্ঞান ফিরছে। চলো, বাস ছাইড়া দেয় যে।

—দিক গে। আমি কী করব? আমি যাচ্ছি না। ঢাকা ফিরে যাব।

—কও কী? ওখানে তোমাগো কাম-কাজ আছে না?

—কীসের কাজ? কিচ্ছু নেই। মামাকে শয়তানরা... আমি একা গিয়ে... আপনি চলে যান। আমি যাচ্ছি না।

কথা আটকে যাচ্ছে, দুচোখ ফেটে আমার জল আসছে। কোথায় যাব, কার সঙ্গে দেখা করব? এই দেশে কিচ্ছু চিনি না, জানি না!

অসহ্য রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। যত গন্ডগোলের গোড়া নিজেই। কী দরকার ছিল, বইমেলার রঞ্জন সরকার, সুধাংশু দে-র বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার? সুনীল আচার্য হারিয়ে গেছে তো গেছে। এরকম কত লোকই তো হারিয়ে যায়। আমিই মামাকে ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। ওঁরা দিব্যি ঢাকায় বইমেলা করছেন আর আমি?

চোখের জল সামলাতে পারছি না। শরীর কাঁপছে। ভদ্রলোক আমার পিঠে হাত রাখলেন। নরমগলায় বললেন,—ভাইডি শান্ত হও। চিন্তা কইরো না, সব বেবস্থা হইয়া যাইব। চলো। ওই শুনো, বাসে ইস্টার্ট দিতাছে।

কী ব্যবস্থা হয়ে যাবে? দ্যুৎ! মরছি নিজের জ্বালায়, উনি এলেন জ্ঞান দিতে! কর্কশগলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, —আপনি যান তো! আমাদের চেনেন না, জানেন না। প্লিজ! বিরক্ত করবেন না। আমাকে আমার মতো

থাকতে দিন।

ভদ্রলোক একটুও রাগলেন না। বরং একটু হাসলেন। আস্তে আস্তে বুকপকেট থেকে একটা ল্যামিনেটেড নেমকার্ড বার করে আমার সামনে ধরলেন।

আমি অবাক।

ছবি সাঁটা সরকারি আইডেন্টিটি কার্ড। নাম মসিয়ার রহমান। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

রহমানসাহেব বিষণ্ণগলায় বললেন,—আমাগোই দুষ। ভাবতেও পারি নাই, জার্নিতে এমনডি হইতে পারে। তোমাগো প্রোটেকশন দিতে, হেল্প করতে আমাগো সরকাররে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন রিকোয়েস্ট করছিল। আমরা চারজন তোমাগো দুজনার সাথে তাই প্লেন ড্রেসে আইত্যাছিলাম। আমার তিন অ্যাসিস্টান্ট বাসের ওখানেই আছে। সক্কলে আর্মড। তোমার কুনো ভয় নাই। চিন্তা কইরো না, ইবলিশের বাচ্চাগুলা উনার কুনো ক্ষতি করতে পারব না। চলো ভাইডি।

কথাগুলো যেন টনিকের মতো কাজ করল। উঠে দাঁড়ালাম। আমি একা নই। হ্যাঁ, আমায় এই রহস্যের শেষ দেখে ছাড়তে হবে।

বাসের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—রহমানসায়েব, আমার কাছে মোবাইল ফোন আছে। হাই কমিশনের নাম্বারও আছে।

—তাই নাকি? তবে খুব ভালো। অখনিই ফুন করো। তাগো জানাও। তাপ্পর আমারে দিও। দফতরে জানাইয়া দেই।

হাই কমিশনার আর্তনাদ করে উঠলেন। কথা বললেন রহমানের সঙ্গে। বললেন, রহমান যেমন বলছেন, সেভাবেই চলতে।

এরপর মসিয়ার রহমান মোবাইল ফোনে কথা বললেন নিজের দফতরের সঙ্গে।

বাসে উঠতে-উঠতে ফিসফিস করে বললেন,—বড়কর্তা কইলেন, আইজ চাঁটগায় হল্ট করতে। ক্রিমিন্যালগুলার কক্সবাজারে থাকা খুব সম্ভব।

বাস ছেড়ে দিল। আমার পাশের সিট ছাড়া, আরও ছ'টা সিট খালি। দুইয়ে-দুইয়ে চার করলে বলে দেওয়া যায়, অপরাধীরা দলে মোট ছয়জন ছিল।

টিভি রিমোট নিয়ে পুটপুট করছি। এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে। আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে। কিছুই ভালো লাগছে না।

রহমানসায়েব বাথরুমে। বাইরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে।

চট্টগ্রামের এই হোটেলের নাম 'সাফিনা'। সাজানো-গোছানো, ছিমছাম। এক ঘরে আমরা দুজন, বাকিরা অন্য ঘরে।

কলিংবেল বাজল।

—আসুন।

রহমানের ফোর্সের একজন পুলিশ অফিসার।

—ছার কই?

—বাথরুমে।

—আইলে কইবেন, আমাগো লগে একবার দেখা করতে।

বাথরুমের সিটকিনি খুলে গেল।

—কী কও, হানিফ?

—ছার, যোগাযোগ করছিলাম হেড কোয়ার্টারের সাথে। অ্যাহনও কোনও খবর নাই।

—তুমি সব রোড ব্লক কইরা দিবার লগে কইছ? রেল ইস্টিশন, এয়ারপোর্ট সব জায়গায় প্লেনড্রেস পোস্টিং করনের কথা?

—জি ছার।

—ঠিক আছে।

—রহমানভাই, আমার মনে হয়, সব থানাতেও মেসেজ পাঠানো দরকার। জগুমামার চেহারার ডেসক্রিপশন দিয়ে।

—ঠিক, ঠিক কইছ।

রহমান হোটেলের ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন।

—হ্যালো, শুনো! আরেকবার ফুন কইরা কইয়া দাও...

ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—হ্যালো, আমি ডক্টর আমেদের ভাই কামালুদ্দিন বলছি।

—হ্যাঁ। বলুন।

ভিতরে-ভিতরে আমি খুবই অবাক, এই নম্বরটা উনি পেলেন কোত্থেকে? কাল সন্ধেবেলায় মামার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়েছে। কিন্তু সে তো হোটেলের ল্যান্ডলাইনে।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই জবাব পেয়ে গেলাম,—আমি ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে ফোন করেছিলাম। সব শুনলাম। আপনি কি ওনার ভাগ্নে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি এখন কোথায়? কক্সবাজারে কোথায় উঠেছেন?

—আমি...আমি এখন...

বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। আমি কোথায়, বলা কি উচিত হবে? যদিও বিজ্ঞানী মেছবাউদ্দিনের ভাই, হাই কমিশন আমাদের এই গোপন নম্বর দিয়েছে, তবুও! আমি ফোনে হাত চেপে রহমানসায়েবকে নিচুগলায় বললাম,—বলব, কোথায় আছি?

ওদিক থেকে কামালুদ্দিন বলে চলেছেন,—কী হল? বলুন? হ্যালো! কী হল...হ্যালো...

একবার হাত সরিয়ে 'হ্যালো' 'হ্যালো' করে আবার চেপে ধরে বললাম,—নিখোঁজ ডক্টর আমেদের ভাই কামালুদ্দিন। ইনিই আমাদের কাল ফোন করেছিলেন।

রহমান বললেন,—না। হে যিনিই হউন, কইও না।

য-যা:! কেটে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই 'পিড়িং...পিড়িং...'। আগের নম্বর থেকেই আবার ফোন।

—হ্যালো। লাইনটা কেটে গেছিল।

—হ্যাঁ। বলুন, আপনি কোথায়? আপনাকে নিয়ে আসব।

—আমি ফেনিতেই আছি।

—সে কী! হাই কমিশন থেকে যে বলল, আপনি সিকিওরিটি নিয়ে কক্সবাজার আসছেন?

—প্রথমে তাই ঠিক ছিল। পরে ডিসিশন চেঞ্জ করেছি। ঢাকায় ফিরে যাব। সেখান থেকে কলকাতা।

—আপনার মামা ডক্টর মুখার্জিকে যে এখনও ট্রেস করা যায়নি। তাঁকে ফেলেই চলে যাবেন?

রীতিমতো জেরা করছে।

—আমি কী করব? ওটা পুলিশ-গোয়েন্দার ব্যাপার।

বুঝলাম।—ওদিকের গলায় হতাশা ফুটল,—যান তবে। আমাদের নসিবে নাই। দেখা হল না। ছাড়ি।...

কপালের ঘাম মুছলাম। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। এতক্ষণ একটানা মিথ্যে বলে যাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

রহমান বললেন,—ভাইডি, একডা কাম করো। অখনি ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে ফুন কইরা জানাইয়া দাও, হুটহাট কাউরে যেন আমাগো মোবাইল নাম্বার না দেয়।

ঘরের বেল আবার বেজে উঠেছে। রহমান বললেন,—আসেন। খোলা আছে।

দুজন পুলিশ অফিসার ঢুকলেন। প্রথমজন বললেন,—সার, হেড কোয়ার্টার থেকে সব শুনছি। আমি অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার। কী করতে হইব, কন।

—বসেন, বসেন। আপাতত এই হোটেলের চারদিকে কিছু প্লেনড্রেস ফোর্স মুতায়েন করেন। আমরা যে এখানে আছি, এডা কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না জানে। কী খাইবেন, চা না কফি?

—না সার, থ্যাঙ্কিউ। আমাগো ফুন নম্বর দিয়া যাইতাছি, কুনো দরকারে খবর দিবেন।

দুজন বেরিয়ে গেলেন। বললাম,—একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেল।

রহমান তাকালেন।

—কামালুদ্দিন কোত্থেকে ফোন করছেন, জানা খুব দরকার ছিল। মোবাইলে তো নাম্বার স্টোর থাকে।

—রাইট! ঠিক কইছ। দাও, দাও। আমি অখনই অগো ধরি।

চটপট লাস্ট কলটা টুকরো কাগজে লিখলাম। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন মসিয়ার রহমান।

আবার টেবিলে রাখা খুদে ফোনটা বেজে উঠেছে। আবার কে রে?

—হ্যালো।

—অর্ণব বলছ?

—আপনি?

—আমি রঞ্জন সরকার। হাই কমিশন থেকে সব শুনেছি। কী সাংঘাতিক! এত খারাপ লাগছে। আমাদের জন্যেই তোমাদের এমন বিপদে পড়তে হল। এখন কী করবে ভাই?

—ঠিক করিনি। দেখি। আপনারা সব ঠিকঠাক আছেন? সুধাংশুবাবু?

—হ্যাঁ, আপাতত সব ঠিক। আমরা সারাদিন এখানেই বন্দি। বইমেলায় কলকাতার অন্যরা অ্যাটেন্ড করছেন। তবে তার মধ্যেই দুদিন ফোনে থ্রেট করেছে।

—তাই? কী বলছে?

—বলছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। নইলে তোমাদের সবকটার লাশ পদ্মায় ভাসবে।

—আপনারা জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। তুমি কবে আসছ?

—অ্যাস আর্লি অ্যাস পসিবল।

আজ সারাটা দিন হোটেলের এই ঘরে বন্দি। সকালে উঠে রহমানসায়েব বেরিয়ে গেছেন। তবে জানা গেছে কামালুদ্দিন কক্সবাজার থেকেই ফোন করেছিলেন।

কী যে করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।

রহমান অবশ্য জানিয়েছেন, কাল আমরা কক্সবাজার যাচ্ছি। তার আগে মামার খোঁজ যতটা নেওয়া যায়, নিচ্ছেন।

'শাজাহান' স্টিমার থেকে যাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, তাদের জেরা করে বেশ কিছু নাম পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পুলিশ তাদের সন্ধান করছে। প্রায় দশজন ধরা পড়েছে, বাকি দুজন বেপাত্তা।

শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছি আর সাত-পাঁচ ভাবছি।

আবার মোবাইল। নির্ঘাত রহমান ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করে চেক করছেন।

এ কী! এ যে সম্পূর্ণ অচেনা নম্বর!

—হ্যালো।

—কে?

—আপনি কে?

—আরে কন না, আপনি কি অর্ণব, মানে টুকলু?

—এর মানেটা কী? আপনি কে বলছেন, সেটা আগে বলবেন তো। ফোন আপনি করেছেন।

—বুইজ্যা ফ্যালাইছি। আপনি টুকলু। না হইলে এমন শুদ্ধ ভাষা বারাইত না। ধরেন, কথা কন।

সর্বনাশ! আবার ঘামতে শুরু করেছি। ভাষা দিয়ে ধরে ফেলল। ফোনটা কেটে দেব কিনা ভাবছি! সেইসময় ওপার থেকে ভেসে এল,—হ্যালো!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছি। আনন্দে পাগল-পাগল লাগছে।

জগুমামা!

—মামা! মামা! তুমি কোথায়?

কিন্তু অন্যপ্রান্তে নি:শব্দ, উত্তর এল না।

৮

একেবারে তীরে এসে তরী ডুবল! নির্ঘাৎ জগুমামার গলা। একবার শুনলেও আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্ট। মামা কোত্থেকে ফোন করলেন? সঙ্গের লোকটি কে? যে-ই হোক, যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তবে কি কিডন্যাপারদের কেউ?

প্রবল অস্থিরতায় আমি ছটফট করছি ঘরের মধ্যে। আর কি ফোন আসবে না? হয়তো ইচ্ছে করেই আমায় ধরার জন্যে মামাকে জোর করে...

ধ্যুৎ! আমি একটা হাঁদা! উত্তেজনার চোটে সামান্য বুদ্ধিটুকুও মাথায় আসেনি।

এক ঝটকায় মোবাইল ফোনটাকে হাতে তুলে নিলাম। বেরিয়ে গেল 'লাস্ট রিসিভড কল'। ঘরের ইন্টারকম-টেলিফোনে ডায়াল করলাম।

—হ্যালো, রিসেপশন?

—জি।

—৬১৪৫৮৩ এই নাম্বারটা কোথাকার বলতে পারেন? মানে বাংলাদেশের কোন শহরের?

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি।

—জি। এই শহরের।

—থ্যাঙ্কিউ। কাইন্ডলি একটু ধরে দেবেন? আবার বলছি—৬১৪৫৮৩।

ফোন ধরে আছি। না:। এনগেজড টোন।

রিসেপশনকে বললাম,—কাইন্ডলি বারবার চেষ্টা করুন। খুব জরুরি।

—জি সার।

'ক্রু ক-ক্রু ক!'

—হ্যালো, লাইন পাইছি। পাবলিক টেলিফোন বুথ। কথা কন।

হ্যালো...! —উত্তেজনায় কাঁপছি।

—জি। কে কইতাছেন?

—শুনুন, মিনিট পাঁচেক আগে আপনার নাম্বার থেকে আমার মোবাইল ফোনে একটা কল এসেছিল। কিন্তু ফোনটা কেটে গেছিল। যারা করেছিল, তারা কি ওখানে আছে?

—একমিনিট ধরেন।...

ফোনের মধ্যে অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। তারপরেই...

—নেন, কথা কন। ...হ্যালো!

—মামা! মা-মা!

—টুকলু! তুই কোথায়?

—চট্টগ্রামে। তুমি কি একা? আগেরবার কে ধরেছিল ফোন?

—তুই যা ভাবছিস, তা নয় রে । বন্ধু লোক, খুব উপকার করেছেন। সব বলব। তুই কোথায়?

—হোটেল সাফিনা। শিগগির চলে এসো।

—আসছি। আসছি।

হোটেলের ঘরে একা-একাই দুপাক নেচে নিলাম। কী যে আনন্দ হচ্ছে, বোঝাতে পারব না।

ঘরের কলিংবেলটা বেজে উঠল।

সামনে রহমানসায়েব। আনন্দে তাঁকে জড়িয়েই ধরলাম,—রহমানসায়েব! জগুমামা ফ্রি!

—ইনশাল্লা! কও কী?

—হ্যাঁ। এখানে এসে গেছেন। ফোন করেছিলেন।

পুলিশের বড়কর্তা মসিয়ার রহমানের মুখচোখের চেহারাও পালটে গেল। শিশুর মতো লাফালাফি শুরু করে দিলেন।

কয়েক মিনিট পর আবেগ একটু কমতে রহমান বললেন,—তাইলে একবার ফুন কইরা জানাইয়া দিই।

—হেড কোয়ার্টারে করুন। তবে হাই কমিশনে এখনই দরকার নেই। কোনওভাবে খবরটা লিক আউট হলে—

—রাইট! ঠিক কইছ।

—'শাজাহান' বার্জ থেকে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে, তাদের কাছ থেকে জেরায় কী-কী জানা গেছে, সেটাও জানতে হবে। তবে আমার কী মনে হয় জানেন, লেট জগুমামা কাম। উনি যখন এসে যাচ্ছেন, তখন ওনার সঙ্গে পরামর্শ করে এগোনো ভালো।

রহমান ঘাড় নাড়লেন,—হ। এডাও ঠিক কইছ। তুমার মাথাখান বড় পরিষ্কার।

—আরেকটা কথাও মনে হচ্ছে রহমানসায়েব।সর্ষের মধ্যে ভূত থাকাও আশ্চর্য নয়। এখানকার পুলিশের কাছে জগুমামার পরিচয় দেওয়া ঠিক হবে না।

আবার কলিংবেলের টুং-টাং। সাদা পোশাকের পুলিশ কনস্টেবল বলল,—ছার, আপনের সাথে কি অর্ণব ভটচাজ নামের কেউ আছেন?

আমি ততক্ষণে দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে চিনে ফেলেছি বিচিত্রবেশী জগুমামাকে।

কফির সঙ্গে চিকেন পকোড়া। সিগারেটও আনানো হয়েছে।

জগুমামা একটা সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরালেন। জোরে-জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন,—উফ, বাঁচলাম! হেরোইনের চেয়েও খারাপ নেশা। শরীরে নিকোটিন লেভেল কমে গেলে মগজও কাজ করে না। এই দুদিন একটাও খাইনি, ভাবতে পারিস?

—বেশ হয়েছে। এই সুযোগে তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন পরপর বলো তো।

—বলছি,বলছি। তার আগে তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওর নাম ফিরদৌস হোসেন। ডক্টর আমেদের ছাত্র। কলেজে পড়ায়। স্টিমারে ওর সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারতাম কিনা জানি না।

ফিরদৌস সলজ্জভাবে বললেন,—কী যে কন, মুখার্জিসায়েব। আপনেই তো আমারে ইস্টিমার থেকে নাইমা ধরলেন। তবে হ, আপনারে দেইখা চিনতে কিন্তু ভুল করি নাই।

—ইয়েস মাই ডিয়ার। ওটাই টার্নিং পয়েন্ট।

—ও:, জগুমামা, প্লিজ বলো।

—বলছি রে বাবা। হ্যাঁ, একটা অভিজ্ঞতা বটে।...

জগুমামা বলে চললেন। অবিকল যেন সিনেমা।...

জগুমামার বলা শেষ হতে রহমান এদিককার খবরাখবর জানাতে শুরু করলেন।

একবার জগুমামা বলেছেন,—আমেদের ভাই সম্পর্কে আর কোনও খোঁজখবর পেয়েছেন?

—খুব অল্প। কওনের মতো নয়। ডক্টর আমেদের লগেই থাকে। কক্সবাজারে। ছুটখাট ব্যবসাপাতি করে। তবে ল্যাখাপড়া বেশিদূর আগায় নাই।

খবরাখবর আপাতত শেষ। বেশ কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। জগুমামা সোফায় আধশোয়া।

একটু পরে মুখ খুললেন। কতকটা নিজের মনেই বললেন,—একটা কথাই ভাবছি। ইব্রাহিমের ডেরায় যে বন্দি হয়ে আছে, সে কি ডক্টর আমেদ! কিন্তু চিনতে পারল না কেন? ওর কি স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে? ওই জায়গাটা এখনই রেইড করা দরকার। ...মিস্টার রহমান, লাইনটা ধরুন। ডিজিসায়েবকে আগে পুরো রিপোর্ট দিন। ...তারপর আমি কথা বলব।

—রাইট সার।

কয়েকমিনিট নিচুগলায় কথা বলে ফোনটা মামার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

—হ্যালো। হ্যাঁ, আপনাদের দোয়ায় বেঁচে ফিরেছি। এইবার আমাদের কাউন্টার অ্যাকশনে যেতে হবে। আমার ফেরার খবরটা টোটালি সিক্রেট রাখতে হবে। আপনি ছাড়া কেউ জানছে না। নোও! ইন্ডিয়ান হাই কমিশনও নয়! আপনি বরিশালের 'ভোলা' শহরের দক্ষিণদিক ধরে চিরুনি তল্লাশি শুরু করুন। আপনাদের হেড কোয়ার্টার থেকে পুলিশ ফোর্স পাঠান। ইয়েস, নদী-খাল এবং তার পাশের গ্রামগুলো। অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা পুরো গ্রাম। বনজঙ্গলে ভর্তি। ...না, কোনও নাম দেখতে পাইনি। খড়ের গাদায় আপনাদের সুচ খুঁজতে হবে।...আজ এখানেই থাকছি। ওকে।...ছাড়ছি।...

—তাহলে আমাদের আরেকটা রুম লাগবে। কী বলো মামা?

মামা ঘাড় নাড়লেন।

—ভাইডি, হোটেলে কওনের আগে তো ফিরদৌসভায়ের পারমিশন লইতে হইব। সার, কী করবেন? বাসায় যাইবেন, না এহানে থাকবেন?

ফিরদৌস একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

—আমার ফেমিলি তো এইহানেই। তাদের ছাইড়া...আপনেরা কি চান, আমি আপনাগো সাথে কক্সবাজার যাই? মুখার্জিসায়েব?

—অবশ্যই। তোমায় তো ডক্টর আমেদের ডেরা পর্যন্ত যেতেই হবে। আমি তো আমেদ ছাড়া আর কাউকে চিনি না। কী বলেন রহমানসায়েব?

—অ্যাক্কেরে হক কথা।

ফিরদৌসের মুখে একটু চিন্তার রেখা ফুটল।

—ঠিক আছে। ...কলেজে কওয়া নাই। যাউগ্যা, হে ম্যানেজ হইয়া যাইব। আমি তবে যাই, বিবিরে কইয়া আসি। হোমফ্রন্টকে না কইলে সর্বনাশ।

—তাই যাও। ভালো করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এসো বৌমাকে। এসব ব্যাপার, খবরদার, কিছু বলবে না।

ফিরদৌস ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মসিয়ার রহমান। বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

আমরা অবাক।

—কী ব্যাপার রহমানসায়েব? কোথায় গেছিলেন?

—হানিফরে কইয়া আলাম ফিরদৌসরে ফলো করনের লগে। দ্যাখেন সার, এই লুকডারে আপনে কতটুক চিনেন? ক-ঘণ্টার আলাপ! হ্যার ঘর দ্যাখলে বুঝা যাইবে, হে সত্য কথা কইত্যাছে কিনা।

—ভেরি গুড। একদম ঠিক কথা বলেছেন। আপনাকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টের পুলিশ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব ভালো নয়। অধিকাংশ কোরাপ্ট, নয়তো দায়সারাভাবে কাজ করে। তবে ব্যতিক্রম যে আছে, আপনি তার প্রমাণ।

৯

পিড়িং...পিড়িং...পিড়িং...

—হ্যালো।

—হ্যালো, মুখার্জিসায়েব?

—না। আমি অর্ণব।

—আমি হেড কোয়ার্টার থিকা কইত্যাছি। ডক্টর মুখার্জিরে দ্যান।

—অসুবিধে আছে। আমায় বলুন।

—বলার অর্ডার নাই। উনারে চাই।

—বলছি তো, অসুবিধে আছে। আমাকেই বলতে হবে।

ওপাশে নীরবতা। তবে লাইন কাটেনি। অর্থাৎ যিনি ফোন করেছেন, তিনি সময় নিচ্ছেন। কথা বলছেন। জড়ানো কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

ফোন কানে দিয়ে কুলকুল করে ঘামছি। বাসসুদ্ধু লোক এদিকে তাকাচ্ছে।

সকাল সাতটা। সৌদিয়া চেয়ারকার ছুটছে কক্সবাজারের দিকে। ঘণ্টাখানেক আগে চট্টগ্রাম ছেড়েছি।

বাসে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। জগুমামা আর ফিরদৌস বসেছেন সামনের দিকে। রহমানসায়েবের সঙ্গে আমি পিছনে। রহমানের শাগরেদরা এদিক-ওদিক।

জগুমামার গালে দাড়ি আরও ঘন। মাথায় সেই নামাজি টুপি। বুশর্শাট, লুঙি পরনে। এমনকী চশমাটাও বুকপকেটে লুকোনো।

একই বাসে একসঙ্গে যাচ্ছি। অথচ কেউ যেন কাউকে চিনি না! এই প্ল্যানটা জগুমামার। ক্রিমিন্যালদের চোখে ধুলো দিতে এই প্রোটেকশন।

হঠাৎ আমায় বিশ্রী জাঁতাকলে ফেলে দিয়েছে এই কল। হেড কোয়ার্টার মানে নিশ্চয়ই পুলিশের খাসদপ্তর। ওঁরা জেনে গেছেন, জগুমামা ফিরে এসেছেন। একসঙ্গেই যাচ্ছেন কক্সবাজার। হয়তো কোনও জরুরি খবর আছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার পক্ষে এখন মোবাইল জগুমামাকে দেওয়া অসম্ভব। সব ভেস্তে যাবে।

ফোনের মধ্যে মিউজিক বাজছে। কী করব? অফ করে দেব?

বাজনা থেমে গেল। অন্য ভরাট গলা,—হ্যালোউ...!

—বলুন।

—আপনে কি মুখার্জিসায়েবের ভাইগ্না?

—হ্যাঁ।

—মুখার্জিসায়েব পাশে নাই?

—না।

—তাইনের সাথে কখন কথা কওয়া যায়?

—মনে হয়, কক্সবাজারে পৌঁছতে ঘণ্টাতিনেক লাগবে। তার আগে হবে না।

—ঠিক আছে। আপনে শুইনা রাখেন, পদ্মায় ওই স্টিমার থিকা যে শয়তানগুলা ধরা পড়ছে, অরা সব স্বীকার গেছে। অরা ওরিজিন্যালি ড্রাগ চালান করে। তবে অগো বস হুকুম দিছিল, তয় লুকটারে গুম করছিল। আর কিছু অরা জানে না। ঢাকা থিকা অপর গ্যাং লুকটারে লইয়া যায়। এইডাও জানছি, অগো মেন অপারেশন পয়েন্ট টেকনাফ।

—সে কোথায়?

—আপনেরা চেনবেন না। আমাগো দ্যাশ আর বার্মার বর্ডারে লাস্ট পয়েন্ট। কক্সবাজারের আরও সাউথে। যাউগ্যা, এইটুকানই মুখার্জিসায়েবরে অবসরমতো কইয়া দিবেন। পরে ফুন করব। ছাড়ি।...

বাপরে! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তবে ছাড়ল কই? যেটুকু শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে কক্সবাজারে আমাদের অপারেশন শেষ হচ্ছে না।

বাস ছুটে চলেছে তেলতেলে মসৃণ হাইওয়ে দিয়ে...। ভূগোল জ্ঞান আমায় বলে দিচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকেছি। দুদিকে উঁচুনিচু পাহাড়। মাঝে-মাঝে কুয়াশা দলা পাকিয়ে আছে। সব ঝাপসা। বাইরে যে ভালো ঠান্ডা, বোঝা যায় জামাকাপড়ে ঢাকা মানুষজন দেখে। আরও বোঝা যায়, আমরা মায়ানমারের কাছে এসে পড়েছি। মানুষদের চেহারায় মঙ্গোলীয় আদল।

হঠাৎ লোকটার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। একঝলক দেখেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

লোকটার সিট আমার ঠিক আগের পাশের রো-এ। কোনাকুনি। বাসে ওঠার পর থেকে লক্ষ করেছি, একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে জগুমামার দিকে। মামা সামনে। এখান থেকে তাঁর ঘাড় ও পিছন ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু লোকটা আদেখলের মতো দেখছে। বারদুয়েক উঠে কন্ডাকটর-ড্রাইভারের সঙ্গে কী যেন গুজগুজ করে এল। আমি সিওর, ওটা ওর ছুতো। কথা বলতে-বলতে ও মামাকে চেনার চেষ্টা করছে।

কিন্তু কেন? লোকটা কে? ক্রিমিন্যালদের খোঁচড়?

মনের মধ্যে ছটফটানি শুরু হয়েছে। মামা কি ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন?

কখন মামাকে বলতে পারব? সেই কক্সবাজার পৌঁছে? চেপে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

জানি না, দৈব বলে কিছু আছে কিনা। আমার ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেল।

একটু পরেই বাসটা স্পিড কমিয়ে ঢুকে পড়ল হাইওয়ের একটা পেট্রল পাম্পে।

কন্ডাক্টর গেট খুলে দিয়ে বলল,—এঞ্জিনে কিছু গড়বড় হইছে। আপনেরা ছা-পানি খাইয়া লন। আধাঘণ্টা লাগব।

কী আনন্দ! তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছি। একটু বেচাল হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

প্যাসেঞ্জাররা সবাই পরপর নামছে নীচে। মামা, ফিরদৌস আগেই নেমে পড়েছেন।

জায়গাটার নাম চকরিয়া। বেশ জমজমাট গঞ্জ-শহর। পাম্পের পর থেকেই শুরু হয়েছে দোকান-হোটেল-রেস্তোরাঁ-বাজার। চা-খাবারের স্টলগুলো থেকে লোকজন চেঁচাচ্ছে,—আয়েন, আয়েন।

আনমনাভাবে এদিক-ওদিক দেখছি। চোখ রয়েছে মামাদের দিকে। কিন্তু মামা একবারও তাকাচ্ছেন না। তাই চোখের ইশারায় কিছু বলা যাচ্ছে না।

মামারা কথা বলতে-বলতে রাস্তা পেরিয়ে শহরের দিকে এগোচ্ছেন। খানিকটা দূরত্ব রেখে আমরাও পিছনে।

পেট্রল পাম্প থেকে বেশ দূরে, একটা বার্মিজ রেস্তোরাঁ। মামা, ফিরদৌস সেখানে ঢুকলেন। আমরাও।

রেস্তোরাঁ ফাঁকা। খদ্দের নেই। তবুও একটু দূরত্ব রেখে বসেছি।

আর থাকতে পারছিলাম না। বলেই ফেললাম,—একটা লোক সারাক্ষণ বাসে তোমায় অবজার্ভ করছিল, দেখেছ?

হ্যাঁ।—জগুমামা বললেন,—আমারও অবাক লাগছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ওকে আমারও চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি। ভালো করে ভেবে দ্যাখ তো, ওকে চিনতে পারিস কিনা।

আমি? উঁহু, আদৌ চেনা লাগছে না।

আধময়লা গায়ের রং। ক্লিনশেভড চোখাচাখা মুখ। মাথায় ফেজ টুপি। চোখদুটো বেশ উজ্জ্বল। একে কখনও দেখিনি।

—মামা, আসল কথাটাই বলা হয়নি। পুলিশের হেড কোয়ার্টার থেকে তোমার ফোন এসেছিল।

—বুঝেছি। তুই হুঁ-হাঁ করছিলি। কী বলল?

—তোমায় ধরে দিচ্ছি। তুমি নিজেই শোনো। উ:, তখন আমার যা অবস্থা হয়েছিল!

'রিসিভ নাম্বার' দেখে কল টিপলাম। তারপর মোবাইল ফোন ধরিয়ে দিলাম জগুমামার হাতে।

'বার্মিজ চা' সার্ভ করে গেছে। রং, স্বাদ দুই-ই অন্যরকম। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে জগুমামা নিচুগলায় কথা বলে যাচ্ছেন।

চা প্রায় শেষ, এমনসময় কাণ্ডটা ঘটল। সেই 'লোকটা' রেস্তোরাঁর স্যুইং ডোর ঠেলে ঢুকে এল ভিতরে।

কী যে অবস্থা, কহতব্য নয়। আমার সেলফোন মামার হাতে। একেবারে 'রেড হ্যান্ডেড কট'।

বুকের মধ্যে ধকধক করছে। খালি মনে হচ্ছে, লোকটা যদি কিছু বলে বা করে!

মসিয়ার রহমানের উপস্থিত বুদ্ধির জবাব নেই। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন,—চল খুকন। ... তারপর মামাদের দিকে তাকিয়ে 'হোসেনভাই, আমরা আগাই। আপনেরা আসেন। শ্যাষ হইলে ফুনটা দিবেন।' বলে আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

একটু দূরে ওঁর সহকারীরা অন্য দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। রহমান তাদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে নিচুগলায় বললেন,—মুখার্জিসায়েব ভিতরে। ওয়াচ রাইখ।

এতক্ষণে আমার শ্বাস পড়ল। হনহনিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চলে এলাম পেট্রল পাম্পে।

ড্রাইভার বললেন, বাসের গোলমাল সারানো শেষ। কক্সবাজার এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ।

পথেঘাটে নানারকম লোক চলাচল করছে। কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুও আছেন। মঙ্গোলীয় চেহারার ছাপ।

—চলো, ভিতরে উইঠা বসন যাক।

—মামারা?

—আইসা পড়বেন। চিন্তা কইরো না।

রহমানসায়েব বাসের পাদানির দ্বিতীয় ধাপে পা রেখেছেন, আমি প্রথম ধাপে—আমার কাঁধে হাত।

কারেন্ট খেলাম। সেই, সে-ই লোকটা!

—ক-কে আপনি?

ভাইডি,—লোকটা মোলায়েম গলায় বলল,—একডা কথা কমু? ওই মানুষডা তোমাগো পরিচিত?

—কে? কে মানুষ?

—ওই-ওই যে লুঙ্গি-জামা। তোমাগো সাথে বইসা ছা খাইতেছিলেন, তাইনের কথা কইতাছি।

—নাতো। আমি কাউকেই চিনি না। আমি কলকাতায় থাকি, ইনি আমার ফুফা। ওনার কাছে বেড়াতে এসেছি।

কেন কন তো?—রহমানসায়েবও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

না, আসলে,—লোকটা চিন্তিতমুখে বলল,—তাইনের সাথে আমার এক পরিচিতজনের খুব মিল। শুধু দাড়ি, বেশভূষা—

—আপনি কে?

আমি? —লোকটা একটু থতমত খেল। ম্লান হেসে বলল,—আমি একজন মানুষ। আপনেগো মতোই। আচ্ছা।...আমারই ভুল হইছে।

কক্সবাজারে সন্ধ্যা। ঠিক কোন কবিতায় পড়েছি, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎ স্মৃতিতে 'ভুস' করে উঠেছে।

সত্যি, কক্সবাজারের তুলনা নেই। সাধে কি আর সাদা চামড়ার এত ভিড়। এমন সোনালি চওড়া সৈকত পৃথিবীতে ক'টা আছে! মসৃণ বালি চিকচিক করছে। দুই বিপরীত প্রকৃতি, পাহাড় আর সাগর পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে এখানে এসেই। পুবে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়ের সারি, পশ্চিমে আধখানা চাঁদের মতো বেলাভূমি —যতদূর চোখ যায়। স্বচ্ছ নীল ঢেউ লুটোপুটি খাচ্ছে। এখানে সূর্য ওঠে পাহাড় ডিঙিয়ে, ডুব দেয় বঙ্গোপসাগরে।

এখন সূর্য ডোবার সময়। গোধূলির মায়াবী আলো ফুটে আছে চরাচরে। আদিগন্ত সাগরে নীল-কমলার খেলা।

এই সৈকতশহরের বাসিন্দারাও নানা জাতির, নানা ধর্মের। চোখের সামনে দেখছি, প্রচুর বৌদ্ধভিক্ষু, উপজাতি, বার্মিজ, বাঙালি চলাচল করছে। মনে হয়, অন্য কোনও দেশে এসে পড়েছি।

কী ভাবো? —মসিয়ার রহমান কখন এসে দাঁড়িয়েছেন।

—না, কিছু না। এত সুন্দর জায়গা, দেখছিলাম। আপনি কখন উঠেছেন?

—হেই তো। দুফরে খাওয়াডা জবর হইয়া গেছিল গিয়া। শুইতেই কহন যে চুখ জড়াইয়া আইল, মালুম পাই নাই। অরা ফিরছেন?

—না। সেইজন্যেই তো—

বলতে-বলতেই দেখলাম, ফিরদৌস হোসেন আর জগুমামা হনহন করে আসছেন। না, ওরা দুজন নয়, সঙ্গে আরেকজনও রয়েছেন। আমাদের অচেনা। তিনজন বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন। আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে ঘরের সিটকিনি নামিয়ে দিলাম।

মশয়, বিষয়ডা গভীর সন্দেহজনক।—ফিরদৌস হোসেন রীতিমতো হাঁফাচ্ছেন। জাগ থেকে ঢকঢক করে জল খেলেন। তারপর বললেন,—আমরা যাইলাম তো সারের বাড়ি। নতুন বাড়ি। ক্রিস্টোফার রুডে এট্টু ভিতরের সাইডে। গিয়া দেখি—

জগুমামা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন,—আরে:! আপনিও তো বিদঘুটে লোক। আপনার এই বন্ধুকে এঁরা চেনেন? আলাপ করাবেন না?

সরি সরি। —ফিরদৌস বললেন,—ভুল হইয়া গেছে। আমার দোস্ত নীলকান্ত বড়ুয়া। কলেজে একসাথে পড়ছি। হেও কলেজে পড়ায়। সারের স্টুডেন্টও ছিল। ডক্টর মুখার্জিরে নিয়া অর বাড়ি খুঁইজা বার করলাম। তারপর অরে নিয়া সারের বাড়ি পৌঁছলাম। নীলু, এই বন্ধুডি হইল গিয়া অর্ণব, ডক্টর মুখার্জির ভাইগ্না। আর ইনি পুলিশের হুমড়াচুমড়া রহমানসায়েব।

—লন, এইবার শুরু করেন।

—আরে সায়েব, কমু কী! সারের বাড়িতেও হেই লুকটা! আরটু হইলেই—

ফিরদৌস, আপনি সিরিয়্যালি বলুন। —জগুমামা বেশ বিরক্ত,—খামচা-খামচা বললে ওরা বুঝবেন কী করে?

নীলকান্ত বড়ুয়া বললেন, —অ্যাক্কেরে হক কইছেন মুখাজ্জিসার। অ্যাত বয়স হইল, অ্যাহনও গোছাইয়া কইতে পারে না। কী কইরা যে কলেজে সে ক্লাস লয়, হেই জানে। অর কওনের দরকার নাই, আপনিই কন।

ফিরদৌস রেগে গেলেন। তাঁর কথা আটকে গেল,—দ-দ্যাখ নীলু, ফ-ফাজলামি করস না। আগাপিছা জানস না, খামকা দালালি করস। জানস, কী সিরিয়াস বিষয়? জানস, শয়তানগুলান ডক্টর মুখার্জিরে—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনে শান্ত হন হোসেনভাই। মুখার্জিসায়েব, আপনি কন তো কী হইছে।

জগুমামা বললেন,—আমরা তিনজন পৌঁছলাম আমেদের বাড়ি। বাগান-পুকুর, বাউন্ডারি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জমির ওপর ছিমছাম বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। কাছে গিয়ে দেখি, নিঝঝুম। বাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ। বাইরে কোনও তালা ঝুলছে না। বাগানের গেটেও ভিতর থেকে সিটকিনি ফেলা। এর অর্থ, ভিতরে কেউ-না-কেউ আছে। ফিরদৌস আর নীলকান্ত খুব ডাকাডাকি শুরু করল। প্রথমে 'স্যার' 'স্যার' করে, তারপর 'কামালভাই' 'কামালভাই' করে, সবশেষে 'চাচিমা' 'চাচিমা' করে।

—চাচিমা! ডক্টর আমেদ তো বিয়া-শাদি করেন নাই।

—ওরা আমেদের মাকে 'চাচিমা' বলে ডাকত। অত হাঁকডাকেও কাজ হল না। কেউ বেরিয়ে এল না! আমরা কী করব, ভাবছি। একবার ভাবলাম, হাত গলিয়ে সিটকিনিটা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ি। বাড়ির দরজায় পৌঁছে ধাক্কা দিই। তারপর ভাবলাম, যদি অন্যরকম কিছু ঘটে থাকে। যদি ক্রিমিন্যালরা বাড়িতে থাকে! এইসময়, অল্পবয়সি একটা মেয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হয়, কাজের মেয়ে। আমাদের তিনজনকে দেখে জিগ্যেস করল আমাদের পরিচয়। বললাম। সে বলল, বাড়িতে এখন কেউ নেই। শুধু আমেদের বুড়ি মা আছেন। তিনি কানে কম শোনেন, চোখেও প্রায় দেখেন না। ফিরদৌস চেপে ধরল, দেখা

করবে। প্রথমে রাজি হয় না। শেষে অনেক বোঝাবার পর নিমরাজি হল। বাড়ির দরজাতেও দেখলাম, বাইরে থেকে খোলার ব্যবস্থা আছে। ভিতর থেকে সিটকিনি সোজা করে তোলা আছে। একটু টানতেই পড়ে গেল।

আমাদের ওখানে দাঁড়াতে বলে মেয়েটা বাড়িতে ঢুকে গেল। একটু পরে ওর সঙ্গে এক বৃদ্ধা এলেন। আমেদের মা। ফিরদৌস-নীলকান্ত নিজেদের পরিচয় দিয়ে আমেদের কথা জিগ্যেস করল। বৃদ্ধ রেগে উঠলেন, 'তোমরা জানো না, তারে পাওয়া যাচ্ছে না? পেপারে বারাইছে!' ওরা বলল, হ্যাঁ, সেটা দেখেছে। তবে তিনি যে এখনও ফিরে আসেননি, জানে না। তারপর আমেদের ভাই কামালুদ্দিনের কথা জিগ্যেস করল। বৃদ্ধা স্পষ্ট বলে দিলেন, সে-ও নেই। কোথায় গেছে, জানেন না। প্রায়ই সে এদিক-ওদিক চলে যায়। কিছু বলে যায় না।

—তারপর?

—তারপর আর কী? আমেদের মা ভিতরে চলে গেলেন। কাজের মেয়েটা আমাদের বের করে দিয়ে গ্রিলগেট ফের আটকে দিল। একরকম হতাশ হয়ে যখন ফিরছি, তখনই মোক্ষম ঘটনাটা ঘটল। একেবারে অপ্রত্যাশিত।

—কী?

কিন্তু জগুমামা জবাব দেওয়ার আগেই 'পান্থনিবাস'-এ আরেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

একটা 'কালো ছায়া'র মতন উড়ন্ত প্রাণী জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে 'ইয়াল্লা' বলে আর্তনাদ ছেড়ে লাফ মারলেন ফিরদৌস হোসেন। সোফার সামনের সেন্টার টেবিল উলটে গেল। ফিরদৌস সোজা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন খাটের তলায়।

সবাই ভ্যাবাচাকা। মামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—কী হয়েছে?

—ছাম! ছামছিকা! ওরে ব্বাপ!

আমরা ধাতস্থ হয়ে তাকিয়েছি ঘরের মধ্যে। হ্যাঁ, কোত্থেকে একটা চামচিকে এসে পড়েছে আলোয়। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল অন্ধের মতো পাক খাচ্ছে।

ফিরদৌসের বন্ধু নীলকান্তর অবস্থাও খারাপ। খাটের নীচে আর জায়গা নেই। তাই উবু হয়ে মেঝেয় বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে দিয়েছেন। মাঝে-মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছেন, 'হুস! হুস!'

দুই বন্ধুতে খুব মিল।

তলা থেকে ফিরদৌসের গলা শোনা গেল,—কী হইল? ওইডা গেছে?

—যাবে কী করে? আলোয় ওরা দেখতে পায় না। নিশাচর প্রাণী, জানেন না? ঘরের আলো নিভিয়ে একটু ওয়েট করলেই—

—না—না—না, উস-স-স...বাবারে! আল্লার কসম, বাতি নিবাইবেন না। তাড়ান, কিছু দিয়া বাড়ি মাইরা ওডারে ভাগান।

হ্যাঁ সার, প্লিজ।—নীলকান্ত বিড়বিড় করলেন।

—কী বলছেন? নিরীহ প্রাণী, ঘা মারলে মরেই যাবে। আচ্ছা লোক তো আপনারা!...আলো নেবালে ক্ষতিটা কী?

—না-আ-নো-ও-ও সার! বাতি নিবাইলেই—ওডা আইসা খুন চুষব।

—খুন! রক্ত? কী বলছেন?

—সার, ফিরদৌস ঠিকই কইছে। এগুলো ভ্যাম্পায়ারের বাচ্ছা। রক্তচুষা বাদুড়!

—ওফ, অসহ্য! দুটো বুড়ো ধাড়ি, কী শুরু করলেন বলুন তো! রহমানসায়েব, আপনি দরজাটা খুলুন। নীলকান্তবাবু, যান, আস্তে আস্তে বেরিয়ে যান।

—আমি? আমার কী হইব?

—আপনিও বেরিয়ে আসুন। কোনও ভয় নেই, আমি গার্ড দিচ্ছি। হ্যাঁ... হামাগুড়ি দিয়েই বেরোন...ওই যে দরজা...।

দুটোই হামাগুড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট তিনেক পরে জগুমামা ডাক দিলেন,—আসুন। গেছে।

দুই মূর্তিমান শঙ্কিতচোখে তাকাতে-তাকাতে ঢুকল। ফিরদৌস অস্ফুটে বলে উঠলেন,—পানি!

জগুমামা ভর্ৎসনার সুরে বললেন,—লজ্জা করে না? আপনারা এত বড় মানুষ, ওইটুকু পুঁচকে প্রাণী। আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র না?

ফিরদৌস বললেন,—আমাগো ছামছিকায় বরাবরের অ্যালার্জি সার।

নীলকান্ত বললেন,—সার, আমরা পিওর সায়েন্স।

—তাতে কী হয়েছে? জানেন না, বাদুড়, চামচিকে অতি নিরীহ প্রাণী। চামচিকে বাদুড়েরই ছোট জাত। ইংরেজিতে বলে 'টিটমাউস'। ওরা ক্ষতি তো করেই না, উলটে প্রচুর উপকার করে আমাদের। ওরা না থাকলে পোকামাকড়ের ঠেলায় বাঁচতে হত না আমাদের। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত।

—ক-কিন্তু সার, ওই ভ্যাম্পায়ার? বইয়ে পড়ছি, সিনেমায় দ্যাখছি?

—ধ্যস! বানানো গপ্পো সব। আসলে ওদের চেহারাটা এমন বিচ্ছিরি, মানুষই গুজব ছড়িয়েছে। সত্যি, কুসংস্কারের ডিপো।

মসিয়ার রহমান বললেন,—যাউগ্গ্যা। এখন কন, সেই মুক্ষম ঘটনাডা।

—হ্যাঁ। আমরা যখন ফিরব বলে ঘুরেছি, ফিরদৌস আমার হাতে টান মারল। সেই, সে-ই লোকটা। আসার সময় যে সারাক্ষণ আমায় ফলো করছিল।

—কন কী! ওহানেও আপনাগো ফলো করছিল?

—না-না। ফলো করেনি। সে নিজেই আসছিল আমেদের বাড়ির দিকে। কেউ যেন দেখে না ফেলে, ওর হাঁটার মধ্যে এইরকম সতর্কতা ফুটে উঠছিল। ও আমাদের দেখতে পায়নি। তার আগেই গাছের আড়ালে সেঁটে গেছিলাম।

—তারপর?

—লোকটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। উবু হয়ে গ্রিলগেটের ছিটকিনি হাত গলিয়ে খুলল। তারপর বাড়ির দরজার গায়ে গিয়ে কান পাতল। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, লোকটা ওই বাড়িতে এর আগে এসেছে।

কান পেতেই ও তড়াক করে নেমে এল নীচে। ছুটতে-ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এল। গ্রিলগেটটা বন্ধও করে দিল।

—আ-চ্ছা!

—হ্যাঁ। বাড়ির একটু দূরে দাঁড়িয়ে ও অপেক্ষা করছিল। একটু পরে কাজের মেয়েটা দরজা খুলে বেরোল। ভিতর থেকে আমেদের মা বন্ধ করে দিলেন। সে যেতেই লোকটা আবার ঢুকে পড়ল। এবার একেবারে বাড়ির মধ্যে।

—কন কী?

—হ্যাঁ। আমরা কী করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পাঁচিলের পাশ দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেলাম। কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সঙ্গে অস্পষ্ট কথাবার্তা।

—কান্না! কথায় কিছু বুঝতে পারলে?

—নারে টুকলু। মাঝে মাঝে শুধু বুড়ি বিলাপ করছিল, 'হায় আল্লা, হায় কপাল'। লোকটা খুবই নিচুগলায় কথা বলছিল। বুড়িকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। মিনিট পনেরো পরে বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল। চুপি-চুপি বাগানের গেট খুলে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটা দিল।

—আপনেরা তারে ফলো করেন নাই?

ফিরদৌস সোজা হয়ে বসলেন,—কন কী! আপনার মাথা খারাপ হইছে!

—মাথা খারাপ তো আপনাগো! যত্তসব ডরপোক। আপনি কন তো মুখার্জিসায়েব, আপনের ধারণা কী?

—অ্যাপারেন্টলি লোকটা বোধহয় খারাপ নয়। আমেদের মায়ের খুব পরিচিত। তাছাড়া—

—তা ছাড়া—?

—তা ছাড়া, লোকটাকে আমি চিনি। কিন্তু কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি না।

—তয় তো আমার মনে হয়, ওই বাড়ির উফর ওয়াচ রাখা উচিত।

—রাইট। আরেকটা ব্যাপারেও আমার খটকা লাগছে। আপনারা যখন চট্টগ্রামে, আমেদের ভাই কামালুদ্দিন টুকলুকে ফোন করেছিল। আপনি তখন খবর নিয়ে জেনেছিলেন, নম্বরটা কক্সবাজারের। তার মানে, সে এখানেই ছিল।...টুকলু, তোর সেলফোনে দ্যাখ তো, সেই নম্বরটা আইডেন্টিফাই করতে পারিস কিনা।

আমি বোতাম টিপে চলেছি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এটাই।

—রহমানসায়েব! রিসেপশনে বলুন এই নাম্বারটা ধরে দিতে। আপনি কথা বলবেন।

মসিয়ার রহমান রিসিভার তুললেন। কিন্তু তার আগেই আমার সেলফোন বাজতে শুরু করল।

—হ্যালোউ।

—কে ভাইগ্না? মামা কই?

—আছেন।

—সুসংবাদ। মামারে কও, বরিশালের ভুলায় ক্রিমিন্যালদের ডেরা মিলছে। ওহানতে একডা শয়তানরে ধরছি। ব্যাটার নাম ইব্রাহিম। ...এট্টু পরে আরও বিস্তারিত জানাইব। ফুনডা মামারে দিয়া রাইখ। কেমন? ছাড়ি।

ফোন কেটে দিলেন। পুলিশের সেই বড়সাহেব।

শুনে মামার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন,—বা:! আস্তে-আস্তে জাল গোটানো যাচ্ছে। এখন নিরুদ্দেশ দুজনের খোঁজ পেলে আর মোটিভ জানতে পারলে অল ক্লিয়ার। রহমানসায়েব, ফোনটা করে কামালুদ্দিনকে চাইবেন।

১১

হ্যালো...

মসিয়ার রহমান কথা শুরু করতেই জগুমামা হ্যান্ডসেট-এর 'স্পিকার ফোন' অন করে দিলেন। বেস-এর মাইক্রোফোন থেকে দুপক্ষের কথাই আমরা শুনতে পাচ্ছি।

—হ্যালো। কামালভাই আছেন?

—পুরা নাম?

—কামালুদ্দিন আমেদ।

—কে কইতাছেন?

—তাইনে আমারে চেনবেন না। উনারে জরুরি খবর দিবার ছিল।

—ধরেন।

অন্য গলা,—হ্যালোও।

—কামালভাই?

—জি। আপনে?

—আমি রহমান। আপনে চেনবেন না। ঢাকা থিকা আইছি। খবর আছে।

—খবর! ...আগে এডা কন তো, হেই নাম্বারডা পাইলেন কোত্থিকা?

—আপনাগো বাসায় গেছিলাম। খালাম্মার লগে আলাপ হইল।

—আম্মা নাম্বার দিল?

—তাইনে দেন নাই। একডা কমবয়সি ছেমড়ি—

—বুঝছি।...

একটু চুপ। নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বকল। তারপর বলল, —কন, কী খবর?

কমু? —রহমান একমুহূর্ত থামলেন । বললেন,—আপনের দাদা, আমেদ ছারের খবর। জানেন নি?

—জানি তো। বাসি খবর। দাদারে কোথাও পাইতেছি না। ফুলিশ খুঁজতাছে, আমরা খুঁজতাছি।

ও খবর নয়। আমেদ ছাররে পাওয়া গেছে। শোনেন কামালভাই,—মসিয়ার রহমান হঠাৎ বোমা ফাটালেন,—আপনের দাদা বর্তমানে আমাগো জিম্মায়।

—হোয়াট? ইমপসিবল! ফাজিল কথা শুনার সময় নাই।

—বিশ্বাস না হয়, কোরেন না। দাদারে যদি ফেরত চান, দেনা-পাওনার কথা কন।

—আপনেরা—আপনেরা দাদারে কিডন্যাপ করছেন? আমি তয় ফুলিশরে—

—কুন লাভ নাই কামালভাই। ফুলিশ আমাগো নূরও ছুঁইতে পারত না।

—কত চান?

—বেশি না। অনলি ফাইভ লাখ।

—পাঁচ লাখ? ইমপসিবল। পারুম না।

—বেশি হইল? আপনে মশায় বড় চিপ্পুস। আমেদছারের প্রপার্টি কম নি? হে সব তো আপনেরই হাতে। ঠিক আছে। ফাইনাল কইয়া দিচ্ছি, লাস্ট তিন লাখ। এক পয়সা কম হইব না। ক্যাশ হাতে হাতে দিবেন, দাদারে জিম্মা নিবেন।

—কবে?

—কালই চাই। আপনের দাদার মতো ফেমাস মানষেরে শহরে নিয়া ঘোরন যায় না। আজ নিয়া আইছি, কাল ডিল না হইলে ফেরত নিয়া যামু। আমেদছারের রিসার্চগুলা ফরেনে পাচার কইরা দিলা কত লাখ-লাখ ডলার পামু জানেন? তবু হাজার হোক আপনে তাইনের ভাই!

কয়েক সেকেন্ড শব্দহীন আবার। তারপর,—ওকে। কহন হ্যান্ডঅভার করবেন?

—অ্যাক্কেরে ভুরে। সানরাইজের আগে।

—কুথায়?

—বিচের ঝাউবন যেহানে শেষ হচ্ছে, ঠিক হেই পয়েন্টে। আমাগো হাতে সাদা কাগজে লিখা থাকব—খোদা হাফেজ। ওইডা সিগন্যাল...গুড নাইট।

ফোন কেটে দিলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ফিরদৌস,—এডা কী হইল?

জগুমামা মিটিমিটি হাসছেন। রহমান বললেন,—কী হইছে? কিছুই হয় নাই। অত একসাইটেড হচ্ছেন ক্যান? হেই প্রভার্ব জানেন না, এভরিথিং ইজ ফেয়ার, ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার? যুদ্ধ শুরু হইয়া গ্যাছে। কামালরে পাইতে হইব।

—কিন্তু, আমেদছার?

—পাওনের দরকার কী? আমাগো একজন, হেই ধরেন আপনে, ছার সাজবেন। কাপড় মুড়ি দিয়া থাকবেন।

—ইয়াল্লা! মইরা যাব! আমি নাই।

—হ, মইরাই থাকেন! ডরপোক একডা। যাউগ্যা, আপনে তো ছারের স্টুডেন্ট ছিলেন। বইলা দেন, কারে আমেদছার সাজাইন্যা যায়।...আমি চেলাগুলানরে ডাকি। একজনরে সিলেক্ট কইরা দেন।

বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। অন্ধকার কেটে-কেটে যখন একটু-একটু করে আলো ফুটতে থাকে, দিনের সেই সময়টাই সবচেয়ে সুন্দর। ব্রাহ্মমুহূর্ত। শুনেছি, বেদ-উপনিষদের যুগে এই সময়েই মুনিঋষিরা ধ্যানে বসতেন। অপার্থিব পরমব্রহ্মের উপাসনা করতেন।

কক্সবাজারের এই সাগরকূলে ঊষাকাল যেন অফুরন্ত রূপ সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। পুরু কুয়াশায় ঢাকা বেলাভূমি, মাঝে-মাঝে ছোটবড় বোল্ডার। তারপর নেতিয়ে পড়ে আছে গাঢ় নীল সাগর। বাঁ-দিকে আবছা নিস্তব্ধ ঝাউবন, উতল হাওয়ায় সবসুদ্ধু বেঁকে যাচ্ছে। ঠিক পিছনে দূরের পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে আলোর দু-চারটে কমলা রেখা।

সুজুকির ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ামাত্র গভীর নীরবতায় ভরে গেল জনপ্রাণীহীন সৈকত।

সোজা বিচ রোড দিয়ে চলে এসেছি। ঝাউবন পেরিয়ে গাড়ি কোনাকুনি বালির ওপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে অনেকটা ঢুকে এসেছে। বেলাভূমি বেশ কঠিন। গাড়ি চলতে পারে।

গাড়ির সব কাচ তোলা। সকলেই গাড়ির মধ্যে। সামনের সিটে ড্রাইভার ছাড়া জগুমামা ও মসিয়ার রহমান। মাঝের সিটে ডানদিক থেকে প্রথমে কালো বোরখায় ঢাকা হানিফ, রহমানসায়েবের প্রধান সহকারী অফিসার। তারপরে আমি, নীলকান্ত এবং ফিরদৌস। পিছনের সিটে বাকি তিনজন অফিসার।

আরোহীদের মধ্যে ফিরদৌস, নীলকান্ত, ড্রাইভার ও আমি ছাড়া আর সকলেই সশস্ত্র। জগুমামাকে যখন দুষ্কৃতীরা কিডন্যাপ করে, সেই সময়েই তাঁর রিভলভার হাতছাড়া হয়। কাল রাতে রহমান তাঁকে একটি জাপানি খুদে রিভলভার দিয়েছেন।

যে-কোনও মুহূর্তে ক্ষুরধার খেলা শুরু হয়ে যাবে।

দু-তিন মিনিট কেটে গেছে...

সামনের বড় বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক মূর্তি। তার পিছনে সাগর, শরীরে আবছা আলো।

রহমান পাকানো কাগজটা সামনের কাচের ওপর চেপে ধরলেন।

কয়েক সেকেন্ড! ওই লোকটি বড় একখণ্ড কাগজ দুহাতে তুলে ধরল।

'খোদা হাফেজ'!

মসিয়ার রহমান গাড়ির দরজা খুললেন। ফিরদৌস ফিসফিস করে বললেন,— এ কামাল নয়।

রহমান নামলেন।

—সালাম আলেইকুম।

—আলাইকুম সালাম। আনছেন?

—জি। টাকা?

—রেডি। হ্যান্ডঅভার করেন।

—কামালভাই কই?

—তারে কী দরকার?

—তার সাথেই কথা হইছিল। তারে চাই।

—ক্যান? টাকা নিবেন, জিম্মা দিবেন।

—না কত্তা, হে হয় না। আমাগো প্রিন্সিপল হইল, যার সাথে সওদা হইব, তারেই দিব। আপনেরে আমরা চিনি না।

—বড় তাজ্জুব কথা! কুনওকালে শুনি নাই।

—অ্যাহন শোনেন। কামালভাইরে ডাকেন।

—আমাগো মানুষডি কোনজন?

—বুরখা ঢাকা। দ্যাখছেন নি?

—বুরখায় ঢাকছেন ক্যান?

—আপনে কি লাইনে নূতন? হেরে খুইলা নিয়ে আসুম, সবাইরে দেখাইতে-দেখাইতে, কন কী!

—অ্যাহন বুরখা খোলেন।

—আগে কামালভায়ের লগে কথা কই, তারপর!

হৃদপিণ্ড ধকধক করছে। জিরো আওয়ার!

পাথরের আড়াল থেকে প্যান্টসার্ট পরা আরেকজন বেরিয়ে এল।

ফিরদৌস—কামাল...! কামাল!

কামাল কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। গর্তে বসা চোখ, চোয়াড়ে চেহারা, ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে। সূর্য আকাশে। আলোয় সব স্পষ্ট। জগুমামা বললেন,—দাদার সঙ্গে মুখের মিল আছে।

কামাল বলল,—কন। কী দরকার?

—আমি রহমান। কাল ফুন করছিলাম। ছাররে আনছি। আপনারে না দেইখ্যা—

—বুঝছি। উনারে হেদিকে পাঠান। যাও, টাকাটা দিয়া আসো।

প্রথম লোকটার হাতে একটি ব্রিফকেস। সে ওদিক থেকে রওনা দিল।

রহমান ইশারা করতেই ডানদিকের দরজা খুলে হানিফকে আলতো ঠেলা দিলাম। হানিফ যেন গড়িয়ে পড়তে-পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর জবুথবু ভঙ্গিতে সামনের দিকে হাঁটছে।

—কী হইল? অর বুরখা তুলেন!

রহমান বললেন,—তাইনে পারব না। হাত-পা সব বান্ধা আছে যে!

ওদিকের লোকটি ব্রিফকেস হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে...হানিফ টলমল করতে-করতে হেঁটে যাচ্ছে কামালের দিকে।

দুজনে খুব কাছাকাছি...একে অপরকে ক্রস করছে...হঠাৎ ওই লোকটা হানিফের বোরখা ধরে টান দিল!

সঙ্গে-সঙ্গে হানিফ বাঁ-হাতে তাকে জাপটে ধরল। রিভলভার-ধরা ডান হাত লোকটার কপালে ঠেকে গেল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম,—নড়াচড়া করছ কী, খুলি ফাটাইয়া দিমু!

মুহূর্তে কামাল অদৃশ্য হয়ে গেছে পাথরের আড়ালে।

কিন্তু এই সর্বনাশা খেলার শেষটুকু যে বাকি, বুঝিনি!

টিউস-স...টিউস-স! গুলির পর গুলি।

হানিফ মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আমরা স্তব্ধ! রহমান উঠে পড়েছেন গাড়িতে। সামনের লোকটা দৌড়তে-দৌড়তে চলে গেল বোল্ডারের পিছনে।

পিছন থেকে শুরু হয়ে গেল গুলিবৃষ্টি...গাড়ির কাচে এসে লাগছে...ঝনঝন করে ভেঙে পড়ছে কাচ...! থরথর করে কাঁপছি! ফিরদৌস-নীলকান্ত ঢুকে গেছে সিটের ফাঁকে।

কয়েক সেকেন্ড।

প্রত্যুত্তরের পালা। আমাদের গাড়ির পিছনের দরজা খুলে গেছে। পুলিশ অফিসারদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠল...

ভয়ংকর রণক্ষেত্র!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, বিচ রোডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা টয়োটা। তার জানালায় সারি-সারি আগ্নেয়াস্ত্রের নল। ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

টয়োটার ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। নিমেষে মুখ ঘুরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এতক্ষণ কেউই নিজেদের মধ্যে ছিলাম না। হানিফ কিছুদূরে পড়ে আছে। ও কি মারা গেছে?

—আমাগোই ভুল। পিছে খেয়াল করা উচিত ছিল।...আচ্ছা, হানিফের তো বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট বান্ধা ছিল!

রহমান গাড়ি থেকে নেমেই ছুটলেন। পিছন পিছন অন্যরা। নামতে যাচ্ছিলাম, মামা ইশারায় নিষেধ করলেন।

বোরখা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মামা নাকের কাছে হাত দিলেন।

রহমানের গলা,—ইনশাল্লা! বাইচা গেছে!

মামা বলছেন,—পায়ে গুলি লেগেছে। তবে ভিতরে ঢোকেনি। মাসল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। রহমানসায়েব, ওকে গাড়িতে তুলুন। এখনি ফার্স্ট-এইড দরকার।

—ওই শয়তানগুলানরে ফলো করবেন না?

—প্রথম কাজ হানিফকে সুস্থ করা। ওরা কি বসে আছে? এক কাজ করুন, ওয়্যারলেসে মেসেজ পাঠান সব থানায়, ফাঁড়িতে।

—কিন্তু হে তো পিছের গাড়িডা। সামনের দুটা, ওই কামাল আর তার শাগরেদডা গেল কই?

—রাইট। চলুন।

মামা ও রহমান ছুটলেন উঁচু বোল্ডারটার দিকে।...

কয়েকমিনিট পরে ফের ইঞ্জিনের গর্জন। সমুদ্রের দিক থেকে একটা মিৎসুবিশি এগিয়ে আসছে।

হকচকিয়ে গেছি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভুল ভাঙল। চালক স্বয়ং মসিয়ার রহমান, পাশে জগুমামা।

মিৎসুবিশি এসে থামল। রহমানের মুখে তৃপ্তির ছাপ,—হারামজাদাগুলান গাড়ি ফ্যালাইয়াই দৌড় দিছে।...ভাই অর্ণব, ফুনডা এটটু দ্যাও। গাড়ির নাম্বারডা জানাইয়া দেই। ...হালায় মালিকরে গলায় গামছা বাঁইধা হাজির করব।

—ঠিক। আপনার অ্যাসাম্পশন মিলেও যেতে পারে। ওই দুটো শয়তান বেশিদূর যেতে পারেনি, যদি না টয়োটায় উঠে পড়ে। আমার মনে হয়, এখনই এই গাড়িটা নিয়ে ধাওয়া করলে—

—রাইট সার! উইঠা পড়েন। শুন, তুমরা হানিফরে লইয়া সিধা হসপিটালে যাও। বেস্ট ট্রিটমেন্ট করাইবা।

বলতে-বলতে সেলফোন নিয়েই গাড়ির মধ্যে উঠে পড়লেন রহমান। পিছনের দরজা খুলে চটপট বসে পড়লাম,—রহমানসায়েব, ফোনটা দিন। নাম্বারটা বলুন, ধরে দিচ্ছি।...

একটা পাক মেরে মিৎসুবিশি বেলাভূমি ছেড়ে বিচ রোডে উঠে পড়ল।

—মুখাজ্জিসায়েব, কুন দিকে যামু? সামনে টেকনাফ, পিছে কক্সবাজার।

—সামনের দিকে তো বটেই।...আরে! দাঁড়ান, দাঁড়ান! এক মিনিট। শুকনো রক্তের ফোঁটা না?

—হাঁ-হাঁ। হেই তো। অগো মধ্যে নিঘঘাত দু-একডা ভালো মতো ইনজিওরড হইছে!

খটখটে রোদ। বাঁদিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঘন সবুজ জঙ্গল, ডানদিকে ঝাউবনের ফাঁকে-ফাঁকে সফেন সাগর। বালির মধ্যে পাথর-বোল্ডার মিশে আছে। ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। কখনও-কখনও পাহাড় বেয়ে চুঁইয়ে আসা রুপোলি ঝরনা কালভার্টের তলা দিয়ে নেমে যাচ্ছে সমুদ্রে।

এত সুন্দর প্রকৃতি চোখকে তৃপ্তি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা কারোরই নেই।

মসিয়ার রহমান নি:শব্দে গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে জগুমামা। ঝুঁকে রয়েছেন জানলা দিয়ে।

আর কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই কেন?

মসিয়ার রহমান বললেন,—কী বেপার কন তো? ভ্যানিশ হইয়া গেল?

জগুমামা গম্ভীরগলায় বললেন,—স্বাভাবিক। গাড়ির ভিতরে ইনজিওরড লোকটাকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। রক্ত গাড়ির মধ্যেই পড়বে।...রহমানসায়েব, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যাওয়ার আর কোনও পথ নেই তো?

—না:! ডাইনদিকে দ্যাহেন, সিবিচের উফর রাস্তা বানানো হইতাছে। আর্মি ক্যাম্প—দ্যাখছেন? আর্মি বানাইতাছে। মেরিন ড্রাইভ। টানা কক্সবাজার টু টেকনাফ। খুব হার্ড বিচ।

—তেমন হলে ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে গাড়িকে নীচে নামতে হবে। পথের পাশে টায়ারের দাগ চোখে পড়ত। মনে হচ্ছে, ওরা এই পথে গেছে।

আবার চুপ। গাড়ির গতি বেশি নয়। নজর রাখতে হচ্ছে। এখনও অবধি এই পথে যানবাহন কম। দু-একখানা গাড়ি, জিপ, ট্রেকার ওদিক থেকে আসছে। মাঝে-মাঝে ওভারটেক করে বেরিয়েও যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত একটাও সাদা টয়োটা চোখে পড়েনি।

—মামা, একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, ডক্টর আমেদের ভাই ক্রিমিন্যালদের লোক?

—ইয়েস। কিন্তু খটকাও লাগছে।

—কেন? সব তো অ্যাহন পানির মতো তরল।

—না।

যদি কামালরা আমেদকে কিডন্যাপ করত, তাহলে আপনার ফোন পেয়ে দাদাকে আজ নিতে আসত না। আমি আমেদকে নিজের চোখে দেখে এসেছি ক্রিমিন্যালদের ডেরায়। তাহলে ওই ক্রিমিন্যালরা কি অন্য গ্যাং? তাদের আমেদকে ধরার মোটিভ কী? ভুলার সেই ইব্রাহিম শুনলাম ধরা পড়েছে ওখান থেকে। তার কাছ থেকে জেরায় কী জানা গেছে, এখনও জানতে পারিনি!...

—মামা, এর সঙ্গে একদম গোড়ার পর্বটাও ধরো। বইমেলার সেই অধ্যাপক সুনীল আচার্যকে কারা হাপিশ করল? কেন?

জগুমামা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ব্রেক কষলেন মসিয়ার রহমান।

জঙ্গল চিরে বেরিয়ে এসেছে একটা ঝরনা। জলস্রোত নামছে। তার ওপরে কালভার্ট। ঠিক তার আগে, বাঁদিকের ঢালু জমিতে চাকার স্পষ্ট দাগ!

খুব আস্তে-আস্তে এগোচ্ছিল গাড়ি। বাঁয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উঁকি মারল একটা গাড়ির পিছন। সাদা টয়োটা মনে হচ্ছে।

স্টার্ট বন্ধ করেই রহমান নামতে যাচ্ছিলেন। জগুমামা তাঁর হাত চেপে ধরলেন,—দাঁড়ান! চারদিক দেখে নিতে দিন। মনে রাখবেন, আপনার অপোনেন্টরা কেউই নিরস্ত্র নয়।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কেউ কি আছে? শুধু ঝিরঝির জলের শব্দ।

উত্তেজনায় রহমান ছটফট করছিলেন। পিছনে ফিরে ফিসফিস করে বললেন,—ফুনডায় ধর। আগের নাম্বার। ফুর্স পাঠাক!...দাও, আমারে দাও!

মামা তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে আছেন জঙ্গলের দিকে। বোধহয় পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করছেন। রহমান ফোনে বিড়বিড় করে কথা বলছেন।

জগুমামা গাড়ির দরজা নি:শব্দে খুললেন। রহমান কী বলতে যাচ্ছিলেন, মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় থামালেন। তারপর বেড়াল-পায়ে নামলেন গুঁড়ি মেরে।

শরীরকে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে মামা এগোচ্ছেন। রহমান বাঁ-দিকে সরে এসেছেন। একটা লাইট মেশিনগান সোজা তাক করে আছেন জানলা দিয়ে।

—ভাইডি, তুমি ড্রাইভিং জানো তো?

—হ্যাঁ। চালাব?

—না না, অ্যাহন না। সামনে চইলা আসো। স্টিয়ারিং-এ বসো। চাবি লও। আমি 'স্টার্ট' কইলেই বামদিকে সিধা চালাইয়া দিবা।

রীতিমতো কাঁপছি। আজ সকাল থেকে যা শুরু হয়েছে, এর শেষ দেখতে পাচ্ছি না।

জগুমামা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। বাঁ-হাত পিছন থেকে সামনে দুবার দোলালেন। সঙ্গে-সঙ্গে রহমান মেশিনগানসুদ্ধু গাড়ি থেকে গড়িয়ে নামলেন। পিছন ফিরে বললেন,—যাই। বি রেডি।

মামা গাড়িটা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন,—শিগগির আসুন!

আমরা তিনজন স্ট্যাচু! এই দৃশ্য কল্পনাও করিনি।

সাদা টয়োটার পাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে এক যুবক। নিস্পন্দ শরীর। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। গাড়ির দরজায়, কাদা জমিতে চাপ-চাপ রক্ত। রক্তের দাগ চলে এসেছে ঝরনার জল পর্যন্ত।

—গুলিটা সোজা বুকে লেগেছিল। মনে হয়, এনকাউন্টারে শট ডেড।

বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক কষ্ট পাক খাচ্ছে। এমন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ যুবক ক্রিমিন্যাল? মুখ দেখে বোঝা অসম্ভব। কত বয়েস হবে। বড়জোর তেইশ-চব্বিশ। হয়তো বাবা-মা-ভাই-বোন আছে, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে আছে। তারা কোনওদিন জানতেও পারবে না। তরতাজা ছেলেটা অজ্ঞাতপরিচয় লাশ হয়ে ঢুকে যাবে পুলিশ-মর্গে। বাড়ির লোকজন বসে থাকবে ওর ফেরার অপেক্ষায়।

এরকম কত ঘটনাই যে এই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে, আমরা জানতেও পারি না।

রহমান ভাবলেশহীন। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বারবার ঘুরে যাচ্ছেন সবদিকে। বললেন,—বাকিগুলান কই? অ্যারে এহানে ফ্যালাইয়া গেল ক্যান? জঙ্গলে ঢুকছে?

জগুমামা ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,—মনে হয় না। মাফিয়া গ্যাংদের কিছু অলিখিত মোডাস অপারেন্ডি আছে। যে গেছে, সে গেছে। তার জন্য বাকিরা কখনও বিপদের ঝুঁকি নেবে না। যদি এর শরীরে প্রাণ থাকত, তবে পরিস্থিতি অন্য হত।

—কী মনে হয়?

—ওরা চম্পট দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে, এই টয়োটা নিরাপদ নয়। পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। টয়োটা দেখলেই পুলিশ সার্চ করবে। তাই লাশসুদ্ধু গাড়িটা জঙ্গলে ফেলে গেছে।

—যাবে কী কইরা? পায়দলে?

—সরি রহমানসায়েব! আপনার আই কিউ বোধহয় কাজ করছে না! ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমাদের যেমন সেল-ফোন আছে, ওদের কাছেও থাকবে। অন্য গাড়ি আনিয়ে নিয়েছে। টেকনোলজি যেমন আমাদের, তেমনিই অপরাধীদেরও প্রচুর সুবিধে করে দিচ্ছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে আছে মাফিয়া ডন, তার নির্দেশে খুন হচ্ছে অন্যপ্রান্তের মানুষ।

মসিয়ার রহমান গুম মেরে গেছেন।

একটু পরে বললেন,—তয় কি অরা কক্সবাজারে ফিরত গেছে মনে হয়?

—মনে হয় না। এটাও একধরনের ঝুঁকি। ওরা নেবে না। আমরা ফলো করব, ওরা জানে। কী দরকার উলটোদিকে যাওয়ার? তার চেয়ে যেদিকে যাওয়ার কথা, সেদিকেই যাবে।

—অর্থাৎ কিনা টেকনাফ? তয়—

—শ-শ-শ!

আর একটা গাড়ির শব্দ। ইঞ্জিন বন্ধ হল।

—বাব্বা! অ্যার মইধ্যে ফুর্স আইয়া পড়ল?

—এত সিওর হচ্ছেন কীভাবে? চলুন, আড়ালে চলুন।

দ্রুত ঢুকে পড়লাম আরও কিছুটা ভিতরে, ঘন ঝোপের আড়ালে।

একটা পায়ের শব্দ! ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে।

তারপর চমকে উঠলাম।

এ যে সেই লোকটা! সেই অদ্ভুত রহস্যময় ব্যক্তি, যে কক্সবাজার আসার সময় থেকে মামার পিছনে পড়ে আছে। গেছে ডক্টর আমেদের বাড়িতেও।

সে এখানে এল কোত্থেকে? আমাদের ফলো করছিল?

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, লোকটাকে যখন যেখানে দেখেছি, একদম একা। সঙ্গে কেউ নেই।

লোকটা ঠিক আমাদের মতোই এদিক-ওদিক সতর্কভাবে তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছিল।

গাড়ির কাছাকাছি এসে ভূত দেখার মতো যুবকের মৃতদেহটা দেখে চমকে উঠল।

তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ফিরতি পথে।

রহমান ছুটতে যাচ্ছিলেন, মামা বললেন,—যেতে দিন।

—ক্যান? সাসপিশাস পারসন।

—মামা, অন্য মাফিয়া গ্রুপের চর হতে পারে।

—ভুল করছেন। তাহলে এভাবে আনআর্মড একা আসত না।

—কিন্তু লোকটা কে, সেটা জানতে হবে না?

—ঠিক সময়ে জানা যাবে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, লোকটা ক্রিমিন্যাল নয়।... রহমানসায়েব, আপনি বরং কক্সবাজারে ফিরে অফিসারদের ওর পিছনে লাগিয়ে দিন।

—তাইলে আমরা কক্সবাজারেই ফিরুম?

—নিশ্চয়ই। হানিফ কেমন আছে, জানতে হবে। অবশ্য ফোর্স না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকছি।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ আস্তে-আস্তে মিলিয়েও গেল।

—দেখেছেন কাণ্ড! সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, এখনও দরজা খুলে দেখলাম না। আমারও বুদ্ধির চোদ্দোটা বেজে গেছে।

—যে গাড়িতে আমরা এলাম, সেটাও তো ওদের গাড়ি। তার মধ্যেও কিছু ক্লু পড়ে থাকতে পারে।

—ঠিক বলেছিস। তোরা ওদিকে যা। আমি এটাকে দেখি।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি, অকস্মাৎ—বু-ম-ম-ম—ম—!

বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম কয়েকগজ দূরে। সামনের টয়োটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে গেছে!

১৩

কয়েক সেকেন্ড ব্ল্যাক আউট। তারপর শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণার অনুভূতি হল। পাথুরে বোল্ডারের ওপর গিয়ে পড়েছি। বসার চেষ্টা করলাম।

জগুমামা, মসিয়ার রহমান দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। রহমানের গলায়-চিবুকে রক্ত। উনিই টয়োটার সবচেয়ে কাছে চলে গেছিলেন।

গাড়িটার টুকরো-টাকরা, ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ডের এদিক-ওদিক হলে একই অবস্থা হত আমাদের।

মামার সিগারেটের প্যাকেটটা ছিটকে পড়েছে। কুড়িয়ে নিয়ে একটা সিগারেট বের করলেন। ধরালেন। মৃদুগলায় বললেন,—টাইমবোম লাগিয়ে চলে গেছিল।

—রিমোট কন্ট্রোল এক্সপ্লোসিভ হতে পারে না?

—নারে! সেটা হলে তো এতক্ষণে আমরা ফটো হয়ে ধূপধুনো খাচ্ছি। তা ছাড়া রিমোটের রেঞ্জ জেনারেলি এক-আধ মাইলের বেশি হয় না। ইন দ্যাট কেস, ওদের কাছেপিঠেই থাকতে হয়। অতটা রিস্ক ওরা নেবে না।

মোবাইলটা বাজছে। একটু দূরে পড়ে আছে। কানে দিতেই সেই পরিচিত ভারী গলা,—হ্যালোও! ভাইগ্না?

—হ্যাঁ।

—সব শুনছি। মুখাজ্জি সায়েবরে দ্যাও।

মামা ফোন ধরলেন,—বলুন। না, সব শোনেননি। আমরা এখন কক্সবাজার-টেকনাফের অর্ধেক রাস্তায়...

সবটা ধীরে-ধীরে বলে গেলেন। অন্যপক্ষ যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল। এরপর মামার শোনার পালা। মাঝে-মাঝে 'সে কী', 'তাই', 'হুঁ', 'আচ্ছা' এইসব উত্তর।

মসিয়ার রহমান উবু হয়ে গাড়ির ভগ্নস্তূপ দেখছেন। বিজবিজ করে ধোঁয়া উঠছে, পোড়া-পোড়া গন্ধ। ভাঙা গাছের ডাল দিয়ে নাড়ছেন।

হঠাৎ ওঁর চোখ ও গলা পালটে গেল।

—পাইছি! পাইছি!

—কী?

ডাল দিয়ে একটা ঝলসানো প্লাস্টিকের প্যাকেট টানতে-টানতে বললেন,—হেই দ্যাখো।

প্যাকেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল গাড়ির কাগজপত্র, যাকে 'ব্লু বুক' বলা হয়। এবং একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স।

মালিক কামালউদ্দিন আমেদ।

—হায় আল্লা, নিজের গাড়িডা পোড়ায়ে দিল।

—ওটা কী?

দেখাতেই রহমান জঞ্জালের ভিতর থেকে টেনে আনলেন ছোট্ট চ্যাপ্টা কালো বস্তুটাকে।

একটা অর্গানাইজার। এককথায় বলা যায়, ইলেকট্রনিক্স টেলিফোন ইনডেক্স। আগে জরুরি টেলিফোন নম্বরগুলো কাগজের ইনডেক্সে লিখে রাখা হত। তার পরিবর্তে এই অর্গানাইজারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা যায় কম করে বিশ-পঁচিশ হাজার নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর। তাছাড়া পৃথিবীর নানাদেশের স্ট্যান্ডার্ড টাইম ও ঘড়ি, ক্যালকুলেটর সবই মজুত এই পুঁচকে মেশিনের ভিতর।

রহমান যন্ত্রটা হাতে নিয়ে অন বোতাম টিপলেন। অমনি পট করে স্ক্রিনে সংখ্যা ফুটে উঠল। কী আশ্চর্য, যন্ত্র এখনও ঠিক আছে।

—ও: ভাইডি! জবাব নাই। একখান চুখ বটে! তুমার! বোঝলেন মুখাজ্জি-সায়েব, আসল বস্তুখান পাইয়া গেছি।

ওটা আমায় দিন।—মামা এগিয়ে এসে যন্ত্রটা টেনে নিলেন। রহমান ভ্যাবাচাকা।

—চিন্তা করবেন না। আমি একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে আপনাকে ফেরত দেব। চলুন। কয়েকটা গাড়ির শব্দ পেলাম। আপনার লোকজন বোধহয় এসে গেছে।

—কীহে, কী খবর?

ক-কে...? ক-ত্তা! —ইব্রাহিম উঠে দাঁড়াল। ওর মুখ হাঁ।

বোসো, বোসো। —মামা হেসে বললেন,—এত অবাক হচ্ছ কেন? খোদার দুনিয়াটা বড্ড ছোট, কখন কোথায় যে কার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! কিন্তু ইব্রাহিম, আমার জিনিসগুলো যে তোমায় দিয়ে এলাম, সেগুলো কোথায়?

ইব্রাহিম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

—বুঝলে না? আরে বাবা, আমার প্যান্টশার্ট। তোমায় এত যত্ন করে পরিয়ে দিয়ে এলাম, সেগুলো পরোনি? অথচ আমি দ্যাখো, সেই থেকে তোমার লুঙি জামা পরেই রয়েছি। ভেবে রেখেছিলাম, যদি কখনও

দেখা হয়ে যায়, পালটা-পালটি করে নেব। যাকগে!

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগুমামা বললেন,—এবার চটপট বলে ফ্যালো। সেই লোকটা, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যাকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই লোকটা কোথায়?

ইব্রাহিম নিরুত্তর। ওর মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

হুঁ, বলবে না! বা:, ভালো। —মামা ঘুরে তাকালেন পাশের পুলিশকর্তার দিকে। বরফঠান্ডা গলায় বললেন,—শুনুন, ওর বিবিকে আমি দেখেছি। বাচ্চাকাচ্চা ক'টা জানি না। স্ট্রেটওয়ে সব্বাইকে তুলে নিয়ে আসুন। তারপর...

বলতে-বলতে ইব্রাহিমের কাঁধ ধরে ঝাঁকালেন,—ইব্রাহিম! কথা বের করার একশো-একটা উপায় আমরা জানি।

বিকেল সাড়ে চারটে। কক্সবাজারে ফিরেছি একটা নাগাদ।

এখনও ভাবলে কাঁপুনি দিচ্ছে। আজ ভোরবেলায় এবং বেলাবেলি পরপর যে দুটো ভয়াবহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি, তার জের কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব।

হোটেলে ফিরে ঠান্ডা জলে স্নান করে মাছ-ভাত মুখে দেওয়ার পর কিছুটা ধাতস্থ হয়েছি।

তখনই শুনেছি, গতকাল রাতে ইব্রাহিমকে পুলিশ দিয়ে কক্সবাজার রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামা ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।

তাতেও হয়তো একটু গড়িয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর এসেছে, ডি.আই.জি. সায়েব নিজে নাকি দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চলে আসছেন। ভারতীয় হাইকমিশন থেকে সরকারি পর্যায়ে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়েছে।

হোটেলে খেতে বসে শুনলাম, তিনি এসে গেছেন। হেড কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছেন। সুতরাং সোজা চলে আসতে হয়েছে।

তবে তাতে মামাদের কোনও অসুবিধে হয়েছে বলে মনে হয়নি। রহমান তো উৎসাহে টগবগ করছেন। আর জগুমামা অর্গানাইজার নিয়ে সেই তখন থেকে বোতাম টিপে চলেছেন। কথা বলতে গিয়ে, উত্তর পাইনি। শুধু একবারই বলেছেন, ওটা কামালের নয়। মেছবাউদ্দিন আমেদের।

অকুস্থল থেকে গাড়ির ব্লু-বুক আর ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া কিছুই অক্ষত পাওয়া যায়নি। বাকি বস্তায় ভরে নিয়ে আসা হয়েছে। যুবকের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে গেছে।...

ইব্রাহিম চুপ করে বসে আছে। ওকে শুনিয়ে এক স্থানীয় পুলিশকর্তা ফোন জুড়েছেন,—হ্যালো। বরিশাল এস.পি. অফিস? আমি ডি.এস.পি., সি.আই.ডি.। একটা কাম করন লাগে। মোস্ট আর্জেন্ট। তোমাগো ভুলায়

ওই যে ক্রিমিন্যালডা—হ-হ...

মামা চোখের ইশারায় থামতে বললেন। নরমগলায় বললেন,—ইব্রাহিম, ভেবে দ্যাখো।... একমিনিট ওয়েট করুন।...ইব্রাহিম, পুলিশের টর্চার কী মারাত্মক, জানো তো? তুমি সহ্য করতে পারলেও তোমার পরিবার কি পারবে? ওরা তো কোনও দোষ করেনি! তোমার পাপে ওদের জীবনটা—

কত্তা!—ইব্রাহিম মুখ তুলে তাকাল। ওর চোখে জল।

—বলো, বলো। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমায় সবরকম প্রোটেকশন দেওয়া হবে।...হ্যাঁ, ওদের জানিয়ে দিন, এখনই দরকার নেই। ইব্রাহিমের ফ্যামিলির দিকে শুধু খেয়াল রাখুক।

—কত্তা! বিশ্বেস করেন, আমি যতটুকন জানি, কইতাছি। আপনে পলায়ে যাবার পর আমি খবর দেই সায়েবরে। সায়েব আইসা আমারে বেদম মারে।

—মারে?

—জি কত্তা। কয়, 'তুই একডা আকাম্মার ধাড়ি, তরে আজ মাইরাই ফেলুম'।

—তোমার সায়েব কোথায় থাকে?

—ঢাকা।

—ভুলার ওই খেতজমি-বাড়ি সব কি তার?

—জি কত্তা। আমি দেখাশুনা করি।

—শুধু মাঝে-মাঝে সায়েব লোকজন ধরে আনলে তাদের আটকে রাখো। পালাবার চেষ্টা করলে খতম করে দাও। তাই তো?

ইব্রাহিম মুখ নিচু করল।

—তোমার সায়েবের নামটা কী?

—নূর মহম্মদ।

—কী করে?

—হে তো আগেই কইছি কত্তা। শুনছি, বর্ডার দিয়া কীসব ন্যাশার বস্তু পাছারের কাম। তাইনের ঢাকায় বড় দাওয়াইয়ের দুকানও আছে।

—গুড! সেদিন সায়েবের সঙ্গে যারা ছিল, তাদের সবাইকে নিশ্চয়ই চেনো?

—না কত্তা। আল্লার কসম, দুজনারে চিনি। হেরা সায়েবের বডিগার্ড। বাকিরা হেদেশের নয়, দ্যাখতে ভিন্ন লাগে।

—তাই? কেমন লাগে?

—একডা বিলাইতি মনে হয়। অন্য দুডার নাক চেপ্টা, চুখ ছোট। অপরডা বুধহয় ইন্ডিয়ান। সায়েব তার লগে 'আগরওয়াল' কইয়া ডাকতাছিল।

—গ্রেট! সর্বধর্ম সমন্বয়!...কী বুঝছেন ডি.আই.জি. সায়েব? র‍্যাকেটের নেটওয়ার্ক কী স্ট্রং দেখছেন? ইব্রাহিম, তোমার সায়েবরা তারপর কী করল?

—লুকডারে লঞ্চে উঠাইয়া লয়ে গেল।

—কোথায় গেল জানো না?

—আল্লার কসম, জানি না। তবে ঢাকায় যাওনের আলাপ করতাছিল।

—বা:! ঠিক আছে ইব্রাহিম, এখন এই পর্যন্ত।

—আমি...আমি তবে যাইব কত্তা?

—নাহে, ইব্রাহিম! এখনই নয়। আমরা তোমায় ছাড়লেও ওরা তোমায় খতম করে দেবে। তার চেয়ে তুমি পুলিশের অতিথি হয়ে থাক।

দুজন পুলিশ এসে ইব্রাহিমকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। জগুমামা বললেন,—সব নোট নিয়েছেন? ইন্ডিয়াতেও খবর পাঠান। আগরওয়ালের খবর পেতে হবে।...আচ্ছা, বাংলাদেশে চিরাদিয়া বলে কোনও জায়গা আছে?

—চিরাদিয়া!!

বাংলাদেশিরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। ডি.আই.জি. বললেন,—চিরাদিয়া? নাহ!

—নেই? কিন্তু...এই যে দেখছেন, এই অর্গানাইজারটা ডক্টর মেছবাউদ্দিন আমেদের। লাকিলি পেয়েছি। বোধহয় দাদার থেকে গোপনে চুরি করেছিল। এখানে 'পার্সোনাল' ফোল্ডারে ওই নামটা রয়েছে। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা সাংকেতিক চিহ্ন। তাই মনে হল—

ছিড়াদিয়া? —মাঝপথে একজন পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন।

রাইট! —চশমার ফাঁকে জগুমামার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—ইংরাজিতে সি-এইচ, 'চ' বা 'ছ' দুটোই লেখা হয়। ছিড়াদিয়া কোথায়?

—টেকনাফ দিয়া যাইতে হয়। বে অফ ব্যাঙ্গলে একডা দ্বীপ। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অ্যাক্কেরে গায়ে।

—লোকালয় আছে?

—সেন্ট মার্টিন পুরা টাউন। মাছের বিরাট আড়ত। তবে ছিড়াদিয়ায় জনমানষে থাকে না। জুয়ারের সময় পুরা আলাদা হইয়া যায়। ঝড়বাদলায় দ্বীপডা কখন-কখন ডুইবাও যায়।

জগুমামার কপালে অজস্র ভাঁজ। বললেন,—টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন সমুদ্রপথে কতক্ষণ লাগে?

—দু-আড়াই ঘণ্টা।

—লঞ্চ সার্ভিস আছে?

—জি। তবে আমাগো পুলিশ লঞ্চ—

ভদ্রলোকের কথা শেষ হল না। তার আগেই—

—এ কী! আপনারা!

রঞ্জন সরকার এবং সুধাংশু দে।

ডি.আই.জি. বললেন—আসেন, বসেন। ...ডক্টর মুখার্জি, সরি, আপনাগো কওয়া হয় নাই। বিষয়ডা হইল, ঢাকা বইমেলা কুড়িদিন হইল শ্যাষ হইয়া গেছে। কইলকাতার সব ফিরত গেছে। কিন্তু এরা কইছিলেন, সুনীলবাবুরে না লইয়া ইন্ডিয়া ফিরুম না। আপনে জানেন, হাইকমিশনে এরা ছিলেন। হইছে কী, কাইল সকালে সুনীল আচার্যির মিসেস ফুন করছিলেন। সুনীলবাবু কলকাতা পৌঁছাইয়া গেছেন।

—সে কী!

—জি। আপনে তারার কাছ থিইকাই শুনেন। হাইকমিশনরে তাই কইলাম, ইনাগো পাঠাইতে। বেপারটা বড় তাজ্জুব।

রঞ্জন সরকার বললেন,—কাল সকালে সীমা ফোন করল। ভাবছিলাম, সুনীলের কথা বুঝি জিগ্যেস করবে। কিন্তু তার আগেই সে বলল, সুনীল বাড়ি ফিরেছে। তবে ফিরেছে ঠিক নয়, তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

—মানে?

—কাল খুব ভোরে ওদের বাড়িতে ফোন বেজে ওঠে। সীমা ফোন ধরতে এক অচেনা গলা বলে, 'আপনার হাসব্যান্ড পাশের বেলেঘাটা লেকে বসে আছেন। তাকে নিয়ে আসুন।'

সীমা বলে, 'সে তো বাংলাদেশ গেছে। ফেরেনি।'

সেই গলা বলে, 'ফিরেছে। আমার বেশি কথা বলার সময় নেই। যদি তাকে জীবিত দেখতে চান, নিয়ে আসুন।'

সঙ্গে সঙ্গে সীমা লেকে ছুটে যায়। খুঁজতে-খুঁজতে দেখে, এককোণে এক বেঞ্চিতে সুনীল এলিয়ে পড়ে আছে।

—সে কী!

—হ্যাঁ। অনেক ডাকাডাকির পর সুনীল চোখ মেলে তাকায়। ব্ল্যাঙ্ক ভিশন। ওদের চিনতে পারে না। ওরা ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসে।

সুনীলদাকে বোধহয় খুব কড়া কোনও ড্রাগ পুশ করা হয়েছিল।—সুধাংশুবাবু বললেন।

—এখন কেমন আছেন?

—আগের চেয়ে ভালো। ট্রিটমেন্ট চলছে। সবচেয়ে যেটা মারাত্মক, সুনীল বাংলাদেশ এপিসোড কিছুই মনে করতে পারছে না।

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। পদ্মায় বার্জে ওঠা পর্যন্ত মনে পড়েছে। তারপর সব ফাঁকা।

১৪

সবে মধ্যরাত্রি পার হয়েছে। মহানগরীর পথঘাট জনশূন্য। শুধু বেলেঘাটার আই.ডি. হাসপাতালের সামনে তিন-চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। পাশেই একটি ট্যাক্সি।

সামনে সুভাষ সরোবর, বেলেঘাটা লেক। গাঢ় কুয়াশায় সোডিয়াম-ভেপার ল্যাম্পের আলোগুলো মিটমিট করছে।

একটা কালো অ্যাম্বাসাডর আস্তে-আস্তে লেকের পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। লেক পেরিয়ে ঢুকে এল আই.ডি.-র পাশের রাস্তায়।

কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে অ্যাম্বাসাডর ফুটপাতের গা ঘেঁষে থামল। স্টার্ট বন্ধ হল না।

চারজন লম্বা-চওড়া লোক নামল গাড়ি থেকে। একটা বাড়ির সরু গলিতে ঢুকে গেল।

খ-ট...খ-ট...খ-ট...খট...।

—কে?

—দরজা খুলুন।

তিনতলা ফ্ল্যাটের আলো জ্বলে উঠেছে।

—কে?...আপনি কে?

—পুলিশের লোক। দরজা খুলুন।

—কী ব্যাপার?

—আগে দরজা খুলুন। বলছি।

খুট করে দরজা ফাঁক হল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার সামনের মহিলাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে চারজন ষণ্ডা চেহারার লোক ঢুকে পড়ল ভিতরে। কালো প্যান্টশার্ট, এমনকী মুখও কালো মুখোশে ঢাকা।

মহিলা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তাঁর কপালে রিভলভার ঠেকল।

—শাট আপ। আপনার হাসব্যান্ড কোথায়?

মহিলা কাঁপতে-কাঁপতে পাশের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

তিনজন ঘুমন্ত মানুষ। বুক অব্দি লেপ। ঘর জুড়ে নীলাভ আলো।

প্রথমজন দরজার পাশের সুইচবোর্ডে পটপট সুইচ টিপল। ফ্লুরোসেন্ট আলো ছড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জন গিয়ে ঝাঁকুনি দিল একধারের মধ্যবয়সি পুরুষটিকে।

ভদ্রলোক চোখ মেলে তাকালেন।

—উঠুন!

—ক-কে আপনারা?

—পুলিশ। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—ক-কোথায়?

—দপ্তরে।

—ক-কেন? আমি কী করেছি?...সীমা—!

—চু-প! আপনার স্ত্রী ঠিক আছেন। কুইক!

পাশের দুই ছেলে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। তাদের দিকে তৃতীয়জনের রিভলভার উদ্যত। তাঁরা আতঙ্কে কাঁপছে।

ভদ্রলোক কাঁপতে-কাঁপতে এগোচ্ছেন দরজার দিকে। বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। প্রথমজন বলল, —ড্রেস চেঞ্জ করার দরকার নেই। শুধু চটিটা পায়ে গলিয়ে নিন।...একটা চাদর দিন ম্যাডাম!

চতুর্থজন পাথরের মূর্তির মতো দরজার কাছে। ভদ্রলোক করুণচোখে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলা কাঁপতে-কাঁপতে একটা গরম চাদর স্বামীর হাতে দিলেন।

তিরিশ সেকেন্ডের মাথায় চতুর্থজন পকেটে রিভলভার ঢোকাল। ভদ্রমহিলাকে হাতের ইশারায় 'বাই' করে সদর দরজা বাইরে থেকে টেনে দিল। সিঁড়িতে তাদের নামার শব্দ।

কালো অ্যাম্বাসাডর মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'অপারেশন' শেষ হতে সময় লাগল তিন মিনিট।

পরিবারের তিনজন বিমূঢ়, চেঁচাতেও ভুলে গেছে। তবে ভদ্রমহিলা যে মানসিক শক্তিতে অন্যদের চেয়ে অনেক শক্ত, সেটা বোঝা গেল যখন, উনিই দরজায় খিল দিয়ে ছুটে গেলেন টেলিফোন ইনডেক্সের দিকে। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একজায়গায় হাত দিয়ে রিসিভার তুললেন। এই সময় দরজার কলিংবেল ফের বেজে উঠল।

ফোন নামিয়ে রেখে ভয়ার্তচোখে তাকালেন মহিলা। আবার? বাকিদের নিয়ে যাবে বলে ফিরে এল? কী করবেন? কাকে ফোন করে ডাকবেন? কিছুই সময়ে মনে পড়ছে না!

যা থাকে কপালে! রান্নাঘর থেকে তরকারি কাটার ছুরি আর বঁটি তুলে দিলেন ছেলেদের হাতে। নিজেও একটা নিলেন।

আবার বেল বাজল।

—কে?

—দরজা খুলুন। থানা থেকে আসছি।

ভদ্রমহিলা ততক্ষণে 'আই-হোল'-এ চোখ রেখেছেন। পুলিশের উর্দি। তার মানে, আগে যারা এসেছিল...তারা! সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে...দরজা খুলেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—কী চাই?

এই লোকগুলো অতি ভদ্র। মোটেই রাগল না। বয়স্ক অফিসার বললেন,—এত এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন ম্যাডাম? আমরা ডিউটি করতে এসেছি। আপনার কর্তাকে একটু পাঠিয়ে দিন। আমাদের সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে।

—থানায়? সে কোথায়? এখনও আছে নাকি?...আসুন, আসুন! নিজেদের চোখে দেখে যান!

—আমাদের যে বলা হল, সুনীলবাবুকে—

কথা শেষ করতে দিলেন না সীমা। রাগ আর যন্ত্রণা বেরিয়ে এল তাঁর গলা চিরে,—এইজন্যেই তো দেশের আইনশৃঙ্খলার এই অবস্থা! ইউ আর এনটায়ারলি ক্যালাস—অপদার্থ! ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে হেলতে-দুলতে হাজির হচ্ছেন। আপনাদের আগেই—

স-সরি ম্যাডাম। —অফিসার ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি নামতে-নামতে বলছেন,—দেখছি ম্যাডাম, এখনই দেখছি।...

—কী দেখবেন? যান! থানায় গিয়ে বালিশ পেতে ঘুমোন। রাগে গজগজ করতে-করতে সীমা এগিয়ে গেলেন টেলিফোনের দিকে।

—আপনার নাম?

—সুনীল আচার্য।

—পেশা?

—কলেজে পড়াই।

—আর?

—কলকাতা বইমেলার সঙ্গে যুক্ত। একটা পত্রিকা চালাই। কিন্তু এসব জানা প্রশ্ন—

—প্লিমিস্টার আচার্য। ...আপনি বাংলাদেশ যাচ্ছিলেন কেন?

—আমার একটা সেমিনার ছিল।

—ও, তার মানে ঢাকা বইমেলায় যোগ দিতে নয়?

—দ্যাট ওয়স আ কোইনসিডেন্স। একই সময়ে ঢাকা বইমেলা শুরু হচ্ছিল। বন্ধুরা যাচ্ছিল। তাই আমি—

—পদ্মা পার হওয়ার আগে পর্যন্ত আপনি নর্মাল ছিলেন। গোয়ালন্দ ঘাটে বার্জ-এ বাস ওঠার সময়েও দুই বন্ধু রঞ্জন সরকার, সুধাংশু দে-র সঙ্গে আপনি নর্মাল বিহেভ করেছেন। কিন্তু তারপর প্রথমে আপনি হারিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন। কিন্তু তখন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ম্যান। তারপর ঢাকায় পৌঁছে আবার নিখোঁজ।

—আমি আগেও বলেছি ডা: চৌধুরী, সেই রাতে পদ্মায় বার্জে উঠেছিল বাস...আমি একা বার্জের তিনতলায় উঠেছিলাম...ব্যস! এই পর্যন্ত মনে আছে। তারপর ব্ল্যাক আউট। আর কিছু মনে পড়ছে না।

—মনে করার চেষ্টা করুন মিস্টার আচার্য... সেই রাত...ঘুটঘুটে অন্ধকারে সব ঢেকে আছে... শুধু বার্জের মধ্যে মিটমিটে আলো...আপনারা ঘোরাফেরা করছেন...সুধাংশুবাবু হইচই করছেন...পদ্মার কালো জল অন্ধকারে মিশে আছে...মনে করুন...

—না-না-না! কিছুই মনে পড়ছে না। আমি হেলপলেস! আমি...

—আমার চোখের দিকে তাকান। হ্যাঁ, ভালো করে তাকান তো এবার! মনে পড়ছে...? সুনীলবাবু...সুনীলবাবু...

ধীরে-ধীরে সুনীল আচার্যর চোখের দৃষ্টি নিস্তেজ হয়ে আসে। শরীর কাত হয়ে পড়ল নরম সোফায়।

ডা: চৌধুরী অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাস্কর মিত্রকে বলেন,—ভয়েস রেকর্ডার অন আছে তো?

—হ্যাঁ দিদি।...

রাত দুটো। বেশ শীতও পড়েছে। সল্ট লেক ঘুমিয়ে আছে। কালো-কালো সব অন্ধকার বাড়ি। শুধু এফ-ই ব্লকের বাড়িটার একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাইক্রিয়াটিস্ট ডা: সুস্মিতা চৌধুরীর চেম্বার। ডা: চৌধুরী ওপরে থাকেন।

একতলায় সারাটা দিন অসংখ্য মানুষের ভিড়। কতধরনের মনোরোগী। ডা: চৌধুরী ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা রোগীদের কাউন্সেলিং করেন।

সুস্মিতার বিশেষ ক্ষমতা, সম্মোহনবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা। প্রয়োজন পড়লে ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি রোগীদের মনের তন্ত্রীগুলোকে অবশ করে দেন। তারপর ধীরে-ধীরে মনের অবচেতনে ঘুমিয়ে থাকা অজানা কথা টেনে বের করে আনেন।

ভদ্রমহিলার বয়েস তিরিশের আশে-পাশে। স্মার্ট, সুশ্রী। এটাও নি:সন্দেহে অ্যাডভান্টেজ।

সুনীল আচার্য এইমুহূর্তে ঝিমধরা চোখে তাকিয়ে আছেন ডা: চৌধুরীর দিকে। সুস্মিতা ইশারা করলেন। ভাস্কর একটু-একটু করে সুনীল আচার্যর মুখের ওপর জোরালো আলোর ফোকাস কমাতে লাগল। ইঙ্গিতে তাকে থামতে বললেন সুস্মিতা। তারপর ফিসফিস স্বরে বললেন,—বলুন, সুনীলবাবু... বলুন...পদ্মায় সেই রাত... আপনি স্টিমারের তিনতলার ডেকে...একা, কেউ কোত্থাও নেই...তারপর...মনে করুন...

—আমি...আমি তিনতলার ডেকে...হ্যাঁ...একেবারে একা...কোত্থাও কেউ নেই...হঠাৎ...হঠাৎ...

—হঠাৎ...? মনে করুন...হঠাৎ?...

—হঠাৎ তিন-চারজন লোক এসে আমার পিছনে দাঁড়াল...চিনি না... তাদের চিনি না...কোত্থেকে যে এল তাও জানি না...

—তিন-চারজন লোক...পিছনে...

—হ্যাঁ, তিন-চারজন লোক...আমায় বলল, সায়েব কোথায় যাবেন? আমি...আমি অবাক, এরা আমায় চেনে। ...আমি বললাম... ঢাকা যাব...ঢাকা...

বলতে-বলতে সুনীলবাবুর চোখ বুঁজে এল। ভাস্কর আলোর রেগুলেটরে হাত দিল। দপ করে চোখধাঁধানো আলো এসে পড়ল সুনীলবাবুর মুখে।

অতিকষ্টে চোখ মেললেন সুনীল। ডা: চৌধুরী ঝুঁকে পড়ে বললেন,—'ঢাকা যাব'? ঢাকা... তারপর?

—ঢাকা...হ্যাঁ, ওরা বলল...আমাদের লগে চলেন...বলে একটা কাপড় ঠেসে...আমার শ্বাস বন্ধ...উ:, কী কষ্ট...আর কিছু মনে নেই...

—সুনীলবাবু প্লিজ...মনে করুন...মনে করুন...আপনার জ্ঞান ফিরে এল...আপনি বসে আছেন বাসে...

—বাসে? হ্যাঁ...মনে পড়ছে...বাসে...কিন্তু কোনও শক্তি নেই...আমি হেল্পলেস...সুধাংশু-রঞ্জন বারবার ডাকছে...কথা বলতে পারছি না...

—কথা বলতে পারছেন না...সুনীলবাবু...বলুন...

—বাস থামল...সব নেমে গেল... রঞ্জনরা বলল আসছে...কিন্তু তার আগেই আবার তিন-চারজন লোক কোত্থেকে উঠে এল...আমায় ঘিরে ধরে নামিয়ে নিল...একটা গাড়িতে তুলল...

—আপনি রেজিস্ট করেননি?

—নাহ...কিছুই ক্ষমতা নেই...কথা বলতে পারছিলাম না...বড় ব্যথা...ব্যথা...

—সুনীলবাবু! তাকান!...আমার দিকে তাকান! ওরা কী বলছিল?

—কী বলছিল?...হ্যাঁ-হ্যাঁ বলছিল...পাইছি, এরে পাইছি...একজন বলছিল...চাপ দিলেই সব বাইরবে...মোবাইলে একজন কথা বলছিল...গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল...

—কোথায়? সুনীলবাবু...কোথায়?

—অনেকক্ষণ লাগল...সকাল হয়ে এল...পুরো গ্রাম...গাছপালা...নদী-খাল-বিল... মাঝে একটা বাড়ি...আশপাশ ফাঁকা ফাঁকা...একটা তাগড়া লোক... তার কাছে আমায় দিয়ে চলে গেল...

—সেখানেই ছিলেন? ওরা আসেনি?

—এসেছিল...রোজ একবার আসত...অচেনা একজনকে এনে রেখেছিল...সে পালাল...আমাকেও পালাতে বলেছিল... সাহস পাইনি...শরীর অবশ...

—তারপর?...সুনীলবাবু।...তারপর?

—অবশ...অবশ...অ-ব...শ!

সুনীলবাবুর মাথা হেলে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভাস্কর বারদুয়েক ঠেলা দিল। কোনও সাড় নেই।

ডা: চৌধুরী বললেন,—ভাস্কর। ছেড়ে দাও। আজ একটানা অনেকটা বলেছে। ঘুম থেকে উঠলে, সহদেবকে বলে দিও, এককাপ গরম দুধে একচামচ ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খাইয়ে দিতে।...গুড নাইট।

ঘরের আলো নিভে গেল।

ঠিক সেই সময়...

নির্জন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে সাদা টাটা সুমো।

আরোহীরা সকলেই চুপ। সুমো স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে সল্ট লেকে ঢুকে পড়ল। একজন বলে উঠলেন, —ফোন করবে না?

—কাকে?

—সে কী! এরমধ্যেই ভুলে গেলে?

—ওহো, তাই তো! আসলে কী জানো গৌতম, মাথার মধ্যে সর্বক্ষণ জটটা পাক খাচ্ছে। ছাড়াতে পারছি না। তাছাড়া তোমাদের যা কীর্তি, ফোন করে কী বলব? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। পাঞ্জাব পুলিশ এসে উগ্রপন্থী ভেবে নিয়ে গভীর রাতে তপসিয়াতে একটা ফ্যামিলিকে ফিনিশ করে দিল, তাই নিয়ে কাগজে-কাগজে কত লেখালেখি হল। তোমরাও কিছু কম যাও না। বলো তো, অকারণ এইসব করার কী দরকার ছিল?

—তুমি বুঝবে না জগুদা! তখন যদি ওরা সঠিক পরিচয় দিত, বিশ্বাস করতে পারত, নাও পারত। হয়তো বসিয়ে রেখে কনফার্ম হবার জন্যে এদিক-ওদিক ফোনাফুনি শুরু করত। তক্কাতক্কিও হতে পারত। তাতে আশেপাশের লোক সব জেনে যেত।

—কেন? আমি আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম। যাগ্যে, ছাড়ো। ফোনটা দাও।...

—হ্যালো!..জগবন্ধু মুখার্জি বলছি।...শুনুন, শুনুন আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন। আমি পারফেক্ট খবর নিয়েছি। ...হ্যাঁ-হ্যাঁ, দায়িত্ব নিয়ে বলছি।...না-না-না, ব্যাপারটা ঠিক উলটো। পরের গ্রুপ যারা গেছিল, তারা পুলিশ নয়। সেজে এসেছিল। কপালজোরে সুনীলবাবু বেঁচে গেছেন।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। স্টাইলটা খুব খারাপ হয়েছে। পুলিশের বড়কর্তা বলছেন, এটা কম্যান্ডোদের স্টাইল। এইভাবেই নাকি ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ...না-না, সরি, সরি। আপনি কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আরেকটা কথা, যদি কেউ খোঁজখবর নেয়, ঘুণাক্ষরেও সত্যিটা জানাবেন না। টপ সিক্রেট!...রাইট! আপনি আপনার হাসব্যান্ডের ব্যাপারে প্রচণ্ড ওয়ারিড। তাকে কয়েকজন মুখোশ-পরা গুন্ডা তুলে নিয়ে গেছে। তারপর আর খবর পাচ্ছেন না। এই ড্রামাটা করতে হবে। ওকে?...

গাড়ি এসে দাঁড়াল এফ-ই ব্লকের বাড়িটার সামনে, একটু আগেও যেখানে আলো জ্বলছিল।

ডি.আই.জি. গৌতম চ্যাটার্জী বাইরের কলিংবেল টিপলেন। জগুমামা বললেন,—ভদ্রমহিলার খুব নাম শুনেছি। আলাপ হবে।

গৌতম মুচকি হাসলেন,—রাত আড়াইটেয় আলাপ! আলাপ, না প্রলাপ?

ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে। গৌতমের সিকিওরিটি গ্রিল গেট খুলে ভিতরে ঢুকল। একজন পোর্টিকোতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে কিছু বলল। কোলাপসিবল গেট খুলছে।

—একটু বসুন স্যার। ম্যাডাম এই মাত্র ওপরে উঠেছেন। খবর দিচ্ছি।

জগুমামা বললেন,—পেশেন্ট কোথায়?

—ভিতরে স্যার। ঘুমোচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডা: চৌধুরী নেমে এলেন।

—নমস্কার।

—নমস্কার ম্যাডাম। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি।

—পরিচয় করানোর কোনও দরকার নেই। উনি আমার স্যারের বন্ধু। ...বলুন স্যার।

—ম্যাডাম, একটা কথা—

—প্লিজ স্যার! আমার নাম ধরে বলুন।

—ও...আচ্ছা। সুনীলবাবুর কাছ থেকে কিছু জানা গেল?

—হ্যাঁ স্যর। হিপনোটাইজড অবস্থায় উনি অনেকটা বলেছেন। পুরোটা টানতে পারিনি। রিকস হয়ে যেত। ঘুম থেকে উঠলে সেকেন্ড সেশন শুরু করব। সব টেপ করা আছে। শুনবেন?

—নিশ্চয়ই। কাউন্সেলিং করে কী মনে হল আপনার? ইচ্ছে করে খবরগুলো সাপ্রেস করছিলেন, নাকি সাময়িক মেমারি লস হয়েছে?

—আমার মনে হয়েছে, কড়া কোনও মেডিসিন দিয়ে ব্রেনসেলগুলোকে বেশ ইন্যাকটিভ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এটাও ঠিক, ভদ্রলোক মনে করার তেমন চেষ্টাও করছেন না।...দু:স্বপ্নের মতো সব ভুলে যেতে চাইছেন।

—হুম। আজ ক'টা থেকে সেকেন্ড সেশন শুরু করবেন, কিছু ভেবেছেন?

—যেই মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠবেন, তখন। কাজের লোককে বলে রেখেছি, আটটার মধ্যে যদি না ওঠে, ঘুম থেকে তুলে দেবে।

—গুড। আসলে সুনীলবাবুকে আমাদের চাই। আজই হয়তো নিয়ে যেতে হবে।...উনি কোথায় ঘুমোচ্ছেন? একটু দেখা যাবে?

—নিশ্চয়ই। আপনি স্যর, সুনীলবাবুকে আগে দেখেননি?

—না:।

—তাই? আসুন, আসুন। সহদেব, লাইটটা জ্বেলে দাও।

অ্যান্টি-চেম্বারে তিনজন ঢুকলেন।

ঢুকেই জগুমামা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—এ কী!

১৫

পিড়িং...পিড়িং...পিড়িং...পিড়িং...

কানের কাছে তীক্ষ্ণসুরে বেজেই চলেছে। হাতড়ে-হাতড়ে টেনে নিলাম। এত রাতে কে রে বাবা? ডিসপ্লের আলোয় ফুটে ওঠা নম্বর দেখেই একঝটকায় ঘুম ছেড়ে গেল। +91 দিয়ে শুরু। অর্থাৎ ফোনটা এসেছে দেশ থেকে।

—হ্যালো।

টুকলু। —জগুমামার গলা,—এয়ারপোর্টে এসে পড়েছি। একটু পরে মর্নিং ফ্লাইট। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঢাকা পৌঁছে যাব। সুনীল আচার্য আমার সঙ্গে।...প্রায় অনেকটাই এখন ট্রান্সপারেন্ট হয়ে এসেছে। গিয়ে বলছি। তুই রহমানকে বল, ডি.আই.জি. সায়েবকে বলে ঢাকা টু কক্সবাজার কানেকটিং ফ্লাইটে দুটো সিট বুক করতে। ঢাকায় প্রপার সিকিওরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট যেন থাকে। আমার আইডেন্টিফিকেশন মার্ক, মাথায় সায়েবি টুপি, ডান কব্জিতে ব্ল্যাক ব্যান্ড। মনে করে বলবি। কক্সবাজার এয়ারপোর্টে যেন গাড়ি থাকে। সোজা হোটেলে ঢুকে যাব। ঢাকায় নেমে গাড়ির নম্বর তোর কাছ থেকে জেনে নেব। হ্যাঁ, আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার, যে লোকটা আমায় ফলো করছিল, ওকে চিনে ফেলেছি।

—মামা, একমিনিট! এদিকের সিচুয়েশন পালটে গেছে। আমরা কক্সবাজারে নেই। টেকনাফে চলে এসেছি। কাল সন্ধেবেলা।

—টেকনাফ! কেন?

—নূর মহম্মদকে ধরতে। ওকে ধরতে পারলে বাকি সবক'টা ধরা পড়বে। ইব্রাহিম আইডেন্টিফাই করবে।

—নূর মহম্মদ! ইয়েস! ইব্রাহিমের সায়েব, কিন্তু সে যে টেকনাফে আছে, কী করে জানা গেল?

—কাল সারা দিন ধরে অপারেশন হয়েছে। ইব্রাহিম ঢাকার একটা ফোন নম্বর দিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেটা 'মহম্মদ মেডিকেল স্টোর্স'-এর। নূর মহম্মদের ছোটভাই তাজ মহম্মদ কর্তা। রহমানসায়েব কাল ঢাকা গেছিলেন। তাজ মহম্মদকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

—দাঁড়া, দাঁড়া। ভাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এ-খবর তো নিশ্চয়ই দাদার কাছে পৌঁছে গেছে। তারপরে কি আর ওরা এদেশে আছে? বর্ডার পেরিয়ে আইদার ইন্ডিয়া নয়তো বার্মায় চলে গেছে।

—আ:।—আগেই তুমি...ওভাবে অ্যাকশন হয়নি। সবটা শুনবে তো! লাঞ্চ করতে তাজ দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিল। গাড়ির মধ্যে প্লেনড্রেস পুলিশ লুকিয়ে ছিল। মাঝরাস্তায় গাড়িসুদ্ধু ওকে হাইজ্যাক করে আনা হয়েছে।

—বলিস কী! তারপর?

—তাজ মহম্মদকে গোপন ডেরায় এনে বেধড়ক ইনটারোগেশন করা হয়েছে। যতটুকু জানে, সব স্বীকার করেছে। বাংলাদেশের সব শহর মিলিয়ে প্রায় কুড়িটা ওষুধের দোকান আছে ওদের। মহম্মদ মেডিকেল স্টোর্স। বিগেস্ট মেডিসিন চেন। নূর বাদে বাকি চার ভাই মেন-মেন শহরের বড় বড় দোকানের দায়িত্বে। অন্যগুলো বিশ্বস্ত কর্মচারীরা চালায়। প্রতিটা দোকানের আন্ডারগ্রাউন্ডেই ড্রাগস-এর কারবার। ওই চেনের মাধ্যমেই ড্রাগ পেডলিং হয়। ভারত-নেপাল-ভুটানেও যায়। মাল আসে বার্মার দিক দিয়ে। টেকনাফেও

মহম্মদ মেডিকেল স্টোর্স-এর ব্রাঞ্চ আছে। বাড়িতেই দোকান। তাজ বলেছে, বড় ভাইয়া অন্য একটা 'বিগ ডিল' নিয়ে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত। সেই জন্যেই টেকনাফে রয়েছে।

—একসেলেন্ট! ভাবতেই পারছি না, বাংলাদেশের পুলিশ এত এফিসিয়েন্টলি অপারেট করেছে। এখন ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট ডিউটি হচ্ছে—ইমিডিয়েটলি টেকনাফ শহর চতুর্দিক দিয়ে সিল করে দিতে হবে। একটা মাছিও গলতে পারবে না। নদীর ওপারেই—মায়ানমার। একবার সেখানে পৌঁছে গেলে কিছুই করা যাবে না। এখনই রহমানকে বল।

—রহমানসায়েব কাল এখানে আসতে পারেননি। রাত হয়ে গেছিল। কক্সবাজারে হল্ট করেছেন।

—তাহলে ডি.আই.জি. সায়েবকে বল। তিনি আছেন তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সবাই গেস্ট হাউসে।

—গুড। আমাদের ফ্লাইট আর সিকিওরিটির ব্যাপারে যা-যা বললাম,...মনে আছে তো?

—কী যে বলো! তবে এত রাতে ঘুম থেকে তুলে—

রাত! —জগুমামা ধমকে উঠলেন, ঘড়ি দেখেছিস? তুই আছিস কোথায় বল তো?

এই রে!

কেস পুরো কেচলে গেছে! গেস্ট হাউসটা একতলা। তাই শোয়ার আগে কাল রাতে জানলা-দরজা সব এঁটে দিয়েছিলাম। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানলার পাল্লা খুলতেই হাল্কা আলো ঝাঁপিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

—কী রে? কী হল?

—সরি মামা। জানলা-দরজা সব বন্ধ ছিল, তাই—এখনই ব্যবস্থা করছি।

—ওয়ান মোর পয়েন্ট। ওই যে নূরের ভাই, যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মোবাইল ফোন আছে। বাড়ির লোক নিশ্চয়ই খোঁজ করবে, কোথায় গেল সে।

—হ্যাঁ। রহমানসায়েব বললেন, তাজ মহম্মদকে তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ওর বডি সার্চ করে একটা রিভলভারও পাওয়া গেছে।

—ওকে...। ছাড়ছি।

ফোন অফ করতে-করতে দেখলাম, বাইরে পোর্টিকোয় একজন দাঁড়িয়ে আছে। আপাদমস্তক চাদর ঢাকা।

—কে—?

নিজেই হেসে ফেললাম। এখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে! রঞ্জন সরকার।

রঞ্জনবাবুও চাদর সরিয়ে হাসিমুখে বললেন,—গুড মর্নিং! মর্নিংওয়াক করছিলাম, তোমার গলা শুনে দাঁড়ালাম। কথা বলছিলে। কে এল?

—কেউ না। কলকাতা থেকে জগুমামার ফোন এসেছিল। এসে পড়ছেন। সঙ্গে সুনীলবাবু।

—তাই নাকি। দারুণ খবর। সুনীল ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ। চলুন, ডি.আই.জি. সায়েবের ঘরে যাই। মামা কয়েকটা...আপনার পার্টনার কই?

—সুধাংশু? তার এখন মাঝরাত। নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে...চলো। আমিও কর্তাকে একটা রিকোয়েস্ট করব।

নক করতেই দরজা খুলে গেল। ডি.আই.জি. সায়েবের পরনে লুঙি, ফতুয়া। হাতে রেজার। গালভরতি। সাবানের ফেনা।

—আইস, ভাইগ্না, আইস। আসেন, বসেন। কও, কী খবর?

জগুমামার কথাগুলো বলে গেলাম। দাড়ি কামিয়েই উনি ফোনের ডাইরি নিয়ে বসে পড়লেন। নিজের সেলফোন থেকে ফোন করে যাচ্ছেন। এত নিচুগলায় যে কাছে বসেও কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

ফোন-ডায়েরি পর্ব শেষ করে বেল টিপে চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর বললেন,—রহমান অলরেডি রওয়ানা দিয়া দিছে। নাইলে হ্যারেই কইতাম মুখার্জিসায়েবরে লগে লইয়া আইতে। যাউগ্গ্যা, সিকিওরিটির প্রবলেম হইত না। ও, ওই মানুষডা, যে তোমাগো ফলো করতাছিল, তারে এহনও ধরা যায় নাই।

—সে তো কক্সবাজারে ছিল। তারপর তো তাকে আর দেখিনি।

—ঠিক। লেট আস ওয়েট ফর রহমান।

এইসময় রঞ্জনবাবু বললেন,—সায়েব, আমাদের একটা রিকোয়েস্ট আছে। সব মিলিয়ে মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের ব্যাপার। ওনারা আসার আগেই ফিরে আসব।

—আরে, কন না!

—ফিরদৌস কাল বলছিলেন, কাছেই একটা পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন বার্মিজ প্যাগোডা আছে। ওই পাহাড়ে দাঁড়ালে শহর, নদী, সমুদ্র সব দেখা যায়। দারুণ সিনিক বিউটি। আপনি যদি—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অ্যাহনই কইয়া দিতাছি।

না এলে সত্যিই খুব মিস করতাম।

পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে বৌদ্ধ প্যাগোডার খণ্ডহর। এখনও পুরো ধ্বংসস্তূপ হয়নি, খিলানগুলো বেঁকেচুরে টিকে আছে।

সামনে শুয়ে আছেন দীর্ঘকায় নেগান-ডাট বুদ্ধ। চিন-জাপান-বার্মায় বুদ্ধের এই এক রূপ। তবে মূর্তি আস্ত নেই। পাথুরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

ফিরদৌস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—প্যাগোডার ভিতরে হেই বিরাট মূর্তি খাড়াইন্যা ছিল। ১৯৮৯ সালে ডিনামাইট বিস্ফোরণ হইল। ব্যস! সব শ্যাষ!

সুধাংশুবাবুর ঘুমের ঘোর কাটেনি। চোখ মুছতে-মুছতে বললেন,—ডিনামাইট! কেন?

রঞ্জনবাবু বললেন,—কেন আবার, ধ্বংস করতে। সুধাংশু, তালিবানরা সব দেশেই আছে। ধর্মের নামে ওরা সবকিছু করতে পারে। আমাদের দেশে ওদেরই অন্যজাতের ভাইরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল অযোধ্যার বাবরি মসজিদ।

ফিরদৌস নিশ্চুপ।

খুব কষ্ট হচ্ছিল। শুনেছি, টিভিতে দেখেছি, কিন্তু চোখের সামনে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের এইরকম কালাপাহাড়ি ধ্বংস কখনও দেখিনি। অল্প-অল্প ঝোপঝাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সকলে পাহাড়চুড়োর শেষপ্রান্তে চলে এলাম।

অনেক নীচে টেকনাফ শহর। যেন পুতুলের ঘর-বাড়ি। বাকি সব সবুজ। ছোট-ছোট পাহাড়ের সারি। বয়ে চলেছে নীলাভ নাফ নদী। ওপারে ঝাপসা সবুজ বন-পাহাড়। অন্য দেশ। মায়ানমার।

ওই দেশটার সঙ্গেও আমাদের কতকালের সম্পর্ক। তখন তার নাম ব্রহ্মদেশ বা বর্মা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'...তার বিপ্লবী ডাক্তার সব্যসাচী, অপূর্ব, ভারতী, সুমিত্রা, শশীমাস্টার...জীবন্ত সব চরিত্র...সেই সময়ের রেঙ্গুন শহর। এখন যার নাম ইয়াঙ্গন।

—চলো ভাই। দেরি হয়ে যাবে।

রঞ্জন সরকারের ডাকে চিন্তা ছিঁড়ে গেল। ওঁরা নামতে শুরু করেছেন।

পাহাড়ি পথ বেয়ে কিছুটা নামতে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ড্রাইভার একজনের সঙ্গে গল্প জুড়েছে।

প্রায় সকলেরই চেহারা মঙ্গোলীয় ধাঁচের। চ্যাপ্টা নাক, ছোট-ছোট চোখ, হলদেটে গায়ের রং।

গাড়িতে উঠে বসেছি। ড্রাইভারের পরিচিত লোকটি তার পাশে উঠে পড়ল।

ফিরদৌসকে ঠেলা দিলাম। ফিরদৌস বললেন,—অ মিঁয়া! তাইনেরে তো চেনলাম না!

ড্রাইভার স্টার্ট দিতে দিতে একগাল হাসল,—আমার জানাশুনা। ফুফাতো ভাইয়ের দুস্ত লাগে। ফেক্টরিতে নাইট ডিউটি কইরা ঘর ফিরতাছিল, আমিই তানারে কইলাম আগাইয়া দিমু।

—অ।

মসৃণ ঢালু পথ দিয়ে টয়োটা ছুটে চলেছে। সোনালি রোদের আলপনা পথ জুড়ে। দুপাশে সবুজ আর সবুজ।

রঞ্জন সরকার বললেন,—সুনীলের সঙ্গে দেখা হবে। কী হয়েছিল তার, জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

—আমার তো মনে হয়—

কথা শেষ হল না। সামনের লোকটা ১৮০০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে আমাদের দিকে। ডানহাতে পিস্তল!

নড়বেন না! খুন করা আমার পেশা!

ড্রাইভার ঘোরাতে যাচ্ছিল। বাঁ-হাতে তাকে রদ্দা মারল,—ছাগলের বাচ্ছা, সিধা যাইবি! ইদিকসিদিক করছস কি অ্যাক্কেরে জাহান্নমে পৌঁছায়ে দিমু। হা:! ফুফাতো ভাইয়ের দুস্ত আমার!

ফিরদৌস চোখ বুঁজে ফেলেছেন। সুধাংশুবাবু কাঁপছেন। একমাত্র রঞ্জন সরকার স্টেডি। বললেন,—ভাই, আমাদের অপরাধ কী, জানলাম না।

—অ্যাক্কেরে চুপ যান। ওসব হিসাব-নিকাশ মালিক করবে। আমি হুকুম তালিল করি।

—কে ভাই আপনার মালিক?

—গিয়াই দ্যাখবেন! অ্যাই ছাগলডা, সামনের চুমুনিতে বামে ঘুরাইবি।

লোকটার চোখের দৃষ্টি ঠিক সাপের মতো। পলকে-পলকে ডান-বাঁয়ে সরে যাচ্ছে। শরীর শিরশির করে উঠছে।

আমি ভেবে চলেছি। এরপর? ফোর ভার্সাস ওয়ান প্লাস পিস্তল। হেরে যাব? কিন্তু কী করব?

রঞ্জনবাবু কথা চালিয়ে যাচ্ছেন,—ভাই, মনে হচ্ছে, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। ফিরেই আমাদের ব্যাক করতে হবে। বাসের টাইম পেরিয়ে যাবে।

—কিচ্ছু ভুল হয় নাই। চুপ যান!

—ভুল হয়নি? আমরা তিনজন ইন্ডিয়া থেকে বেড়াতে এসেছি, ইনি লোকাল ফ্রেন্ড।

লোকটা একটু থমকাল। ওর চোখে বিভ্রান্তি। বিড়বিড় করে বলছে,—চারজন...হ, মালিক কইছিল বটে কমপক্ষে ছয়জন...কিন্তু হেই গাড়িডা...

এই সময়টুকুর দরকার ছিল।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম,—অ্যাকসিডেন্ট—অ্যাকসিডেন্ট! ব্রেক! ব্রেক!...

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে টয়োটা থেমে গেল। বাকি কাজগুলো ঘটে গেল সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে। লোকটার ডান হাত একটু ওপরে উঠে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার জোড়া হাত ঠিক খাঁড়ার মতো নেমে এল ওর কব্জিতে। পিস্তলটা 'টুপ' করে খসে পড়েছে পিছনের সিটের ফুটস্পেসে। সুধাংশুবাবু, রঞ্জনবাবু টপকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওর ওপর। আমি নিচু হয়ে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছি।

ব্যস! অপারেশন শেষ।

খুনেটাকে হাত-পা বেঁধে গাড়ির পিছনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। সামনের সিটে আমি। পকেটে পিস্তল। টয়োটা আবার ছুটছে। ড্রাইভার এখনও কাঁপছে।

রঞ্জন সরকার ব্যাপক রাগে তাকে ধমকাচ্ছেন,—তুমি পুলিশের ড্রাইভার? ছি:, ছি:, সামান্য বোধবুদ্ধি নেই তোমার! রাস্তার একটা লোককে গাড়িতে তুলে ফেললে!

—না, মানে কইল আমার ফুফাতো ভায়ের নাম...তয়...

—আর অমনি তাকে গাড়িতে তুলে নেবে? স্টুপিড! তোমাকে এখনি সাসপেন্ড করা উচিত।

ড্রাইভার দরদর করে ঘামছে।

মিনিট দশেকের মধ্যে গেস্ট হাউসের কম্পাউন্ডে ঢুকে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে ফিরদৌস ছুটে গেছেন ভিতরে।

ভিতরে আরও দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেলা প্রায় এগারোটা।

ভিতর থেকে পাঁচজন সশস্ত্র পুলিশ বেরিয়ে এল।

ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দিল। খুনেটাকে নামানো হল। এটা 'শাপে বর' হয়েছে। ওর মালিকরা কোথায় ঘাঁটি গেড়েছে, ওকে সঙ্গে নিয়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

ফিরদৌস হোসেন বেরিয়ে এলেন। আনন্দ-উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন,— আয়েন। সার আইয়া পড়ছেন।

—স্যর! মানে ডক্টর আমেদ?

—জি, জি। দুই ফ্রেন্ড গপ্পো মারতাছেন।

—বলেন কী! সুনীলবাবু?

—না, তাইনেরে দেখি নাই।

ঢুকেই সুধাংশুবাবু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন,—আরে! কখন এলে?

১৬

আমি হতভম্ব, কিছুই বুঝতে পারছি না। ফিরদৌস হোসেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর দুটো সানগ্লাস, একটা শিখ-পাগড়ি, একটা সায়েবি টুপি রাখা।

জগুমামা মুচকি-মুচকি হাসছেন। বললেন,—ফিরদৌস! কিডন্যাপাররা যে ভুল করেছিল, আপনিও সেই ভুল করলেন। ইনি আপনার স্যার নন, কলকাতার সুনীল আচার্য।

কয়েকটা বিস্ময়সূচক শব্দ উছলে উঠল।

জগুমামা বললেন,—অবশ্য আপনাকেই বা কী বলব! বরিশালের ভোলায় আমিও একই ভুল করেছিলাম। বারবার আমেদ ভেবে ওনাকে আমার সঙ্গে যেতে ডাকছি, উনি অচেনা চোখে দেখছেন। আমি টোটালি কনফিউজড। শেষপর্যন্ত ওঁকে ফেলে রেখেই পালালাম।

ভালোই করেছিলেন। —সুনীলবাবু বললেন, নইলে আপনিও ধরা পড়ে যেতেন। একটু পরেই তো ওরা এসে পড়ল।

জগুমামা ঘাড় নাড়লেন। বললেন,—আসলে আপনাদের দুজনের চেহারায় এত মিল, যমজ ভাই ছাড়া দেখা যায় না। জেনেটিক্সের সুতো খুঁজতে-খুঁজতে হয়তো পঞ্চাশ-ষাট জেনারেশন আগের কোনও আত্মীয়তা বেরোবে। তারপর শাখা-প্রশাখা—

এ আবার কী? —সুধাংশুবাবু বলে উঠলেন,—দুজনের দেশ, জাত সব আলাদা!

—না। সব আলাদা নয়। সুনীলবাবু বলেছেন, ওদের আদি দেশ ছিল চট্টগ্রামে। ঠাকুর্দা তিরিশের দশকে টাকিতে সেটল করেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মেনলি হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের মানুষই বসবাস করতেন। বাংলায় তুর্কি রাজত্বের সময় সামাজিক কারণে অনেকে ইসলাম ধর্ম নেন। বাংলাদেশে নাইনটি পার্সেন্ট মানুষই তাই। কনভার্টেড মুসলিম। ঠিকঠাক শিকড় খুঁজলে দুজনের আত্মীয়তার সম্পর্ক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। তারপর জিন-জেনেটিক্সের অদ্ভুত খেলা! ডমিন্যান্ট-রিসেসিভ জিন পারমুটেশন-কম্বিনেশন হতে-হতে এতকাল পরে এসে দুজনের চেহারায় মিল ফুটে বেরিয়েছে!

জগুমামা থামলেন। সকলেই উন্মুখ হয়ে শুনছেন। ডি.আই.জি. সায়েবের আর তর সইছিল না।

—মুখার্জিসায়েব, হেডা বোঝলাম। আপনে অ্যাহন, যেভাবে ঘটনা ঘটছে, খুইলা কন তো।

খুলে বলার কি কিছু বাকি আছে? —জগুমামা হেসে বললেন,—অবিকল একরকম দেখতে দুটো লোক। দুজনেই বাঙালি, দুদেশের। একজন ইংরেজির অধ্যাপক, অন্যজন বিজ্ঞানী। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীকে কব্জা করার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছে মাফিয়ারা। কেন, সেটা আন্দাজ করতে পারি। বিজ্ঞানী মেছবাউদ্দিন আমেদ এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যার কোটি-কোটি ডলার দাম। সেটা ওরা চায়। বুঝতে পেরে আমেদ গা ঢাকা দিয়েছেন। এদিকে কলকাতা থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বাসে আসছিলেন, সুনীল আচার্য। ক্রিমিন্যালদের কাছে খবর ছিল, আমেদ কলকাতায় লুকিয়ে আছেন। ওরা সব জায়গায় খবর দিয়ে রেখেছিল, দেখতে পেলেই 'গুম' করবে। অতএব সেই রাতে সুনীলবাবুদের বাস পদ্মা পেরোনোর বার্জে উঠতেই, মাফিয়াদের অ্যাসিস্ট্যান্ট তাঁকে আমেদ ভেবে আইডেন্টিফাই করে ফেলল, এবং ড্রাগ পুশ করে অসাড় করে দেয়। ঢাকা পৌঁছোবার সঙ্গে-সঙ্গে রিলে সিস্টেমে আরেকটা দল সুনীলবাবুকে নিয়ে চলে যায় 'ভোলা'য়। সুনীলবাবুকে

দিয়ে চিঠিও লিখিয়ে নিল। তারই জেরক্স এল রঞ্জনবাবুদের কাছে, আবার আমেদের বাড়িতেও। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল রঞ্জনবাবু, মনে আছে?

—হ্যাঁ।

সুনীল আচার্য বললেন,—ডক্টর মুখার্জি, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। আমাদের দুজনের ব্যাপারটা।

রাইট। —জগুমামা বললেন, এই ঘটনার পিছনে সুনীলবাবু এবং আমেদেরও ভূমিকা আছে।

সবাই অবাক হয়ে তাকালেন।

জগুমামা বললেন,—আমরা জানতাম না মেহবাউদ্দিন আমেদ এবং সুনীল আচার্য পুরোনো বন্ধু। কলকাতায় এলে আমেদ সুনীলবাবুর বাড়িতেই উঠত। আমার ডায়েরিতে আজই চেক করে দেখলাম, আমেদের কলকাতার কনট্যাক্ট নাম্বার আর সুনীলবাবুর বাড়ির নাম্বার এক। তেমনি সুনীলবাবু এদেশে এলে আমেদের বাড়িতে উঠতেন। ঢাকাতেও আমেদের একটা ফ্ল্যাট আছে। তাই না?

সুনীল আচার্য সায় দিলেন।

—বিপদের গন্ধ পেয়ে আমেদ চলে গেল কলকাতায়। প্রায় একই সময়ে সুনীলবাবুর এপারে আসার কথা। উনি আমেদকে নিজের বাড়িতে রেখে আমেদের ভিসা-পাসপোর্ট নিয়ে চলে এলেন এদেশে। খানিকটা বীরত্ব দেখানোর ইচ্ছেও সেসময়ে ওঁর মধ্যে কাজ করছিল। খুবই ছেলেমানুষি, খানিকটা পাগলামি! অনেকটা এরকম ভাবনা—ধরবি, ধর না। পরে নিজেরাই বোকা বনবি। এইজন্যে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে কোথাও সুনীল আচার্যের নাম ছিল না।

—ডক্টর আমেদ কি কলকাতাতেই থেকে গেলেন?

না রঞ্জন। —সুনীল আচার্য বললেন,—কয়েকদিন পরে সে আমার পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে এপারে চলে এল। বর্ডার পেরিয়ে চেহারা পালটে সে দিব্যি মিশে গেছে। বাংলাদেশি সিটিজেন হয়েও ওর কাছে আছে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট-ভিসা।

বলো কী সুনীলদা! —সুধাংশুবাবু বললেন,—পুরো বেআইনি ব্যাপার। জাল পাসপোর্ট! কিন্তু চেহারাটা পালটালেন কী করে?

খুব সোজা। —জগুমামা বললেন, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে চুলের স্টাইল পালটে ফেললে চেনা কঠিন। টুকলু, নিশ্চয়ই বুঝছিস, যে লোকটা কক্সবাজারে আমাদের—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। যাকে আমরা ক্রিমিন্যাল বলে সন্দেহ করছিলাম!

—রাইট। ওর চোখদুটো ভীষণ চেনা-চেনা লাগছিল, ধরতে পারছিলাম না। এদিকে আমিও লুঙি-ফতুয়া-টুপি পরে, খোঁচাখোঁচা দাড়িতে অন্য লোক সেজে আছি। ও-ও আমায় ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। তাই

নিজের আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ করার সাহস—

মামার কথা আটকে গেল। ঢুকে পড়েছেন মসিয়ার রহমান। দুচোখে খুশির ঝিলিক।

—বা:-বা: চুমুৎকার। দুইজনাই আইয়া পড়ছেন।

জগুমামা হেসে ফেললেন। বললেন,—না, মিস্টার রহমান। সবাই এক ভুল করছে।—কলকাতার সুনীল আচার্য। ওদের 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। পরে শুনে নেবেন।

—হঃ!—রহমানের চোখ গোল্লা। বললেন,—তয় আমেদ সার কই?

—আছেন ধারে-কাছে। আমাদের খবর পেলেই এসে হাজির হবেন।...জরুরি কাজের কথা বলি। ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন শুরু করতে হবে। সেই মাফিয়ার ভাইটা কোথায়?

—তাজ মহম্মদের কথা কইতাছেন? আছে।

—মোবাইল ফোনসহ তাকে নিয়ে আসুন।

দুজন পুলিশ এনে হাজির করল লোকটাকে। পুলিশের হাতে একটা খুদে সেলফোন।

সুপুরুষ চেহারা। টকটকে ফরসা গায়ের রং। এইমুহূর্তে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত। চোখমুখ বসে গেছে।

পুলিশ দুজন বেরিয়ে গেল। রহমান তাজ মহম্মদকে পাশে বসালেন।

জগুমামা নিষ্পলকে তাকিয়ে আছেন। বললেন,—দাদা কোথায়?

তাজ বলল,—আমি যা জানি, কইয়া দিছি। বড়ভাইয়ার এই শহরে থাকনের কথা।

—কামালুদ্দিন আমেদ?

—কইতে পারুম না। তয় সে তো সব্বক্ষণ ভাইয়ার লগে লগেই থাকে।

—দাদার মোবাইল নম্বর নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?

—না...মানে...ঢাকার বাসায় আছে।

জগুমামা সামান্য হাসলেন। বললেন,—শুধু-শুধু চালাকি করার চেষ্টা করছেন কেন? তাতে আপনারই কষ্ট বাড়বে। আপনার সেলফোনে দাদার নম্বর নেই? রহমান, ফোনটা দিন!

তাজ মহম্মদ মুখ নিচু করল। বিড়বিড় করে বলল, —জি...ভুইলা গেছলাম...

ধরুন! আমি বললে ফোন অন করবেন।—কঠিন গলায় মামা বললেন,—আগে একটা কথা বলুন। এদেশে আপনাদের অ্যান্টি-গ্রুপ কারা?

—জি? অ্যান্টি গ্রুপ!

—আবার ন্যাকামি হচ্ছে? অ্যান্টি গ্রুপ বোঝেন না? এবার কিন্তু অন্য দাওয়াই দিতে বাধ্য হব। ভালোভাবে বলছি, ঠিক জবাব দিন। বাংলাদেশে আপনারা ড্রাগস-এর র‍্যাকেট চালান। আপনাদের অপোন্যান্ট গ্রুপও নিশ্চয়ই আছে। তাদের বস-এর নাম কী?

একটু অবাক হয়েই মামার দিকে তাকালাম। ওদের বিষয়ে আমাদের জেনে কী হবে?

তাজ মহম্মদও ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে ফেলল,—জি, শেখ আনিস।

—গুড। ওদের হেড কোয়ার্টার কোথায়?

—জি, ঢাকায়।

বেশ। —মামার পরের কথায় উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল। বললেন,—আপনার ফোন থেকে দাদাকে ফোন করুন। বলবেন, আনিস-এর দল আপনাকে কিডন্যাপ করেছে। ওরা দশলাখ মুক্তিপণ চাইছে। দাদা এখন যেখানে আছে, সেই ঠিকানায় তারা লোক পাঠাবে। দাদা যেন টাকাটা দিয়ে দেয়।

মুখার্জিসায়েব।—রহমান বলে উঠলেন,—এত কথা কওনের দরকার নাই। ...শোনেন, আপনে কইবেন, আনিসের লুক তুমার লগে কথা কইতাছে। আমি কথা কমু।

—ঠিক আছে। এবার ফোন করুন।...

তাজ মহম্মদ বোতাম টিপতে শুরু করল। পাশ থেকে ঝাঁকি দিয়ে দেখছেন রহমান। কানে ধরল।... আবার হাতে নিয়ে রি-ডায়াল করল। কানে দিল।

—নাহ! ভাইয়ারে পাইতাছি না।

জগুমামা দাবড়ে উঠলেন,—ফের মিথ্যে কথা! রহমান! দেখুন তো।

—না সায়েব, তাইনের ফুনে 'বড়ভাইয়া' স্টুর করা আছিল। হেই নম্বরেই করছে। আমি দেখছি।

রহমান নিজে ফোন নিয়ে বারকয়েক রি-ডায়াল করলেন। তারপর হতাশভাবে বললেন,—নাহ! মিলতাছে না। নূর মহম্মদ অ্যাহন যেহানে আছে, হেইখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নাই।

—সে কী! ওরা কি টেকনাফ ছেড়ে চলে গেল? নাকি ফোন অফ করে রেখেছে?

—মামা! ওই খুনেটাকে জিগ্যেস করো।

—ঠিক, ঠিক। রহমানসায়েব, চলুন তো।

হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় লোকটা পড়ে ছিল বারান্দায়। জগুমামা গটগট করে গিয়ে ওর কানের পাশে রিভলভার ঠেকালেন।

—তোমার মালিক এখন কোথায়?

লোকটা হিংস্র জন্তুর দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,—কইতে পারুম না।

টিউস...টি-উস—!

মামা বললেন,—এ দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। পরেরটা তোমার খুলিতে। কুইক! ওয়ান-টু-থ্রি...

খুনেটা কাঁপতে শুরু করেছে,—সঠিক জানি না হুজুর...আল্লার কসম...তাইনেরা কাল রাইতেই হক্কলে চইলা গেছে।

—কোথায় গেছে?

—বিশ্বাস করেন হুজুর, কয় নাই। নিজেগো লগে আলাপ করতাছিল, সুমুন্দুর পেরাইয়া নাকি মার্টিন দ্বীপে যাইব।

—দেখলেন! দেখলেন!—জগুমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। এটাই সকালে টুকলুকে বলেছি। কালই প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল। যাগ্গে, ভেবে লাভ নেই। অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা স্টার্ট করব।...

মামার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ফিরদৌস, রঞ্জনবাবু, সুধাংশুবাবু, সুনীলবাবু সকলেই যেতে চাইছেন। এঁদের সঙ্গে পুলিশ ফোর্স, রহমানসায়েব এবং ডি.আই.জি.। সব মিলিয়ে প্রায় কুড়িজন।

গেস্ট হাউসের বাইরে দুটো পুলিশের টয়োটা এসে গেছে। কিটব্যাগ নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই একে-একে বেরিয়ে আসছেন।

হঠাৎ চোখে পড়ল, একজন মানুষ আস্তে-আস্তে ডানদিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। মুখ নিচু। কাছে আসতে চমকে উঠেছি।

—মামা! মামা! শিগগির। ডক্টর আমেদ।

শুধু জগুমামা নন, সুনীল আচার্যও ছুটে এলেন।

১৭

বোঝতেই পারি নাই, কখন যে কামাল কুসংসর্গে জড়াইয়া পড়ছে! —ড. মেছবাউদ্দিন আমেদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওঁর গলার স্বর ভারী হয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে বললেন,—আমার থিইকা কামাল অনেক ছুট, ওর চোখ ফুটনের আগেই আব্বার ইন্তেকাল হইছিল। ছুটভাইডারে তাই শাসনের থিইকা আদরই দিছি বেশি। পড়াশুনায় মতি নাই। বকাঝকা কইরা যখন দ্যাখলাম, অর দ্বারা বেশিদূর হইত না, তখন কামে লাগাইয়া দিলাম। হেই শয়তানডা, নূর মহম্মদ, আমার বিশেষ পরিচিত। আমিই অর মেডিসিন শপে কামালরে

ঢুকাইয়া দিলাম। তবু সারাদিন আড্ডাবাজি বন্ধ হইব। কী কপাল দ্যাখেন, যার লগে অরে দিলাম, হেইডাই ইবলিশের বাচ্ছা!

আমেদ থামলেন।

সকলে এখন পুলিশ লঞ্চের ডেকে। লঞ্চ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দিকে।

ওপারে মায়ানমারের পার্বত্য অঞ্চল। পাহাড়ের পর পাহাড়। ফাঁকে-ফাঁকে ঘরবাড়ি। একটা বৌদ্ধ প্যাগোডা। আমাদের লঞ্চের মাথায় জাতীয় পতাকা। আবার নদীর ওপারের কাছাকাছি কয়েকটা নৌকোয় মায়ানমারের পতাকা।

নাফ নদী চওড়া হচ্ছে। জলের রং বদলে যাচ্ছে। বড়-বড় ঢেউ। ডানদিকের ডাঙাজমি সরু হতে-হতে একসময় মিলিয়ে গেল দিগন্তে। এখন জল গাঢ় নীল। আমরা ঢুকে পড়েছি গভীর সমুদ্রে।

জগুমামা সিগারেটে জোরে-জোরে টান দিয়ে বললেন,—একটা কথা ডক্টর আমেদ। আপনি ঠিক কবে বুঝলেন, কামাল-নূর এরা ড্রাগ র‍্যাকেটে যুক্ত? ওরা আপনাকে কিডন্যাপ করতে চায়?

—আগে বুঝি নাই। ছয়মাস হইল, কামালের মতিগতি অন্যপ্রকার লাগতাছিল। ভুরে বেরায়ে যায়, রাইতে ফেরে। কুনওদিন ফেরেও না। আমি তো সবসময় বাসায় থাকি না। আম্মা আমারে কয়। কামাল কইলে সে কয়, তুমি বোঝবা না। কামকাজের খুব চাপ।

—আচ্ছা!

—হেই...তা মাসদুই হইব, এক রাইতে সে কার লগে ফুনে আলাপ করতাছিল। আমি ওভারহিয়ার করি। শুনি সে আমার রিসার্চের বিষয় লইয়া কইতাছে। আমার রিসার্চে তার কী প্রয়োজন? বোঝলেন, হেই রাতে আমার খুব সন্দেহ হইল। কারণ হেইদিন মার্টিন থিকা সকালেই ফিরছি।

—আপনার রিসার্চ সেন্টার তো ছিড়াদিয়া দ্বীপে?

—জি। ছিড়াদিয়া সেন্ট মার্টিনেরই অংশ। তার গায়ে লাগা ছুট একখান দ্বীপ। বান আইলে পানি ঢুইকা আলাদা হইয়া যায়। ও দ্বীপে কুনও জনমনিষ্যি বাস করে না। তিনদিকে সুমুন্দুর।

—কামালকে আপনি কিছু বললেন?

—কওনের আগেই তো প্রমাণ আইয়া পড়ল। পরদিন সকাল হইতে না হইতে কামালের মালিক নূর মহম্মদ আইয়া হাজির। কী বেপার? নূর এটা-সেটা ভালো-মন্দ জিগায়। কেমন আছি, কামকাজ কেমন চলতাছে...হাবিজাবি, বোঝলেন! অনেক জিগাইবার পর শেষে কয়, আমার রিসার্চের বিষয়ে ও ইন্টারেস্টেড।...আমি সতর্ক হইয়া গেলাম। কয়, কুন বিষয়ে রিসার্চ করতাছি, কাগজপত্তর কুথায় থাকে, এইসব। অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমি বুইঝা ফ্যালাইলাম, অগো ধান্দা ঠিক নাই।...

—আপনি কী করলেন?

—হেই রাতেই বাসা থিকা চম্পট দিলাম। পেরথমে গেলাম ছিড়াদিয়া। সেন্টার বন্ধ কইরা ডকুমেন্টস উঠাইয়া নিজেই পলায়ে গেলাম।...বাকিডা তো জানেন।

—হ্যাঁ। ক'দিন আগে তো একবার কক্সবাজারের বাড়ি গেছিলেন।

—জি। আম্মার লগে দেখা করতে। বুড়িডা কিছুই জানে না। তাইনেরে ভাসা-ভাসা কইয়া আলাম।

—কিন্তু ডক্টর আমেদ, আপনার রিসার্চ সেন্টারে অ্যাপারেটাসগুলো যে পড়ে আছে! সে সবের কী অবস্থা?

ডক্টর আমেদ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন। আস্তে-আস্তে বললেন,—ওইডাই চিন্তা। আমার লেবরেটারিডার কী যে হাল হইল!

থম মেরে গেলেন।

সামনে দিগন্তে ফুটে উঠেছে তটরেখা। স্পষ্ট হচ্ছে ভূখণ্ড সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, বাংলাদেশের শেষ জনবসতি।

বড়-বড় ঢেউ কেটে লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। ইঞ্জিনের একটানা শব্দ। মাঝে-মাঝে লঞ্চ দুলে উঠছে। অথৈ জলরাশি। বঙ্গোপসাগর এখানে বেশ অশান্ত।

জগুমামা বললেন,—ডক্টর আমেদ, আমার ধারণা, আপনি ওই নোম্যানস আইল্যান্ডে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ ধরনের গবেষণা করছিলেন। কী গবেষণা,জানি না। আপনি যখন আমায় ইনভাইট করেছিলেন নতুন বাড়ি দেখাবেন বলে, তখনই মনে হয়েছিল। কি, ঠিক বলছি?

মেছবাউদ্দিন আমেদ ম্লান হাসলেন। বললেন,—অ্যাক্কেরে ঠিক। বড় সাধ ছিল, আপনারে দেখাইয়া স্যাটিসফাইড হইব। কিছুই হইল না...নসিব!

একমুহূর্ত চুপ করে বললেন,—আপনার লগে রিসার্চের ডিটেলস পরে আলোচনা করুম। অ্যাহন সংক্ষেপে কইতাছি।...আপনেরা জানেন, সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা আজ আর্থ রিসোর্স লইয়া রিসার্চ করতাছেন। মানবসভ্যতার কামে পৃথিবীর সব সম্পদ ফুরাইয়া আইতাছে। বাকি শুধু সি-রিসোর্স—সামুদ্রিক ভাণ্ডার। সি ফুড-এ শুধু মাছ নয়, অন্যান্য প্রাণীও প্রচুর, মানুষের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

এই লইয়া ভাবতে-ভাবতে শুরু করি একটা বিশেষ ধরনের মেশিন তৈয়ারি। হেই মেশিনটা ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বুকের মতো সি-ক্রিচারদের টাইনা আনবে। ছিড়াদিয়ার লাস্ট পয়েন্ট, একসট্রিম সাউথে, আন্ডার দা সি, চুঙ্গার মতো 'হলো' একখান রড বসাইছি। পঞ্চাশ মিটার তলা পর্যন্ত। মেটালিক রড। হেই রড-এর বিভিন্ন ডেপথে বিভিন্ন ইনটেনসিটির ইউ-ভি আলো জ্বলবে। বিভিন্ন ওয়েভের সাউন্ড ছাড়া হইব। এক-এক জাতের সি-ক্রিচার আইয়া জড়ো হইব ওই রডের এক-এক পয়েন্টে। ব্যস, আর কুনও ভাবনা নাই। তাগো

জাল দিয়া ধরেন আর পৌঁছায়া দেন বাজারে। খাবার অভাব মিইটা যাবে, ফরেনে একসপোর্ট হইব। কস্ট ফ্যাকটর অনেক কম। মাছমারাগো দূর সুমুন্দুরে জান হাতে কইরা যাইতে হইব না।...আমি এক্সপেরিমেন্ট কমপ্লিট কইরা ফ্যালাইছি। ঠিক করছিলাম, আমাগো বাংলাদেশের সাদার্ন পার্টের সব বড়-বড় নদীর মুহানায় একখান কইরা হেইরকম যন্তর—

গ্রেট!—মামা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—অসাধারণ ভাবনা। আপনাকে কনগ্রাচুলেশন আমেদ। পরে আপনার কাছ থেকে ডিটেলস শুনে নেব। এখন ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট কাজ রিসার্চ সেন্টারটা বাঁচানো।

পুলিশ লঞ্চ এসে নোঙর ফেলেছে বেলাভূমির কাছেই। আর এগোনো যাবে না। সেন্ট মার্টিনে কোনও জেটি নেই। পুরো দ্বীপটা যে প্রবাল দিয়ে তৈরি।

ছোট-ছোট ডিঙি নৌকো এগিয়ে আসছে তীর থেকে। নৌকোগুলোয় উঠে পড়লাম।

সোনালি বেলাভূমি। তীব্র নীলাভ স্বচ্ছ জল, অনেক গভীর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

সৈকতের কাছেই ঝিনুক, প্রবাল, শামুক দিয়ে তৈরি ঘর-সাজানোর জিনিসের সারি-সারি দোকান। বেশ কিছু বিদেশি-বিদেশিনী ছাতার তলায় শুয়ে।

হোটেলের এজেন্টরা আমাদের ঘিরে ধরেছে। হাতে নেম কার্ড। একজন আমাদের পাশে এসে বলল,—আপনেরা ইন্ডিয়া থিকা আইছেন তো? আমাগো হোটেলের মালিক ইন্ডিয়ার মানুষ। ওয়েস্ট বেঙ্গলের হাওড়ায় বাড়ি। আবদুল কাশেম চৌধুরী। বে-অব-বেঙ্গল লজ। আমাগো লগে আয়েন।

আমি হাসলাম। ইচ্ছেমতো কোথাও যাওয়ার সুযোগ এই মুহূর্তে নেই। পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জিপে উঠতে-উঠতে জগুমামা ডি.আই.জি. সায়েবকে জিগ্যেস করলেন, —সোজা ছিড়াদিয়া দ্বীপে যাব। এখন যাওয়া যাবে তো?

ডি. আই. জি. স্থানীয় পুলিশকর্তার সঙ্গে কথা বলে বললেন,—হ। অ্যাহন মরাকুটাল চলতাছে। ঘণ্টা দুই পর বান আইব।

পাঁচটা পুলিশ-জিপ ছুটে চলল বেলাভূমিকে বেড় দিয়ে। দক্ষিণমুখো।

দশ মিনিটের মধ্যে সেন্ট মার্টিনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছি। সামনে ঢালু খাড়ি। ওপারে আরেক ভূখণ্ড। লাগোয়া ছিড়াদিয়া দ্বীপ।

মামা বললেন,—ডক্টর আমেদ, আপনাকে বলা হয়নি, আপনার অর্গানাইজারটা পাওয়া গেছে। তার মধ্যেই ওই দ্বীপটার নাম জানতে পারি। কিন্তু CHIRADIA-350₀। এর মানে কী?

আমেদ বললেন,— যেইখানে আমার রিসার্চ সেন্টার, তার লুকেশন হইল গিয়া বাংলাদেশের শ্যাষ বিন্দুতে। ওইখান থিকা তিনশ পঞ্চাশ ডিগ্রি সাগর দেখা যায়।

কনভয়ের প্রথম জিপে আমরা। জিপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমেদ ফের বললেন,—কী হইল, খাড়াইলেন ক্যান? অ্যাহন শুকনার সময়, গাড়ি হরদম যায়।

ঢালু খাড়িতে টলমল করতে-করতে জিপ নামছে। পরপর। জল-কাদা জায়গায়-জায়গায়। ওপারে বড়-বড় কেয়া গাছের ঝোপঝাড়। বললাম,—মামা, দেখেছ? চাকার দাগ না?

হুঁ।—মামা গম্ভীর। নিচুগলায় বললেন,—আস্তে চালাও।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল অস্পষ্ট ইঞ্জিনের শব্দ—ঘর...ঘর...ঘর...

জিপের মুখ ততক্ষণে চড়াই বেয়ে ওপরের দিকে।

দ্রাম!...দ্রাম!...দ্রাম!...

ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে এল গুলি। হেডলাইটের কাচ ঝন-ঝন করে ভেঙে পড়ল ।

সিট আর ড্যাশবোর্ডের ফাঁকে মুখ গুঁজে দিয়েছি।

—ব্যাক! ব্যাক করো।—মামা চেঁচিয়ে উঠলেন।

গাড়িগুলো পিছন দিকে গড়িয়ে নামছে। আতঙ্কে শরীর কাঁপছে। আবার...আবার এনকাউন্টার?

সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নেমে পড়েছে। জগুমামা চাপাগলায় বললেন,—ডি.আই.জি. সায়েব! অর্ডার দিন—চার্জ দেম! উই আর ইন আ ভেরি ব্যাড পজিশন। ওরা যদি এদিকে ছুটে আসে, কেউ বাঁচব না।...এই যে আপনারা,—আমেদ, টুকলু, সুধাংশুবাবু...সবাই গাড়ির নীচে ঢুকে পড়ুন! কুইক।

পুলিশবাহিনী হামাগুড়ি দিয়ে গেরিলাদের মতো উঠছে। সঙ্গে রহমান, ডি.আই.জি. এবং জগুমামা।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—যদি মামার কিছু হয়ে যায়?

গাড়ির চাতালের নীচ থেকে দেখছি, ওঁরা সকলে ওদিকে উঠে পড়েছেন, ঝোপের ফাঁকে বসে পড়েছেন।

এক রাউন্ড গুলি চলার পর সব নিস্তব্ধ। শুধু একটানা হাওয়া আর সাগরের গর্জন। আর হ্যাঁ, সেই 'ঘর-র-র' শব্দটা এখন আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। ফোর্স নিয়ে মামারা সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তবে কি প্রতিপক্ষ সারেন্ডার করল?

দম আটকে রয়েছি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কয়েক সেকেন্ড পরে মামারা আরও খানিকটা ছুটে গেলেন। আর দেখা যাচ্ছে না!

যা হয় হবে। গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলাম সামনের দিকে।

ছুটতে-ছুটতে ওপরে উঠে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে স্তম্ভিত বললেও কম বলা হয়।

একটা সবুজ হেলিকপ্টার প্রপেলার ঘোরাতে-ঘোরাতে জমি ছেড়ে উঠে পড়েছে। ওরই শব্দ পাচ্ছিলাম। ডাঙার শেষপ্রান্তে একটা একতলা লোহার খাঁচা-জড়ানো বাড়ি। সমুদ্রে ভেসে পালিয়ে যাচ্ছে চার-পাঁচটা

মোটর বোট।

পুলিশফোর্স ছুটতে-ছুটতে হেলিকপ্টার আর মোটর বোট লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু ওরা রেঞ্জের বাইরে।

পিছন-পিছন ছুটে চলেছি বাংলাদেশের শেষ বিন্দুর দিকে—একটু দূরেই একতলা বাড়িটা। আমেদের রিসার্চ সেন্টার।

—বুম-বুম—বুম-বুম—!

ভয়ংকর বিস্ফোরণ! দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। রিসার্চ-সেন্টার আগুনের চুল্লি! সাপের মতো লকলক করে উঠছে লেলিহান শিখা। বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

জগুমামা বালির ওপর বসে পড়লেন। দু-হাতে মাথা চেপে ধরেছেন।

হেলিকপ্টার অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে-উড়তে চলে যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিকে। মোটর বোটগুলো ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে দিকচক্রবালে।

চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়, ওরা যাচ্ছে মায়ানমারে।

মামার পাশে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলাম। মামা মুখ তুলে তাকালেন। মুখ জুড়ে হেরে যাওয়ার গ্লানি। বিড়বিড় করে বললেন,—পারলাম না রে! শেষ মুহূর্তে ওরা জিতে গেল। একটু আগে যদি...।

ডি.আই.জি. সায়েব সান্ত্বনার সুরে বললেন,—আপনে রেস্ট অ্যাসিওরড থাকেন ডক্টর মুখার্জি। অগো আমরা নিশ্চিত ধরব। দরকার হইলে ইন্টারপুলের হেল্প নিমু। আপনে যথেষ্ট করছেন। ওঠেন...চলেন...।

পরাজিত সেনাপতির মতো মুখ নীচু করে জগুমামা হাঁটছেন। পিছনে সবাই।

মে ২০০১

মূর্তি ও মৃত্যুফাঁদ

একটা লোক। মাথায় ত্রিভুজ টুপি। রঙিন ঢোলা জামা-পাজামা পরা। হাত বাড়িয়ে মেঘ ছুঁতে চাইছে।

হঠাৎ-হঠাৎ মনের বয়েস অনেকখানি কমে যায়। এই যেমন, এখন। পশ্চিম-দিগন্তে সূর্য আগেই ডুবে গেছে। আধখানা আকাশ জুড়ে গোধূলির রং—লাল-কমলা-হলদে। রং মেখে খণ্ড-খণ্ড মেঘেরা স্থির হয়ে আছে। তাদেরই একজনকে মনে হচ্ছে জ্যান্ত মানুষ।

ছেলেবেলায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। কতকিছু কল্পনা করে নিতাম। এখন আর বিস্ময় জাগে না। তবে ভালো লাগে। প্রকৃতি কত বড় শিল্পী!

রবিবারের বিকেল। কাজকর্ম নেই। টাটকা হাওয়া খেতে চারতলার ছাদে উঠেছি। পরপর কদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেছে। আবহাওয়া পালটাচ্ছে। একটু-একটু শরতের ছোঁয়া।

টুং-টুং। নীচে কলিং বেলের বাজনা। কে এল?

ঝুঁকে পড়লাম। যা ভেবেছি, তাই।

জগুমামা। কিটসব্যাগ ঝুলিয়ে উঠে আসছেন। পিছনে পিকলুর হাতে ঢাউস একটা সুটকেস।

—একটু দেরি হয়ে গেল।

—হ্যাঁ রে। ফ্লাইট আধঘণ্টা লেট ছিল।

আবার 'কলিং বেল'! মা এগিয়ে গেলেন। আবার কে এল?

পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই চমকে উঠেছি। ড্রইংরুমের সোফায় আয়েশ করে বসে পড়েছেন আমাদের আদি অকৃত্রিম মহাপ্রভু। শ্রীযুক্ত অন্তহীন সরখেল।

সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার! ভদ্রলোক কি হাত গুনতে জানেন নাকি? এমনিতে অবশ্য জগুমামা না থাকলেও মাসের মধ্যে দু-চারবার আসেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে, এসে পড়লেন কীভাবে? মামা এসেছেন, এখনও পাঁচ মিনিটও হয়নি।

—ব্যাপারখানা কী? মামার পিছন-পিছন হাজির হলেন!

—হেঁ-হেঁ বাছা, ওসব তুমি বুঝবে না। স্যারের গন্ধ পাই, বুঝলে। ফেমাস লোকদের শরীর দিয়ে স্পেশাল টাইপের সেন্ট বেরোয়। ওই যে কী বলে যেন, কসৌরির মতো!

—কসৌরি? সে আবার কী? আপনি কি খাবার কচুরির কথা বলছেন?

—না-না! ওই যে, তোমার ইয়ে হরিণের, মানে—

—মৃগনাভি? সে তো কস্তুরী। আপনি একটা—বাজে না বকে ঝেড়ে কাশুন তো।

—কাশব আবার কী? যা সত্যি, তাই বললুম। বিশ্বেস না হয়, কোরো না। দিব্যি আমায় ফেলে রেখে বাংলাদেশে হই চই করে এলে। এবার একেবারে অ্যান্টেনা খাড়া করে রেখেছি। আর ছাড়ছি না।

—যাওয়া হলে তো ছাড়বেন। আমরা কোত্থাও যাচ্ছি না। হায়দরাবাদে মামার প্রচুর চাপ ছিল। মামা জাস্ট এখানে খেয়ে-বসে-শুয়ে কাটাবেন।

—দ্যাখো, কী হয়!

—মানে?

—মানে আমরা তিনজন, স্যার-তুমি-আমি একজায়গায় জুটলেই কী হয়, দেখোনি?

—আপনি তো আচ্ছা লোক! এসেই অলক্ষুণে কথাবার্তা—

তুই থাম তো! —মা ময়দানে নেমে পড়েছেন। বললেন,—আমি বুঝি না, অনন্তবাবু এলেই তুই পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিস কেন?

—আপনিই বলুন দিদি। সবসময় টুকলু—

—আমি জিগ্যেস করছিলাম, মামার আসার খবর উনি—

—আমি বলেছি। হয়েছে?

জগুমামার গলা পেলাম, পিকু! তোর কম্পিউটারটা একটু খোল। আমার ই-মেলগুলো একটু চেক করে নিই। সকাল থেকে সময় পাইনি।

মামা বাথরুম যেতে-যেতে দাঁড়ালেন।

—অনন্তবাবু! কেমন আছেন? ...আসছি।

—হ্যাঁ স্যার, সব ঠিক আছে।

কম্পিউটার আমি খুব একটা জানি না। পিকলু আবার কম্পিউটারে মাস্টার। সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ে পড়ে আছে। প্রোগ্রাম করছে, ডিজাইন করছে, ইন্টারনেট খুলছে। একেবারে নেশাগ্রস্ত।

মা কালকেই চেঁচামেচি করছিলেন। ইন্টারনেট চালানো মানেই টেলিফোন চালু। এমাসে তিন হাজার টাকা বিল এসেছে। তাছাড়া টেলিফোন এনগেজড থাকায় কেউ ফোনে পায়ও না।

পিকলু এসব পাত্তা দেয় না। কম্পিউটারের দৌলতে ও এই বয়েসেই জার্মানি ঘুরে এসেছে। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বড়সড় চাকরি করছে।

—দাদা! মামার পাসওয়ার্ড জেনে বল তো।

—জে এ জি ইউ।

পিকলু খুটখুট করে টাইপ করল। তারপর প্রিন্টার চালু করে দিল।

এই ইলেকট্রনিক মেল, সংক্ষেপে ই-মেল এক আশ্চর্য আবিষ্কার। তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো, নিজের ই-মেল খুলে খবর পেতে পারো, পাঠাতেও পারো। একটা কম্পিউটার, টেলিফোন লাইন আর ইন্টারনেট কানেকশন থাকলেই হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চিঠি আসবে-যাবে। খরচ একটা লোকাল টেলিফোন কল।

মেসেজগুলো পরপর প্রিন্ট হতে শুরু করেছে। মামার কাছে আজকে দশটা চিঠি এসেছে।

মামা ড্রইংরুমে। চা খাচ্ছেন। পিকলু চিঠিগুলো ধরিয়ে দিল। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে।

মামা পরপর উলটে যাচ্ছেন। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের, বন্ধুবান্ধবের, বিশ্ববিদ্যালয়ের...বিজ্ঞানের নানা খবর...

হঠাৎ জগুমামা থেমে গেলেন। তাঁর হাতে ধরা চিঠিটা এসেছে এক বন্ধুর কাছ থেকেই। কারণ প্রথমেই ইংরেজিতে 'Dear Jagu' লেখা।

মামা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। বললেন,—পিকু! এই চিঠিটার এখনই জবাব দিতে হবে।

কম্পিউটারে বসে পড়েছেন মামা। পাশে চিঠিটা রাখা। আমি দ্রুত পড়ে যাচ্ছি।

রোমান হরফে বাংলাতে লেখা। প্রথমে একটু হিজিবিজি লাগছিল, তারপর বুঝতে পারলাম। আজকাল অনেকেই এভাবে লেখেন।

চিঠিটা মোটামুটি এইরকম—

ডিয়ার জগু,

আশা করি, ভালো আছ। কিছুতেই তোমায় ধরতে পারছি না। কোথায় যে কখন থাকো। অতিকষ্টে তোমার ই-মেইল নম্বর পেয়ে লিখছি।

মনে হল, তুমিই পারবে। কারণ, এর আগেও তুমি নাকি নানারকম ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করেছ। এটা তোমার প্যাশন।

আমার রিলেটিভকে তুমিই বাঁচাতে পারবে। সে খুব বিপদে। আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের খুব ক্লোজ।

তোমার এখনকার টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর যদি ই-মেল করো, আমি তাকে দিয়ে দেব। সে-ই কনট্যাক্ট করবে। তবে বিদেশে থাকলে দিয়ে লাভ নেই।

ম্যাটারটা খুব আর্জেন্ট। লাইফ-ডেথ কোশ্চেন।

তোমার সাহায্যের আশায় থাকছি।

ড. সুমিত হাজরা

জগুমামা তাঁর মেইল-বক্সে টাইপ করে যাচ্ছেন। আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর দিলেন। তারপর পিকলুকে বললেন,—তোর মোবাইল নম্বরটাও বল। যদি ল্যান্ড লাইনে না পায়।

পিকলু একটু ভেবে বলল,—৯৮৩০৩৪৪৫০৭।

মামা চিঠি শেষ করে মেইল পাঠিয়ে দিলেন।

পিকলু কম্পিউটারের সামনে বসে রইল। ওর সেলফোন নিয়ে আমরা এসে বসলাম ড্রইংরুমে। অনন্ত সরখেলের চোখদুটো চকচক করে উঠেছে।

—স্যার, কোনও প্রবলেম?

খেঁকিয়ে উঠলাম, ন্যা-কা! আপনি তো এতক্ষণ সেটাই চাইছিলেন।

—আহ টুকলু! হ্যাঁ অনন্তবাবু, আমার ক্লাসমেট সুমিত হাজরা হঠাৎ মেইল করেছে। ওর কোনও আত্মীয় বিপদে পড়েছে। আমার সাহায্য চান। অবশ্য বিপদটা কী, আত্মীয়ের নাম কী, কিছুই লেখেনি। ফোন নম্বর চেয়েছে, যোগাযোগ করে নেবে। ওসব বাদ দিন, আপনার কথা বলুন। আছেন কেমন?

—চলে যাচ্ছে স্যার।

—ব্যবসাপত্র? আপনার দোকান?

—মোটামুটি স্যার। তেমন কিছু না। আসলে আজকাল লোকে ব্র্যান্ডের দিকে ছুটছে। একটা জামা, বড়জোর দুশো টাকা দাম, ব্র্যান্ডেড হলেই তার দাম হচ্ছে আটশো টাকা। বিদেশি কোম্পানির ছাপ্পা। লোকে তাই কিনছে। তারমধ্যেই টেনেটুনে চালিয়ে যাচ্ছি স্যার।

—আপনার অবশ্য সমস্যা নেই। ঝাড়া হাত-পা মানুষ।

—হ্যাঁ স্যার, ওইটেই রক্ষে।

বলতে-বলতে অনন্ত সরখেল হাত বাড়িয়ে প্লেট তুলতে যাচ্ছিলেন। তখনই মোবাইলটা কাঁপতে-কাঁপতে বেজে উঠল।

—হ্যালো।...হ্যাঁ দিচ্ছি।...মামা!

২

—হ্যাঁ, বলছি। কে বলছেন?

—আমায় চিনবেন না।...আমি খুব বিপদে।...যে-কোনও সময় খুন হব।...একবার আসবেন?

—কোথায় যাব? আপনি কোথায় আছেন?

—আপনি তো সল্টলেকে।...পাঁচ মিনিট পরে আবার টেলিফোন করছি।...তারমধ্যে কাইন্ডলি রেডি হয়ে নিন।...আপনার নিয়ারেস্ট পয়েন্ট বলুন।

—করুণাময়ী।

খুট করে ফোন কেটে দিল। জগুমামা হতভম্ব। লোকটা কে, কোত্থেকে ফোন করছে, কিছুই বলল না!

—যাবে নাকি? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।

—আমার হচ্ছে না। সুমিতের রেফারেন্স। লোকটা খুব ভয়ে আছে।

ঝড়ের বেগে গোটা দুই লুচি খেয়ে জগুমামা ঘরে ঢুকে গেলেন। অনন্ত সরখেলও অবিশ্বাস্য দ্রুততায় প্লেট সাফ করে ফেলেছেন।

ঠিক তিন মিনিটের মাথায় মামা রেডি হয়ে বেরিয়ে এলেন। আমিও প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়েছি।

মোবাইলটা এগিয়ে দিয়ে জগুমামা বললেন,—পকেটে রেখে দে।

মামা! —পিকলুর গলা,—সুমিত হাজরা মেইল ব্যাক করেছে।

—কী লিখেছে?

—ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, ওর রিলেটিভ নিশ্চয়ই এতক্ষণে যোগাযোগ করে নিয়েছে। উনি দুর্গাপুরে আছেন। ফোন নাম্বার দিয়েছেন।

—গুড। ফিরে এসে কথা বলব। পিকু, বাড়ির ফোনটা ফাঁকা রাখ। ইন্টারনেট বন্ধ করে দে।

মামার কথা শেষ হল না। সেলফোন বেজে উঠেছে।

—হ্যালো।

—রেডি হয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—ফোনটা না কেটে চলে আসুন।...করুণাময়ী কত দূর?

—দু-মিনিট।

মামার পিছন-পিছন আমি আর অনন্তবাবু। জগুমামা প্রচণ্ড জোরে হাঁটছেন।

—কোথায় আপনারা?

—এসে গেছি।

—বাস স্ট্যান্ডের উলটোদিকে একটা মারুতি দাঁড়িয়ে আছে।... সাদা। দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—নম্বরটা বলুন।

—ডব্লিউ বি বাহান্ন দুশো ছেচল্লিশ।

—হ্যাঁ। ওইটাই।...আপনি কি একা?

—না। সঙ্গে দুজন।

—আপনার প্যান্টশার্টের রং?

—গ্রে আর হোয়াইট।

—একটু ধরুন। ...প্লিজ।

ফোনের মধ্যে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওই লোকটা কাউকে কিছু বলছে। আমরা তিনজনে সেই সাদা মারুতির সামনেই প্রায় এসে পড়েছি। মামা বিড়বিড় করলেন,—মাথায় ছিট আছে।

মারুতির দরজা খুলে একজন বেরিয়ে এল। তার কানে সেলফোন। বলল,—চলুন।

আমরা পরপর পিছনের সিটে।

সেলফোনে আবার শোনা গেল,—কাচ তুলে দিন। ...প্লিজ।

গাড়িটা এয়ারকন্ডিশনড। ঠান্ডা হাওয়া সামনে থেকে আসছে।

হঠাৎ সামনের লোকটা ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল! তার ডানহাতে উদ্যত রিভলভার, বাঁ-হাতে তিনটে কাপড়ের মোটা ব্যান্ড। আমাদের দিকে সেগুলো ছুঁড়ে দিয়ে খুব ঠান্ডাগলায় বলল,—এগুলো চোখের ওপরে বেঁধে নিন। জলদি।

—মানে?

জগুমামা স্তম্ভিত।

—জবাব দিতে পারব না। কর্তার হুকুম।

জগুমামার মোবাইলে ফের সেই গলা,—প্লিজ! ...বেঁধে নিন।... কারণ আছে।

মামা আমাদের ইশারা করলেন। ঠুলি পরে নিলাম।

—থ্যাঙ্কিউ। ...এবার ফোন বন্ধ করে দিতে পারেন।...

ফোন কেটে দিল।

অসহ্য! রাগে হাত-পা নিশপিশ করছে। মামার কানে ফিসফিস করে বললাম,—হচ্ছেটা কী? আমরা কি ওর চাকর নাকি? যা বলবে—

—আ: বাপু! একটু সহ্য কর না! আমার তো মজা লাগছে।

—মজা?

জগুমামাকে মাঝে-মাঝে বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়।

রাগ একটু থিতিয়ে আসতে ডানপাশে অনন্ত সরখেলের কথা মনে হল। কোনও সাড়াশব্দ নেই! ব্যাপারটা কী?

—অনন্তবাবু!

—উঁ-উঁফফ!

—কী হল?

—বড্ড কড়া।

—কড়া!

—হ্যাঁ গো। রবারগুলো বড্ড টাইট। এমন এঁটে বসেছে যে কথা কইতে গেলেই লাগছে। ...উঁ:! ...স্যার, একটা কথা বলি?

—বলুন।

—আমরা যাচ্ছি কার কাছে কেন কোথায়, স্যার?

—ওই যে লাইফ-ডেথ কোশ্চেন। শুনলেন না?

—স্যার, আমাদের নয়তো? আমাদেরই পিস্তল ঠেকিয়ে—

—এরকম ভাবলে তো ভালোই! বেশ থ্রিলড হবেন।

কথাবার্তা নেই। গাড়ি চলেছে। এসির মৃদু শব্দ। কোনও ঝাঁকুনি নেই। রাস্তা বেশ মসৃণ।

মনে হচ্ছে, অনন্তকাল অন্ধ হয়ে আছি। কতক্ষণ হয়েছে? মনে তো হচ্ছে, আধঘণ্টার বেশি। নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, সে-ই আমাদের প্রায় কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে! হয় নাকি? জগুমামার পুরোনো কোনও শত্রুর ষড়যন্ত্র নয়তো?

লোকটি বলল,—এবার খুলে ফেলতে পারেন। এসে গেছি।

ও:! লম্বা শ্বাস পড়ল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, নিশ্বাসও বুঝি আটকে আছে।

কয়েকসেকেন্ড লাল-হলুদ তারা দেখলাম। তারপর দৃষ্টি ফিরে এল। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুদিকে মিশমিশে অন্ধকার। মাঝে-মাঝে আলোর বিন্দু। বাড়িঘরের চিহ্ন নেই।

চোখ সয়ে যেতে বুঝলাম, দুদিকে শুধু জল আর জল। আদিগন্ত কালো জলাভূমির মাঝে-মাঝে ছোট ছোট চালাঘর। সেখানে খুঁটির মাথায় মিটমিট করে একেকটা বাল্ব জ্বলছে।

এ জায়গাটা কি ভেড়ি এলাকা? মাছ-চাষ হয়?

জগুমামা সেলফোনটা নিয়ে টেপাটেপি করলেন। কোনও সিগন্যাল নেই। অর্থাৎ আমরা মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে। তাহলে? সুমিতবাবুর বিপদগ্রস্ত আত্মীয় ভদ্রলোক আমাদের ফোন করলেন কোত্থেকে?

হঠাৎ একটু দূরেই পরপর আলোর ঝলকানি। পরক্ষণেই কানফাটা শব্দ —বুম-বুম-বুম! ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে।

অনন্ত সরখেল অস্ফুটে 'উফ-আফ' করে উঠলেন।

সামনের লোকটি বলল,—ভয় পাবেন না। এখানে রোজ রাতে পেটো পড়ে। ডালভাত।

পাশ দিয়ে একদল ছায়ামূর্তি ছুটতে-ছুটতে অন্ধকারে মিশে গেল। সামনে আরেকদল মশাল জ্বালিয়ে তেড়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট হই-হল্লা, চিৎকার।

আবার সব নিঝুম। মারুতি ছুটছে ঝড়ের বেগে।

গাড়ি বাঁদিকে ঘুরে সরু রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। একটু এগিয়ে একটা গেট। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিল দুবার। গেট খুলে গেল।

আমরা ঢুকে এলাম একটা বাগানবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, গেট বন্ধ হয়ে গেছে।

ছোট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। একতলা। চারিদিকে ফুলের বাগান, বড়-বড় গাছ। সামনের গাড়ি-বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে।

লম্বা চেহারার একজন লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন। আলো-আঁধারিতে চোখমুখ বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটা বলে উঠল,—কী হল? নেমে আসুন। কত্তা এসে গেছেন। ...চলুন।

আমরা তিনজনে বাড়ির দিকে এগোলাম।

বাড়ির মালিক বললেন,—আসুন। ...আপনাদের জন্যেই ওয়েট করছি। ...ইউসুফ, তুমি বাইরে থাকো।

হ্যাঁ, মোবাইলে এঁর কণ্ঠস্বরই শোনা গেছে।

বাইরের ঘরে খানকতক প্লাস্টিকের চেয়ার, একটা টেবিল। আমরা বসেছি। ভদ্রলোক বললেন,—কী খাবেন? চা, না কফি?

জগুমামা বললেন,—যেটা সুবিধে। তার আগে একটা প্রশ্ন। এখানে তো মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। আপনি মোবাইল থেকে আমার মোবাইলে ফোন করলেন কীভাবে?

ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন। বললেন,—আমিও আপনাদের মতোই এখানে এসেছি। মিনিট পাঁচেক আগে।...পাশেই আরেকটা গাড়ি ছিল। দেখেননি?

—লক্ষ করিনি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনিও কলকাতা থেকে এসেছেন, আমরাও। কী দরকার ছিল? কলকাতায় বসেই তো আপনার কথা শোনা যেত।

—না ডক্টর মুখার্জি। যেত না।...আসলে আমার অবস্থা বুঝিয়ে না বললে আপনি পরিস্থিতি বোধহয় বুঝতে পারবেন না। 'মৃত্যুভয়' বোঝেন? ...সবসময়ে আপনার মনে হচ্ছে, শেষঘণ্টা বেজে গেছে। যেকোনও মুহূর্তে আপনি 'ফুস' হয়ে যাবেন। আমি সেই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি। লাস্ট চান্স দিচ্ছে। এই মাসের মধ্যে যদি আমি কথা না রাখি, তবে পয়লা জুলাই থেকে তিনদিনের মধ্যে আমাকে খতম করবেই। কেউ বাঁচাতে পারবে না!

—আপনি পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন?

—জানিয়েছি। কোনও লাভ হয়নি। ওরা প্রথম স্টেপ হিসেবে আমার স্ত্রীকে মেরে দিয়েছে গত মাসে। তেমনই বলেছিল।

—আপনার স্ত্রীকে!

—হ্যাঁ। ভেরি সিম্পলি। ...আমার বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে টেলিফোন পরিষ্কার করতে একটি ছেলে আসত। রিসিভার পরিষ্কার করে, মাউথপিসে সেন্ট স্প্রে করে দিয়ে যেত। এবারেও এসেছিল। সে চলে যাওয়ার পরেই আমার স্ত্রী ফোন করতে যান। কথা বলতে বলতে তাঁর শরীর খারাপ লাগে। ...বেলভিউতে নিয়ে যাই। ...আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ।

—তদন্ত হয়নি?

—হয়েছিল। জানা গেছে, ফোনে স্প্রে করা ওই সেন্টের মধ্যে পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো ছিল।

—ওই ছেলেটিকে ধরা যায়নি?

—কী করে ধরব? তার নাম-ঠিকানা কিছুই জানি না। ভালো করে চেহারাটাও দেখিনি। আমাদের ওদিকের প্রায় সব বাড়িতেই আসত। অনেকদিন ধরে। প্রতিবার পাঁচ টাকা নিয়ে চলে যেত।

জগুমামা চুপ।

কয়েকসেকেন্ড পরে জগুমামা বললেন,—সেই জন্যেই এত গোপনীয়তা, নিরাপত্তার কড়াকড়ি?

—ঠিক তাই। ডক্টর মুখার্জি...আজকাল কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না।...এরকম যদি হয়, আপনার মোবাইল ট্যাপ করে ওই খুনিগুলো যদি আপনার বদলে চলে আসে? আমার এই গোপন ডেরাটা দেখে নেয়?...মনে মনে হয়তো আপনারা রেগে আছেন, কিন্তু...প্লিজ!...আমি বাঁচতে চাই ডক্টর মুখার্জি।

—হুঁ!...কিন্তু ধরুন, আপনার ওই লোকের কথা যদি আমরা না মানতাম? আমাদের কাছেও ফায়ার আর্মস ছিল।

—ড্রাইভার এবং ওই সিকিউরিটি পার্সন দুদিকে লাফিয়ে নেমে যেত। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে এক্সপ্লাসন হত। টুকরো-টুকরো হয়ে যেত গাড়িটা। তেমনই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

—মাই গড।

ভদ্রলোক বললেন,—আসলে স্ত্রীর ওরকম ভয়ানক মৃত্যুর পর আমি আমার পুরো নিরাপত্তার ব্যাপারটা বি. সি. সিকিউরিটি সার্ভিসকে দেখতে দিয়েছি। বি. সি. মানে 'ব্ল্যাক ক্যাট'। ওরা পয়সা অঢেল নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু খুবই প্রফেশন্যাল। প্রায় সব মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে টপ-বসদের সিকিউরিটির দায়িত্বে ওরা।...যা দেখলেন, সবই ওদের স্টাইল অব অ্যাকশন।...প্লিজ, একটু বসুন, চা বলে দিই।...ফিরে এসে সব বলছি।...

৩

—কামতাপুরের ব্যাপারে কিছু জানেন?

ভদ্রলোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন।

জগুমামা বললেন,—বিশেষ কিছু নয়। যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে, এই দাবি ভিত্তিহীন। কামতাপুরি বলে আলাদা কোনও ভাষার অস্তিত্ব নেই, কোনওকালে ছিলও না।

ঠিকই বলেছেন।—ভদ্রলোক একইরকম খসখসে গলায় কেটে-কেটে বললেন,—সেদিক দিয়ে দেখলে আমিও একজন কামতাপুরি! কোচবিহারের ইতিহাস জানেন? রাজফ্যামিলি সম্পর্কে?

—বিশেষ কিছু না।

তবে শুনুন।—ভদ্রলোক বললেন,—ইতিহাস জানলে আপনার পরিস্থিতিটা বুঝতে সুবিধে হবে। সংক্ষেপে বলছি।

উনি বলতে শুরু করলেন।

আমাদের বাংলার উত্তর-পূর্ব জুড়ে ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। নাম হয়তো শুনেছেন। এখনকার আসাম, কোচবিহার আর জলপাইগুড়ির কিছুটা অংশ নিয়ে বিরাট রাজ্য। পরে নাম হয় কামরূপ। বাংলায় যখন পালবংশের রাজারা শাসন করছেন, তখন কামরূপের কোচবিহার-অংশ প্রায় পুরোটাই চলে এল বাংলার সীমানায়। পাল রাজত্বের শেষদিকে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সেন বংশের রাজারা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

যতদূর জানা যায়, সেন-শাসকরা এসেছিলেন আসাম থেকে। মঙ্গোলীয় প্রভাব ছিল তাঁদের মধ্যে। তাঁরা এই রাজ্যের নাম দিলেন কামতারাজ্য বা কামতাপুর। এই বংশের মাত্র তিনজন রাজা রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নীলাধ্বজ, চক্রধ্বজ আর নীলাম্বর।

নীলাম্বর যখন সিংহাসনে, গৌড়-বাংলার সুলতান তখন হোসেন শাহ। তিনি আক্রমণ করলেন কামতাপুর। অনেকদিন ধরে দুপক্ষে যুদ্ধ চলল। নীলাম্বর হেরে গেলেন এবং যুদ্ধে মারাও গেলেন। ৪৮ বছরের কামতাপুর শেষ হয়ে গেল।

এরপর অল্প কিছুদিন পাঠান শাসনে ছিল কোচবিহার। কিন্তু বাইরের শাসকদের এখানে এসে রাজ্যপাট চালানো খুব মুশকিল। কোচ, মেচ, রাভা, বোরো—অনেকরকম উপজাতি। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা। ফলে অরাজক অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেশটা চলছিল তখন।

তখন ছোট-ছোট ভুঁইয়া বা জমিদার কিছু-কিছু এলাকা দখল করে নিজেদের শাসন চালাচ্ছে। মারামারি-কাটাকাটি লেগেই আছে। ভুঁইয়াদের মধ্যে চিকনা পাহাড়ের তুরকা কোতোয়াল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যখন-তখন হঠাৎ-হঠাৎ হানা দিয়ে অন্যের এলাকা দখল করে নিচ্ছে।

এই সময়ে, বোধহয় যুগের প্রয়োজনে, উঠে এল চারটে ছেলে। চার ভাই। চিকনা গাঁয়ের মেচ সর্দার হরিদাস মণ্ডলের ছেলে—চন্দন, মদন, বিশু আর শিশু। তাদের দুই মা, কোচ ভুঁইয়া হাজোর দুই মেয়ে হীরা আর জীরা।

চারভাইয়ের সঙ্গে লড়াই বাধল তুরকার। প্রথমে মদন মারা গেল। শেষপর্যন্ত তিন ভাই লড়াইয়ে জিতলেন, ক্ষমতা দখল করলেন। তিন ভাই বিয়ে করলেন তুরকা কোতোয়ালের তিন মেয়েকে। চন্দন বসলেন রাজা হয়ে। সেটা ১৫১০ সাল।

সেই শুরু কোচবিহার রাজবংশের। ১৫২২ সালে চন্দন মারা গেলেন। সিংহাসনে বসলেন বিশু, বিশ্বসিংহ নাম নিয়ে। ছোটভাই শিশু বা শিষ্যসিংহ 'রায়কত' উপাধি নিয়ে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠপুর। এখনকার জলপাইগুড়ি জেলায়।

তখন থেকেই রাজ্যের নাম পাকাপাকিভাবে কোচবিহার। আস্তে-আস্তে পুবে-পশ্চিমে তার সীমানা বেড়ে চলছিল। কামতাপুরের কোনও অস্তিত্বই রইল না।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক থামলেন।

জগুমামা বললেন,—বা:! এত পুরোনো কালের কথা ভারি সুন্দর বললেন। কিন্তু, কিছু মনে করবেন না, এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কোথায়?

—আছে আমার কথা শেষ হয়নি।...

কোচবিহারের রাজারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন। কামরূপ বা অহোম, ভুটান, প্রতিবেশী সব রাজারাই রীতিমতো তখন ভয় পান কোচবিহারকে। সেটা তৃতীয় রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল। নরনারায়ণ ছিলেন সব দিক দিয়ে সেরা রাজা। তাঁর পরের ভাই চিলারায়, যার আরেক নাম শুক্লধ্বজ, ছিলেন মহা বীর।

নরনারায়ণের তখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। চিলারায়-এর ছেলে রঘুদেবকে ছেলের মতোই ভালোবাসেন। সবাই জানে, নরনারায়ণের পর ভাইপো রঘুদেব কোচবিহারের মাথায় বসছেন।

কিন্তু সব উলটে গেল। রাজার ছেলে হল বেশি বয়েসে। হতাশ রঘুদেব খেপে গেলেন। তার রাজত্ব চাই। নরনারায়ণ আদরের ভাইপোকে বশে রাখতে কোচবিহার রাজ্যের পুবদিকের কয়েকটা অঞ্চল দিয়ে দিলেন। রঘুদেব হলেন 'ছোট রাজা'। তার রাজ্যের রাজধানীর নাম দিলেন চিলাখানা। নিজের বাবার নামে।...

প্রথম দিকে ভালোই ছিল, পরে দুই রাজফ্যামিলির মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল। রঘুদেবের ছেলে পরীক্ষিৎনারায়ণ যুদ্ধ ঘোষণা করলেন জ্ঞাতিকাকা লক্ষ্মীনারায়ণের বিপক্ষে। হেরে গেলেন। ফলে পুরো রাজত্ব আবার ফিরে এল কোচবিহারের মধ্যে।...

আবার একটু দম নিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন,—অর্থাৎ রাজপরিবার তিনটে শাখায় ভাগ হয়ে তিন জায়গায় বাস করতে লাগল।

—একটা বৈকুণ্ঠপুরে, একটা চিলাখানায়, আর প্রধান শাখা কোচবিহারে। তাই তো?

—ঠিক।...এবার আসল কথায় আসি। শুনে চমকে উঠবেন না, আমি কোচবিহার রাজপরিবারেরই ছেলে। তবে মূল ধারার নয়। ছোট রাজা রঘুদেবের বংশধর।...পরবর্তীকালে আমার পূর্বপুরুষরা চিলাখানার পাট চুকিয়ে কোচবিহার শহরে চলে আসেন। আবার সম্পর্ক তৈরি জ্ঞতি কাকা-জ্যাঠাদের অর্থাৎ মূল রাজাদের সঙ্গে।

—আপনার নাম কিন্তু বলেননি।

—সরি ডক্টর মুখার্জি। ভুলে গেছি।...আসলে এই মুহূর্তে আমার যা মেন্টাল কন্ডিশন... আমার নাম জীবন।

—কিন্তু নারায়ণ পদবি নেননি কেন? আপনিই বললেন, রাজপরিবারের সকলের নামের শেষে 'নারায়ণ' আছে!

জীবনবাবুর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। বললেন,—আপনি জানলেন কী করে?

—আপনার ব্রিফকেস-এর ওপরেই লেখা আছে জে. এম.। 'এম' কী, সেটা জানি না।

—এম মানে মণ্ডল। আমার বাবা পদবি পালটে নিয়েছিলেন। রাজ্য যখন নেই, তখন রাজপদবি বয়ে বেড়িয়ে লাভ কী!

—কিন্তু মণ্ডল কেন?

—এটা কিন্তু আপনার বোঝা উচিত ছিল ডক্টর মুখার্জি। গোড়াতেই বলেছি আমরা অরিজিন্যালি 'মেচ' ট্রাইব। হরিদাস মণ্ডলের বংশধর।

জগুমামা একটু অপ্রস্তুত। বললেন,—ঠিক।...এবার বলুন আপনার সমস্যাটা কীভাবে তৈরি হল।

হ্যাঁ। সেটাই বলছি।—জীবনবাবু বললেন,—যাদেরকে 'কামতাপুর' নিয়ে উসকানি দেওয়া হচ্ছে, সেই রাজবংশী জাতের মানুষরা দীর্ঘকাল উত্তরবাংলার বাসিন্দা। সন্দেহ নেই, উত্তরবঙ্গের মানুষরা নানা দিক দিয়ে অবহেলিত। রাজবংশীদের বোঝানো হচ্ছে, জাতে তারা ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশের লোক। কামতারাজ্য ছিল তাদের রাজ্য। খেন রাজারা তাদেরই রাজা। অনেকের মধ্যে এমনও বিশ্বাস 'শুক্লধ্বজ' অর্থাৎ চিলারায় নাকি কামতারাজা। চক্রধ্বজের বংশধর। অর্থাৎ যেখানে-যেখানে রাজবংশীরা ছড়িয়ে আছে, সব জায়গাই কামতাপুর। সুতরাং তাদের স্বাধীন দেশ চাই। সে দেশ তারা নিজেরা শাসন করবে। তাহলেই সব সমস্যা মিটে যাবে, সোনা ফলবে।

—এতো পুরো মিথ্যে!

—হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জি। তার ওপর দাঁড়িয়েই আন্দোলন। আসলে এটা আন্তর্জাতিক উগ্রপন্থীদের কাজ। দারিদ্র্য-বেকারি-অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে দেশে-দেশে অশান্তি বাধাতে চায়। ত্রিপুরা-আসাম-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি কি জঙ্গলমহল সব উগ্রপন্থীদেরই শিকড় এক জায়গায়। তারা বিরাট সংখ্যক উপজাতি-আদিবাসী মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কিছু হবে না। অধিকার কেড়ে নিতে হবে, সেজন্যে রক্তপাত হলে হবে।

যেমন ধরুন পঞ্চানন সরকার, যিনি পরে বর্মণ পদবি নিয়েছিলেন, সেই বিরাট মানুষটি ছিলেন রাজবংশী। সেই সময় উনি রাজবংশীদের সম্মানের জন্য, অধিকারের জন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধেও লড়েছিলেন। কিন্তু আলাদা দেশের কথা কখনও ভাবেননি। ...আজ ওরা তাঁরও নাম নিচ্ছে।

—আপনি এইসব চক্রের মধ্যে ঢুকলেন কী করে?

—ওদের নেটওয়ার্ক যে কী ভয়ংকর আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি চিলারায়ের বংশধর, সে খবর ওদের নেতাদের কাছে পৌঁছে গেছে। অতএব স্বাধীন কামতাপুর আন্দোলনে আমায় যোগ দিতে হবে। সেটা হলে ওদের দাবি প্রতিষ্ঠায় সুবিধে হয়। রাজবংশীদের মধ্যে রাজার প্রতি অদ্ভুত আনুগত্য আজও রয়েছে। তাছাড়া বংশপরম্পরায় ওই 'ছোট রাজা'র হিরে-জহরত, সোনাদানা এবং মদনমোহন বিগ্রহ, সব কিছুই কামতাপুর আন্দোলনে ওদের কাজে লাগবে।

—এক মিনিট জীবনবাবু! মদনমোহন বিগ্রহের কথা বলছেন। কাগজে পড়েছি, সেই মূর্তি প্রায় দশ বছর আগেই মন্দির থেকে চুরি গেছে! তখন খুব হই-চই হল, ধরপাকড় হল। মূর্তি পাওয়া গেল না! সে মূর্তি আপনার কাছে গেল কীভাবে?

জীবন মণ্ডল বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন,—মদনমোহন মূর্তি একটা নয় জগবন্ধুবাবু। নানা সময়ে, কোচবিহারের রাজারা মদনমোহনের অনেক মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তবে তার মধ্যে আদি মদনমোহন বিগ্রহ-ই সবচেয়ে দুর্লভ। মহারাজা নরনারায়ণ আসামের বৈষ্ণবসাধক শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব নিলেন। তৈরি করলেন মদনমোহন মন্দির এবং বিগ্রহ। অষ্টধাতুর ছোট বিগ্রহ তৈরি করা হয়, একটা নয়, দুটো। অবিকল একরকম দেখতে। এক মদনমোহন থাকেন কোচবিহারে, অন্যজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রঘুদেবের কাছে। তখনও পর্যন্ত কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক বাবা-ছেলের মতো।

—রঘুদেবের কাছে থাকা ওই মদনমোহন চুরি যায় না?

—কী করে যাবে? কেউ জানেই না। নরনারায়ণ-এর বংশধর কোচবিহারের রাজা রূপনারায়ণ নিজের রাজত্বকালে আবার এক মদনমোহন বিগ্রহ তৈরি করালেন। বেশ বড়। আগাগোড়া সোনার। কোচবিহারের মন্দিরে থাকতেন এই দুই মদনমোহন। বড় ও ছোট। ওই দুই বিগ্রহ একই সঙ্গে লোপাট হল ১৯৯৪ সালে।

—রঘুদেব যে মদনমোহন পেয়েছিলেন, সেটি এখন আপনার কাছে?

—হ্যাঁ। বুঝতেই পারছেন, কী দুর্লভ মূর্তি। রাজবাড়ির মদনমোহন চুরি যাওয়ার পরে যখন খুব শোরগোল হল, একবার ভাবলাম, ডিক্লেয়ার করে দিই। অন্তত ঐতিহাসিক বিগ্রহটা মন্দিরে থাকুক। তারপর ভাবলাম, হিতে বিপরীত হবে। এই ইতিহাস প্রমাণ করতে পারব না। তখন পুলিশ আমায় নিয়েই অকারণ

টানাহ্যাঁচড়া করবে।...তারপর একদিন ওটাও চুরি হয়ে যাবে।...আর এখন যা শুরু হয়েছে, তাতে ওই বিগ্রহটা কামতাপুরিরাই তুলে নিয়ে যেত।

জগুমামা আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন,—এই সম্পত্তির আর কোনও ভাগীদার নেই? আপনার ভাই-বোন?

—নাহ। প্রায় ছ-পুরুষ ধরে এই বংশে পরপর একজন ছেলে জন্মেছে। চিলাখানার রাজপরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী আমিই।

—আপনারও কি একটিই ছেলে?

—না। এক ছেলে, এক মেয়ে। তবে ওরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। জানেই না, ওরা রাজপরিবারের। আমার বাবা কিছু সম্পত্তি বেচে টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ব্যবসা শুরু করলেন। পরে সেই ব্যবসা আমি অনেক বাড়িয়েছি। এই মাছের ভেড়ি ছাড়াও কনসট্রাকশন, হোসিয়ারি, ফার্মিং তিনটে ব্যবসার আমি মালিক।

—আপনি কি বাবার কাছ থেকে বংশপরিচয় জেনেছিলেন?

—হ্যাঁ। তাঁর শেষ বয়েসে। রাজফ্যামিলির সোনাদানা, বিগ্রহ যেখানে আছে, তার চাবি আমায় দিয়ে সব বলেছিলেন।

—আপনার এখন যে অবস্থা, কিছু মনে করবেন না জীবনবাবু, ছেলেমেয়েকেও তো সব বলে যাওয়া উচিত?

জীবনবাবুর মুখে ভয় আর কষ্ট ভেসে উঠল। অসহায়ভাবে বললেন,—কী করে বলব? পাচ্ছি কোথায়?

—কেন?

—ওরা দুজনেই এখন ইউ.এস.এ-তে। স্কুল শেষ করে হায়ার এডুকেশন নিতে গেছে। সেও ওদের মায়ের ইচ্ছেতে । সেই মা—

জীবনবাবুর গলা হঠাৎ বুঁজে এল,—ওদের আর দেখা হল না! ওদের কিছু জানাইনি।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ ঢাকলেন জীবন মণ্ডল। ভিতরে-ভিতরে মানুষটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছেন।

ঘরের মধ্যে পিন-পড়া নৈ:শব্দ। একটু পরে জগুমামা ধীরে-ধীরে বললেন,—আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু বলি, ভেঙে পড়বেন না। যখন লড়তে নেমেছেন, তখন শেষপর্যন্ত লড়বেন। ...একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনি কি আমায় বিশ্বাস করছেন?

জীবন মণ্ডল রুমাল সরিয়ে তাকালেন। নিষ্পলক দৃষ্টি। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—মনে তো হচ্ছে, করা যায়।

—তাহলে বাকিটুকু বলুন।

বলছি। —জীবনবাবু সামলে নিয়েছেন। আবার বলতে শুরু করলেন।

বাবা যা করতেন, আমিও তাই করি। কলকাতাতেই সব। শুধু মাঝে-মাঝে দেশের বাড়ি যাই। কোচবিহারে। চিলাখানায় অনেকখানি জমি-জায়গা এখনও আছে। একজন সরকারমশাই আছেন। তিনিই সব দেখাশুনো করেন। আমি গেলে হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেন। তবে কোনওদিনই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

—আপনি কোথায় যেতেন? কোচবিহার শহরে? না, চিলাখানায়?

—কোচবিহারে। চিলাখানাতেও অবশ্য আমার পৈতৃক বাড়ি-বাগান আছে। সেখানে সরকারমশাই ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। বছর-দু'বছরে কালেভদ্রে যাই।

—তারপর?

—মাস ছয়েক আগে আমি কোচবিহারে গেছি। সরকারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। পরদিন ফিরে আসব। সন্ধেবেলা বসে বই পড়ছি, হরিপদ খবর দিল, দুজন বাবু এসেছেন দেখা করতে।

—হরিপদ কে?

—বাড়ির কেয়ারটেকার। সে-ও পরিবার নিয়ে একতলায় থাকে। ওর বাবা তারাপদও ওই বাড়ির কেয়ারটেকার ছিল। বছর দুয়েক হল মারা গেছে। ওরা জাতে রাজবংশী।

—আপনি যে রাজফ্যামিলির, জানে?

—ওর বাবা জানত। ...এই ইতিহাস অবশ্য কোচবিহার শহরের বৃদ্ধ মানুষরা কেউ কেউ জানেন।

—তারপর?

—আমি দুজনকে দোতলায় ডেকে পাঠালাম। একজন মাঝবয়েসি, অন্যজন বাইশ-তেইশের যুবক। ...তারা দু-চারটে কথার পরই হঠাৎ সোজাসুজি বলল, ওরা কামতাপুরি। মানে 'স্বাধীন কামতাপুর' চায়! আমায় বলল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। তাহলে ওদের লড়াই করতে সুবিধে হবে। বাঙালিদের ওরা বলে 'ভাটিয়া'। ভাটিয়াদের তাড়িয়ে শাসন-ক্ষমতা দখল করবে। এ লড়াই ওদের কাছে স্বাধীনতার লড়াই।

—আপনি কী বললেন?

—কী বলব! আমি হতভম্ব! বলে কী! তারপর পরিষ্কার করে বললাম, এসব আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা শুনে চুপ করে গেল। একটু পরে মাঝবয়েসি লোকটা মেশানো বাংলায় বলল,

তাহলে আমাদের কাছে কামতাপুর রাজার যে হিরে-জহরত আছে, মদনমোহন বিগ্রহ আছে, সব ওদের দিয়ে দিতে হবে।

আমি ততক্ষণে সামলে উঠেছি। বললাম, আমি ওসবের খবর রাখি না।

মাঝবয়েসি বলল, বাজে কথা বলবেন না। আমাদের কাছে পাকা খবর আছে।

বললাম, যদি না দিই?

সে বলল, প্রথমে আপনাকে বোঝানো হবে, অনুরোধ করা হবে, সময় দেওয়া হবে। তাতেও কাজ না হলে যা করার তাই করতে হবে।

—কী করবেন?

—আপনার ফ্যামিলির সবাইকে শেষ করে দেব। তারপর ওগুলো উদ্ধার করব।

বলতে-বলতে সে 'দুম' করে একটা রিভলভার বের করল। বলল, দেখছেন? এখনই আপনাকে শেষ করে দিতে পারি। করব না। ভাবুন। তারপর বলবেন।

—তারপর? কী করলেন?

তখন আমি ভয়ে কাঁপছি। বুক ধকধক করছে, ঘামে ভিজে গেছে শরীর। কথা বলার শক্তি নেই।

মাঝবয়েসি উঠে দাঁড়াল। আধা-বাংলায় বলল,—শুনুন রাজাসায়েব! আমাদের হাত থেকে পার পাবেন না। সে আপনি কলকাতায় থাকুন, কি বিলেতে, সব জায়গায় আমাদের লোক আছে। ...এরপর আমরা আর আসছি না। আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নেব।...

দুজনই গটমট করে বেরিয়ে গেল। হরিপদ বলল, এদের সে এর আগে কখনও দেখেনি।

দুটো প্রশ্ন জীবনবাবু। —জগুমামা বললেন,—হরিপদ এদের দলের নয়তো? আপনি বললেন, জাতে সে রাজবংশী। তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? দুনম্বর প্রশ্ন, মাঝবয়েসি লোকটা কোন ভাষায় কথা বলছিল? রাজবংশীদের চলতি বাংলায়?

জীবনবাবু বললেন,—হরিপদরা তিনপুরুষ আমাদের ওই বাড়িতে আছে। ভালোই আছে দিব্যি খেয়ে-পরে। ওর ঠাকুর্দা রামপদকে আমার দাদু চিলাখানা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। মনে তো হয়, এতকাল পরে বেইমানি করবে না। ...আর ওই মাঝবয়েসির ভাষা—

একটু ভাবলেন। তারপর বললেন।—না, চলতি রাজবংশী মেশানো বাংলা নয়। বরং বাংলা-অসমিয়া মেশানো।

হুম।—জগুমামা বললেন,—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা আসামের উগ্রপন্থী দল আলফার মাঝারিমাপের কোনও নেতা। সবগুলো তো এখন একজোট হয়েছে। ভুটানের জঙ্গলে ওদের ট্রেনিং চলছে।

...যাকগে, অনেক রাত হয়েছে। চলুন...ফিরতে হবে।

—কোথায় যাব? আমার বালিগঞ্জের বাড়ি? ...না-না-না, ওরা আমায় মেরে দেবে।

বলতে-বলতে জীবনবাবু কেঁপে উঠলেন।

—মশাই! একটা কথা জেনে রাখুন । যত ভয় পাবেন, তত চেপে বসবে। মরার আগে মরবেন না! আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।

—না-না-না ডক্টর মুখার্জি! আমায় লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে ওরা!

—জীবনবাবু, এইভাবে ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে কতদিন থাকবেন? যে নেটওয়ার্ক আপনার হাঁড়ির খবর জেনে ফেলেছে, এই ডেরা তাদের কাছে নস্যি। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক জেনে ফেলবে। মরতে যদি হয়, সাহসীদের মতো মরবেন।

৪

নিঝুম রাত। দুধারে মিশমিশে অন্ধকার। দুটো গাড়ি পরপর ছুটে চলেছে। হেডলাইটে আলোর সুড়ঙ্গ। সামনে মারুতি। প্রায় খালি। আমরা চারজনেই অ্যাম্বাসাডারে। ড্রাইভারের পাশে অনন্ত সরখেল, পিছনে জীবনবাবুর পাশে জগুমামা আর আমি।

অনন্তবাবুকে অনেকবার বলা হয়েছিল ফাঁকা মারুতিতে পিছনে এলিয়ে আরাম করে যেতে। উনি রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু এই অ্যাম্বাসাডারটা বুলেটপ্রুফ শোনার পর বেঁকে বসেছেন।

এই গাড়িও বলা বাহুল্য এয়ারকন্ডিশনড। কাচ তোলা।

—এই জায়গাটা কোথায় জীবনবাবু?

—খড়িবাড়ি, শাসন এলাকা। কেন বলো তো টুকলু?

—না, আসার সময় বোমাবাজি হচ্ছিল।

—ও তো রোজ হয়। ভেড়ি মানেই মাছ, তার দখল নিয়ে মারামারি।

জগুমামা বললেন,—জীবনবাবু, একটা ব্যাপারে আমি কনফিউজড! একটা ধাঁধা।

—কী?

—একদিকে আপনি মৃত্যুভয়ে কাঁপছেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকছেন। সেটা স্বাভাবিক। স্ত্রী খুন হয়েছেন। অন্য দিকে আবার মৃত্যুর আশংঙ্কা জেনেও মূর্তি, সোনাদানা আগলে বসে আছেন। ওগুলো ছাড়াই

তো আপনার দিব্যি চলে যাচ্ছিল। দিয়ে দিলেই তো পারতেন। এই মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটতই না! এটা করলেন কেন?

—হ্যাঁ।

জবাব দিতে একটু সময় নিলেন জীবন মণ্ডল। বললেন,—সমস্যা হচ্ছে রক্ত। হ্যাঁ, রক্ত। এককণা হলেও আমার শরীরে হয়তো সত্যিই ব্লু ব্লাড আছে। সেই রক্তের তেজ বা জ্বালা, যাই বলুন, ওগুলো ওদের হাতে তুলে দিতে চাইছে না। বলছে, তুমি এত অপদার্থ, কয়েকশো বছরের অমূল্য সম্পদ কতকগুলো শয়তানের ভয়ে দিয়ে দিচ্ছ? বংশপরম্পরায় পেয়েছ তুমি। ওগুলো কাউকে এভাবে দেবার অধিকার তো তোমার নেই। জগবন্ধুবাবু, সত্যিই আমি বড় দোটানায় আছি।

ফিরে তাকালেন জগুমামার দিকে। অন্ধকারেও ওঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—দিয়ে দেব? বলুন, দিয়ে দেব? হ্যাঁ, সব শোনার পরেও আপনি যদি বলেন দিয়ে দিতে, দেব! সব তুলে দেব। আমি...একা...একদল উন্মাদ টেররিস্ট—আর পারছি না!

জীবনবাবুর কথা জড়িয়ে গেল। জগুমামা ওঁর হাত ধরলেন। বললেন,—শান্ত হোন জীবনবাবু। আমি আপনাকে জাস্ট পরীক্ষা করছিলাম।...না, দেবেন না! কখনওই দেবেন না।

'ঝুপ' করে নৈ:শব্দ নেমে এল। শুধু ইঞ্জিন আর এ.সি.-র মৃদু শব্দ। নাহ, আরেকটা শব্দও শোনা যাচ্ছে। খুব হাল্কা। 'ঘুর-র...র...ঘুর-র-র...' ঢেউয়ের মতো উঠছে, নামছে। ঝুঁকে দেখি, শ্রীযুক্ত অনন্ত সরখেল নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁরই নাসিকা-নিসৃত ধ্বনি।

অন্ধকার গাড়ি, ঠান্ডা হাওয়া এবং নানাবিধ টেনশনের যোগফল।

মামা চুপ করে ভাবছিলেন। বললেন,—আপনার স্ত্রীকে যেভাবে হেলায় খুন করল, একটু অস্বাভাবিক লাগছে।

—অস্বাভাবিক কেন?

—ফোন পরিষ্কার করার চেনা ছেলেটা এসে ফোনে সেন্ট স্প্রে করল। তারপরেই উনি ফোন করতে গেলেন! কেন যাবেন? আরেকটা ব্যাপার। আপনার স্ত্রী কি রিসিভার মুখের খুব কাছে এনে, প্রায় মুখ ছুঁইয়ে ফোনে কথা বলতেন?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ওটা ওর একটা বরাবরের বদভ্যেস ছিল। বারবার বলেও শুধরোতে পারিনি। অনেকটা সাইকোলজিক্যালও বলতে পারেন। ওর ধারণা ছিল, ফোনের মাউথপিস মুখের কাছে না ধরলে অন্যদিকের লোক ঠিকমতো শুনতে পাবে না।

—কিন্তু সেটা তো বাইরের ওই ছেলেটার জানার কথা নয়।

—হ্যাঁ।....কিন্তু—

—সেইসঙ্গে ভেবে দেখুন, ঠিক তখনই উনি কেন ফোন করতে গেলেন? যদি ডেফিনিট মার্ডার হয়, তবে কেউ নিশ্চয়ই সেই সময় এসে ওনাকে ফোন করতে রিকোয়েস্ট করেছিল।

জীবনবাবু কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন। বললেন,—না। মনে পড়েছে। ও ফোন করতে যায়নি। একটা ফোন বেজে উঠেছিল। ও উঠে গিয়ে ফোন ধরেছিল।

—কার ফোন?

—এটা কী করে বলব? কত ফোনই তো আসে! একমাস আগের ঘটনা।

—উঁহু! সে বললে চলবে না। পারটিকুলার ওই ফোনকলটা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। যে করেছিল, তার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক থাকা খুব স্বাভাবিক। সে নিশ্চয়ই জানত, ঠিক তখনই ছেলেটা ফোনে বিষমাখানো সেন্ট স্প্রে করে গেছে। বাতাসে বিষ মিশে যাবার আগেই আপনার স্ত্রীকে ফোনের কাছে ডেকে নিতে হবে। আপনি তখন ঠিক কোথায় ছিলেন মনে পড়ে?

আমি—আমি, —জীবনবাবু ভ্রূ কুঁচকে ভেবে বললেন,—নাহ! মনে পড়ছে না।

জগুমামা বললেন,—ভাবুন, আরও ভাবুন। ওর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আপনার স্ত্রীর—

ক্যাঁ-চ-চ...! আচমকা ব্রেক কষেছে গাড়ি। মুখ থুবড়ে ধাক্কা খেতে-খেতে সামলে নিলাম। কিন্তু বেচারি সামনের যাত্রী! ঘুমন্ত অনন্তবাবুর কপাল সোজা গিয়ে ঠুকে গেল ড্যাশবোর্ডে।

উহ, বাবারে!—যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে অনন্তবাবু মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। বেচারির সুখনিদ্রা সুদে-আসলে উশুল হয়ে গেছে!

পরপর দুটো গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছিলাম, মামা হাত চেপে ধরলেন,—দাঁড়া! সাহস দেখাস না। এটা কলকাতা নয়।

সামনের গাড়ি থেকে ড্রাইভারের সঙ্গীটি বেরিয়ে পড়েছে। এগিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে কিছু সরাচ্ছে। ড্রাইভারও হাত লাগিয়েছে।

তখনই জলাজমি থেকে উঠে এল তিনটে ছায়ামূর্তি। মারুতির দুজন জ্বলন্ত টর্চ হাতে তাদের কিছু বলছে। লোক তিনটে ঘাড় নাড়ছে। ওদের হাতে বড়-বড় সড়কি।

ইউসুফ আমাদের গাড়ির কাছে চলে এসেছে। জীবন মণ্ডল কাচ নামালেন। ইউসুফ বলল,—এরা এই গ্রামের লোক। পাহারা দিচ্ছে। এখানে রাতে প্রায়ই ডাকাতি হয়। ডাকাতরা দুতিনটে গাড়ি বোঝাই হয়ে আসে। সেইজন্যে ওরা রাস্তায় আড়াআড়ি বাঁশ ফেলে রেখেছে।...

গাড়ি আবার ছুটছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি। এখন দুধারে একটু-একটু আলোর ফুটকি। কলকাতার কাছে এসে পড়ছি। প্রায় নটা বাজে।

ডিং-টিং-টিং-টিং...

মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করেছে। নেটওয়ার্কের মধ্যে এসে গেছি। এতক্ষণ ভুলেই গেছিলাম। বাড়ির ফোন।

—হ্যাঁ।

—দাদা, আমি পিকলু। তোরা কোথায়?

—কাছাকাছি।

—কখন ফিরছিস?

—একমিনিট।...মামা, কটা নাগাদ ফিরব?

—এগারোটা বাজবে।

—শোন পিকলু, আমাদের দেরি হবে। খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে বলিস।

—আচ্ছা, মামাকে বলিস, সুমিত মিত্র ফোন করেছিলেন। ফোন করতে বলেছেন।

ফোন কেটে দিয়ে মামাকে বললাম,—এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—ঠিক করিনি। যদি জীবনবাবু বালিগঞ্জে রাত কাটান, তবে আমাদের সেখানেই আগে যেতে হবে। সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখতে হবে।...একটা কথা জীবনবাবু, আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে কি আপনি একাই থাকেন? মানে স্ত্রী বেঁচে থাকতে তিনি আর আপনি? ছেলেমেয়ে তো বিদেশে।

—না, ঠিক একা নয়। ইনফ্যাক্ট, স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওই বাড়িতে আমি থাকিইনি বলতে গেলে। থাকা যায়? সবজায়গায় তার স্মৃতি! তাছাড়া ওই শয়তানগুলো তো থেমে নেই। প্রায় রোজই ফোনে থ্রেট করত। একরকম বাধ্য হয়ে ল্যান্ডফোন আর ধরতাম না। দুটো মোবাইল কানেকশন নিলাম। এই নম্বর দুটো কেউ জানে না। শুধু সিকিউরিটি এজেন্সির কয়েকজন ছাড়া।

একটার নম্বর অবশ্য আমরা জেনে ফেলেছি।—জগুমামা বললেন,—আপনি ফোন করেছিলেন আমাদের। সেলফোনে নম্বর স্টোর হয়ে যায়। আমি কিন্তু আপনার থাকা-না-থাকা নিয়ে প্রশ্ন করিনি। আমার প্রশ্ন, ওই বাড়িতে এখন আপনি ছাড়া আর কেউ থাকে বা থাকত কি?

—থাকে। পুরোনো আমলের বড় দোতলা বাড়ি। দুটো তলা মিলিয়ে অনেক ঘর। বেশিরভাগ অবশ্য ফাঁকা।—সব মিলিয়ে কাজের লোক প্রায় পাঁচজন। তাছাড়া দারোয়ান। সে থাকে পাশের ছোট আউট হাউসে। মূল বাড়ির দোতলায় এখন আমি ছাড়া আর দুজন। একজন আমার শালির মেয়ে। শালি-ভায়রা

দুজনেই কোচবিহারে থাকে। অনিতা যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, আমার স্ত্রী ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে এখানেই। এখন ফিজিক্সে এম.এস.সি. করছে। ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে। বি.এস.সি.-তে ফার্স্টক্লাস থার্ড হয়েছিল। আমার ইচ্ছে ছিল, ওকে বিদেশে পাঠাবার।

—বয়েস কত?

—কত আর? বাইশ-তেইশ।

—আরেকজন?

—আমার মাসতুতো দিদির ছেলে। শান্ত। বলতে গেলে ওই আমার দিকের একমাত্র ভাগ্নে। ছ'পুরুষ আগের কোনও আত্মীয়ের খোঁজ পাইনি।

—আপনার দিদির অবস্থা কেমন?

—মোটামুটি। কোচবিহারেই থাকেন। শান্ত বি.ফার্মা কোর্স করছে। ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড অলসো ওয়েল-বিহেভড। ইচ্ছে ছিল, পাশ করলে ওকে দিয়ে একটা মেডিসিন কোম্পানি খুলব। এখন আর—!

আশ্চর্য লোক তো আপনি!—জগুমামা বললেন,—সারাক্ষণ ডিপ্রেশনে ভুগছেন। হঠাৎ স্ত্রী চলে যাওয়া যে কী দু:সহ ব্যাপার, সবাই বোঝে। কিন্তু হেরে গেলে তো চলবে না জীবনবাবু। শক্ত হোন।

জীবন মণ্ডল চুপ।

জগুমামা ফের বললেন,—আর কেউ ঘনিষ্ঠ নেই?

—ঘনিষ্ঠ তো অনেকেই তবে সত্যিকারের বন্ধু যদি বলেন, সে একজনই। দ্বৈপায়ন, দ্বৈপায়ন দত্ত। দেখতে-দেখতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল। সেই স্কুলের ক্লাস নাইনে আলাপ, তারপর একসঙ্গে কলেজ, ইউনিভার্সিটি। আমি পাস করে বাবার বিজনেসে জয়েন করলাম, ও পি.এইচ.ডি. করে অধ্যাপনায় জয়েন করল। তবে তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনও ছেদ পড়েনি। কলেজ থেকে ফিরে প্রায়ই রাতের দিকে চলে আসত। ঘণ্টাদুয়েক আমাদের আড্ডা-গপ্পো চলত। ওর বউ-ও কখনও-সখনও আসত।

—আসত মানে? এখন আর আসেন না?

—না:! আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে এমন শক পেয়েছে, আসা বন্ধ করেছে। মাঝেমধ্যে শুনি ফোন-টোন করে খবর নেয়। অনিতা বা শান্তর সঙ্গে কথা বলে।...আমিও তো, বলতে গেলে, বাড়ি থাকিই না।

—আপনার মোবাইল নম্বর উনি জানেন না?

—না। সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে মানা করে দিয়েছে।

—তাহলে সুমিত জানল কী করে?

—জানে না তো। আমি অফিস থেকে ফোন করে সুমিতকে সব পরিস্থিতি বলতে ও আপনার ডিটেলস জানিয়ে রিং-ব্যাক করেছিল।

—দ্বৈপায়নবাবুর ছেলে মেয়ে?

—একটিই ছেলে। পি.এইচ.ডি. করছে। আমাদেরই সাবজেক্টে।

—আপনাদের সাবজেক্ট মানে?

—কেমিস্ট্রি।

—একটা কথা জীবনবাবু। আপনি তো নিজের বাড়িতে এখন থাকছেন না। অনিতা, শান্ত? ওরা?

—ওরা ওখানেই আছে। পড়াশুনো করছে। ওদের কী প্রবলেম? কাজের লোকেরা দেখভাল করে। অবশ্য ওরা বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ! সকালে বেরিয়ে যায়, সন্ধের পর ফেরে।

—সুমিত আপনার কেমন আত্মীয়?

—মাসতুতো বোনের হাজব্যান্ড। দুর্গাপুরে থাকে। আমায় খুব ভালোবাসে। শুনলাম, আপনার অনেককালের বন্ধু?

—হ্যাঁ। কলেজ জীবনের। যোগাযোগ খুব কম, তবে ভিতরের টানটুকু আছে। আসলে কী জানেন, ওই বয়েসের বন্ধুত্বগুলো এমন নির্ভেজাল হয় যে, সারাজীবন ভেতরে-ভেতরে টান থেকে যায়।

ঠিকই বলেছেন । জীবনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—তাহলে শেষ অব্দি আমি কি বাড়িতেই ফিরছি?

জগুমামা কয়েকসেকেন্ড ভাবলেন। তারপর বললেন,—না আজকে হঠাৎ করে ওখানে থাকাটা ঝুঁকি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। যাবার পথে ভি.আই.পি. রোডে বেশ কিছু নতুন হোটেল হয়েছে। ভালো ব্যবস্থা। আজকের রাত কোনও একটায় কাটিয়ে দিন। কাল সকালে সবাই মিলে আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাব। আচ্ছা, জীবনবাবু, এখন আপনার সিকিউরিটির সঙ্গে কথা বলা যায় না? মানে ধরুন, যিনি আপনার কেসটা সুপারভাইজ করছেন, তাকে আপনার হোটেলে নিয়ে আসা যায় না?

—কেন?

—ওদের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিতাম। আপনার নিরাপত্তার দিকগুলো নিয়ে। আপনার আপত্তি নেই তো?

—না-না, আপত্তির কী।...

জীবন মণ্ডল মোবাইল টিপতে লাগলেন।

৫

আজ ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে আটটা। বসার ঘরে পা দিয়েই বুকের ভিতর 'ধ্বক' করে উঠল। জগুমামার মুখ থমথমে। কী হল?

সেন্টার টেবিলে আজকের কাগজ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীর দিয়ে ঠান্ডাস্রোত নেমে গেল।

টপ হেডলাইন—

কামতাপুরি জঙ্গিদের গুলিতে ৬ জন নিহত

ধপ করে সোফায় বসে পড়েছি।

এই নৃশংস লোকগুলোর হাত থেকে জীবনবাবুকে বাঁচাতে পারবেন তো জগুমামা? এরা স্বাধীনতার নেশায় এখন উন্মাদ। এদের কাছে কারও জীবনের কোনও দাম নেই।

টুং-টুং! কলিং বেল বাজল। অনন্ত সরখেল এলেন। কপালের কাছটা এখনও ফুলে আছে। গুটি-গুটি এসে সোফায় বসলেন।

কাল ফিরতে-ফিরতে রাত বারোটা বেজেছে। ওই রাতেই ভি.আই.পি. রোডের হোটেলে ডেকে পাঠানো হয়েছিল সিকিউরিটির অমর মোদিকে। তাঁর সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা হয়।

ঠিক হয়েছে, এখন যেসব সিকিউরিটি আছে, তা তো থাকবেই। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে—

এক, বাড়ির কম্পাউন্ডের চারিদিকে নজরদারির জন্যে প্লেন ড্রেসড সশস্ত্র রক্ষীরা থাকবে।

দুই, একজন সিকিউরিটির দক্ষ লোককে কাজের লোক সাজিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বলা হবে, বাগানবাড়ি থেকে জীবনবাবু নিয়ে এসেছেন।

আরও ঠিক হয়েছে, আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ জীবনবাবু গাড়িতে আমাদের তুলে নেবেন। ওর বালিগঞ্জের বাড়ি যাব। অমর মোদিও পৌঁছে যাবেন।

বেসিনের সামনে কুলকুচি করছি, কর্ডলেস ফোনটা 'পিঁপ-পিঁপ—পিঁপ-পিঁপ' বাজছে।

—অনন্তবাবু, ধরুন।

—ধরব? —অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতে তুলে নিলেন,—কী করতে হবে?

—ওপরের দিকে ছোট বোতামটা টিপুন।

—ঠিক আছে। ...হ্যালোউ!...হুঁ, কাকে চান বলুন?... আচ্ছা। ...আপনার নামটা বলবেন? অ্যাঁ, দইব্যসন! অদ্ভুত নাম।...ও-হো-হো, সরি, সরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। ...কী দরকার বলবেন?...মানে স্যার তো সকালে...ধরুন দেখছি, উনি কোথায়?

কর্ডলেস ফোনের মাউথপিস টিপে ধরে অনন্তবাবু বললেন, এত আস্তে কথা বলে যে শোনাই যায় না। স্যার, আপনাকে চাইছে... কী অদ্ভুত নাম! গোড়ায় শুনলুম দইব্যসন। পরে অবিশ্যি কারেক্ট করে দিয়ে বলল, 'দইমাখন'। জম্মে শুনিনি! কী দরকার, বলছে না। বলছে, পার্সোনাল।

দইমাখন?—জগুমামা বললেন,—এ নামে তো কাউকে চিনি না। আশ্চর্য! ...দিন দেখি। ...হ্যালো।...

এর পরের কথোপকথন এরকম—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ...বলেছিলাম। ... অবশ্যই আসবেন। খুব জরুরি ডিসকাশন আছে। আপনাকে লাগবে। ...আমরা পৌনে এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব।

ফোন বন্ধ করে মামা সোজাসুজি তাকালেন অনন্ত সরখেলের দিকে।

—আপনার বয়েস এখন কত?

—তা কি সঠিক জানি স্যার? ষাট-ফাট হবে। কেন স্যার?

—আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর থরোলি চেক-আপ দরকার।

—কেন স্যার? আমি তো কোনও অসুবিধে ফিল করি না।

—আপনি করেন না, আমরা করি। হাড়ে-হাড়ে করি। আপনার কান পুরো গেছে। বলছে 'দ্বৈপায়ন', আপনি শুনছেন দইব্যসন—দইমাখন। ধ্যাৎ!

অনন্তবাবুর মুখখানা ঝুলে গেল। দাড়িগোঁফ চুলকোতে-চুলকোতে উনি বিড়বিড় করছেন,—কানটা একবার...আসলে মেটালিক সাউন্ড ঠিক...কান...তবে কিন্তু পষ্ট শুনলুম...

ওঁর আক্ষেপ হয়তো আরও খানিকক্ষণ চলত, কিন্তু এইসময় আবার কর্ডলেস বেজে উঠেছে। মামা এবার নিজেই তুলে নিলেন।

—হ্যালো। ...হ্যাঁ, করেছিলেন। ...আপনার এখানে আসার দরকার নেই। সোজা চলে যান। আমরা ঠিকসময়ে পৌঁছে যাব। সবাইকে থাকতে বলবেন। ...অ্যাড্রেসটা বলুন।

পেল্লায় প্রাচীন বাড়ি। তবে নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। রংচঙে, ফিটফাট। সামনে বড় বাগান।

দারোয়ান ফটক খুলে দিল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে চলে এলাম পোর্টিকোর নীচে।

আর একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের চেনা। মালিক এসে গেছেন?

—জী সাব। আপনি মুখাৰ্জ্জিসাব তো? সিধা চলিয়ে যান।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। হঠাৎ কর্কশগলায় কে ধমকে উঠল,—অ্যাই, ক্যা র‍্যা?

চমকে দেখি, একটা প্রকাণ্ড সাইজের সাদা কাকাতুয়া কটকট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনও খাঁচা নেই, স্রেফ লোহার দাঁড়ে দোল খাচ্ছে। অনন্তবাবু শিউরে উঠলেন,—আইব্বাপস!

—অস্ট্রেলিয়ান ম্যাকাও। চলে আসুন।

—য-যদি স্যার উড়ে এসে—

—পা বাঁধা। স্টেডিলি উঠে আসুন।

আগাগোড়া শ্বেতপাথরের মেঝে। দোতলার সিঁড়ির পাশেই পরপর জুতোর তাক। চটি-জুতো খুলে জগুমামা ডাকলেন—জীবনবাবু, কোনদিকে?

—এই যে। আসুন।

সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরের প্রবল গর্জন!

অনন্ত সরখেলের চোখ রাজভোগ। কাঁপা গলায় বললেন,—অ্যাঁ:! বাড়িটা এক্কেবারে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছে!

জীবন মণ্ডল বাঁ-দিকের প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন,—জিমি। অ্যাত্তটুকু বয়েস থেকে পুষেছি।...এখন নেকড়ের সাইজ। ভয় নেই, চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছি। কদিন আমায় দেখেনি, তাই আরও খেপে উঠেছে।

আমরা বিরাট ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম। পুরোনো-নতুন আসবাবের আশ্চর্য সমাবেশ। তবে বেশ মানিয়ে গেছে। ঝাড়বাতি আছে, আবার টিভি-স্টিরিও আছে।

জগুমামা হাতজোড় করলেন,—দ্বৈপায়নবাবু, নমস্কার। কখন এলেন?

—মিনিট পাঁচেক। মোদিসায়েবও এই এলেন।

—জীবনবাবু, বাড়ির সকলে আছে তো? আপনার ভাগ্নে, শালীর মেয়ে?

—হ্যাঁ। তবে বাড়ি ঢুকতে-না-ঢুকতেই শুরু হয়ে গেছে।

—কী শুরু হয়ে গেছে?

—ফোন।

—ফোন! ওরা?

—হ্যাঁ। সেই জানোয়ারটা। নিশীথ সিং। কামতাপুরিদের কম্যান্ডার। বলল, রাজামশাই, বড্ড বেড়েছ। টিকটিকি আর বডিগার্ড পুষে ভাবছ, বেঁচে যাবে। সাতদিনের মধ্যেই তোমায় খতম করছি। লাস্ট অপশন

দিচ্ছি, ওগুলো দিয়ে দাও।

—আপনি কী বললেন?

—বললাম, মেরে ফ্যালো। তাতে লাভ কিছু হবে না। ওইসব সোনাদানা-মূর্তি মাথা খুঁড়েও পাবে না। এমন জায়গায় রাখা আছে, কারও সাধ্য নেই। হারামজাদা বলল, না পেলে তোমার যেখানে যত বাড়ি আছে, জ্বালিয়ে দেব। জমিজমা দখল করব। তোমার পুরো বংশ শেষ করে দেব।

জগুমামার চোখ সরু, ভ্রূ সেকেন্ড ব্র্যাকেট।

—কাল রাতে কোনও ফোন পেয়েছিলেন?

—নাহ।

—হুস।...চলুন, একটু ঘুরে দেখা যাক।

বসার ঘর থেকে বেরিয়ে টানা করিডর। শেষ হয়েছে সুন্দর একটা ব্যালকনিতে গিয়ে। বসার ঘরের লাগোয়া জীবনবাবুর শোবার ঘর। করিডরের উলটোদিকে পরপর দুখানা ঘর। বাইরে থেকে বন্ধ।

জীবনবাবু বললেন,—ছেলে আর মেয়ের। এখন বন্ধ।

আমরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছি। সামনেটা ভারি সুন্দর লাগছে। সবুজ বাগান, গাছে-গাছে পাখি। মনেই হয় না, আমরা কলকাতায় আছি।

—অনিতা, শান্ত? ওদের ঘর?

জীবনবাবু বললেন,—আপনি বোধহয় লক্ষ করেননি ডক্টর মুখার্জি, বাড়িটার দুটো অংশ। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি। পিছনেও একইরকম করিডর। চারখানা ঘর। দুটো বন্ধ আছে। ডাইনিং রুম, কিচেন, স্টোর সব একতলায়। কাজের লোকজনও নীচে থাকে।

—আপনার শোবার ঘরটা দেখব।

—আসুন।

ছিমছাম, সুন্দর ঘর। বড় পালঙ্কখাটে ধবধবে সাদা চাদর পাতা। শ্বেতপাথরের ড্রেসিং টেবিল, কারুকাজ-করা কাঠের আলমারি, ছোট রাইটিং টেবিলের একপাশে কম্পিউটার। বিছানার মাথার দিকে বড় এয়ার-কন্ডিশনার। খাটের শেষে দেয়ালে স্যুইংডোর। অ্যাটাচড বাথরুম।

মামা বললেন,—বা:!

—হ্যাঁ। বাবা শৌখিন মানুষ ছিলেন। প্রতিটি ফার্নিচার, ডিজাইন সব নিজে দেখে করেছেন। বাথরুমে বাথটাবও উনিই লাগিয়েছিলেন।

—তাই বলে এত বড়! দিব্যি শুয়ে থাকা যায়! সব ঘরেই কি অ্যাটাচড বাথ?

—হ্যাঁ। তবে ছোট। জমাদার ওঠার জন্যে বাবা বাইরের দিকে লোহার সিঁড়িও করেছিলেন। এখন অবশ্য বন্ধ থাকে।

—ওদের ঘরে একবার চলুন।

ডানহাতের প্রথম ঘরে শান্ত থাকে। বিশেষ আসবাব নেই। একটা খাট পাতা। দেয়ালের একদিক জুড়ে বইয়ের র‍্যাক। একটা স্টিল আলমারি। খাটের পাশে বেশ বড় টেবিল। দুটো চেয়ার। বইখাতার স্তূপ। একটা কম্পিউটার। তার পাশে চার-পাঁচটা কাচের শিশিতে সাদা-সাদা গুঁড়ো।

আমরা ঘরে ঢুকতেই শান্ত উঠে দাঁড়াল।

—বোসো, বোসো। পড়ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মামা কলেজ যেতে বারণ করলেন।

—তোমায় আমি একটাই প্রশ্ন করব। তোমার মামি যেদিন মারা যান, তুমি কোথায় ছিলে?

—কলেজে। ফোন পেয়ে ছুটে আসি।...শনি-রবিবার বাদে রোজই আমাদের কলেজ।

—ঠিক আছে। ...চলুন।

বাঁদিকের শেষ ঘর অনিতার। ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দুবার নক করতে দরজা খুলে পাশে দাঁড়াল বছর বাইশ-তেইশের মেয়েটি। সুশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। উজ্জ্বল চোখ। সালোয়ার-কামিজ পরা।

এইঘরের আসবাবপত্রও এক রকম। অতিরিক্ত শুধু ছোট পোর্টেবল টিভি, ছোট স্টিরিও আর দেয়ালে কয়েকটা ফোটো। মাসি-মেসো, মা-বাবার সঙ্গে নানাসময়ে তোলা পারিবারিক ছবি।

জগুমামা টেবিলে ঝুঁকে পড়েছেন। বললেন,—ইন্টারনেট চালাও?

—হ্যাঁ। আপ-টু-ডেট ইনফর্মেশন দরকার হয়।

—এই কম্পিউটারের সঙ্গে টেলিফোন-কানেকশন আছে?

—শুধু এটা কেন, এ-বাড়ির তিনটে কম্পিউটারের সঙ্গেই টেলিফোনের ল্যান-কানেকশন করা আছে।

—বা: বা:।

হ্যাঁ।—অনিতা ম্লান হাসল,—মাসি-মেসো না থাকলে আমার এতদূর লেখাপড়াই হত না। আমায় এনে—

—মাসি যেদিন মারা গেলেন, তুমি কোথায় ছিলে?

—সেদিন পিরিয়ড অফ হয়ে গেছিল। আমি যখন বাড়ি ঢুকছি, তখন বাড়িতে কান্নাকাটি। মাসিকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে।

—ঠিক আছে অনিতা। আজ এইটুকু থাক।

আধঘণ্টা পরে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। দ্বৈপায়ন দত্ত গাড়িতে ওঠেননি। ওঁর বাড়ি হাঁটা পথ। জীবনবাবু নিজের গাড়িতে। আমাদের গাড়িতে মামা, অনন্তবাবু আর আমি।

কিন্তু গড়িয়াহাট মোড় থেকে বাঁ-দিকে ঘুরে একটু এগোবার পরই মামা গাড়ি থামাতে বললেন। পিছন-পিছন জীবনবাবুর গাড়ি আসছিল। সে-ও থেমে গেল।

টুকলু, নেমে আয়।

—কেন?

—প্রশ্ন করিস না। যা বলছি, কর। ওই গাড়িতে যাব।

—এই গাড়িটা কী হবে?

—জীবনবাবুর গাড়িতে যে দুজন সিকিউরিটি স্টাফ আছে, তাদের একজন চালিয়ে নিয়ে যাবে। তেমনিই কথা।....

কিছুই বুঝতে পারছি না। জীবনবাবুকে নিয়ে আমরা যাচ্ছি কোথায়? ওঁর তো নিজের বাড়িতেই থাকার কথা।

দুটো গাড়ি এসে পড়েছে ইস্টার্ন বাইপাসের রুবি-মোড়ে। প্রথমে জীবনবাবুর গাড়ি, পিছনে আমারটা।

বেলা প্রায় দেড়টা। ইস্টার্ন বাইপাস মোটামুটি ফাঁকা।

পার্ক সার্কাস কানেক্টর পর্যন্ত এসে গেছি, দূ-রে সায়ান্স সিটির বড়-বড় গম্বুজ দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ ঘটনাটা ঘটল।

অবিশ্বাস্য, ভয়াবহ!

নিরীহ একটা অ্যাম্বাসাডার আমাদের সামনে অনেকটা দূরে যাচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার? গাড়ির প্রবলেম? আমাদের ড্রাইভার কৌতূহলী হয়ে স্পিড একটু কমিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে সামনের গাড়ির জানলা থেকে বেরিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের নল! সেই নল থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে পিচকিরির মতো গুলি বেরুচ্ছে। আমাদের লক্ষ করে।

গাড়ির গায়ে লাগছে, ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি দুলছে!

ড্রাইভার আতঙ্কিত অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। দক্ষ হাতে গাড়িটাকে কাটিয়ে প্রাণপণে স্পিড বাড়িয়েছে।

নাগালের বাইরে বেরিয়ে এসেছি।

ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে মনে পড়ে গেল, জীবনবাবুর এই গাড়িটা বুলেটপ্রুফ! আর তাই এখনও নিশ্বাস নিতে পারছি।

হ্যাটস অফ জগুমামা! তোমার জন্যেই আজ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরছি।

কিন্তু পিছনে এখনও গুলির শব্দ কেন? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একটা সাদা টাটা সুমো ওই খুনে গাড়িটাকে তাড়া করেছে। গাড়িটা বাঁদিকে একটা রাস্তায় সাঁ করে ঢুকে গেল।

জগুমামা আস্তে-আস্তে বললেন,—পুলিশের সুমো। বলা ছিল। ধরে ফেলবে।

এরপর দশ মিনিটের মধ্যেই সল্টলেক এবং আমাদের বাড়ি।

জীবনবাবুকে নিয়ে মামা সোজা উঠে গেলেন তিনতলায়। বললেন,—তোরা নীচে বোস। আমার একটু আলাদা কথা আছে। ডোন্ট মাইন্ড।

আমাদের ড্রাইভার তখনও অসাড় অনন্ত সরখেলের চোখেমুখে জল ছিটোচ্ছে।

৬

—টুকলু! উঠে পড়।

জগুমামা ডাকছেন। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। পাশে পিকলু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

—কী মামা?

—চল,

—কোথায়?

—রাজা জীবন নারায়ণের প্রাসাদে।

বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠেছি,—কেন? কেন? খবর এসেছে?

—আসেনি। তবে আসবে নিশ্চয়ই। ভালো খবর মানে জীবনবাবু নিজে ফোন করবেন। খারাপ খবর মানে অন্য কেউ। সোজা ব্যাপার!

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বললাম,—আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না মামা। তুমি এত ক্যাজুয়ালি বলছ! জীবনবাবুর খুন হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

—আছে।

—তারপরেও তাঁকে ওখানে থাকতে পাঠালে?

তাছাড়া আর কী করার আছে? যা কিছু প্রোটেকশন নেওয়ার, নেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক নিজের বাড়ি ছেড়ে কতদিন পালিয়ে থাকবেন? এটা সম্ভব? ওই বাড়িতে তার টাকাকড়ি, দলিল-কাগজপত্র সব রয়েছে। এমনকী সোনাদানা, মদনমোহনের মূর্তিও।

—সব ওখানে?

—হ্যাঁ। উচিত ব্যাঙ্কের লকারে রাখা। কিন্তু সংস্কার। কুলদেবতাকে ভলটে রাখব?

—বাড়ির কোথায়?

—সেটা বলেনি।...এখন চল!

ঠিক সওয়া পাঁচটায় আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিল। পাশে জগুমামা।

পিকলুকে বলে আসা হয়েছে, যদি জীবনবাবুর বাড়ি থেকে ফোন আসে, বলে দেবে 'মামা ঘুমোচ্ছেন'। খবরটা জেনে নেবে। এবং মোবাইলে জানিয়ে দেবে আমাদের।

ফাঁকা রাস্তা, সকালের শরীর-জুড়োনো হাওয়া। চোখ জড়িয়ে আসছে। এককাপ চা পেলে ভালো হত।

ঝুপড়ি চায়ের দোকানগুলো খুলে গেছে। আমি গাড়ি 'স্লো' করে বললাম,—একটু থামাব? একটু চা—

—না-না-না! গড়িয়াহাট না পৌঁছে থামা যাবে না।

বিরক্তিতে 'গুম' মেরে গেছি। আশ্চর্য লোক তো! দু-মিনিট থামলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

পার্ক সার্কাস কানেক্টর পেরিয়ে এসেছি। আলো ফুটে গেছে। দু-একটা গাড়ি। দুদিকের গ্রাম থেকে সবজির ভ্যান-ট্যান দেখা যাচ্ছে।

গড়িয়াহাট কানেক্টর দিয়ে ঢুকে পড়লাম। পাঁচটা বেজে সাতাশ।

আস্তে-আস্তে লোকজন বাড়ছে রাস্তায়, যানবাহন বাড়ছে। বিজন সেতুর মুখটা জমজমাট। এই জায়গাটাই বোসপুকুর। খুব নাম করা দুর্গাপুজো হয়।

ফ্লাইওভার পেরিয়ে নীচে নামতে মামা বললেন,—বা:! ওয়েল ড্রিভন। এখানে চা খাওয়া যেতে পারে।

— দরকার নেই। বাড়ি অব্দি গিয়ে থামব।

—রাগ করিস না। জগুমামা হেসে বললেন,—খবর না পাওয়া পর্যন্ত ও বাড়ি এখন যাওয়া যাবে না।

গাড়ি পার্ক করে চা-মিষ্টির দোকানে দুজন। মামা চা অর্ডার দিয়ে বললেন,—ভাগ্নে, তুই তো জানিস, আমি খারাপটা আগে ভেবে নিই। আর সেভাবেই আটঘাট বেঁধে এগোতে চেষ্টা করি। আসলে ফাঁকা জায়গায় থামলে বড় ঝুঁকি হয়ে যেত। ওখানে আর কোনও গাড়িও ছিল না।

—কীসের ঝুঁকি?

—মাই গড! তুই এখনও বুঝিসনি, আমরা ওদের টার্গেট হয়ে গেছি? কাল বাইপাসে অ্যাটাক করল।

—সে তো জীবনবাবুকে মারার জন্যে!

—না হে বাছা! জীবনবাবুকে মারতে হলে আমাদের আগে সরাতে হবে, এই মোদ্দা কথাটা ওরা বুঝে ফেলেছে। কাল ওদের টার্গেট ছিল তোর গাড়ি। গাড়ি ফাঁকা দেখে এই গাড়ির ওপর হামলা করেছে।

—তার মানে, এরমধ্যেই টেররিস্টদের কাছে আমাদের সম্পর্কে ইনফর্মেশন পৌঁছে গেছে?

—ইয়েস! টোটাল ইনফর্মেশন। আরে বাবা, সেজন্যেই তো জীবনবাবুর বাড়ির সামনে এসে ওয়েট করছি। ধর, খারাপ খবরটা এল। আমরা তখন বাড়িতে। খবর পেয়ে আসার পথে বাইপাসে কালকের ঘটনা আবার ঘটতে পারে। তখন? আমাদের কাছে তো বুলেটপ্রুফ গাড়ি নেই। কীরে, এবার রাগ কমেছে?

—কিন্তু। কালকে শেষ পর্যন্ত কী হল? খবর পেয়েছ?

—পেয়েছি। মাত্র দুটো লোক ছিল। ড্রাইভার বাদে আরেকজন। যে গুলি চালাচ্ছিল, পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে উলটে পড়েছে সরু খালে। হেড ইনজুরি। বাঁচবে না।

—তার মানে ওদের কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না?

—বেঁচে থাকলেও যেত না। এরা মাফিয়া র‍্যাকেটের ভাড়াটে খুনি। এরা জানে না, মূল সোর্স কে! শোন, একটা ব্যাপার তোকে স্পষ্ট করে দিই। এই টোটাল অপারেশনে জীবনবাবুর নিজের লোকজন ইনভলবড।

—সে কী!

—হ্যাঁ। ভালো করে ভেবে দ্যাখ, জীবনবাবু বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে কামতাপুরিরা ল্যান্ডলাইনে ফোন করল। তার মানে বাড়ির কেউ সঙ্গে-সঙ্গে ওদের জানিয়েছে।

—ঠিক। মোবাইল নম্বর তো কেউ জানেই না! মামা, কাল রাতে কি সিকিউরিটির লোক জীবনবাবুর সঙ্গে গেছিল?

—হ্যাঁ। ফোনে জীবনবাবুকে বলেছিলাম, ওই লোকটি রাতে বাইরের করিডরে মাদুর পেতে শোবে। উনি রাজি হননি। কাজের লোকদের দোতলায় শোয়া ওদের বাড়িতে নাকি প্রহিবিটেড!

—বাব্বা! তার মানে ঘরে জীবনবাবু একাই থেকেছেন?

—হ্যাঁ। সঙ্গে আদরের জিমি শোয়। এইসব রাজাদের ঢং দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। রাবিশ! মানুষকে দোতলায় শুতে দেওয়া যাবে না, অথচ কুকুরে দোষ নেই!

ঠিক তখনই, মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো।...হ্যাঁ বল। কী! কে করেছিল?...ঠিক আছে, ছাড়ছি।

জগুমামা উত্তেজিতভাবে বললেন,—শান্ত ফোন করেছিল। জীবনবাবুর ঘর বন্ধ। ধাক্কাধাক্কিতেও খুলছে না!

মুহূর্তে মাথার মধ্যে 'ঢং' করে পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল! জগুমামা হেরে গেলেন? এত আটঘাট বেঁধেও জীবনবাবুকে বাঁচানো গেল না?

দু-মিনিটের মধ্যেই ঢুকে পড়লাম জীবন মণ্ডলের প্রাসাদের ভিতরে। জগুমামা পরপর মোবাইলে ফোন করে গেছেন, কাদের কীসব বলেছেন। আমার মাথায় কিচ্ছুই ঢুকছে না। একটাই কথা ঘুরছে—জগুমামা হেরে গেলেন?

জীবনবাবুর শোবার ঘরের বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে শুধু অনিতা আর শান্তকেই চিনি। চেহারা দেখে বোঝা যায়, বাকিরা বাড়ির কাজের লোক। তাদের মধ্যে একজন আবার দরজার সামনে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শান্ত ছুটে এল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—এসে গেছেন! দ্বৈপায়নমামাকেও খবর দিয়েছি।

জগুমামা সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন,—শান্ত হও। সবাই এসে যাবেন। থানায় জানিয়েছ?

কান্নার শব্দ। অনিতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। শান্ত যন্ত্রের মতো ঘাড় নাড়ল।

জগুমামা গট-গট করে দরজার সামনে চলে এসেছেন। সেই লোকটা এখনও দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। জগুমামা বললেন,—কী ব্যাপার? তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?

পাশ থেকে শান্ত ফুঁসে উঠল,—বলুন আপনি! আমরা কতক্ষণ থেকে বলছি, সবাই মিলে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলি। মামার কী অবস্থা...—ও কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না। বলছে, পুলিশ আসুক, তারপর।

—কে ও? কাজের লোক?

—হ্যাঁ। মামা কালকেই নিয়ে এলেন! এতজন পুরোনো লোক রয়েছে, ভগাদা, রামদা, বীণাদি—সবাই মিলে বলছি, কোনও কথাই কানে নিচ্ছে না! আপনি, আপনি ওকে বলুন তো! শয়তানটা নিশ্চয়ই চাইছে, সর্বনাশটা ঘটে যাক!

জগুমামা বললেন,—শুনছ?

লোকটা কাটা-কাটা ভাবে বলল,—শোনার কিছু নেই। উর্দিপরা পুলিশ না দেখলে কর্তার ঘর খুলতে দেব না।

জগুমামা অসহায়ভঙ্গিতে হাত উলটোলেন। বললেন,—শান্ত, আজ সকালে কে প্রথম বাইরে থেকে জীবনবাবুকে ডেকেছে? কে?

শান্ত ভ্রূ কুঁচকে বলল,—সে আমি বলতে পারব না।...আমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠি। আমায় অনিতাদি ঘুম থেকে তুলে বলল, মামা দরজা খুলছেন না। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেও সাড়া দিচ্ছে না।...আমি প্রথমেই আপনাকে আর দ্বৈপায়নমামাকে ফোন করি। ...মামা কাল রাতে আপনাদের নাম্বার আমায় দিয়েছিলেন।...এই যে দ্বৈপায়নমামা এসে গেছেন।

দ্বৈপায়ন দত্তর চোখ টকটকে লাল। মুখ জুড়ে কালো পোঁচ। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছেন। বললেন,—দেরি হয়ে গেল। শান্ত ফোনে বলতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল।...মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম। ...হে ভগবান, আমায় আর কত...

পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

জগ্গুমামা শান্তগলায় বললেন,—শক্ত হোন দ্বৈপায়নবাবু। এই বিপদের সময়ে আপনিই আমাদের ভরসা।...কাল রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন?

অ্যাঁ-হ্যাঁ! মানে,—দ্বৈপায়ন একটু চমকে উঠলেন,—কেন বলুন তো?

—আসলে ট্রাংকুলাইজার খাওয়ার পর কাঁচা ঘুম ভাঙালে চোখ লাল থাকে। কাল কি খুব টেনশন হচ্ছিল?

ঠিক তাই, ডক্টর মুখার্জি।—দ্বৈপায়ন বললেন,—কাল কিছুতেই ঘুম আসছিল না। জীবনের জন্যে প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছিল। ও বাড়িতে থাকছে। শয়তানগুলো থ্রেট করেছে। আর ঘুম না এলে, জানেনই তো, যতরাজ্যের আজেবাজে চিন্তা মাথায় এসে জড়ো হয়। শেষে রাত দুটোর পর দুটো ভ্যালিয়াম খেয়েছি।...আমার আশঙ্কাই সত্যি হল ডক্টর মুখার্জি! আপনারা কেউ কিচ্ছু করতে পারলেন না।...জীবন! আমার পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধু!

প্রৌঢ় ফুঁপিয়ে উঠলেন।

জগ্গুমামা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন,—অনিতা, তুমিই কি প্রথম জীবনবাবুর ঘরে নক করেছিলে?

অনিতা অন্যমনস্ক হয়েছিল। বলল—আমি একা নই। দুজনে।...বলছি। শান্ত অনেক রাত অব্দি পড়ে, বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আমি এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়ি, ভোর পাঁচটায় উঠি। করিডর ধরে বই নিয়ে পায়চারি করতে-করতে পড়ি। মেসোও ইউসুয়্যালি আর্লি রাইজার। ছটার মধ্যে উঠে পড়েন। ভগাদা সোয়া ছটা নাগাদ চা বিস্কুট নিয়ে আসে। ততক্ষণে মেসো উঠে পড়েন। মেসো-আমি একসঙ্গে ব্যালকনিতে বসে চা খাই। মাসি উঠতেন দেরি করে।...আজও ভগাদা সোয়া ছটায় চা নিয়ে এসেছিল। আমি তখন পড়ছি। মেসো যে ওঠেননি, খেয়াল করিনি। ভগাদা এসে বলল। তখন দুজনে পরপর নক করি দরজায়।...ওই যে, ব্যালকনিতে এখনও কাপ প্লেট চা-বিস্কুট পড়ে আছে।

অনিতা আর কিছু হয়তো বলত, কিন্তু চুপ করে গেল। বাইরে পরপর গাড়ির শব্দ এবং সিঁড়িতে বুটের মচ-মচ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক পুলিশকর্তা এসে পড়লেন। সঙ্গে বেশ ক'জন অফিসার।

—আপনি ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি? নমস্কার। আমি ডি.সি.ডি.ডি.-টু অরিন্দম ব্যানার্জি। কমিশনার সায়েব আর্জেন্ট আসতে বললেন। থানায় জানিয়ে, ওদের সঙ্গে নিয়ে আসতে-আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।

—নো, ইটস ওকে। আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। ঘটনা কিছু শুনেছেন? স্বরাজ, মানে কমিশনার কিছু বলেছে?

—স্যার বললেন, আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে। যদি কাইন্ডলি ব্রিফ করেন।

—ঠিক আছে। আপনি ও.সি-কে নিয়ে ব্যালকনিতে আসুন। বাকিরা এখানেই থাকুন। ...বাড়ির চারপাশে পুলিশ পোস্টিং হয়েছে? একটু বলে দিন। উইদাউট ইয়োর পারমিশন নান উড বি অ্যালাওড টু এন্টার অর একজিট।

তিনজনে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ করছি। শান্তকে কি একটু অস্থির লাগছে? অনিতা দেয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে। দ্বৈপায়ন দত্ত হাত দিয়ে চোখ ঢেকে। কাজের লোকদের মুখ-চোখে কিছু পড়া যাচ্ছে না। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল, যে লোকটি এতক্ষণ দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল, সে এখন করিডরের এককোণে বসে আছে।

ছটা বেজে পঞ্চাশ। জগুমামার আলোচনা শেষ। অরিন্দম বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,—একটা কথা শুনে রাখুন। ভিতরে ঢুকব শুধু আমরা তিনজন। আর কেউ নয়।

অনিতা ফুঁপিয়ে উঠল। দ্বৈপায়ন দত্ত তার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। শান্ত দুহাতে মাথা চেপে দাঁড়িয়ে আছে।

জগুমামা পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে অরিন্দমের হাতে এগিয়ে দিলেন। অরিন্দম নীচু হয়ে নাম্বার দেখে একটা চাবি ভিতরে ঢোকালেন, ঘোরালেন। হ্যান্ডেলে মোচড় দিতেই দরজা খুলে গেল।

জগুমামা অরিন্দমের কানে-কানে কিছু বলছেন। তারপর দুজন অন্ধকারে ঢুকে গেলেন। সবশেষে ও.সি.। এবং আমাদের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। ভেতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বুক টিপটিপ করছে। জগুমামা কি সত্যিই হেরে যাবেন?

সাত মিনিটের মাথায় ভিতর থেকে ও.সি. বেরিয়ে এলেন। একজন অফিসারকে বললেন,—বডি বের করতে হবে। দুটো বডি।...

ধপ করে বসে পড়লাম।

৭

কালো কাচের সেন্টার টেবিলের ওপর শোয়ানো রয়েছে একটা মাঝারি মাপের পলিব্যাগ। তার ভিতর থেকে জগুমামা টেনে বের করলেন লাল শালুতে জড়ানো ছোট্ট একটা জিনিস।

আস্তে-আস্তে শালুর কাপড়ের পাক খুলে নিতেই তিনি দৃশ্যমান হলেন।

ড্রইংরুমের সবদিকের জানলা খুলে দেওয়া হয়েছিল। সকালের হলুদ আলো এসে পড়ল তাঁর ছোট্ট শরীরে। আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

জগুমামা বললেন,—হ্যাঁ। ইনিই সেই আদি মদনমোহন বিগ্রহ। কুচবিহারের প্রাণের ঠাকুর। পনেরো শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেন মহারাজা নরনারায়ণ। প্রতিষ্ঠা করেন মদনমোহন বাড়ি। তৈরি হয় অষ্টধাতুর অমূল্য একজোড়া বিগ্রহ। এক মদনমোহন কুচবিহারেই থেকে যান। অন্যজনকে মহারাজ পাঠিয়ে দেন তাঁর আদরের ভাইপো চিলাখানার 'ছোট-রাজা' রঘুদেবকে। কুচবিহারের মদনমোহন বাড়ি থেকে এরই যমজ মদনমোহন চুরি হয়ে গেলেন ১৯৯৪ সালে। ইনি থেকে যান রঘুদেবের বংশধর জীবননারায়ণ বা জীবন মণ্ডলের কাছে।

জীবনবাবুর কাছ থেকে এই মদনমোহন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সোনাদানার দখল নিতেই এ বাড়িতে শুরু হয় খুনোখুনি। উত্তরবঙ্গের টেররিস্ট গ্রুপ 'কামতাপুরি'রা আগেই ডিম্যান্ড করেছিল। জীবনবাবু রাজি হননি। তাই মাসখানেক আগে খুন করা হয় তাঁর স্ত্রীকে। আর আজ—

অনিতা ফুঁপিয়ে উঠল।

ডি.সি.ডি.ডি. বললেন,—কিন্তু সোনাদানা তো নেই। তাহলে কি বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে?

না অরিন্দমবাবু।—জগুমামা বললেন,—সোনাদানা নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের লকারে আছে। এই বিগ্রহেরও থাকার কথা। সংস্কারবশে জীবনবাবু রাখতে পারেননি।...এবার কাজের কথায় আসি। আপনারা জেনে খুশি হবেন, একমাস আগে জীবনবাবুর স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পিছনে কে বা কারা আছেন, আমি জেনে ফেলেছি। কাল রাতে জীবনবাবু ফোনে আমায় জানান, ঠিক সেইসময় কার ফোন রিসিভ করেছিলেন ওঁনার স্ত্রী। তার থেকে দুয়ে-দুয়ে চার করতে অসুবিধে হয়নি।

আজকে যে ঘটনার সামনাসামনি আমরা হয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে আমরা হেরে গেছি। হয়তো হেরেছি বলেই এই খুনের রহস্যটাও মোটামুটি পড়ে ফেলতে পেরেছি। কিন্তু এখনই কিছু বলছি না। অরিন্দমবাবুকে বলেছি, আজ সন্ধের মধ্যে ফোরেনসিক রিপোর্ট আমাদের চাই-ই। মনে হচ্ছে ওই রিপোর্ট আমার অনুমানের সঙ্গে মিলে যাবে।

দ্বৈপায়নবাবু বলে উঠলেন,—ডক্টর মুখার্জি, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—ও.সি. সায়েব একটু আগে বললেন, এ বাড়িতে জীবনের ঘর ছাড়া বাকি দুজনের ঘরও সিল করে দেওয়া হয়েছে। আপনার নির্দেশে। ওই ঘরদুটোর বাসিন্দারাও ঢুকতে পারবে না। এটা কী হচ্ছে?

—আমি নিরুপায়। এখন সকাল সাড়ে আটটা। সন্ধে সাড়ে আটটার মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। খুব বেশি হলে বারো ঘণ্টার ব্যাপার। আপনার বন্ধু-খুনের তদন্তের স্বার্থে এটুকু কষ্ট সবাইকেই মেনে নিতে হবে।

—বুঝলাম। শান্ত, অনিতা তাহলে থাকবে কোথায়?

—কেন, বাকি দুটো বন্ধ ঘরে। ঘরদুটো যথেষ্ট ভালো।

—আর আমি? আমায় আটকাচ্ছেন কেন? বুড়ো মানুষ। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধু চলে গেছে, বুক জ্বলে যাচ্ছে। অথচ বাড়িতে গিয়ে একটু কাঁদব! তাও পারব না? ও.সি. বলছেন, বেরোতে দেবেন না।

—আরেকটু কষ্ট করুন প্লিজ। সবই আপনার অভাগা বন্ধুর জন্যে! শান্তর ঘরে থেকে যান।...আর হ্যাঁ, সবাই তোমরা যারা এ বাড়ির কাজের লোক, তোমরা নীচের একটা ঘরে থাকো। দারোগাবাবু দেখিয়ে দেবেন।

—সে কী মশাই!—দ্বৈপায়ন দত্ত বললেন,—এতগুলো লোক খাবে কী?

—সে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। বড় হোটেল থেকে খাবার আসবে। ...চিন্তা করবেন না। আজ সকলের ছুটি।...এই যে শান্ত, তুমি আমাদের সঙ্গে একটু এসো তো।

কোথায়?—শান্তর চোখেমুখে আতঙ্ক।

—কোথাও না। তোমার নিজের ঘরে। তোমার সামনেই আমরা তল্লাশি চালাব। এসো।

শান্তর পিছন-পিছন ঢুকে পড়লাম ওর ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ মামা ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। শান্তর কাঁধে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,—সেই বস্তুটা কোথায়? এই যে সব শিশিতে রেখেছ, এগুলো তো নিরিমিষ। কোথায় সেটা? আলমারিতে? খোলো!

জগুমামার হাতে চকচক করছে ছোট্ট রিভলভার।

শান্ত ভয়ে কাঁপছে। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

—অ-আপনি ক-কী বলছেন, ব-বুঝতে—

—চো-ও-প! ন্যাকামি হচ্ছে? পটাশিয়াম সায়ানাইড-এর অ্যাম্পুলটা কোথায় রেখেছ?

শান্ত 'ভ্যা' করে কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,—বিশ্বাস করুন, ভগবানের দিব্যি, আমি খুঁজে পাইনি। একমাস আগে কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলুম। অনিতাদি দেখতে চেয়েছিল।...রাতে ড্রয়ারে রাখা ছিল। পরদিন সকাল থেকে আর পাইনি। ...বিশ্বাস করুন, মামিকে আমি মারিনি, বিশ্বাস করুন...

—আমি বিশ্বাস করলেও কিছু যায় আসে না শান্ত। পটাশিয়াম সায়ানাইড যে কেউ জোগাড় করতে পারে না। সুতরাং তোমার বিষ দিয়ে যদি মামির মৃত্যু ঘটে থাকে, আইনের চোখে তুমি অপরাধী। বুঝলে?...

শান্ত মাথা নীচু করে কাঁদছে। জগুমামা বললেন,—আর দুটো জিনিস চাই। তোমার ব্যাঙ্কের পাস বই আর ই-মেল।

শান্ত ড্রয়ার থেকে ব্যাঙ্কের ফাইল এগিয়ে দিল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল,—আমার ই-মেল আইডি santosree82@hotmail.com। পাস ওয়ার্ড 1 2 3 4 5 6। আপনিই খুলুন। আমি বহুদিন খুলি না।

মামা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উলটে-পালটে দেখছেন। চেক-বই, পে-ইন-স্লিপ। বললেন,—একটা সাফ কথা বলে দিচ্ছি। তুমি যদি আমাদের হেল্প করো, আমরা তোমায় বাঁচাতে চেষ্টা করব।

—বলুন।

—অনিতা কাগজপত্র কোথায় রাখে জানো?

—জানি।

—গুড।

—ও কি ই-মেল খোলে?

—খোলে। চব্বিশ ঘন্টা ওর ইন্টারনেট অন থাকে।

—তুমি আমাদের সঙ্গে এখন থাকছ।...

এবার আমরা অনিতার ঘরে। একজন লেডি-পুলিশকেও নিয়ে আসা হয়েছে।

দরজা বন্ধ করেই মামা সোজাসুজি বললেন,—অনিতা, তোমার ই-মেল খোলো।

—কেন?

—কোনও কৈফিয়ত দেব না। যা বলছি, করো!

—যদি না করি?—অনিতার চোখমুখের চেহারা হঠাৎ অন্যরকম।

যদি না করো?—জগুমামা অদ্ভুত হাসলেন। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটুকরো রবারের পাইপ। সেটা তুলে নিয়ে বললেন,—এটা তোমার কী কাজে লাগে?

—বোকা-বোকা প্রশ্ন করছেন তো! রান্নার গ্যাসের পাইপ, একসট্রা হয়েছিল, কিচেনে পড়েছিল। এমনিই তুলে এনেছি। তাতে হয়েছেটা কী?

তাই? তাহলে এটা কী?—বলতে-বলতে পকেট থেকে লম্বা একটা রবারের পাইপ বের করলেন। দোলাতে-দোলাতে বললেন,—এটাও তাই। তাই না? এটারই টুকরো ওইটা। ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। এই দ্যাখো, বেশ খাঁজে-খাঁজে বসেও যাচ্ছে। এই লম্বা পাইপটা কোথায় বলো তো?

অনিতার মুখ ঝট করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খাটে বসে পড়ল। ওদিক থেকে শান্ত বলল,—স্যার, এই যে অনিতাদির ব্যাঙ্কের কাগজপত্র।

—বা:! এবার দ্যাখো, ই-মেইল প্রিন্টগুলো কোথায় থাকে।

—শান্ত, খবর্দার! বেইমানি করিস না।

—চিৎকার করে কোনও লাভ নেই অনিতা। তুমি ধরা পড়ে গেছ। খালি সিলিন্ডার দুটোয় তোমার হাতের ছাপও পাওয়া গেছে। তারপর—এই যে পনেরো দিন আগে পঞ্চাশ হাজার টাকার ড্রাফট জমা করেছ তোমার অ্যাকাউন্টে, এটা জাস্টিফাই করতে পারবে? কে দিল তোমায় এত টাকা? তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই নয়। মেসো দেননি, মাসি তো নেই-ই।...অনিতা, এক মাস আগে মাসি কার ফোন রিসিভ করে কথা বলেছিলেন! তার জন্যে সায়ানাইডের বিষে তাঁকে মরতে হল। সায়ানাইড নিয়েছিলে কোত্থেকে? শান্তর কাছ থেকে। ও চুরি করে এনেছিল। তুমি বাটপাড়ি করেছ। শান্ত সব স্বীকার করেছে।

অনিতা দুহাতে মুখ ঢেকেছে, শরীর কাঁপছে বেতের মতো।

জগুমামা আবার বললেন,—আমরা সব জেনে ফেলেছি অনিতা। শুধু ফোরেনসিক রিপোর্টের জন্যে ওয়েট করছি। ...তুমি স্বীকার করো। অ্যাকচুয়ালি যে তোমায় এই কাজে নামিয়েছে, তাকে ধরিয়ে দাও। তাতে তোমার শাস্তি কমবে, তোমার বিবেকও একটু শান্তি পাবে। তাকেও আমি চিনি। ...কিন্তু তুমি সাক্ষী না দিলে তার ঠিকঠাক শাস্তি হবে না। তার অপরাধের একমাত্র প্রমাণ তোমায় পাঠানো তার ই-মেলগুলোর প্রিন্ট আউট। তার একটা কালই তোমার টেবিলে পড়ে ছিল। ঠিক বলছি তো অনিতা?

অনিতা হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল। বড়-বড় চোখ দুটোয় গ্লানি, জ্বালা-যন্ত্রণা, রাগ সব মিলেমিশে একাকার।

ধীরে-ধীরে উঠে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল। চালু করল। ঝট-ঝট পৌঁছে গেছে 'আউটলুক একসপ্রেস'-এ। প্রিন্টার অন করে দিয়েছে। পরপর প্রিন্ট হচ্ছে 'রিসিভড মেইল'। তারপর 'সেন্ট মেইল'।

মামা সব গুছিয়ে নিলেন। অনিতার মাথায় হাত রেখে বললেন,—থ্যাঙ্কিউ অনিতা। দেরিতে হলেও শেষপর্যন্ত তোমার মনে যে শুভবুদ্ধি এসেছে, এটাই আনন্দের। তোমার শাস্তির ব্যাপারটা আমি দেখব, কথা দিচ্ছি। চলি। ...সন্ধের পর আসছি।

৮

আগেরদিন গুছিয়ে লুচি খেতে পারেননি। সেই আপশোস, বারবার করে যাচ্ছিলেন। আমার মা-ও তেমনি। কেউ খেয়ে তারিফ করলে 'গলে জল'। এই মাঝবেলায় লুচি, বেগুনভাজা, আলুর চচ্চড়ি, মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছেন।

অনন্ত সরখেলের আপাতত কোনওদিকে মন নেই। একমনে লুচির টুকরোগুলো ভাঙছেন, ঝোলে বা বেগুনে মাখাচ্ছেন, তারপর পাকিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। চোখ বোজা। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে সব লেপটে মাল্টি-কালারড হয়ে আছে।

আমি বলতে গেছিলাম,—একটু দেখেশুনে খান।

উনি তেড়ে উঠেছেন,—তাতে তোমার কী হে? তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে ? বেসিন আছে, সাবান দিয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে ফেলব। এখন একটু শান্তিতে খেতে দাও তো।

জগ্গুমামা খাওয়া শেষ করে বেসিনের কাছে।

—মামা, একটা কথা বলি?

—বল।

—দুদিন না জানিয়ে অফিস কামাই করেছি। কাল যেতেই হবে। সন্ধে পর্যন্ত না টেনে সবটা যদি এখনই বলে দাও। যখন তুমি সবটা বুঝেই ফেলেছ। ফোরেনসিক রিপোর্টে কী আসবে, সেও নিশ্চয়ই জানো।

—তা জানি। কিন্তু তোর কোথায়-কোথায় বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে বল তো?

—সবটাই তালগোল পাকিয়ে গেছে। একমাস আগে জীবনবাবুর স্ত্রী পটাশিয়াম সায়ানাইডের ঝাঁজে মারা গেলেন। কিন্তু কে ফোন করেছিল, সেটা বলোনি।

—অনিতার মা ফোন করেছিলেন। না জেনেই অবশ্য করেছিলেন। ছেলেটা যেই বিষমাখা সেন্ট স্প্রে করে চলে যাচ্ছে, অনিতা ওর মাকে অন্য ফোন থেকে রিং করে বলে, তখখনি মাসিকে ফোন করতে। মাসির খুব জরুরি দরকার দিদির সঙ্গে। বেচারি দিদি তড়িঘড়ি ফোন করলেন।... যা ঘটার ঘটল!

—বাপরে! কী ডেঞ্জারাস মেয়ে! নিজের মাসি, যে ওকে এত আদরে বড় করল,—নাহ, ভাবা যায় না!

—ভাবা যায়। শোন টুকলু, টাকা এমনই জিনিস, যার কাছে মানুষ যদি একবার বশ মানে, তখন ভ্যালুজ, কনসেন্স সব তুচ্ছ হয়ে যায়। মানুষ আর মানুষ থাকে না। দেখলি না, এই 'মহৎ কীর্তি'র পুরস্কার হিসেবে ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে আধলাখ টাকা। এ লোভ সামলানো সোজা কথা? এটা ঘটনা, প্রথম ইনসিডেন্ট যে অনিতাই করিয়েছে, এটা বুঝে ফেলার পর আমার পক্ষে আজকের ব্যাপারটা কষে ফেলতে খুব সুবিধে হয়ে যায়। তারপর বাকি প্রমাণ কীভাবে পেয়ে গেলাম, নিজেই দেখলি। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, উগ্রপন্থী আর অনিতার মাঝে আরেকজন 'মেঘনাদ'ও আছেন, যিনি অদৃশ্য থেকে ওকে চালনা করছেন। শুধু টাকার লোভ নয়, অনিতার মনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হতাশা, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তিনি উসকে দিয়েছেন। আজ ওর কম্পিউটারের ই-মেলগুলো চেক করে জানতে পারলাম, অনিতার বাবাও রাজফ্যামিলিরই লোক। থার্ড ব্রাঞ্চ। যারা বৈকুণ্ঠপুরে সেটলড করেছিলেন, তাদের বংশধর। কিন্তু ভাগ্যের

হাতে মার খেয়ে সম্পত্তি কিছুই অবশিষ্ট নেই। অনিতার বাবা সামান্য চাকুরিজীবি।...অনিতার একটা গ্লানির জায়গা। ফলে 'মেঘনাদ' যখন ওই নরম জায়গাটায় চাপ দেন, অনিতা পালটে যায়। ই-মেইলে জানলাম, এমনও কথা হয়ে গেছিল, যদি কোনওদিন 'কামতাপুর' স্বাধীন হয়, অনিতা তার মাথায় বসার সুযোগ পাবে।

জগুমামা সোফায় ছড়িয়ে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

—সব ঠিক আছে মামা। একটা কথা বলো। আগে থেকে জেনেও তুমি তাহলে জীবনবাবুকে ওই বাড়িতে থাকতে পাঠালে কেন? তার আগে অনিতাকে অ্যারেস্ট করতে পারতে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি জেনেশুনে মানুষটাকে খুনির হাতে তুলে দিয়েছ! গো-হারা হেরে গেছ শেষখেলায়।

জগুমামা সিগারেট ধরিয়ে টান দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। দার্শনিকের মতো বললেন,—টুকলু, তোকে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। সবসময় একভাবে হারজিত ফয়সালা হয় না। অত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? আগে সবটা শুনে নে—কেন, কোন পরিস্থিতিতে জীবনবাবুকে আমি বাড়ি যেতে বলেছিলাম।

—বলো! শুনতেই তো চাইছি।

এইসময় কলিংবেল বেজে উঠল। মামা বললেন,—পিকলু, আমার এক বন্ধুর আসার কথা আছে।...

পিকলুর পিছন-পিছন একজন অচেনা মানুষ হাজির হলেন। মাথায় কাউবয় টুপি, চোখে মার্কারি গগলস, গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখ। জিনসের প্যান্ট, সাদা শার্ট।

মামা ইংরেজিতে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন,—ওয়েলকাম মিস্টার নারায়ণন। আই'ম জাস্ট ওয়েটিং ফর ইউ।

তারপর আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রতি-নমস্কার জানালাম। কিন্তু অনন্তবাবু হুড়মুড়িয়ে লুচি-বেগুনভাজাসহ হাত জুড়তে গিয়ে টেবিলে সব ছেতরে ফেলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে ফেললেন।

দিদি, আরেককাপ চা।—জগুমামা ভদ্রলোককে বললেন,—প্লিজ, ওয়েট। আই হ্যাভ সাম টকস উইথ মাই নেফিউ।...

আমি ভদ্রলোকের দিকে চোখের ইশারা করলাম।

জগুমামা বললেন,—ব্যাঙ্গালোর থেকে আসছে।...বাংলা বোঝে না।...হ্যাঁ, যা বলতে চাইছিলাম—

এবারের মতো অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। যেন সিনেমার মতো ঝটঝট ঘটে গেল। পরশু বিকেলে শুরু, আজ সকালের মধ্যে শেষ।...

মোদ্দা ব্যাপারটা হল, কিছু লোক একটা লোককে হুমকি দিচ্ছে, তার স্ত্রীকে সাংঘাতিক বুদ্ধি দিয়ে মেরেও ফেলছে, ভদ্রলোক বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকছেন! অথচ সেই তারা, মানে উগ্রপন্থীরা কোথায়? কয়েকশো

মাইল দূরে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে ওনার স্ত্রীর মৃত্যু এবং অন্যান্য ঘটনা পরপর শুনে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল, ওর ক্লোজ লোকজন এই র‍্যাকেটে অবশ্যই ইনভলবড। এছাড়া এভাবে প্ল্যান করা সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম, জীবনবাবু বাড়ি ফেরামাত্র ফোনে হুমকি শুরু হয়ে গেছে। এবং আমাদের পরিচয়ও তারা জেনে ফেলেছে। আজ সকালেই একথা তোকে বলছিলাম। কাল যখন ওর বাড়ি গেলাম, এবং ঘরগুলো তন্নতন্ন করে দেখলাম, তখনই মনে হল, খুনি বা খুনিরা চেষ্টা করবে ওকে ঘরের মধ্যেই খুন করে ফেলতে। কারণ, তারা জানে, জীবনবাবুর অন্য সবরকম প্রোটেকশন নেওয়া আছে।...তাহলে কীভাবে মারতে পারে? ঘরের মধ্যে একসপ্লাসিভ রাখা বা শট সার্কিট করে আগুন জ্বালানো যাবে না। কুকুর আছে, জীবনবাবুর সিকিওরিটি এজেন্সি আছে। তারা চেক করবে। খাবারে বিষ মেশানোও ঝুঁকি হয়ে যাবে।...আমি বলে দিয়েছিলাম, রাতের খাবার 'জিমি'কে দিয়ে টেস্ট করিয়ে তবে খেতে।...তাহলে?

এদিকে জীবনবাবুকে ওই বাড়িতে না রাখলে এদের হাতেনাতে ধরা যাবে না।...ফাঁদ পাততে হবে।...আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, সিকিওরিটি সার্ভিসের দক্ষ একজন লোককে কাজের লোক সাজিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে জীবনবাবুর সঙ্গে। বুঝতেই পারছিস, এ হল সেই লোকটা যে পুলিশ না আসা পর্যন্ত দরজা খুলতে বা ভাঙতে দেয়নি। তেমনই বলা ছিল।...সমস্যা হল, ফ্যামিলির ঐতিহ্য দেখিয়ে ওকে ওপরের করিডরে শুতে দেওয়া হল না। হলে হয়তো রাতেই হাতেনাতে অনিতা এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভগা ধরা পড়ত।...

জীবনবাবুর শোবার ঘর দেখে গেলাম ভাগ্নে আর শালির মেয়ের ঘরে। ভাগ্নের টেবিলে ছোট-ছোট শিশি দেখে সন্দেহ হল, এগুলো ওর কলেজ ল্যাবরেটরির। লুকিয়ে এনেছে। তাহলে কলেজ থেকে সায়ানাইডও নিয়ে আসতে পারে।...দ্যাখ, স্রেফ আন্দাজে একটু কড়কে দিতে শান্ত স্বীকার করে ফেলল।...

তারপর অনিতার ঘর। টেবিলের ওপর কাগজপত্র-বইখাতা ছড়ানো। তোরা যখন ঘর দেখছিস, আমি টেবিলে ঝুঁকে দেখছিলাম। ল্যুজ প্রিন্ট-আউটগুলো ছড়ানো ছিল। একটায় লেখা আছে 'কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং'। চমকে উঠেছিলাম। ফিজিক্সের ছাত্রীর কোন কাজে লাগবে? আরেকটা জেরক্সকপির ওপরে এয়ার কন্ডিশনারের ছবি, নীচে ফাংশন লেখা। ওদের সিলেবাসে এসব নেই, থাকার কথাও নয়।

সবচেয়ে বেশি চমকে উঠলাম, দ্বৈপায়ন দত্তর সঙ্গে ওর রেগুলার ই-মেলে চিঠি দেওয়া-নেওয়া দেখে। বাড়ির এত কাছে থাকেন, মেসোর এত বন্ধু, ফোন না করে ই-মেল কেন? কীসের গোপনীয়তা?

জীবনবাবুকে নিয়ে ফেরার সময় বাইপাসে অ্যাটাক হল। বুঝলাম, ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। জীবনবাবু ওখানে থাকলে আজই ওরা অ্যাটেমপ্ট নেবে। ওনাকে সব বুঝিয়ে দিলাম। বলে দিলাম সিকিওরিটি সার্ভিসকে।

ঠিক হল, জীবনবাবু শোবার আগে এ.সি. চালিয়ে দিয়ে আর ঘরে থাকবেনই না! চাদর-বালিশ নিয়ে সোজা বাথরুমে চলে যাবেন। সেখানেই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বেন। বাইরে বাগানের দিক দিয়ে জমাদার ওঠানামার যে ঘোরানো সিঁড়ি, তার মুখের বন্ধ খিড়কির চাবি দিয়ে দেওয়া হল সিকিওরিটির ছদ্মবেশী লোকটাকে। মাঝরাত পেরিয়ে গেলে সে তালা খুলে দিয়ে আসবে।

দ্যাট মিনস,—আমি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি,—জীবনবাবু পালিয়ে গেছেন?

—দাঁড়া! অত একসাইটেড হোস না। একটু ধৈর্য ধর। জীবনবাবুকে আমার আশঙ্কা অর্থাৎ কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং-এর কথাটা বলে দিয়েছিলাম। উনি কেমিস্ট্রির লোক, এক সেকেন্ডে বুঝেছেন! জেনে রাখ, কার্বন মনোক্সাইডের মতো ভয়ঙ্কর মৃত্যু-গ্যাস আর দুটো নেই। রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে ওর অ্যাফিনিটি বা টান আমাদের প্রাণদায়ী অক্সিজেনের চেয়ে ২৫০ গুণ বেশি। বাতাসে CO_2 বেশি হয়ে গেলে, আমাদের শরীর অক্সিজেন ছেড়ে মনোক্সাইড বেশি-বেশি টেনে নেবে। এবং যন্ত্রণাহীন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা বহু ঘটেছে। কিছুদিন আগে একটা জার্নালে পড়েছিলাম, ক্যালিফোর্নিয়ায় মোটর গ্যারাজে ইঞ্জিন চালিয়ে রাতে কাজ করছিল মিস্ত্রিরা। রাত বাড়তে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে বাইরের শাটার নামিয়ে দিয়েছে। মোটর ইঞ্জিনের মনোক্সাইডে গ্যারাজ ভরে গেছে। সকালে দেখা গেছে, সব কজনই মৃত।

জীবনবাবুকে বলেছিলাম, ভোরের ঠিক আগে উনি বাথরুমের জানলা সব ভালো করে খুলে তবে মাঝের দরজাটা খুলবেন। টর্চ ফেলে কুকুর জিমির অবস্থা দেখবেন। যদি দেখেন, সে বেঁচে আছে, শরীরের ওঠানামা আছে, তাহলে উনিও অফিসিয়্যালি বেঁচে থাকবেন। নইলে সোজা খিড়কি দিয়ে নেমে বাইরে।... গেটের ওপাশে গাড়ি থাকবে।...

আজ সকালে দরজা খোলার আগে দুই পুলিশকে নিয়ে যখন ব্যালকনিতে গেলাম, তখন চোখে পড়ল, এ.সি. মেশিনের ঠিক নীচে একটা রবারের পাইপ ঝুলছে। এ.সি. মেশিনটা ব্যালকনির দিকেই ফিট করা। এতে ওদের সুবিধে হয়েছে। মেঝেয় দেখলাম, ভারী ধাতুর কিছু ছেঁচড়ে যাওয়ার দাগ। পরে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের পাশে ওই দুটো মনোক্সাইড ভরতি সিলিন্ডার পেয়েছে পুলিশ।

মুহূর্তে বুঝে গেলাম, টোটাল মার্ডার প্ল্যান। এ.সি.-র সাকসন পয়েন্ট দিয়ে একটু-একটু করে কার্বন মনোক্সাইড ঢোকানো হয়েছে। অক্সিজেন হালকা, ওপরে উঠবে, CO_2 দখল করে নেবে ঘরের নীচের বাতাস। ঘুমের মধ্যেই অক্ষয় স্বর্গলাভের বন্দোবস্ত।

—কিন্তু দুটো ডেডবডি যে বেরোল? একটা তো জিমির, অন্যটা?

—পাশবালিশ! চাদর ঢাকা দেওয়া।

উ:! বুক থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেল।—কিন্তু জীবন মণ্ডল? তিনি কোথায়?

মামার চোখ হাসছে। বললেন,—যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। তোরা যখন এখনও নারায়ণনকে চিনতে পারিসনি, তখন কোনও চিন্তা নেই।

ফিনিশিং টাচ চিরকালই দিয়ে এসেছেন অনন্ত সরখেল। এঁটো হাতদুটো জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে হঠাৎ সুর করে গেয়ে উঠলেন,—জয়ো জয়ো মামা, চরাচরসারে—

—অ্যাই, চুপ! আপনার মাথাটা একেবারে গেছে! মামা কি মেয়ে নাকি?

শেষটুকু খবরের কাগজে অনেকেই পড়েছি। কামতাপুরি উগ্রপন্থীদের অনেক নেতাই পরপর ধরা পড়ছে। দ্বৈপায়ন দত্ত পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছেন, অন্যান্য টেররিস্ট দলের সঙ্গেও ওঁর যোগাযোগ রয়েছে। সেই সূত্র ধরে পুলিশ ভুটানের সীমান্ত জঙ্গলে এখন অপারেশন চালাচ্ছে।

তবে রাজ ফ্যামিলির কথা আপাতত গোপন রাখা হয়েছে। বিগ্রহের কথাও জানানো হয়নি। ঠাকুর মদনমোহন এখন আপাতত ব্যাঙ্কের লকারেই বিরাজ করছেন।

শারদীয়া ২০০২

সাক্ষী ছিল ছবি

১

সিম্পলি সুপার্ব!

—যা বলেছেন স্যার। অ-পূর্ব!

—অদ্ভুল্ল অন্যরকম একটা—

-হ্যাঁ স্যার, অদ্ভুত অন্যরকম টেস্ট। তেমনি মোলায়েম!

জগুমামা ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন,-মোলায়েম! কী মোলায়েম? আমি কী বলছি বুঝেছেন?

হ্যাঁ স্যার। তা আর বুঝব না?-একগাল হাসলেন অনন্ত সরখেল। হাতের আধখাওয়া বস্তুটি দেখিয়ে বললেন,-এইটের কথা। দিদি বানিয়েছেন। দারুণ হয়েছে।

ধ্যুর মশাই!-জগুমামা বললেন,-আমি বলছি মর্ডান টাইমস-এর কথা। দেখছেন না?

-হ্যাঁ স্যার, ইয়ে...দেখছি। তবে কি জানেন স্যার, ভালো জিনিস জিভে পড়লেই আরামে চোখ বুজে আসে। তাই মাঝে-মাঝে...তা ছাড়া স্যার, সবটা ঠিক বুঝতেও পারছি না। কথা নেই তো।

জগুমামা হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন,-নাহ! আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। চার্লি চ্যাপলিনের ছবিতে কথা নেই, তাই বুঝতে পারছেন না?

সবাই হেসে উঠলেন। অনন্তবাবুর অবশ্য তাতে কিছু যাচ্ছে-আসছে না। উনি নির্লিপ্তভাবে প্লেট থেকে একটার পর একটা তুলছেন আর মুখে পুরছেন।

আমাদের ড্রইংরুম আজ সরগরম। মে দিবসের ছুটি। দিল্লি থেকে এসেছেন জগুমামার কলেজের বু-দম্পতি সুব্রত-জয়ন্তী, ওদের মেয়ে পিয়া, পিকলুর দুই বু এবং যথারীতি অনন্ত সরখেল। মডার্ন টাইমস-এর সিডি নিয়ে এসেছে পিকলু, সেটাই চলছে। সবারই প্রায় দেখা, তবু দেখতেই হচ্ছে। এসব ছবি কখনও পুরোনো হয় না।

চার্লি মেয়েটির হাত ধরে সূর্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, আবার নতুন করে বাঁচার প্রতিজ্ঞা নিয়ে-শেষ দৃশ্য। শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। সুব্রতমামা বলে উঠলেন,-গ্র্যান্ড! দুটো 'ম'-এরই জবাব নেই।

দুটো 'ম''' !

সুব্রতমামা হেসে বললেন,-মডার্ন টাইমস আর "মোমো'। জগু, এটা কি বাড়িতে বানানো?

আলবা ।-প্লেট থেকে শেষ মোমো তুলে নিয়ে অনন্তবাবু বললেন, দিদি নিজে বানিয়েছেন। তবে মোমো-ফোমো না বলে দিশি নামে ডাকতে পারেন। মাসি।

-মাসি?

-হ্যাঁ। মাংসের সিঙাড়া, মা-সি। তাই না স্যার?

জগুমামা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দরজায় পাখি ডাকল।

পিকলু দরজা খুলল। জগুমামা বলে উঠলেন,-আরে:, বাবলু! আয় আয়।

বাবলুমামা ভেতরে ঢুকে একসেকেন্ড দাঁড়ালেন। ওঁর চোখ আনন্দে ঝকঝক করে উঠল। তারপরেই উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন,-সুব্রত-জয়ন্তী, তোরা! বাব্বা! কত্তদিন পর! কবে এলি? তোদের মেয়ে? এত বড় হয়ে গেছে? তোরা-

দাঁড়া, দাঁড়া, আগে বোস।-জগুমামা বাধা দিলেন, এসেই হইচই শুরু করে দিলি। যাকে নিয়ে এলি, পরিচয় করা। তোর স্বভাব পালটাল না।

বাবলুমামা লজ্জা পেয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা বেশ সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবলুমামা বললেন,-এক্সট্রিমলি সরি। এর নাম মিনা। মিনা বিজলানি। ওর কর্তা গণেশ আমার ছোটভাইয়ের মতো। গণেশও এসেছে। আমাদের ড্রপ করে সল্ট লেকে আরেকজনের সঙ্গে দেখা করে আসছে। বোসো মিনা।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসুন।-জগুমামা বললেন,-আমি জগবু মুখার্জি, উনি সুব্রত সেন, জয়ন্তী সেন, ওদের মেয়ে পিয়া। আমার বড় ভাগ্নে অর্ণব, ছোট ভাগ্নে কৌস্তভ, ওর দুই বু। আর উনি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড অনন্ত সরখেল। ইনি আমার জামাইবাবু। দিদি রান্নাঘরে, আসছেন।

বাবলুমামা টেবিলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়েছেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,-গণেশ অনেকদিন ধরেই বলছিল তোর কাছে নিয়ে আসতে। আমার সময় হয় না। তারপর তুইও

থাকিস কি না....আফটার অল য়ু আর আ বিগ শট। বিজি ম্যান। আজ সকালে গণেশ যখন ফের মনে করাল, আমি ফোন করলাম। দিদি বললেন, বিকেলে আছিস।

জগুমামা বললেন,-ব্যাপারটা কী? কোনও প্রবলেম?

-মোটেই না। মিনার ট্যালেন্ট। অ্যাই মিনা, চুপ করে আছ কেন? বলো। প্যাকেটগুলো খোলো। বসকে দেখাও। আরে বাবা, যদি কেউ তোমার গতি করতে পারে, ও-ই পারবে। য়ু নো, হি'জ আ ন্যাশনাল সায়েন্টিস্ট অব আওয়ার কান্ট্রি?

-আ:, তুই থাম। মিসেস বিজলানি, আপনি বলুন।

মিনা বিজলানি ফর্সা, সুন্দরী। লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেছে। মৃদুগলায় বললেন,-প্লিজ, বাবলু ভাইয়া! আপ দিখাইয়ে।

নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না! -বাবলুমামা বললেন,-এত লজ্জা! ...যাকগে শোন, মিনার প্যাশনই বল, অবসেসনই বল, ফোটোগ্রাফি। ছবি তুলতে ভীষণ ভালোবাসে। গণেশ সকালে খেয়েদেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। মিনাও ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ে।

বাবলুভাইয়া, ডোন্ট একসাসারেট।-মিনা সলজ্জ আপত্তি করলেন,-রোজ আমি বাহার হই না। উইকে দো-তিন দিন।

-ও-ই হল। গণেশ বউকে গাড়ি-ড্রাইভার দিয়েছে। বউ তেল পুড়িয়ে কোথায়-না-কোথায় চলে যায়।

-আপনি ছবি তোলা কোথায় শিখেছেন?

-না রে। কোথাও শেখেনি। ওই যে বললাম, প্যাশন। তবে ছবি ও সত্যিই ভালো তোলে। ওদের ফ্ল্যাটে আলমারি ভর্তি শুধু ফোটোগ্রাফির বই আর ম্যাগাজিন।

-বাঃ!

-হ্যাঁ। বুঝলি জগু, আমি এমন ফোটোগ্রাফার জম্মে দেখিনি, যে শুধু নিজের খুশিতে ফোটো তুলে যাচ্ছে।...মিনা, বের করো।

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, মিনার ভ্যানিটি ব্যাগের পাশে সুদৃশ্য মোটা একটা ফোলিওব্যাগ রয়েছে। উনি তার ভিতর থেকে পরপর ছবিগুলো বের করে টেবিলে ফেললেন।

সবাই হাতে-হাতে দেখছি। কয়েকখানা চমকে দেওয়ার মতো ছবি। কোথাও না শিখে এইরকম দেখার চোখ, লেন্স, আলো-ছায়া সম্পর্কে এত ভালো কনসেপ্ট, ভাবা যায় না। বাবলুমামা বাড়িয়ে বলেননি।

দু-তিনটে ছবি মার্ভেলাস। নদীর গা ঘেঁষে উঠেছে প্রাচীন বটগাছ, তার শাখা-প্রশাখায় চড়ে জলে ডাইভ দিচ্ছে গাঁয়ের ছেলেরা, সেই মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন মিনা। শূন্যে একটি ছেলে, অন্যজন জল স্পর্শ

করছে। গাছটা, জলে তার ছায়া, ছেলেদের ছায়া, ব্যাকগ্রাউন্ডে বিকেলের আলো সব মিলিয়ে এক অন্য জগ সৃষ্টি হয়েছে।

আরেকটা ছবি, কোনও মেলার। একজন জটাজুটধারী সাধু বোঁচকা মাথায় নিদ্রামগ্ন। পাশে পোষা বাঁদর সাধুর উকুন বেছে-বেছে মুখে পুরছে। ক্যামেরা ফোকাস করেছে বাঁদরটাকে। ক্লোজ আপ শট। বাঁদরটার মুখে এক স্বর্গীয় তৃপ্তি!

গ্রেট! -জগুমামা ছবিগুলো দেখে টেবিলে গুছিয়ে রাখলেন। বললেন,-আপনি চালিয়ে যান। হবে।

চালিয়ে তো যাবেই। তুই বললেও যাবে, না বললেও যাবে। -বাবলুমামা বলে উঠলেন,-এবার ওর একটা গতি করে দে।

-গতি! কী গতি করব?

-বোঝ! সেটাও বলে দিতে হবে! আরে ভাই, তোর এত চেনাজানা, দু-একটা পেপারে একটু বলে দে। ওর ছবি ছাপা হোক। তবে তো মেয়েটা উ-সাহ পাবে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।-জগুমামা বললেন,-আপনার কাছে পেন-পেপার আছে? লিখে নিন। কল্যাণ বাগচী, স্টেটসম্যান, অনিরুদ্ধ দত্ত, হিন্দুস্তান টাইমস, সোমশংকর...

জগুমামা গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন, মিনা নোট করে নিচ্ছেন। লম্বা লিস্ট। প্রায় এগারোটা নাম বলে মামা বললেন,- এদের সবার সঙ্গে আমার রেফারেন্সে যোগাযোগ করবেন। নো হেসিটেশন।

বাবলুমামা ওদিকে গপ্পে মেতে গেছেন। হা-হা-হি-হি-শব্দে ড্রইংরুম কেঁপে উঠছে। আরেকপ্রস্থ চা-মোমো এসেছে। কারও খেয়াল নেই। অনন্ত সরখেল নিঃশব্দে সাবড়ে যাচ্ছেন।

আবার দরজায় বেল। দরজা খুলতেই বাবলুমামা বলে উঠলেন,-আও, আও গণেশবাবু! তুমহারা বিবিকা কাম হো গয়া।

ক্যাবলা-ক্যাবলা চেহারা। বয়েস ত্রিশের এদিকে। মুখে লাজুক হাসি। গণেশ মাথা নুইয়ে সবাইকে নমস্কার করলেন।

-বসুন।

নারে, আজ আর বসা যাবে না।-বাবলুমামা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,-আমার জরুরি একটা কাজ আছে। জয়ন্তী-সুব্রত, তাহলে ওই কথা রইল। নেক!সট রবিবার। বা-ই।

তিনজনেই বেরিয়ে গেলেন। বাইরে গেট টানার শব্দ হল।

সুব্রতমামা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। আস্তে-আস্তে বললেন,-মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল হে।

কেন? -জগুমামা অবাক হয়ে বললেন,-তোমার আবার কী হল?

-না, আমার কিছু হয়নি। মেয়েটার জন্যে খারাপ লাগছে। মিষ্টি মেয়ে। ওর সময় ভালো যাচ্ছে না।

-মানে! কার কথা বলছ? মিনা বিজলানি?

-হ্যাঁ।

-তার আবার কী হল? কী বলছ বলো তো?

-বলতে কি আর চাইছি! না বলে পারছি না। ওর মুখের ওপর-

-রাবিশ! ও জয়ন্তী, তোর কর্তা ছেলেঠ্যাঙানো ছেড়ে ফেস-রিডিং ধরল কবে?

কী জানি ভাই, কী বলব।-জয়ন্তীমাসি হাত উলটে বললেন,-আজকাল ও হুটহাট বেশ কিছু বলে দিচ্ছে। খেটেও যাচ্ছে। তাও তো হাত দেখেনি! হাত দেখে আরও অনেক কিছু বলে দেয়।

-সে কী রে! তোরা সায়েন্সের প্রফেসর হয়ে এইসব বুজরুকি করছিস!

-নোও! আমায় জড়াস না! ওকে বল। তবে একটা কথা বলি, ও যাদের ভবিষ্য- বলে দিচ্ছে, তাদের নিজের চোখে দেখেছি। তুই চিনিস, আমাদের পরের ব্যাচের অরিন্দম, দিল্লি গেছিল। আমাদের বাড়ি গেল। কথা বলতে-বলতে সুব্রত দুম করে বলল, তুমি কিছুদিনের মধ্যে বিশাল সম্পত্তি পাচ্ছ। অরিন্দম হ্যা-হ্যা করে হাসল। মজা করে হাত পেতে দিল। ব্যস, সুব্রত তখন ওর গোপন এমন কিছু ব্যাপার বলে দিল, অরিন্দমের মুখে রা নেই। ঠিক তিন মাস পর অরিন্দম আবার দিল্লি গেছে। মাথায় ছোট-ছোট চুল। সুব্রতর হাত ধরে বলল, তুমি জানতে আমার মাতৃবিয়োগ হবে? সুব্রত বলল, হ্যাঁ। এও জানতাম, তোমার বাবা নেই। সব সম্পত্তি মায়ের নামে। মা তোমাকেই দিয়ে গেছেন। খারাপ বলি না। ভালোটুকু বলেছি।...সুব্রত নাকি ছোটবেলায় চর্চা করত। এক সাধুর কাছে শিখেছে।

সুব্রতমামা গুম মেরে বসে আছেন। জগুমামা বললেন,-ও সুব্রত, রাগ করলে নাকি?

-না-না, রাগ করব কেন? বিশ্বাস যার-যার নিজের কাছে। আমার ভালো লাগছে না। মেয়েটার মুখে বিপদের ছায়া! পারলে সাবধান করে দিও।

-কীভাবে সাবধান করব? কোনও কারণ ছাড়াই বলব, সাবধানে থাকুন?

তুই চুপ কর টুকলু!-জগুমামা হঠা রেগে উঠলেন,-এই বয়েসে এসে আমায় জ্যোতিষীতে বিশ্বাস করতে হবে! অল বোগাস।

২

ডাইনিং টেবিলে জগুমামা আর আমি। সকাল আটটা। আধঘণ্টার মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ব। মামাকে সায়েন্স কংগ্রেস অফিসে নামিয়ে অফিসে ঢুকব।

আজ জগুমামার একটা সেমিনার আছে। আমেরিকা থেকে দুজন বিজ্ঞানী আসছেন। কীভাবে সেদেশে মরুভূমিকে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে আস্তে-আস্তে সবুজ করে তোলা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোচনা।

বক্তৃতার ছাপানো কপি চলে এসেছে আগেই। জগুমামা গভীর অভিনিবেশে পড়ে যাচ্ছেন।

মা বললেন,-জগু! তোর চা যে শরবত হয়ে গেল।

অ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।-বলতে-বলতে আনমনাভাবে চায়ের কাপ মুখে ধরলেন। নিজের মনেই বললেন,-আনথিঙ্কেবল!

আমি বললাম,-কী?

ভাবছি এদের কাজের কথা।-কপিটা ফাইলে ঢুকিয়ে জগুমামা বললেন,-ভাবতে পারিস, কী বিরাট কাণ্ড করে যাচ্ছে ওদেশের বিজ্ঞানীরা? অ্যারিজোনা মরুভূমির একপ্রান্তের শহর লাস ভেগাস। রুক্ষ, শুকনো। দেশের অন্য প্রান্ত থেকে বিশাল-বিশাল ক্রেন করে আস্ত এক-একখানা বড় গাছ শিকড়সুদ্ধ এনে সেখানে পুঁতে দিচ্ছে। এইভাবে গোটা অঞ্চল গাছ দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছে। রোজ সরে সময়ে স্প্রিংক!লার দিয়ে জল ছেটাচ্ছে সমস্ত গাছে।

-অত জল ডেজার্টে পাচ্ছে কোথায়?

-মাইলের পর মাইল পাইপলাইন দিয়ে টেনে এনেছে। সেই লক্ষ-লক্ষ টন জল মরুভূমির মাটিতে পড়ছে, গাছ টানছে। আর গাছ থাকা মানেই বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়বে, মেঘ জমবে আকাশে। আস্তে-আস্তে মাটির রং বদলাবে, উর্বরতা বাড়বে। ওরা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছে, আগে যেখানে লাস ভেগাস শহর ও আশেপাশে বছরে ২-৩ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হত না, সেখানে এখন রেইনফল বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২-১৪ মিলিমিটার।

-কিন্তু মামা বিরাট খরচের ব্যাপার! আমাদের মতো গরিব দেশে কি আর ওই টেকনোলজি-

-এই হচ্ছে তোদের মুশকিল। টাকা কোনও ফ্যাক্টর নয়। যদি সদিচ্ছা থাকে। আমাদের দেশে পপুলেশনের যা ডেনসিটি, সেখানে থর মরুভূমিতে এখনই এই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অল্প-অল্প করে এগোবে। প্রয়োজনে টাকা ধার করবে। কিন্তু কত উর্বর চাষের, বাসের জমি পাওয়া যাবে, ভাব তো! আসলে দেশটার মাথায় যারা আছে, তারা কেউ কিচ্ছু ভাবে না।

-তুমি কথা বলো সরকারের সঙ্গে। প্রোপোজাল দাও।

-নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু , কাজের কাজ কিছু হবে না। নানান সেমিনার হবে, ইন্সপেকশন হবে, ওই পর্যন্ত। সেদিন এক অনুষ্ঠানে আমাদের পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা। উনি দুঃখ করে বলছিলেন, কেন্দ্র ইচ্ছেমতো পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়াচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের তুলনায় আমাদের দেশে জ্বালানি তেলের দাম বেশি। কেনা হচ্ছে কিন্তু একই দামে। তারপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপিয়ে-

-মামা, দেখেছ? ওই ছবিটা বেরিয়েছে।

পিকলুর হাতে আজকের টাইমস অব ইন্ডিয়া।

তাই তো রে। মিনা বিজলানির ফোটোটা। গঙ্গার পাড়ের বটগাছ, ছেলেপিলেরা। ক্যাপশন করেছে "মোমেন্টস উইথ ওয়াটার'। নীচে ফোটোগ্রাফারের নাম।

বাঃ!-জগুমামা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,-মেয়েটার এলেম আছে বলতে হবে। দাঁড়া, ওকে ফোন করে কনগ্র্যাচুলেট করি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

-মামা, প্লিজ! এখন নয়। আমার অফিসে লেট হয়ে যাবে।

সাদার্ন স্টেশনে একটা ট্রানসফরমার বেশ কদিন ভোগাচ্ছে। এখনই সারাতে হবে। আবার পাওয়ার সাপ্লাইও চালু রাখতে হবে। সেই নিয়েই ছুটির পরে আলোচনা হচ্ছিল।

মোবাইল বেজে উঠেছে।

-হ্যালো।

-মামা। তুই কোথায়?

-অফিসে। কেন?

-এখন পাঁচটা পনেরো। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পার্ক সার্কাস আসতে পারবি? আলিশান রেস্টুরেন্ট। বাবলু ফোন করেছিল। ও গণেশকে নিয়ে আসছে। মিনার ব্যাপারে কিছু ঘটেছে।

-পৌঁছে যাচ্ছি।

আলিশানের পাশে গাড়ি পার্ক করলাম পাঁচটা তেত্রিশে। ভিতরে ঢুকতেই মামা কোনার টেবিল থেকে হাত নাড়লেন।

-তোর চা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। গণেশ, কুল ডাউন। ঠান্ডা মাথায় বলো, কী হয়েছে।

গণেশ বিজলানি তবু ছটফট করছেন,-কী বোলছেন স্যার? হামি ওকে এত বিশওয়াস করি, অর সে হামার কাছে পুরো কনফাইড করে গেছে। আজ ভি বোললো না।

-আবার এক্সাইটেড হচ্ছ? তবে আমি শুনবই না। ইয়োর ওয়াইফ ইজ আ গুড গার্ল।

লেকিন,-গণেশ নিজেকে সামলে নিলেন। ঢকঢক করে গ্লাসের জল খেলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকলেন প্রায় আধমিনিট।

তারপর বললেন,-আজ সোকালে, হাঁ, তোখোন অ্যাবাউট টেন, হামি রেডি হোয়ে দুকানে যাব, একটা ফোন বাজল। মিনা কিচেনে। হামার লাঞ্চ প্যাক কোরছিল। হামি ফোন ধোরলাম। মেল ভয়েস। মিনার সোঙ্গে কথা কোরতে চায়।

হামি পুছলাম,-হাপনি কে?

সে বলল,-হাপনি কি মিনা বিজলানির হাজব্যান্ড?

-জি।

হাঁ হাপনাকেই দোরকার। হাপনার ওয়াইফ ইস প্লেয়িং উইথ ফায়ার। হাপনি তাকে থামতে বোলেন। যো-যো ডকুমেন্ট তার কাছে আছে, সোব ডেস্ট্রয় করুক। আদারওয়াইস উই হ্যাভ টু গেট রিড অব হার।

গণেশ থামলেন। জগুমামা বললেন,-তারপর?

-হামি খুব ডরে গেলাম। বোললাম, কী বোলছেন? কী ডকুমেন্ট হামার ওয়াইফের কাছে আছে?

লোকটা বোলল,-আপনার ওয়াইফই বোলবে। পহেলে দো-চারবার তাকে ওয়ার্ন করেছি। শুনছে না। ন্যাচারালি উই হ্যাভ নো আদার অপশন। ব্যস, ইতনাসা বোলকে ফোন রাখ দিয়া।

গণেশ। ওয়ান কোশ্চেন। -জগুমামা বললেন,-লোকটা কি বাঙালি?

-জি।

-তুমি তারপর মিনাকে চার্জ করলে?

-ন্যাচারালি। লেকিন হামি আশ্চোর্য হোয়ে দেখলম, শি ওয়াস ভেরি নরম্যাল। হামায় বোললো, হাঁ। অ্যায়সা ফোন পহেলে ভি আয়া থা। আই ডোন্ট বদার। হামি বোললাম, তুমি হামায় বোলোনি কেন? মিনা বোললো, অ্যায়সা কোই ইম্পট্যান্ট বাত নেহি, ইসিলিয়ে। শোচিয়ে স্যার, হাউ ডেয়ার শি ইস।

-তারপর?

-আগেন শি টোল্ড মি, ডোন্ট পোক ইওর নোস। আই'ল ট্যাকল মাই ওন প্রবলেম। হামি পুছলাম, কী প্রোবলেম? কী ডকুমেন্ট? শি কেপ্ট মাম। রিপ্লাই দিল না। হামি রিপিটেডলি প্রেসার দিতে বোললো, হামি বাবলুভাইয়ার সোঙ্গে কথা করে নেব। তোখোন শুনো।

-তার মানে, তোমায় কিছুই বলল না?

-নেহি। শি ওয়স অ্যাডামেন্ট। আই ফেল্ট ইনসাল্টেড অ্যান্ড কেম আউট অব মাই অ্যাপার্টমেন্ট।

-ফ্ল্যাটে তুমি একাই ছিলে?

-হামরা কাপলই তো থাকি।...বাট অ্যাট দ্য লাস্ট ফেস অব আওয়ার হট টকস, হামার পিতাজি অর চাচাজি ফ্ল্যাট মে আয়া থা। হামায় বুলাতে। ওফিসের টাইম হোয়ে যাচ্ছিল।

-তোমার বাবা-কাকা কোথায় থাকেন?

-স্যর, ন্যাচারাল লাইট কমপ্লেক্সে হামরা চারঠো ফ্ল্যাট খরিদ করেছি। পিতাজি, চাচাজি, হামি, একঠো চাচাতো ভাইয়ের। হামাদের জয়েন্ট বিজনেস।

-তোমাদের কীসের বিজনেস?

-মোটর পার্টসের। উই আর ডিস্ট্রিবিউটরস অব মারুতি, হিন্দুস্তান মোটর, হুন্ডাই। বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, বিরাটি-তিনঠো শপ আছে। একঠো সার্ভিস সেন্টার।

বাবলুমামা একটাও কথা বলেননি। এবার বললেন,-জগু, আমার মনে হচ্ছে, মিনার কাছে এমন কিছু ডকুমেন্ট এসে গেছে, যেগুলো আন্ডারওয়ার্ল্ডের। তারা ফেরত চাইছে, বা পুড়িয়ে দিতে বলছে। মিনার জেদ চেপে গেছে। ও রাজি হচ্ছে না।

-হাঁ-হাঁ, এহি হুয়া।

-জগু, এখন কী করণীয়?

-তুই আজকালকের মধ্যে মিনার সঙ্গে দেখা কর। কথা বল। মিনা তো তোকে বলবে বলেছে।

-আমি বলি কি, তুইও একবার চল না সঙ্গে। কী বলো গণেশ?

-হাঁ-হাঁ। বহোৎ আচ্ছা হোগা।

জগুমামা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,-ঠিক আছে। কাল সকাল সাতটার মধ্যে যাব। তারপরে আর সময় হবে না। গণেশ, তুমি যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছ, মিনাকে একদম বলবে না। আর আজকে রাতে ওর সঙ্গে নর্ম্যালি বিহেভ করবে। সকালের প্রসঙ্গ পুরো বাদ। কেমন?

৩

চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে ড্রইংরুমে এসে দেখলাম, জগুমামা এখনও টিভির সামনে বসে।

-কী যে রোজ খবর শোনো! তেতেপুড়ে এলে, ফ্রেশ হয়ে নাও। সেই তো খারাপ খবর। তাপপ্রবাহে মৃত্যু, হাসপাতালে শিশুমৃত্যু, ট্রেন দুর্ঘটনা, জঙ্গি হানা-

-কেন? আমাদের রাজ্য ঘুরে আবার দাঁড়াতে চাইছে, শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে-এগুলো ভালো খবর নয়?

আমার মাথায় ওসব ঢুকছে না।-শুধু ভাবছি মিনা বিজলানির ব্যাপারটা। কোথাও কিছু নেই, ভদ্রমহিলার ছবি আজই কাগজে বেরোলও, আবার ঝামেলা পাকিয়ে উঠল। যাই বলো, সুব্রতমামা কিন্তু বলেছিলেন!

-বাদ দে তো! মুখ দেখে যদি বলে দেওয়া যেত, পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠত। আগে থেকেই সব জেনে-

জগুমামার কথা শেষ হল না। টেবিলের ওপর শুয়ে থাকা আমার সেলফোনে বেজে উঠল।

-হ্যালো!

-টুকলু?

-হ্যাঁ বাবলুমামা কী ব্যাপার?

-জগু কোথায়?

তরপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন-সে কী রে!

একনিমেষে জগুমামার মুখচোখে কেউ যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

কয়েকসেকেন্ড নিঃশব্দ। তারপর মামা বললেন,-টুকলু। প্যান্টসার্ট পরে নে। এখনই বেরোতে হবে। বাবলু এখনই এসে যাচ্ছে।

-কী হয়েছে মামা?

-মিনা খুন হয়েছে! ফ্ল্যাটের মধ্যে।...আসার সময় টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমার রিভলভার নিয়ে আসিস।...

বাবলুমামা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন।

আমাদের গাড়ি বাইপাসে এসে পড়ল। একটু-একটু ঝড় উঠেছে। হয়তো কালবৈশাখী হবে।

কারও মুখে কথা নেই। দুই বুর হাতে সিগারেট।

-যতটুকু জানিস, বল তো।

কী বলব!-বাবলুমামা থেমে-থেমে বললেন,-গণেশ ফোনের মধ্যে হাউহাউ করে কাঁদছিল। আমি তোদের সল্ট লেকে কাজে এসেছিলাম। বেরোচ্ছি। এইসময় গণেশের ফোনটা ঢুকল। উঃ ! কী মর্মান্তিক!

-গণেশ পার্ক সাকাস থেকে মধ্যমগ্রাম গেছিল। ওদের সার্ভিস সেন্টারে। তখন মিনা ফোন করে। খুব উচ্ছ্বসিত গলা। সকালের ঝগড়ার চিহ্ন ছিল না। গণেশকে বলে, তাড়াতাড়ি চলে আসতে। আজ একটা দারুণ গিফট এসেছে। গণেশকে সারপ্রাইজ দেবে।

গণেশ চটপট কাজকর্ম সেরে ফিরে আসে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে। বাইরে থেকে বারবার কলিংবেল টেপে। কোনও সাড়া নেই। ভিতরে ফুল ভল্যুমে স্টিরিও বাজছিল। গণেশ ভাবে, বউ নিশ্চয়ই বাথরুমে। পকেট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বের করে দরজা খুলতে চেষ্টা করে। খোলে না।

-খোলে না?

-না, কারণ ভিতর থেকে সিটকিনি তোলা ছিল। প্রায় দশ-বারো মিনিট ধাক্কাধাক্কি-ডাকাডাকি-বেল বাজিয়েও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন গণেশ ভয় পেয়ে অন্য ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের, সিকিওরিটির লোকজনকে ডেকে আনে। সবাই মিলে ধাক্কা মারতে-মারতে সিটকিনি ভেঙে যায়। ঢুকে দেখে একেবারে ড্রইংরুমে মিনা পড়ে আছে। মৃত।

-সুইসাইড নয় তো?

-একেবারেই নয়। মিনার মুখ থেকে শুরু করে বডির আপার পোরশান কমপ্লিটলি বার্নট। পুড়ে ঝলসে গেছে। চেনা যায় না। কেউ এক্সপ্লোসিভ ছুঁড়ে মেরেছে।

-কী করে মারবে? বলছিস, ফ্ল্যাট ভিতর থেকে ব ছিল। একটা শব্দও তো হবে।

-শব্দ হয়তো ঢাকা পড়ে গেছে স্টিরিওর বাজনায়। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি না। খুনি এক্সপ্লোসিভ ছুঁড়বে কীভাবে? কোত্থেকে? পুরো ফ্ল্যাট গ্রিল আর কাচ দিয়ে আটকানো। সরে পর ওরা মশার উৎপাতে কাচ টেনে দেয়।...জগু! আমি ভাবতেই পারছি না, বাচ্চা মেয়েটা মরে গেছে। খুব ভালোবাসত আমায়! বলত, আমার নিজের কোনও দাদা-ভাই নেই, আপনিই আমার দাদা।

ভিতরের আবেগ বাবলুমামাকে চুপ করিয়ে দিল। উনি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন।

জগুমামা মৃদুগলায় বললেন,-টুকলু, একবার চম্পককে ধর তো। এটা ওরই এলাকা। ওর মোবাইল নম্বরটা...দাঁড়া, হ্যাঁ মনে পড়েছে... ৯৪৩৩০...।...

-হ্যালো, চম্পক! আমি জগু বলছিরে। সরি, তোকে অসময়ে ডিস্টার্ব করছি। এখনই তোকে একবার আসতেই হবে। কোনও উপায় নেই ভাই। মার্ডার হয়েছে তেঘরিয়ার ন্যাচারাল লাইট কমপ্লেক্সে।...একটু আগে। আমার খুব পরিচিত ফ্যামিলি। সেজন্যেই এত রাতে...প্লিজ আয়। আর লোকাল ও.সি.-কে বলে দে।

এয়ারপোর্টের একটু আগেই ভি. আই. পি. রোডে আবাসনটি। সুদৃশ্য তোরণ পেরিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকে গেল। সুদৃশ্য সব উঁচু-উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি। টানা রাস্তা চলে গেছে। মাঝে-মাঝে সবুজ লন, বাগান। বাঁ-দিকে সুইমিং পুল, ক্লাব হাউস। বাড়িগুলোর ওপর থেকে সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের ফোকাস, কিছুদূর অন্তর পুরোনো গ্যাসবাতির আদলে স্ট্রিট লাইট। পুরো কমপ্লেক্স আলোয় উজ্জ্বল। মনে হয় যেন বিদেশ।

সামনে নানারঙের আলোয় নাচছে সুদৃশ্য ফোয়ারা। আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম।

বেশ কিছু মানুষ ভিড় করেছে। একটা কালো পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। বাবলুমামা ফ্ল্যাটের নীচে এসে থামলেন।

সাড়ে ন'টা বাজে।

বাবলুমামা এগিয়ে গেলেন। পিছনে আমরা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে বাবলুমামার হাত ধরে ফুঁপিয়ে উঠলেন,-বাবলু ভাইয়া! এ কেয়া হো গয়া! যাইয়ে...যাইয়ে। ঘর কা বহু...হে ভগ!বান।

লিফট ব করে বাবলুমামা বললেন,-গণেশের কাকা! রাজকুমার বিজলানি।

চারতলায় ঠাসাঠাসি ভিড়। বাবলুমামা উঁচুগলায় বললেন,-প্লিজ! যেতে দিন।

পুলিশ আমাদের আটকাল। জগুমামা বললেন,-ও.সি. কোথায়?

-বড়বাবু, আপনাকে ডাকছে...

-নমস্কার, আমার নাম জগবু মুখার্জি।

-আপনি স্যার! আসুন, আসুন।

-এস. পি. আসেনি?

-সার এখনই এসে পড়বেন।

তীব্র কারেন্টের শক! বাবলুমামা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

এ দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব নয়। মিনার মুখ বলে কিছু নেই! পুড়ে কালো হয়ে গেছে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ।

ওর কাছাকাছি যা ছিল, সব গেছে। সোফা সেট পুড়ে কালো। পিছনে টিভি, দেওয়ালের ছবি, ক্যাবিনেট সর্ব বিস্ফোরণের চিহ্ন। সিলিং-এর ঝাড়লন্ঠন টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে।

মিনার শরীর চি- হয়ে পড়ে আছে। দুটো হাত দুদিকে ছড়ানো। মেঝেতে অজস্ত্র ভাঙাচোরা জিনিসের টুকরো। ফুলদানি, অ্যাশট্রে, সেন্টার টেবিলের কাচ, প্লাস্টিক, ধাতুর পাত-! কার্পেটের পোড়া-পোড়া টুকরো।

একপাশে বসে চোখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছেন গণেশ।

বাঁ-দিকে তাকাতেই বুকটা ছ্যাঁ-করে উঠল। শ্বেতপাথরের প্রাচীন টেবিল। তার ওপর বিরাট অয়েল পেন্টিং। মিনা-গণেশ। দুজনেই হাসছে।

জগুমামা কয়েকমুহূর্ত দেখলেন। তারপর বললেন,-ও.সি. সায়েব! ঘর পুরো ফাঁকা করে দিতে হবে।... গণেশ!

গণেশ মুখ তুলে তাকালেন।

-ভাই, উঠে এসো। পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দাও।

বাইরে হুটারের শব্দ। বুটের আওয়াজ।

-সরুন! সরুন!

-জগু কই?

-সার, এখানে।

চম্পক ভট্টাচার্য এগিয়ে এলেন,-জগু, সব ঠিক আছে?

-তোর জন্যে ওয়েট করছিলাম। এখনই বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে। কাল রিপোর্ট চাই।

বাইরের ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। জগুমামা চম্পকবাবুকে নিয়ে ড্রইংরুমের বাঁ-দিকের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত কাচ টানা। কাচ সরালে ছোট্ট ব্যালকনি। ব্যালকনিও গ্রিল দিয়ে আটকানো।

পাঁচিলের ওপারে খেত-জমি। ঝোপড়ির হলুদ আলো। জগুমামা নিচুগলায় বললেন,-খুনি এদিক দিয়েও উঠে আসতে পারে। এই দ্যাখ, ব্যালকনির দিক দিয়ে এই কাচ টেনে দেওয়া যায়।

-কিন্তু গ্রিল?

তাই?-মামা গ্রিলে জোরে চাপ দিলেন। গ্রিল একটু সরে গেল।

-দেখলি? ও.সি., আপনি নীচে কাউকে পাঠান তো। নরম জমি। যদি কোনও ছাপ-।

পুলিশের দুজন ডোম এসে সাদা কাপড় জড়িয়ে লাশ নিয়ে চলে গেল। ঘর ফাঁকা।

জগুমামা উবু হয়ে বসে মেঝে দেখছেন। পাশে আমরা ক'জন।

-মামা, দেয়ালটা দেখেছ? কালো-কালো টুকরো।

-হ্যাঁ। মিনার শরীরের অংশ।

একজন কনস্টেবল ঘরে ঢুকল।-স্যার, পেয়েছি।

-পায়ের ছাপ?

-হ্যাঁ, স্যার। আর এইটা। ঠিক নীচে পড়ে ছিল।

একটা আঙটা-লাগানো মোটা নাইলনের দড়ি। অনেকটা লম্বা।

দ্যাট মিন!স, এভরিথিং ক্লিয়ার হয়ে গেল। খুনি দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। গ্রিল সরিয়ে, কাচ টেনে সরিয়ে একসপ্লোসিভ চার্জ করেছে। কী বলিস জগু?

জগুমামা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন। ও.সি. মিনমিন করে বললেন,-স্যার, একটা কথা বলব? বাইরে স্যার এত লোকজন, এদের নিজস্ব সিকিওরিটি ফোর্স আছে...অচেনা লোক দেখলেই আটকে দেয়...সবার চোখ এড়িয়ে ক্রিমিন্যাল সন্ধেবেলা চারতলা পর্যন্ত দড়ি বেয়ে উঠে।...

তা ছাড়া, তার এক হাতে থাকছে মারাত্মক বিস্ফোরক। কী করে সে ফাঁকা একটা হাতের জোরে এতখানি উঁচুতে দড়িতে ঝুলে উঠবে?...গ্রিল ঠেলে সরাতে গেলেও যথেষ্ট জোর লাগে। শব্দ হবে। মিনা শুনতে পাবে না?

-যা ব্বাবা! তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না জগু। একবার বলছিস, মার্ডারার বাইরে থেকে উঠে এসেছে, আবার তার উলটো যুক্তি সাজাচ্ছিস।

-আমি কোনওটাই ফাইন্যাল বলছি না। সবরকম পসিবিলিটি পরপর ভেবে চলেছি। রাখছি। তিনটে পয়েন্ট। কীভাবে খুন হল, কেন খুন হল, কে খুন করল? নীচে চল!। গণেশ, ওর বাবা-কাকা, রিলেটিভ, নেবার, সকলের সঙ্গেই কথা বলতে হবে। ও.সি., আপনারা অ্যাস ইট ইস, ফ্ল্যাট সিল করে দিন। কাল সকালে আবার আসছি।

৪

ঠিক চারটে পঞ্চাশে আমাদের গেটে হর্ন বেজেছে। গাড়িতে উঠেছি। ড্রাইভার ছাড়া আরোহী তিনজন। জগুমামা, চম্পক ভট্টাচার্য আর আমি।

দু মিনিটের মধ্যে সল্ট লেক ছেড়ে বাইপাসে। এখনও এই পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে। পথে একটা কুকুরও চোখে পড়েনি।

অকার কমে আসছে। পুব আকাশে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে সাদা-সাদা রেখা, দুদিকের গাছে শোনা যাচ্ছে অল্প-অল্প কিচিরমিচির।

কাল রাতে ন্যাচারাল লাইট থেকে বেরোবার আগে জগুমামা পুরো কমপ্লেক্সে পুলিশ পোস্টিং করিয়ে এসেছেন। এমনকী গণেশ যে ফ্ল্যাটে রাত কাটিয়েছে, ওর বাবার সেই ফ্ল্যাটেও একজন সশস্ত্র কনস্টেবল থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগুমামার বক্তব্য, ওদের ফ্যামিলি এখন ক্রিমিন্যালদের টার্গেট, সিকিওরিটি প্রয়োজন।

কেস্টপুর এসে গেল। চারপাশ এখন অনেক ফর্সা। পাখিটাখিও ডাকছে, পথের পাশের ঝুপড়ি দোকানে উনুনের লালচে আভা। দু-চারজন পথচারী। সাঁ-সাঁ গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে এয়ারপোর্টের দিকে।

ভোরবেলার এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। এই সময়টুকুতে কোনও পাপ নেই। স্বচ্ছ জলের মতো টলটলে। এই আবছা আলো, এই শরীর জুড়োনো বাতাস প্রাণে শিহরন জাগিয়ে তোলে।

-জগু, কোথায় থামাব?

-মেন গেটের বাইরে। ও.সি. আছে তো?

-সিওর। প্রথমে কোথায় যাবি?

-গণেশ যেখানে আছে, সেখানে। ওর সঙ্গেই প্রথম কথা বলব। তারপর ভট!চায সাহেবের সঙ্গে।

-ভটচায কে?

-মিনাদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা।

গাড়ি থেকে নেমে হাঁটছি। কমপ্লেক্স ঢুকতেই কোত্থেকে চারটে লোক জুটে গেল। লম্বা-চওড়া চেহারা, ভাবলেশহীন মুখ। নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে।

মামা খুব নিচুগলায় বললেন,-ঘাবড়াস না। সাদা পোশাকের পুলিশ। খোঁচড়।

এ পর্যন্ত ন্যাচারাল লাইট-এর একজন বাসিন্দাকেও দেখতে পাইনি। "মর্নিং ওয়াক' করতেও কেউ বেরোয়নি। এখন বেশ আলো ফুটে গেছে। ভূতুড়ে বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে বহুতল অট্টালিকাগুলো।

ফোয়ারার সামনে দুজন মানুষ। একজন ও.সি.। চম্পকবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কিছু বললেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন।...

গণেশ এসে বসেছে আমাদের সামনে। এক রাত্রের মধ্যে ছেলেটার চেহারাই পালটে গেছে।

-সরি গণেশ। ঘুম থেকে তুলে তোমায় ডিস্টার্ব করছি। কাল তোমায় কখন ফোন করেছিল মিনা?

-ফোন-ফোন-কেয়া লাস্ট ফোন?

-লাস্ট ফোন! তোমায় মিনা দুবার ফোন করেছিল?

-নেহি, নেহি। একইবার। সরি সার, মেরা দিমাক কাম কোরছে না। হাঁ, ফোন কোরেছিল করিব সাড়ে পাঁচ বাজে।

-সত্যিই তোমার মাথা কাজ করছে না! সাড়ে পাঁচটায় আমরা পার্ক সার্কাসে।

গণেশ কয়েক সেকেন্ড ভাবল। বলল,-ওহি তো! হামরা কথা কোরে বাইরালাম। গাড়িতে উঠছি, ও ফোন কোরল।

-কী বলল?

-বোললো, একঠো বহো- বড়িয়া গিফট আসিয়েছে, কোই ভেজেছে, সেটো হামায় দিখাবে। জলদি চোলিয়ে আসতে বোললো। শি ওয়জ একসাইটেড।

-কে পাঠাল গিফট? তোমাদের কোনও রিলেটিভ?

-নেহি স্যার। কোই আননোন পার্সন। মিনার অ্যাডমায়ারার। কাল পেপারে ফোটো দেখে ইমপ্রেসড হোয়ে ভেজেছে।

-ঠিকানা পেল কোত্থেকে ?

-মিনা বোললো, ও আদমি একঠো খত ভি লিখা। উসমে লিখা কী পেপার হাউসসে পাতা মিলা।

-গিফটটা কী ছিল?

-হামায় বোলেনি। সারপ্রাইজ দিবে, বোললো। ফির হাম জলদি-জলদি আয়া, ফ্ল্যাট বন!ধ!। সবনে মিলকে দরওয়াজা তোড়া! দেখা মিনা...বাস! হায় ভগ!বান!

গণেশ ফুঁপিয়ে উঠল। তখনই বাবলুমামা ঘরে ঢুকলেন।

-সরি জগু, দেরি হয়ে গেল।

-নো প্রবলেম। বোস।...গণেশ, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন খবর পেয়েছেন? কাউকে দেখলাম না।

-স্যার, উলোগ কাটিহার রহনেওয়ালে হ্যায়। কাল রাতমে পিতাজিসে বাত হুয়া। আজ জরুর আ যায়েঙ্গে।

-দেন ইটস ওকে। আফটার অল ওদের মেয়ে। তা ছাড়া, ফ্ল্যাটটা ওরাই দিয়েছেন। মিনার নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে দেখলাম।

-জি স্যার।

চমকে উঠেছি।

-মিনা যে গাড়িটা ব্যবহার করত, সেটাও তো ওর বাপের বাড়ি থেকে দিয়েছে, তাই না?

গণেশ সংকুচিত হয়ে বলল,-হাঁ স্যার। ড্রাইভার অওর তেল হামি দিতাম।

-ড্রাইভার কোথায় থাকে? কটায় আসে?

-সাড়ে ন বাজে। লেকিন উসকো বারে মে অর কুছ মালুম নেহি। হামার আসার পহেলে সে চোলে গয়েছিল।

-ঠিক। গণেশ, আর-একটা প্রশ্ন। এই কমপ্লেক্সে কারও সঙ্গে তোমাদের ইন্টিমেসি ছিল না?

-হামি সুবহ নিকলে যাই, শামকে বাদ আসি। মিনার সোঙ্গে কিসি ফ্যামিলিকে সাথ ইন্টিমেসি থা। স্পেশালি ভট্টাচারিয়া সাবকে সাথ। হামাদের অপোজিট ফ্ল্যাট। এজেড পারসন, লার্নেড।

চম্পকবাবু অবাকচোখে তাকালেন।

-ওকে গণেশ, থ্যাঙ্কিয়ু।

-জি সার। স্যর, মেরা মোবাইল আপকা পাস হ্যায়।

-এহে, একদম ভুলে গেছি। কাল তোমার কন্ডিশন দেখে রেখেছিলাম। বাড়ি ফিরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।...

জগুমামা হনহন করে হাঁটছেন। যাচ্ছি মিনা বিজলানির ফ্ল্যাটবাড়ি।

-চম্পক দুটো ব্যাপার তোকে এনসিওর করতে হবে। প্রথম মেন গেটের সামনে পুলিশ পোস্টিং কর। যে-কোনও আউটসাইডার এলে তাকে জেরা করবে। যদি সন্তুষ্ট হয়, তবেই ছাড়বে। দ্বিতীয়, মিনা বিজলানির গাড়ির ড্রাইভার আজও নিশ্চয়ই ডিউটিতে আসবে। তাকে আইডেন্টিফাই করে ধরতে হবে। কোনওভাবে খবর পেয়ে গেলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।

ওকে জগু। কিন্তু একটা ব্যাপার আমায় বল তো গণেশ বলার আগেই তুই কী করে জানলি মিনার সঙ্গে ভট!চাযের ঘনিষ্ঠতা ছিল?

জগুমামার মুখে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন,-কিছু মনে করিস না ভাই, তোদের চোখ খুব উইক। কাল যখন আমরা মিনার ড্রইংরুমে, ওদের শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরে একগোছা ছবি পড়ে ছিল। মিনারই তোলা। সবচেয়ে ওপরের ছবিটা এক বৃদ্ধের ক্লোজ প্রোফাইল। ওই বৃদ্ধ কাল ওখানে হাজির ছিলেন। যখন সকলকে বেরিয়ে যেতে বলা হল, ভদ্রলোক ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলেন। নামার সময় সেই ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটে দেখলাম-টি. কে. ভট্টাচার্য। ব্যস!! অঙ্কটা পরিষ্কার। ঘনিষ্ঠতা না থাকলে মিনা যত্ন নিয়ে ওনার ফটো তুলবে কেন?

এই জন্যেই বলি, বিজ্ঞানী হয়েও তুই ডিটেকটিভের ঠাকুদ্দা!-বাবলুমামা বলে উঠলেন,-তবে তোর অন্য কাণ্ডজ্ঞান ঢিলে। কাল থেকে আজ পর্যন্ত চম্পকবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলি না!

সে সময়টা পাচ্ছি কোথায়! সরি। চম্পক আমার স্কুলের বু। এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার এস. পি.।...বাবলু আমার কলেজ-ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভালো নাম কৃষ্ণকুমার রাস্তোগি।...হ্যাঁ চম্পক, অবাক হোস না, ও অবাঙালি।

বলতে-বলতে আমরা এসে পড়েছি, টি. কে. ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাটের সামনে।

৫

-কে?

-আমরা।

দরজা ফাঁক হল, একটি অল্পবয়সি মেয়ের মুখ উঁকি দিল। চম্পক ভট্টাচার্য গম্ভীর গলায় বললেন,-মিস্টার ভট্টাচার্যকে ডেকে দিন। আমরা পুলিশ থেকে আসছি।

দাদু!-মেয়েটি দ্রুতপায়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে চলে গেল। আমরা ড্রইংরুমে ঢুকে পড়েছি।

জগুমামা বললেন,-বড়বাবু, আপনি ওদিকের ফ্ল্যাটটা খুলুন। একজন কনস্টেবলকে দিয়ে ঝাড়ু দিয়ে টুকরো-টাকরা সব গুছিয়ে একটা কাপড়ে মুড়ে ফেলুন। দেখবেন, একটা টুকরোও যেন এদিক-ওদিক না হয়।

ও.সি. বেরিয়ে গেলেন। কোণের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একমাথা সাদা চুল, সৌম্যদর্শন চেহারা। তাঁর মুখে ভয়ের ছায়া।

ভদ্রলোক কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,-ব-বলুন।

-বসুন আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। আপনার আপত্তি নেই তো?

-না-মানে-বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।

-তা বললে হয় না ভট!চার্য সায়েব! আপনার উলটোদিকের ফ্ল্যাটে খুন হয়েছে যে।

-আপনারা কী বলতে চাইছেন?

কিছুই এখনও চাইনি। আপনার পুরো নাম?

-তপনকুমার ভট্টাচার্য।

-পেশা? ব্যবসা?

-আজ্ঞে না। এল. আই. সি.-তে ছিলুম, জোনাল ম্যানেজার হয়ে তেরো বছর হল রিটায়ার করেছি।

-বেশ। মিনা বিজলানির সঙ্গে আপনার কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল?

-প্রতিবেশী হিসাবে যতটুকু থাকে।

-শুধু শুধু বাজে কথা কেন বলছেন তপনবাবু?

-মানে?

-মানে খুব পরিষ্কার। এই কমপ্লেক্সে আপনার সঙ্গেই মিনার ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

কে বলল? -তপনবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,-নিশ্চয়ই ওর হাজব্যান্ড? একটা ক্যালাস স্পাইনলেস টাইপ।

-মিস্টার ভট!চায ভুল করছেন।-জগুমামা বললেন,-ওর বলায় কিছু যায় আসে না। ওই ফ্ল্যাটে আপনার ছবি পেয়েছি।

ভদ্রলোক একটু চুপসে গেলেন। বললেন,-দেখুন, আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। আমি একজন সিনিয়র সিটিজেন।

-দাঁড়ান। সিনিয়র সিটিজেন তো কী হয়েছে? বয়স্ক মানুষেরা ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না? চট্টগ্রামের ইংরেজ কাঁপানো বিপ্লবী অনন্ত সিংহকে মনে আছে? লেজেন্ড! সেই অনন্ত সিং বৃদ্ধ বয়সে ধরা

পড়লেন ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে। কী মর্মান্তিক ব্যাপার! তদন্তে প্রমাণিত হল, অনন্ত সিং ডাকাতদের গ্যাং অপারেট করতেন।

তপন ভট্টাচার্য ধসে পড়লেন।

-আপনি কি তেমনি কিছু মিন করছেন? বিশ্বাস করুন-

-আমি কিছুই মিন করিনি। আপনি সত্য গোপন করছেন। সাপ্রেসন অব ফ্যাক্ট ইজ অলসো ক্রাইম। মিনা বিজলানি সম্পর্কে যা জানেন, স্পষ্ট করে বলুন। সেটাই ভালো হবে।

তপনবাবু থুতনিতে ভর দিয়ে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, প্রবল দোটানায় পড়েছেন। একটু পরে থেমে-থেমে বললেন,-এই ফ্ল্যাটে আমার নাতনি দীপা আর আমি থাকি। নাতনির সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়, তারপর আমার সঙ্গে। ও আমার নাতনির বয়সি। চম-কার, হাসিখুশি মেয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, খুব স্পিরিটেড, কিছু-না-কিছু করার জন্যে উ-সাহে টগবগ করছে। প্রচুর পড়াশোনা করত। ফোটোগ্রাফি ওর হবি। আমারও এক সময় একই হবি ছিল। সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। ওদের কাস্টে এইরকম মেয়ে আমি দেখিনি।

-আপনাকে কিছু বলেছিল? মানে কোনও থ্রেটনিং?

ভদ্রলোকের দৃষ্টি পালটে গেল। বললেন,-হ্যাঁ। বলেছিল। বলেছিল, ও ছবি তুলতে গিয়ে এমন কিছু জেনে ফেলেছে, যা নিয়ে হইচই পড়ে যাবে। হাজব্যান্ডকে ও রিলাই করে না। এ বিষয়ে সে বাবলুবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে নেকস!ট স্টেপ নেবে।

আমরা বাবলুমামার দিকে তাকালাম। এই যে, ইনিই বাবলুবাবু। ওর সঙ্গে এ কথা কবে হয়েছিল?

-দিন চারেক আগে।...তখন থ্রেটনিং-এর কথাও বলেছিল। উড়ো ফোনে কারা ওকে রেগুলার শাসাচ্ছে।

-আপনি কী বলেছিলেন?

-বলেছিলুম, ইমিডিয়েট পুলিশকে ইনফর্ম করো। শোনেনি।

-কাল সরে দিকে কোনও শব্দ পাননি? মারাত্মক কোনও এক্সপ্লোসিভে মিনার মৃত্যু হয়েছে।

-পেয়েছিলুম। সাড়ে সাতটা নাগাদ। ফ্ল্যাট খুলে বেরিয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই। মিনার ঘরের ভিতর থেকে জোরে মিউজিক বাজছিল। ভাবলুম, অন্য কোথাও কিছু হয়েছে।

-কাল সারাদিন আপনার সঙ্গে ওর কথা হয়নি?

-হ্যাঁ। সক্কাল-সক্কাল টাইমস অব ইন্ডিয়া নিয়ে ও ছুটে এসেছিল। ওর ফোটোগ্রাফ বেরিয়েছে। তারপর আবার সরে পর এসেছিল। আমি তখন ইভনিং ওয়াকে বেরিয়েছিলুম। দেখা হয়নি। দীপাকে একটা উপহার দেখিয়ে গেছিল। ওর ছবি দেখে কোনও ফ্যান ওকে পাঠিয়েছে।

একবার দীপাকে ডাকুন তো প্লিজ।

-দীপা, তুমি মিনার গিফটটা দেখেছিলে?

-হ্যাঁ। -কী ছিল?

-একটা ট্রান্সপ্যারেন্ট প্লাস্টিক ফোল্ডারের মধ্যে বিদেশি একটা ফোটোগ্রাফি ম্যাগাজিন। সাদা কাগজে তিন লাইনের একটা চিঠি। কোনও এক পি. গোলানি কনগ্র্যাটস জানিয়েছে।

-ব্যস?

-না। ওই সঙ্গে ছিল সিল করা একটা ছোট্ট পলিপ্যাক। ফোল্ডারের মধ্যে। ওপরে সেই গোলানি পেনে লিখেছে, ফর ইয়োর বেটার ফটোগ্রাফি।

-থ্যাঙ্কিউ দীপা। মিস্টার ভট্টাচার্য, চলি। কাইন্ডলি কো-অপারেট করুন। আমি ডক্টর মুখার্জি, বাবলুর বু। একজন বিজ্ঞানী হয়েও আমি ইনভলব হয়ে পড়েছি। আপনারই মতো মিনাকে একদিনেই খুব পছন্দ করে ফেলেছিলাম। আমরা চাই, মিনার খুনি ধরা পড়ুক।

ভদ্রলোক পাথরের মতো বসে রইলেন।

দরজা হাট করে খোলা। সেই অভিশপ্ত ফ্ল্যাট। তার ড্রইংরুম। ভাঙাচোরা ফার্নিচার। দেয়ালে, সিলিং-এ পোড়া-পোড়া দাগ। শুধু কালকের বীভ–স পরিবেশটা নেই। দগ্ধ মৃতদেহ

মামা বললেন,-গুড। সব সাফ হয়ে গেছে এর মধ্যে। আমাদের গাড়িতে পুঁটলিটা তুলে দেবেন।

জগুমামা করিডর পেরিয়ে ভিতরের প্রথম ঘরে ঢুকে গেলেন।

এটা বোধহয় গেস্টরুম। ছিমছাম। একটা সোফা-কাম-বেড, দুটো চেয়ার। ওয়াল ক্যাবিনেট।

দ্বিতীয় ঘর। মিনা-গণেশের বেডরুম। সুদৃশ্য নিচু ডিভানে টানটান করে চাদর পাতা। চাদরের ওপর ভাজ করা সাদা ওড়না। কাল সারাদিন এই খাটে কেউ শোয়নি। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত টানা কাচের বক্স জানলা। জানলার তাকে পাশাপাশি দুটো কাচের গেলাস, একটা রাইটিং প্যাড, পেনস্ট্যান্ড, কর্ডলেস টেলিফোন সেট। বেস রয়েছে, হ্যান্ডসেটটা নেই। দেওয়ালে ড্রেসিংটেবিল, সুদৃশ্য আয়না। কিছু প্রসাধনী, পারফিউমের শিশি। একপাশে ছোট কালার টিভি, অন্য ধারে স্টিল আলমারি। ডিভানের মাথার দিকে ফোটোফ্রেমে দু-তিনটে গণেশ-মিনার ফোটো। বিয়ের ছবিও রয়েছে।

জগুমামা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছেন। আলমারির হ্যান্ডেলে চাপ দিলেন। খুলল না। বিড়বিড় করলেন-প্যাকেট...ফোল্ডার..কিছুই তো...ও.সি.। মিনার মোবাইল সেটটা পেয়েছেন?

-না স্যার।

পাননি,- ওটা খুব দরকার। এখানকার ল্যানলাইন নম্বরটা নিয়ে নেবেন।...

রাইটিং প্যাডটা তুলে নিলেন। প্রথম দুটো পাতায় কিছু লেখা। একটানে পৃষ্ঠা দুটো ছিঁড়ে পকেটে পুরলেন।

এবার তৃতীয় ঘর। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন,-এই তো।

একটা ছোট ডিভানের ওপর পড়েছিল। ফোটোগ্রাফির ঝাঁ চকচকে বিদেশি ম্যাগাজিন। প্লাস্টিকের ফোল্ডার। ম্যাগাজিনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা সাদা কাগজ। এই তো অভিনন্দন বার্তা! মামা নিমেষে পকেটে পুরে ফেলে ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছেন।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা মিনার একান্ত নিজস্ব ঘর । সর্বত্র এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ফোটোগ্রাফি সংক্রান্ত জিনিসপত্র । ফিল্মের ফোটো, তিন-চাররকম লেন্স-অ্যাটাচমেন্ট, রঙিন সব মোড়ক, দুটো ফ্ল্যাশ, একটা ক্যামেরা, প্রচুর সিডি, ডাঁই করা ফোটোগ্রাফি ম্যাগাজিন। দুটো ছোট-ছোট স্টিল আলমারি। একটা হাট করে খোলা, অন্যটা ভেজানো।

জগুমামা ম্যাগাজিনটা ভরে ফেললেন ফোল্ডারে। আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ফোটোগ্রাফির সরঞ্জাম। একটা লেন্স-ক্যাপ বিছানায় পড়ে ছিল, পকেটে ভরলেন। ও.সি.-কে বললেন-এই লেন্স-অ্যাটাচমেন্টগুলো গুছিয়ে নিন। আমার সঙ্গে যাবে। হ্যাঁ, ফ্ল্যাশগানগুলো নিয়ে নেবেন।

ঘরের একধারে ওয়েস্টপেপার বিন। জগুমামা ঝুঁকে পড়লেন। ওই তো! ছোট পলিপ্যাক, ছিঁড়ে গেলেও ওপরের হাতে লেখাটা পড়া যাচ্ছে। পাশে একটা রঙিন মোড়ক। মামা পটাপট পকেটে ভরলেন।

টেবিলের ওপর একগোছা ফোটো, মোটা খাতা, একটা ডায়েরি, দুটো পেনসিল ব্যাটারি। জগুমামা খোলা আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আলমারি বোঝাই ফোটো। একটা র‍্যাকে হাল-আমলের সিডি, ফিল্মের স্ট্রিপ। মামা বারদুয়েক নেড়েচেড়ে দেখে পাশের ব আলমারির হ্যান্ডেল ঘোরালেন। খুলে গেল।

এই আলমারির তিনটে তাক ফোটো-অ্যালবামে বোঝাই। নানা সাইজের মাউন্ট বোর্ড। দু-তিনটে আঠার টিউব, ফেভিকল। ছুরি-কাঁচি। কালো কাগজের রোল। লকারে চাবি ঝুলছে। চাবি ঘুরিয়ে লকার খুলে ফেললেন মামা।

লকারের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তিন-চারটে পুরোনো ফিল্মের রোল। সিডির প্যাকেট । ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মামা সব বের করে আনলেন। একটা স্প্রে-র শিশি বেরিয়ে এল।

-মামা, এটা কী? সেন্ট?

-না রে। একধরনের বার্নিশ। ম্যাটফিনিশ প্রিন্ট ফোটোর ওপর স্প্রে করলে খুব ভালো লাগে।...বাবলু, একটা বড় পলিব্যাগ দে।...আপাতত কাজ শেষ।...চলুন।

আমরা ফ্ল্যাটের বাইরের প্যাসেজে এসে দাঁড়িয়েছি। জগুমামা বললেন,-ও.সি., পুলিশ ফোর্স একইরকম থাকবে। ভটচায এবং বিজলানি ফ্যামিলির ওপর স্ট্রং ওয়াচ রাখবেন। গণেশের কাছ থেকে মিনার মোবাইল নম্বর নিয়ে যা করণীয় করবেন। বুঝলেন?

-হ্যা সার।

-কবে পাচ্ছি?

- সরে মধ্যে।

-আরও একটা জরুরি কাজ আছে। আমাদের সঙ্গে চলুন। গণেশের মোবাইলটা আপনাকে দিয়ে দেব।

নীচে নামতেই চমকে উঠলাম। কী অবস্থা! সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, তিন-চারটে টিভি চ্যানেল, হইচই করছে। ওদের ওপরে যেতে দিতে হবে। ফ্ল্যাটের ছবি নেবে। পুলিশের অফিসাররা হিমসিম খাচ্ছেন।

জগুমামা হাত তুলে শান্ত করলেন,-দয়া করে শুনুন। যারা ইনসাইটে ছবি নিতে চান, ওয়ান-বাই-ওয়ান পুলিশের সঙ্গে ওপরে যান। এস. পি. নিজে পুরো ঘটনা আপনাদের জানাবেন।...

৬

এই যে শ্রীমান! তোমাকেই খুঁজছিলুম।

ঢুলুঢুলু চোখে বেসিনের দিকে এগোচ্ছিলাম, সামনেই অনন্ত সরখেল। সাত সকালেই হাজির।

ঘুম-টুম উড়ে গেল। কিন্তু এত সকালে কেন? কিছু খবর পেয়েছে? জগুমামাকেও দেখছি না। নিশ্চয়ই ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়েছেন।

মা চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুব মনোযোগ দিয়ে চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে কামড় দিচ্ছি। আড়চোখে দেখছি, অনন্তবাবু জুলজুল করে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

-কী হল, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন?

-তাকাব না? ছিঃ! একটা অনেস্ট কনসেসন কর, কাজটা ঠিক করোনি।

ক-কী? কনসেসন?...উফ!! বলুন কনফেসন। স্বীকারোক্তি।

একই হল গে। বেশি ইংরেজি ফলিও না! মানে বুঝলেই হল। নিজেরা অন্যায় করেছ, এখন আমার ভুল ধরছ। লজ্জা করে না?

খেয়েছে! আচমকা বুড়ো এমন চেঁচাতে শুরু করেছে, মা এখনই রান্নাঘর থেকে ছুটে আসবেন।

-আহা-হা, রাগছেন কেন? কী কনফেসন করব বলবেন তো।

-ন্যাকামি কোরো না তো! খবরের কাগজ পড়ে আমায় জানতে হল। কয়েকটা দিন আমার ইনটারাপসন ব ছিল, তার মধ্যেই এতসব ঘটে গেল। একটা ফোন পর্যন্ত পেলুম না!

আবার! ইনটারাকশনকে ইনটারাপসন। উত্তেজিত হলেই অনন্তবাবুর নিজস্ব ইংরেজি চালু হয়ে যায়। এখন হজম করা ছাড়া গতি নেই।

-কাগজে বেরিয়েছে বুঝি?

-বেরোবে না? অল পেপার হেডলাইন। তেঘরিয়ার আবাসনে হত্যাকাণ্ড। এস. পি.-র স্টেটমেন্টে তোমাদের নাম আছে। মেয়েটার ছবিটা দেখে চমকে উঠলুম। পয়লা মে এল।...আলাপ হল। আর সেই আমায় ডার্কে রেখে-

একমিনিট অনন্তবাবু-কথাটা তো শুনুন। হঠা– ব্যাপারটা ঘটে গেছে। তা ছাড়া, আপনি সহ্য করতে পারতেন না।

-কী সহ্য করতে পারতুম না? তোমাদের সঙ্গে কম মার্ডার কেস করিচি, অ্যাঁ!...একটা ফোন-

অনন্ত সরখেলের বাক্যস্রোত থামানো অসম্ভব হয়ে উঠত, যদি না মাঝপথে দরজায় বেল বাজত।

জগুমামা ঢুকলেন। আমি হাতে চাঁদ পেলাম। অনন্ত সরখেল একেবারে ভিজে বেড়াল! কে বলবে, এতক্ষণ এই লোকটাই একনাগাড়ে তড়পাচ্ছিল।

-অনন্তবাবু, ভালো? কখন এসেছেন?

-এহেঁ-হেঁ স্যার। একটু আগে।

-চা-টা খেয়েছেন? টুকলু আজ অফিস ছুটি নিয়েছিস তো? বেরোতে হবে।

-মামা। অনন্তবাবু অভিমান করেছেন। আমরা-

আঃ-আঃ টুকুল!-অনন্ত সরখেল হাঁ-হাঁ করে উঠলেন,-কী ফালতু বকছ? ওটা তোমার-আমার ব্যাপার! সতিË তোমার এখনও আক্কেল হল না।

আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা। জগুমামা বললেন,-ওসব বাদ দে। কাল আমি আর-একটা জিনিস পেয়েছি। কাজে লাগবে।

-কী?

-মিনার ড্রাইভার রাজিন্দরের মোবাইল।

-ওরও মোবাইল ছিল?

-হ্যাঁ। এটা নতুন কিছু নয়। আজকাল মোবাইল সবার কাছে। ড্রাইভারকে মোবাইল ফোন দিয়ে দেয়। দূরে থাকলে তখুনি ডেকে নেওয়া যায়।

-কাল সন্ধ্যাবেলায় তো ফোরেনসিক-পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দিয়ে গেল। কী বলছে?

-নতুন কিছু না! বিস্ফোরকের সাহায্যে মৃত্যু। আর.ডি.এক্স পাউডার কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু কীভাবে আর.ডি.এক্স. ভিকটিমের মুখের অত কাছে এল? ছুঁড়ে না মারলে...দেখা যাক।

-দুদিন ধরে কোথায়-কোথায় ঘুরছ?

কোথায়ই না ঘুরেছি!-জগুমামা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন,-আমার অবস্থা এখন "খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর'। রাজিন্দরের ম্যাডাম ছবি তুলতে যেসব জায়গায় গেছে, ওকে নিয়ে সেইসব স্পটে যাচ্ছি। তবে কাছাকাছি, যেমন ওদিকে বজবজ, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার; এদিকে মধ্যমগ্রাম, হাবড়া-অশোকনগর, ব্যারাকপুর পর্যন্ত যেতে পেরেছি। তারপরে আর যাওয়া হয়নি।

-এর চেয়েও দূরে যেতেন মিনাদেবী?

-নিশ্চয়ই। রাজিন্দরকে নিয়ে কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, কাকদ্বীপ পর্যন্ত।

-অদ্ভুত নেশা ছিল ভদ্রমহিলার!

-হ্যাঁ, অবসেসন। স্পট আর অবজেক্ট খুঁজে বেড়াত।

-এনি ক্লু?

-নাহ। জিরো।

-ড্রাইভার মিসগাইড করছে না তো?

-মনে হচ্ছে না। ছেলেটা সোজা-সরল, গোবেচারা গোছের। কাল নিজে থেকেই ও.সি.-কে ওর মোবাইল ফোন তুলে দিল। বলেছি যাবতীয় কল লিস্ট বের করতে।

-মিনা-গণেশের কল লিস্ট পেয়েছ?

-পেয়েছি।

-তপন ভট্টাচার্যের খবর কী?

-চম্পক কথা বলতে গেছিল। আমিও ফোন করেছিলাম। সবসময় ভয়েই মরছে লোকটা। -বলতে-বলতে মামা চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন,-ওর কীসের ভয় বল তো? নিশ্চয়ই কিছু গোপন করে যাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে, বেশি চাপ দেওয়াও যাচ্ছে না। সত্তরের ওপর বয়েস। যদি অসুস্থ-টসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন আরেক বিপদ! ভাবছি—

হঠা- মামার চোখ চকচক করে উঠল,-ইয়েস! কর্ডলেসটা দে।

পকেট থেকে ছোট ডায়েরি বের করে বোতাম টিপতে শুরু করলেন।

-হ্যালো। ও.সি.জে.বি মুখার্জি বলছি। ন্যাচারাল লাইট-এ সব ঠিক ? ...গুড। এবার আপনাদের একটা রিস্কি কাজ করতে হবে।...হ্যাঁ, ঠিক করে শুনুন। মিনার উলটোদিকের ফ্ল্যাটের সেই...বলতে-বলতে মামা খানিকটা চলে গেলেন, ওঁর গলার স্বর খাদে নেমে এল, কিছুই শুনতে পেলাম না।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে জগুমামা আবার এসে বসলেন।

-এতে যদি কাজ হয়।

-কী কাজ?

-যদি জানা যায়, ওর এত ভয় কীসের।

-পুলিশকে কী করতে বললে?

জগুমামা একটা সিগারেট ধরালেন। চেঁচিয়ে বললেন,-দিদি, চা। তিন কাপ।

মামাকে হাড়ে-হাড়ে চিনি। এই প্রশ্নের উত্তর এখন আর পাওয়া যাবে না। অতএব অন্য প্রসঙ্গে গেলাম,-মামা পুঁটলি বেঁধে ফ্ল্যাট থেকে সেদিন যেসব জিনিস নিয়ে এলে, তার মধ্যে কিছু?

-উঁহু! মোবাইল ফোনের ভাঙা কেস ওপরেই ছিল। মিনার ফোনটা বিস্ফোরণেই উড়ে গেছে।

-আর কিছু?

-প্লাস্টিকের ভাঙাচোরা টুকরো, টিভির কাচ, একটা প্লাস্টিকের ফিতের গলে যাওয়া অংশ...এইসব।

অনন্ত সরখেল বলে উঠলেন,-মেয়েটা ফটো-ফটো করেই গেল! আপনিও স্যার, ওকে এত তোল্লাই দিলেন।

-বাজে বকবেন না! এত সুন্দর ছবি তোলে, মামা তাকে এনকারেজ করবেন না?

-তার এই পরিণতি! হুঁ:। লেন্স বড় সাংঘাতিক জিনিস হে টুকলু, ঠিক আমাদের চোখের মতো। চোখের পাতা যেমন সময়মতো বুজে ফেলতে জানতে হয়, ক্যামেরার লেন্সও তেমনি। ক্যাপ লাগিয়ে নিতে হয়। মেয়েটা থামতে জানত না।

-বাব্বা! দার্শনিকের মতো জ্ঞান ঝাড়ছেন যে!

জগুমামা সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন,-কী ? কী বললেন? লেন্সক্যাপ? একটা তো পেয়েছি। কিন্তু-

-কিন্তু?

-কিন্তু ক্যামেরাটা কোথায়? ইস!-স!! আমি একটা ইডিয়ট!

-একটা ক্যামেরা নিয়ে এলে যে।

- সে তো ওলিম্পাস। মিনার আলমারিতে ছিল। কিন্তু যে লেন্সক্যাপটা পেয়েছি, সেটা-

মামা প্রায় ছুটে গেলেন। পুঁটলিটা এনে ফেললেন সেন্টার টেবিলে।

-দেখেছিস? এটা নিকরম্যাট ক্যামেরার!

পুঁটলি খুলে হাঁটকাতে লাগলেন।

-মামা, সাবধান! কাচে হাত কেটে যেতে পারে।

—যাক গে!-মামা বেপরোয়া,-প্লাস্টার লাগিয়ে নেব।

খুঁজতে-খুঁজতে পেয়ে গেছেন। একটা গলে যাওয়া প্লাস্টিকের টুকরোর গায়ে NIC তিনটে লেটার এখনও বোঝা যাচ্ছে।

—বুঝলি? বিস্ফোরণের সময় নিকরম্যাট ক্যামেরা মিনার সঙ্গেই ছিল। যেভাবে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়েছে, একটু দূরে থাকলেও কিছু অংশ অক্ষত থাকত। বুঝলি?

—জগুমামা পাগলাটে চোখে তাকিয়ে বললেন,- কী হল? বল! ওইসময় ক্যামেরা কেন ছিল মিনার সঙ্গে?

—হয়তো হাতেই ছিল। উনি ছবি তোলার তোড়জোড় করছিলেন। ঠিক সেইসময় আততায়ী এক্সপ্লোসিভ ছুঁড়ে মারল।

- একসেলেন্ট! দ্যাট মিন!স সেইসময় ক্যামেরা মিনার হাতে ছিল। কিন্তু আততায়ী ফ্ল্যাটে ঢুকছে কী করে?

-ওই যে লম্বা দড়ি। ওটা বেয়ে-

-অ্যাবসার্ড। ওটা রাখা হয়েছে মিসগাইড করার জন্যে। যদি এক্সপ্লাসিভ ছুঁড়ে না মারা হয়ে থাকে?

—তার মানে?

-মানে যদি ফটো তোলার সময়...

জগুমামা ঝপ করে থেমে গেলেন। আমি বারকয়েক জিগ্যেস করেও আর সাড়া পেলাম না।

এক-দেড়মিনিট কেটে গেল। তারপর নিজের সঙ্গেই কথা বললেন,-পাওয়া যাবে, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে...ভটচায...ক্যামেরা...।

তারপর বললেন,-অনন্তবাবু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যে কী উপকার করলেন, নিজেও জানেন না।

—হেঁ হেঁ। কী যে বলেন স্যার! স্যার, একটা রিকোয়েস্ট করব? আপনাদের সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবেন?

—চলুন না।

৭

রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে...

রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানার...

রাত্রির পথে পথে চলে কোন নিষেধ জানে না মানার।...

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার...

গমগম করে বাজছে হেমন্তর মায়াবি কণ্ঠ। মন্ত্রমুগ্ধ আমরা। জগুমামা অস্ফুটে বললেন,- কতকাল পরে শুনছি। এখনও শরীরে কাঁটা দেয়।

ঠিক বলেছিস।-বাবলুমামা বললেন,-এসব গান পুরোনো হয় না। হিন্দিতে তখন হেমন্তকুমার। নাগিন, বিশ সাল বাদ।

সুকান্তর কবিতা, সলিল চৌধুরীর সুর।-জগুমামা বললেন,-আমাদের ছোটবেলা। এই এফ.এম. চ্যানেলগুলো পুরোনো দিন ফিরিয়ে আনছে।

রেডিওতে তখন বাজছে—

...দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি...

এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি...

পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে গানটা। দুদিকে নিবিড় অকার। মাঝে-মাঝে আলোর ফোঁটা। তারায়-তারায় ভরা কালো আকাশ উপুড় হয়ে আছে। দুটো গাড়ি ছুটে চলেছে জাতীয় সড়ক এন.এইচ. ৩৪ দিয়ে। রাত প্রায় দশটা।

সামনের জিপসিতে চম্পক ভট্টাচার্য আর তাঁর পুলিশফোর্স। আছে মিনার ড্রাইভার রাজিন্দরও। এ গাড়িতে আমরা।

অপ্রত্যাশিত আলো নিয়ে এসেছে আজকের দিন। তদন্ত নতুন মোড় নিয়েছে।

সকালে ভবানী ভবনে ডি.আই.জি. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে মিটিং ছিল।

মিটিংয়ে জগুমামা ছিলেন প্রধান বক্তা। আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে, মামা বলছিলেন। অন্যদের মতামত নেওয়া হচ্ছিল।

একজন ডি.এস.পি. বললেন,-আমার মনে হয়, গিফটের ব্যাপারটা খুব ভাইটাল।

-হ্যাঁ। একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডারে সাদা কাগজে একপাতা চিঠি, ফোটোগ্রাফি ম্যাগাজিন আর...

—আর ছেঁড়া একটা পলিপ্যাক পাওয়া গেছিল ওয়েস্ট পেপার বিন থেকে। তপন ভটচাযের নাতনি দীপা বলেছিল, ওটাও প্লাস্টিক ফোল্ডারের মধ্যে ছিল। মার্কার পেনে লেখা ছিল "ফর ইয়োর বেটার ফোটোগ্রাফি'।

—ঠিক বলেছিস। মিনা গিফটটা প্যাকড অবস্থায় দেখিয়েছিল দীপাকে। কিন্তু কী ছিল ওই সাদা পলিপ্যাকের ভিতরে? সেটা কোথায় গেল?

-ওই ম্যাগাজিন বা চিঠির মধ্যে কোনও ক্লু-

ডি.এস.পি. সায়েবের কথা শেষ হয়নি। ও.সি. ফোটোগ্রাফি ঢুকে পড়লেন। মিনা বিজলানির ফ্ল্যাটের আলমারি থেকে যে ফিল্মের রোলগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো সদ্য ডেভেলাপ হয়ে এসেছে।

মোট তিনটে প্যাকেট। প্রথমটার অধিকাংশ ছবিই কালো। হয়তো ফিল্মে কোনও ডিফেকট ছিল। দ্বিতীয় প্যাকেটের ফিল্মগুলি সাম্প্রতিক কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানের। বিজলানি পরিবারের গণেশ, বাবা ইন্দ্রকুমার, কাকা রাজকুমার।

তৃতীয় প্যাকেট খুলতেই সকলে চমকে উঠেছে।

একটা রিসর্টের ছবি। ছোট-ছোট কটেজ-বাংলো,পার্ক-দোলনা, একদিকে বড় দিঘি। দু-তিনটে প্যাডেল-বোট বাঁধা। লোকজন।...একটা কটেজের ছবি, তার বাইরের দরজা। ভিতরের ছবি। আশ্চর্য! চার-পাঁচজন লোক কম্পিউটারের সামনে কাজ করছে। এটা কী? ফোটো জুড়ে বিরাট একটা টিভি স্ক্রিন। ক্লোজ-আপ শট। স্ক্রিনে নানারকম ডিজাইন। কীসের ডিজাইন? সব রেখাচি । কম্পিউটারে বানানো।...আরেকটা স্ক্রিন।...এরিয়াল ম্যাপ আকাশ থেকে তোলা? সবুজ-সবুজ অংশ গাছপালা....। লালচে-হলুদ জমির রং... সাদা-সাদা ফিতের মতো নদী... লম্বা কালো লাইন এঁকেবেঁকে গেছে। লাইনটার মাঝে-মাঝে ফাঁক। সেখানে লাল "তারা (*)...। ম্যাপটার নানান অ্যাঙ্গেলে অনেকগুলো ছবি।

দেখতে-দেখতে জগুমামার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

পার্থবাবু বিশেষ ছবিগুলো দেখেই বলে উঠেছেন,-এ তো ভয়ানক কাণ্ড!

তাই মনে হচ্ছে। জগুমামা থেকে-থেকে বললেন,-মিনার ড্রাইভার রাজিন্দর এখানে আছে তো? ওকে রিসর্টের ছবিগুলো দেখান। ও জায়গাটা চিনতে পারবে।

দাঁড়ান ডক্টর মুখার্জি-পার্থ চট্টোপাধ্যায় টেলিফানে তুলে বললেন,-কর্নেল "কিউ' পুরোহিত সায়েবকে ধরে দিন।...বুঝলেন, আর্মির লোকজনকে দেখালে তাঁরা আরও স্পেসিফিক বলতে পারবেন।

রাইট।-জগুমামা বলেছেন,-তবে বিষয়টা স্ট্রিকটলি কনফিডেন্সিয়াল। এখন কোনওভাবে বেরিয়ে গেলে পাখি পালিয়ে যাবে।

এরপর রাজিন্দরকে ডাকা হয়। সে একবার দেখেই চিনে ফেলল। ম্যাডামকে নিয়ে একবারই সে গিয়েছিল। জায়গাটা ছোটজাগুলিয়া, নদিয়া জেলায়। হাইওয়ের পাশেই। খুব সুন্দর স্পট। ম্যাডাম সেদিন সন্ধ্যে বেলা ফেরার সময় নাকি খুব উত্তেজিত ছিলেন। নিজে-নিজেই নানাকথা বলছিলেন।

তখনই ঠিক হয়েছে, আজ রাতেই আমাদের "অপারেশন ছোটজাগুলিয়া'।

এরপর গেছিলাম ফোর্ট উইলিয়াম। কর্নেল পুরোহিত ভয়ানক উত্তেজিত। কয়েকটি ডিজাইন ভারতের অত্যাধুনিক সমর অস্ত্রের। যার ইন্টারনাল ড্রইং কারও পাওয়ার কথাই নয়! ম্যাপটি বর্ডার এলাকার-আর্মি ড্রইং!

পুরোহিতকে জগুমামা কথা দিয়েছেন, অপরাধীদের আর্মির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এখন সেই অপারেশন...

মামা বললেন,-টুকলু, চম্পককে ধরে দে।

-হ্যালো, চম্পক? শোন, রাজিন্দরকে বলে রাখ, লোকেশানের অন্তত আধ কিলোমিটার আগে আমরা থামব। লোকালয় নেই, এমন জায়গায়।...ওকে।

একটু এগিয়ে সামনের গাড়িটা থেমে গেল।

হেডলাইটগুলো নিভে যেতে থইথই অকার। রাস্তার দুপাশে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছগুলো কালো-কালো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে। নিঝুম, নিথর চরাচর। একটানা ঝিঁঝিঁ, ব্যাঙের ডাক।

তারার ঝাপসা আলো চোখে সয়ে আসছে। জগুমামা চম্পকবাবুকে একদিকে নিয়ে গিয়ে কিছু বলছেন। রাজিন্দরকে ইশারায় ডেকে নিলেন। পাশ থেকে অনন্ত সরখেল বললেন,-কেমন লাগছে হে? তোমার তো আবার ভূতের ভয় আছে। ভয় পেলে বোলো। আমি আছি।

একটু পরে দেখলাম, সামনের গাড়ি থেকে পুলিশরা নেমে পড়ল। চম্পক ভট্টাচার্য, ও.সি., আর রাজিন্দর সামনে। ছায়ামূর্তির মিছিল।

বাবলুমামা বললেন,-আমরা যাব না?

-যাব। আগে ওরা কাছাকাছি পৌঁছে যাক। ওদের অন্তত: দশ মিনিট লাগবে।...অনন্তবাবু, আজ আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

-বলুন স্যার।

-আমরা গাড়ি নিয়ে রিসর্ট পর্যন্ত পৌঁছে যাব। এত রাতে ওরা অ্যালাউ করতে চাইবে না। আপনি নেমে গিয়ে রিকোয়েস্ট করবেন। বলবেন, আমরা জাস্ট রাতটুকু কাটাতে এসেছি।

-ত-তবু যদি ঢু-ঢুকতে না দেয় স্যার?

-কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন।...তার ফাঁকে পুলিশ ফোর্স ঢুকে পড়বে।

-স-স্যার, মা-মানে ওরা তো-

-হ্যাঁ, ওরা আর্মড। সেইজন্যেই তো আপনাকে বলছি। আপনার ঠান্ডা মাথা। মিষ্টি-মিষ্টি অভিনয় করে যাবেন। তবে কিছুতেই নার্ভাস হবেন না। বি স্টেডি । আমাদের সঙ্গে কত ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন ফেস করেছেন, এ তো-

নস্যি! কোই বাত নেহি স্যার! -মুহূর্তে অনন্ত সরখেলের চেহারা পালটে গেল। আমার দিকে দুবার ভুরু নাচিয়ে গটমট করে গাড়িতে উঠে পড়লেন। বললেন,-আসুন স্যার। ওরা এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন।

আমার মন খচ-খচ করতে লাগল। মামা আর লোক পেলেন না। শেষ অবধি ওনাকেই দিলেন রাজার পার্ট!

মিনিটদুয়েকের মধ্যে একটা পেট্রল পাম্প। তারপরেই মোরামের চওড়া পথ।

হেডলাইটের আলোয় পড়লাম, ফটকের মাথায় লেখা, "জয় হেলথ রিসর্টস'।

গ্রিল গেটের বাইরে ঘ্যাঁচ করে থামল আমাদের গাড়ি। ড্রাইভার হেডলাইটে সিগন্যাল দিচ্ছে। ডিপার-ডিমার-আলো বাড়ছে...কমছে। আমাদের এ.সি গাড়ির কাচ তোলা।

ভিতর থেকে একজন সিকিওরিটির উর্দি পরা লোক এসে একদিকের পাল্লা টেনে নিল। আরেকজন এসে পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দেখাচ্ছে।

মামা বললেন,-নেমে পড়ুন অনন্তবাবু। টুকলু, তুইও যা। খবর্দার, মাথা গরম করবি না।

অনন্ত সরখেল সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নামলেন। সঙ্গে আমি। আমাদের গাড়ির আলো নিভে গেছে।

-এই যে ভাই, কার সঙ্গে কথা বলব?

কী ব্যাপার?-দ্বিতীয়জন বলল।

-কী আর ব্যাপার! রাতে একটু থাকব। অনেক দূর থেকে এসিচি।

লোকটা আমাদের আপাদমস্তক দেখল। তারপর বলল,-হবে না! আমাদের অফিস ব হয়ে গেছে।

-লক্ষ্মী সোনা আমার! এমন করে না! কী এমন রাত হয়েছে, বলো! একটু ম্যানেজ করো না ভাই!

-বলছি তো, কিছু করা যাবে না। আপনারা চলে যান, কাল সকালে আসবেন।

-এমন করে না ভাইটি! কতদূর থেকে এসিচি। তোমাদের নাম শুনে, একটু দেখো। প্লিজ ভাই!

অনন্ত সরখেল কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন।

প্রথমজন দ্বিতীয়জনের কানে-কানে কিছু বলল। দ্বিতীয়জন ঘাড় নেড়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

বিরাট এলাকা জুড়ে রিসর্ট। উঁচু কাঁটাতারের পাঁচিল। ভিতরে মোরামের রাস্তা তিন-চারদিকে চলে গেছে। গেটের পাশেই সিকিওরিটি অফিস। একটা বিদেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, ছোট-ছোট একতলা বাংলো-প্যাটার্নের কটেজ। কটেজের বাইরে মিটমিটে আলো। ঘন গাছপালা, মাঝে-মাঝে বাগান। বাচ্চাদের দোলনা, সি-স, নাগরদোলা। পথের পাশে স্ট্রিটলাইট জ্বলছে।

আধমিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় সিকিওরিটির সঙ্গে জনাদুয়েক লোককে আসতে দেখা গেল। দুজন মুশকো চেহারার ষণ্ডামার্কা লোক।

-এই যে, যা বলার ভোলাদাকে বলুন।

লোকদুটোর চোখ ভাঁটার মতো লাল। খালি গা, লুঙ্গির কষি বাঁধছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওরা এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

-কী হয়েচ মোসই? কেন রাতবিরেতে এসে ক্যাচাল করছেন, অ্যাঁ?

ভোলাদা!-গলায় সমস্ত আকুতি ঢেলে অনন্তবাবু বললেন,- আমরা এসে পড়িচি। ওনাকে অ্যাত করে বললুম, একটু যদি আশ্রয় দেন-!

-ধুর শালা! বলল না, রিসর্ট ব হয়ে গেছে। যান, যান, অন্য জায়গা দেখুন! অ্যাই বলাই! তুই গেট খুললি কেন? তোকে বলিনি, সায়েবের অর্ডার, দশটার পরে যে-ই আসুক, খুলবি না?...যান, ফুটুন।

অনন্ত সরখেল তবু বলছেন ,-ভোলাদা! এমন করবেন না। রাতটুকু শুধু থাকতে দিন। ভোর হলেই চলে যাব।

ভোলার সঙ্গীর আরও তুরীয় অবস্থা। তেড়ে এল অনন্তবাবুর দিকে। জড়ানো গলায় হিসহিসিয়ে বলল,- অ্যাই বুড়ো! একদম হ্যাজাবে না! কোনও কথা নয়। কেটে পড়ো! অ্যাই ড্রাইভার! স্টার্ট দে, চল-হাট।

সঙ্গে-সঙ্গে সিকিওরিটির লোক দুজন লাঠির ঘা মারতে থাকে গাড়ির গায়ে।

জগুমামারা নেমে এসেছেন। মামা বললেন,-কী হচ্ছেটা কি? অসভ্যতা করছেন কেন?

-আরে ব্বাওয়া! তুমি কে হে চাঁদু? যা বলেছি, বেস করেছি। বেশি ভ্যাক-ভ্যাক করলে-

ঠাপ। ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল। পিছন থেকে দুটো লাঠি দড়াম! করে পড়ল ভোলাদের মাথায়। দুজনেই কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল।

সিকিওরিটি দুটোও সময় পেল না। জগুমামার দুই হাতের দুখানা সপাট রদ্দা এসে পড়েছে ওদের ঘাড়ে।

ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিত ঘটনা!

ঢিউস-ঢিউস...ঠংঠং...ঝনন-ন। পর-পর গুলি! গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন হয়ে গেছে টুকরো-টুকরো।

আ! -অস্ফুট আর্তনাদ। অনন্ত সরখেল ভূপতিত।

আমরাও শুয়ে পড়েছি। বুকের মধ্যে ধপ-ধপ। অনন্তবাবুর গায়ে গুলি লাগল? পড়ে গেলেন কেন?

কিন্তু কী এক সব জাদুমন্ত্রে থেমে গেল। আর কোনও গোলাগুলি নেই! সাড়াশব্দ নেই! কী হল?

দম আটকে শুয়ে আছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশের তীব্র হুইসল বেজে উঠল। জোরালো টর্চের আলো। চম্পকবাবুর গলা,-উঠে পড় জগু। সবকটাকে ধরে ফেলেছি।

—শিগগির টর্চ নিয়ে আয়।

অনন্ত সরখেল পড়ে আছেন। চম্পকবাবু টর্চ ফেলেছেন। মামা উবু হয়ে পালস দেখছেন।

শরীরের কোথাও বুলেটের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। রক্তের চিহ্ন নেই। বুক জোরে-জোরে ওঠানামা করছে। জগুমামা বললেন,-ড্রাইভার। জলের বোতলটা দাও।

চোখেমুখে বারকয়েক জলের ছিটে দিতেই শব্দ বেরোল।

-উঃ!

-কী হয়েছে অনন্তবাবু?

-ব্যথা-উঃ!

-কোথায়?

অনন্তবাবু ডানহাত ডান-কানের পাশে নিয়ে গেলেন। আমরা চমকে দেখলাম, কানের ওপরের বেশ কিছুটা চুল ঝলসে গেছে।

-জগুমামা বললেন,-বুলেট কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে।

৮

চম্পক, আমার কপালটা খারাপ।-জগুমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,-এমন সব ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ি, যেগুলো পিকিউলিয়র। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। মিনা মেয়েটা খুন হল। বাবলুর ক্যান্ডিডেট, তাই আমায় ঢুকতে হল। আর সেটা তদন্ত করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল এইসব ব্যাপার!

খারাপ কি বলছিস রে পাগলা?-চম্পক ভট্টাচার্য বললেন,-তুই আছিস বলেই তো অ্যাদ্দুর যাওয়া গেছে। তুই না থাকলে তো ও.সি. লেভেলেই সব ফুসফুস-ভুসভুস। অন্য গল্প সাজিয়ে ধামাচাপা দেওয়া হত।...ভাবাই যায় না, কী কাণ্ড হচ্ছিল ওখানে! কাকচক্ষুর আড়ালে ইন্টারন্যাশনাল স্পাইং। আমাদের

দেশের যা কিছু ডিফেন্স ইনফর্মেশন-ওয়ার স্ট্র্যাটিজি, ওয়েপন!স, বর্ডার ম্যাপ সব ইন্টারনেটে পাচার হয়ে যাচ্ছিল।...কোটি-কোটি ডলার ট্রান্সজাকশন।

ওরা মুখ খুলেছে?-বাবলুমামা বললেন।

মুখ খুলল কি না খুলল, কী এসে যায়!-চম্পকবাবু বললেন,-হাতেনাতে ধরা পড়েছে। চারজনের তিনজন পাকিস্তানি নাগরিক। নেপালের ভিসা ছিল। নর্থ বেঙ্গল দিয়ে ঢুকেছে। ঘরের মধ্যে প্রচুর আর্মস পাওয়া গেছে। ওদেরই একজন আমাদের চোখ এড়িয়ে আচমকা গুলি করেছিল।

—ওরা ওইসব ইনফর্মেশন পেত কীভাবে?

-বাবলুবাবু, আজকাল সব জায়গায় সর্ষের মধ্যে ভূত! আমি সিওর ডিফেন্সে ওদের এজেন্ট ছিল। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে ছবি তুলে আনত। এরা প্রত্যেকেই তুখোড় কম্পিউটার-ইঞ্জিনিয়ার। ওইসব ছবি থেকে কম্পিউটারের "ক্যাড' প্রোগ্রামের সাহায্যে এনলার্জ করে ডিজাইন করত। তারপর নেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিত। সেজন্য সম্পূর্ণ নিজস্ব সার্ভার-অ্যান্টেনা বসিয়েছিল কটেজের মাথায়! যাতে অন্য কেউ ডিকোড না করতে পারে।

—এরকম বসানো যায়?

—না। পারমিশন লাগে। সেটা পাওয়া অসম্ভব।

-তুই পার্থবাবুকে জানিয়েছিস?

-সিওর। কাল অপারেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছি। ডি.আই.জি. সায়েব একটু আগে ফোন করেছিলেন। বললেন, উনি দিল্লিতে জানিয়েছেন। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট উইথ হেল্প অব আর্মি হেডকোয়ার্টার অ্যান্ড সি.বি.আই. উইল ইনভেস্টিগেট। আমরা ওদের হাতে টোটাল ইনপুট তুলে দেব। আশা করছি, আজ ভোরের ফ্লাইটে ওরা এসে পড়বে। আমাদের দায়িত্ব শেষ।

দায়িত্ব শেষ কি মশাই?-বাবলুমামা উদ্বিগ্নগলায় বললেন,-এখনও তো মিনার খুনি ধরা পড়ল না!

-না-না, ওটা আলাদা । মিনা বিজলানির খুনের যেমন তদন্ত চলছে, চলবে। জগু আছে, খুনি ঠিক ধরা পড়বে। আমি বলছি, এই আই.এস.আই. চরদের নিয়ে আমাদের ফার্দার কিছু করার নেই।

আমরা এখন ভি.আই.পি. রোডে। কইখালির মোড়ে। গাড়িতে। সকাল সাতটা বেজে গেছে। চোখের ওপর দিয়ে কাল সারাটা রাত উড়ে গেল।

অপারেশন শেষ হওয়ার পর সব ব্যবস্থা করে ফিরতে-ফিরতে রাত ভোর। রিসর্ট থেকে বেরোবার ঠিক মুখে, ও.সি. ভূপেশবাবুর মোবাইলে একটা ফোন এল। ও.সি. জগুমামা আর চম্পকবাবুকে একদিকে ডেকে নিয়ে কিছু বললেন। তারপরে জিপসি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এর একটু পরে বাকিরা বেরিয়ে এসেছি। "জয় হেলথ রিসর্টস' থেকে। পুলিশ প্রহরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন অফিসারকে। ক্রিমিন্যালগুলোকে ওখানেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

-মামা, আর কতক্ষণ?

-এই তো। এসে পড়ছে।

-ব্যাপারটা কী? বলছ না কেন?

-আরে বাবা, দেখতেই পাবি।...চম্পক, অনন্তবাবু কেমন আছেন রে?

-ওকে। একটু আগে ড্যাফাডিল-এ ফোন করেছিলাম। বলল, ফার্স্ট এইড দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু মেন্টাল শক-এ ভদ্রলোক নর্মাল হতে পারছেন না।

জগুমামা চট করে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং অন্য প্রসঙ্গে যেতে হল।

না মামা, ক্রাইমের মোটিভ এখন ক্লিয়ার। ওই ফোটোগুলো মিনাদেবীর মৃত্যুর কারণ। তার মানে, রিসর্টের মালিক এই র‍্যাকেটে জড়িত। মালিককে অ্যারেস্ট করলে গোটা ব্যাপারটা জানা যাবে। আমরা সেটা করছি না কেন?

জগুমামা হেসে ফেললেন। বললেন,-হাতের কাছে পেলে তো ধরব। রিসর্টের অফিসিয়াল মালিক একজন এন.আর.আই। অনাবাসী ভারতীয়। লন্ডনে থাকেন। তিনি এসবের বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তাঁর অ্যাপয়েন্টেড কেয়ারটেকার পলাতক। তাকে ধরা যাচ্ছে না।

এইসময় আমাদের ক্রস করে সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশের জিপসি। ওসির সঙ্গে যে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন, তাকে দেখে চমকে উঠেছি।

তপনকুমার ভট্টাচার্য। মিনা বিজলানির নিকটতম প্রতিবেশী।

তপনবাবুর চোখ গর্তে বসে গেছে। উসকোখুসকো সাদা চুল, গালে না-কামানো সাদা-সাদা দাড়ির বিন্দু, অপরিচ্ছন্ন জামাপ্যান্ট। উদ!ভ্রান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা।

জগুমামা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নামলেন।

-কী ব্যাপার ডক্টর মুখার্জি?

-কী হয়েছে ভটচাযসায়েব?

-মানে আপনি কিছুই জানেন না? আমার এইরকম অবস্থার ঠাট্টা করছেন? আমার সঙ্গে পুলিশ এরকম করছে কেন? আমি কী অপরাধ করেছি?

-তপনবাবু, উত্তেজিত হবেন না। হ্যাঁ, আমি জানি, আপনার নাতনি দীপা নিখোঁজ। কাল সকালে দীপা কলেজে বেরিয়ে যায়। সে পার হয়ে যাওয়ার পরেও যখন সে ফেরে না, আপনি পুলিশকে জানান। পুলিশ

ডায়েরি নেয়। অলরেডি খোঁজখবর শুরু করেছে। ও.সি. তখন ছিলেন না। সেকেন্ড অফিসার কেস টেক আপ করেন। এর মধ্যে পুলিশের দোষটা কোথায়?

-কিন্তু তারপর সারা রাত কেটে গেছে। দীপার কোনও খোঁজ নেই! আপনি ভাবুন, অল্পবয়েসি মেয়ে...ওর বাবা-মা বাইরে...আমি একা বুড়ো মানুষ...পুলিশ কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না!

-কেন দেবে না? আপনি ভোরবেলা থানাকে ফের কমপ্লেন করতে থানা থেকে সঙ্গে-সঙ্গে ও.সি.-কে জানায়। ও.সি. একমুহূর্ত দেরি করেননি। নিজে আপনার ফ্ল্যাটে ছুটে গেছেন!

-হ্যাঁ, গেছে। কিন্তু গিয়ে বলল, আপনি কইখালিতে আছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এর মধ্যে আপনি, মানে আপনি কেন? আপনি কী করবেন? করবে তো পুলিশ!

-নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু যেহেতু মিনা বিজলানির খুনের তদন্তে আমি জড়িত, সেজন্যেই ও.সি. আপনাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। আমার মনে হয়েছে, ঘটনাগুলো ইন্টার-রিলেটেড।

-কী বলছেন? দীপাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?

আমরা চারজন নীরব দর্শক। জগুমামা নির্বিকার গলায় বললেন,-হতে পারে। তপনবাবু, আপনাকে প্রথম দিনেই বলেছিলাম, কোনওকিছু গোপন করবেন না। খুনিকে চিনিয়ে দিন।

-এসব কথা বলছেন কেন? খুনিকে আমি চিনি নাকি? যা জানি, সব বলেছি।

-নাহ! বলেননি। বরং আপনার নাতনি বলেছিল। এর দুটো কারণ হতে পারে। আপনি কোনওভাবে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। অথবা অযথা ভয় পাচ্ছেন। জীবনের ভয়।

তপন ভট্টাচার্য জ্বলন্ত চোখে জগুমামার দিকে তাকিয়ে আছেন। জগুমামারও নিষ্পলক দৃষ্টি। আস্তে আস্তে তপনবাবুর দৃষ্টির উত্তাপ নিভে এল, দুচোখের কোণ জলে ভরে গেল।

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললেন,-বিশ্বাস করুন, আমার সঙ্গে খুনের কোনও সম্পর্ক নেই...আমি মিনাকে খুবই পছন্দ করতাম...দীপা আমার একটাই নাতনি..এই বৃদ্ধের একমা অবলম্বন...ওর যদি কিছু হয়ে যায়...

-তপনবাবু দীপার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। ওকে ফেরত আনবই।...আপনি সেদিনের ঘটনার যেটুকু বলেননি সেটা এবার বলুন।

তপনবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর থেমে-থেমে ধরা গলায় বললেন, সেদিন সন্ধ্যেবেলা, সাড়ে ছ'টা-পৌনে সাতটা হবে, আমি ইভনিং ওয়াক করতে-করতে রেস্ট নিচ্ছিলুম কমপ্লেক্সের বাইরের সিমেন্টের বেদিতে। স্কুটারে চেপে একটা ইয়ং ছেলে এসে নামল গেটের মুখে। ওর হাতে একটা প্যাকেট।

বলল, এখানে মিনা বিজলানি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

-কেন ভাই?

-ওনার একটা গিফট আছে।

-কে পাঠিয়েছে?

-ওনার একজন অ্যাডমায়ারার।

আমি হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে বললুম, তুমি আমায় দিয়ে যেতে পারো। মিনা আমার নেক্সটডোর নেবার। আমি পৌঁছে দেব।

না স্যার। গিফ!টটা মিসেস বিজলানির হাতে দিতে হবে। আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। চলুন।

তারপর আমিই ওকে মিনার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলুম। ও প্যাকেটটা মিনাকে দিল। আমি মিনাকে কনগ্র্যাচুলেট করলুম। ছেলেটার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।...তার কিছু পরেই তো ভয়ানক কাণ্ড-আমি তখন ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছি।...ব্যস, এই পর্যন্ত আমি জানি। বিশ্বাস করুন।

তার মানে,-জগুমামার চোখ সরু হয়ে গেছে,-আপনি গিফ!ট প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছেন! খোলাখুলি বলুন, কী-কী ছিল ওর মধ্যে।

—প্যাকেটের মধ্যে? একটা ট্র্যান্সপ্যারেন্ট প্লাস্টিক ফোল্ডারের মধ্যে বিদেশি ফোটোগ্রাফির ম্যাগাজিন। সাদা কাগজে একটা তিন লাইনের হাতে লেখা চিঠি আর-একটা সিল করা ছোট পলিপ্যাক। যার ওপরে লেখা ছিল-

ফর ইয়োর বেটার ফোটোগ্রাফি।-জগুমামা উত্তেজিত হয়ে থামিয়ে দিলেন,-এই পর্যন্ত জানি। কিন্তু ওই সিল!ড পলিপ্যাকের ভিতরে কী ছিল?

-পলিপ্যাকের ভিতরে?...গিফ!ট ফোল্ডার আমার সামনে খোলেনি মিনা। সেটা বলাও যায় না। ওর মধ্যেই সিল!ড পলিপ্যাক ছিল। তবে বাইরে থেকে দেখে এবং হাতে ধরে মনে হয়েছিল হয়তো ওর মধ্যে ফিল্মের রোল আর ব্যাটারি আছে।

-ক-কী! ব্যাটারি?

তারপরেই ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন,-মিল গিয়া!

সবাই অবাক চোখে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

-কোনও চিন্তা করবেন না তপনবাবু। দীপা ভালো আছে। কাল রাতে ওকে রেসকিউ করা হয়েছে। আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে আছে। এখনই ওকে এখানে পাঠাচ্ছি না। যে-কোনও সময়ে ওর ওপর আবার অ্যাটেম্পট হতে পারে। আমি বলব আপনিও আজই এখান থেকে চলে গিয়ে কোথাও গা-ঢাকা দিন। খুনিদের বিশ্বাস নেই।

৯

পরপর দুরাত কখনও জেগে থাকিনি। আমি কাল দুপুরে তবু ঘণ্টাখানেক ঘুমোবার অবকাশ পেয়েছিলাম। জগুমামা সেটুকুও পাননি।

একটানা তিন ঘণ্টা জেরা যখন শেষ হল, তখন ভোর ছ'টা। জেরা চলছিল ভবানীভবনের এক বদ্ধ ঘরে, জোরালো আলোর নীচে। একবারে অন্তিমলগ্নে সে স্বীকার করেছে, মিনা বিজলানি হত্যাকাণ্ডের নাটের গুরু আজ সকালের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি যাচ্ছেন!

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি শিয়ালদা স্টেশনের দিকে। পুলিশের গাড়ি আমাদের স্টেশনে নামিয়েছে ঠিক ছ'টা পনেরোয়। দুমিনিট বাদে ট্রেন ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটতে-ছুটতে বাবলুমামা দাঁড়িয়ে গেলেন। রিজার্ভেশন চার্ট দেখছেন।

-কী হল? দাঁড়ালি কেন?

-চার্টে দেখে নিই কোন কম্পার্টমেন্টে আছে।

-তোর মাথা গেছে! সে কি নিজের নামে যাচ্ছে নাকি?...চল, চল! আমাদের একেবারে গোড়ার দিকে যেতে হবে। ইঞ্জিনের পরের ফার্স্ট কোচ।...অনন্তবাবু, চলুন, চলুন।

ট্রেন ফাঁকা। আমরা একটা জেনারেল কোচে বসতে-না-বসতে ছেড়ে দিল।

-মামা, খুঁজবে না?

-দাঁড়া, আগে পার্থবাবুকে বলে দিই। উনি রেলের বড়কর্তাদের আমাদের নামগুলো বলে রাখুন। ডব্লিউ-টি যাচ্ছি। ধরলে জেল অবধারিত। বাবলু ধরে দে তো।

তারপর গুটি-গুটি বাথরুমের কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট। এটাও বে-আইনি। ধরলে দুশো টাকা ফাইন।

—এসব কী করছ মামা?

—উফ! যা টেনশন।

—তাহলে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

-এখন আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে। সবে ছেড়েছে, সেটল হোক। যখন সিওর হবে, ওর পিছনে কেউ নেই, তখন গিয়ে ধরব।

-আমাদের কি সেই নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যেতে হবে নাকি?

-হতেও পারে।

-শেষটা বড্ড প্যাথেটিক হয়ে গেল রে জগু। আমি ভাবতেও পারছি না।

আমিও না। যে ছেলেটা নিজে গাড়ি চালিয়ে তোদের আমার কাছে নিয়ে এল, সে নিজেই মিনাকে খুন করিয়েছে, এ ভাবা যায় না!

একটু থেমে বললেন,-আসলে গণেশ ওর বউকে সত্যিই ভালোবাসত। বউয়ের ফটোগ্রাফি চর্চার তারিফ করত। কিন্তু মিনা যখন ওইরকম ছবি তুলে আনল রিসর্ট থেকে, এবং কথায়-কথায় বরকে গল্প করল, গণেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ড্রাইভারের কাছে জায়গাটার লোকেশন জেনে নিয়ে সে যখন ডেফিনিট হয়ে গেছে কী করবে? একদিকে বউ, অন্যদিকে পুরো ফ্যামিলি! ওদের মেইন সোর্স অফ মানি। মিনা যদি এইসব ফটো পুলিশের হাতে তুলে দেয়, তাহলে পুরো গুষ্টির যাবজ্জীবন অবধারিত।

-তুমি যে বললে রিসর্টের মালিক অনাবাসী ভারতীয়। লন্ডনে থাকেন।

-ঠিকই বলেছি। ভদ্রলোকের নাম অলখ আগরওয়াল। সত্যিই কিছু জানেন না। রিসর্টের দেখভাল করার জন্যে বন্ধু রাজকুমারকে বলেছিলেন কেয়ারটেকার-কাম-ম্যানেজার দেখে দিতে। বন্ধু দেখেশুনে তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোককে রিসর্টের কেয়ারটেকার করে বসিয়ে দিল। তারপর নিরিবিলিতে শুরু হল স্পাইংয়ের জঘন্য কাজ। কাল দুপুরে লন্ডনে ফোন করে আমি যখন আগরওয়ালকে থ্রেট করলাম, সরকার সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে, আপনাকে টেনে আনবে, তখন উনি ভয় পেলেন। রাজকুমারের নাম বললেন।

-ইনি কি সেই লোক, মিনার মৃত্যুর রাতে যিনি ফ্ল্যাটবাড়ির একতলায় দাঁড়িয়েছিলেন? খুব দুঃখ করছিলেন?

হ্যাঁ। গণেশের কাকা। অমায়িক, সজ্জন লোক বলেই এতকাল জানতাম। মুখোশের নীচে কী ভয়ংকর মুখ!

-কিন্তু মামা, মিনাকে যে প্রায় থ্রেট করত ফোনে?

-গণেশদের লোক। যখন দেখল, কাজ হচ্ছে না, মিনা গণেশকেও অ্যাভয়েড করছে, তখন ওরা ঠিক করল, মিনাকে পার্মানেন্টলি সরিয়ে দেবে। গণেশ স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে শেষ সুযোগ চাইল বাবা-কাকা-ভায়ের কাছে। ঠিক হল, গণেশ থাকার সময় ফোন আসবে। তাই এল। তবু মিনা অ্যাডামেন্ট। বাবলুর সঙ্গে কথা বলবে বলল। গণেশ তখন ফের বাবলুর সঙ্গে যোগাযোগ করল। সবটাই দুদিকে সামাল দিতে। বাবলু ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এল। ঠিক হল, আমরা পরদিন সকালে ফ্ল্যাটে যাব। মিনার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে বলব। ব্যস! ওদের সব গোলমাল হয়ে গেল। গণেশের কাছে আমার কথা আগেই শুনেছে। ওইদিনই আমার রেকমেন্ডশনে কাগজে মিনার ছবি বেরিয়েছে। আমার সামনে যদি সব বলে দেয় মিনা? সুতরাং আর দেরি করা যাবে না! মাস্টারপ্ল্যান আগেই রেডি ছিল।

-মাস্টার প্ল্যান!

—হ্যাঁ। ছবি তোলা ছিল মিনার অবসেশন। ঠিক করা ছিল, সেই অবসেশনকে কাজে লাগানো হবে। খুনের কোনও চিহ্ন থাকবে না! যে-কোনও ইনডোর ফটোগ্রাফিতে ফ্ল্যাশ লাগে। ফ্ল্যাশ জ্বালাতে পেনসিল ব্যাটারি দরকার। স্পাই নেটওয়ার্কের সাহায্যে এমন মৃত্যু-ব্যাটারি আনা হল, যার মধ্যে আর.ডি.এক্স. এক্সপ্লোসিভ রয়েছে। সেই ব্যাটারি পৌঁছে যাবে মিনার কাছে। হাতের কাছে নতুন ব্যাটারি পেয়ে ইনডোর ছবি তোলার সময় ক্যামেরার ফ্ল্যাশ-অ্যাটাচমেন্টে সেগুলোই ভরবে মিনা। ক্যামেরার শাটার "ক্লিক' করার সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলবে আলো এবং-

হবে বিস্ফোরণ! -বাবলুমামা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন,-তাই তুই কাল তপনবাবুকে জড়িয়ে ধরলি।

-হ্যাঁ। কীভাবে খুন হল মিনা? খুন হয়েছে। কিন্তু খুনি নেই! প্রথম অনন্তবাবু লেন্সক্যাপের উল্লেখ করতে একটু আলো পেলাম। বোঝা গেল, মৃত্যুর সময় ওর হাতে ক্যামেরা ছিল। তারপর তপনবাবু ব্যাটারির কথা বলতেই সবটা মিলে গেল। গোটা ষড়যন্ত্রটা নিখুঁত সাজানো হয়েছিল। সকালের কাগজে মিনার ছবি বেরিয়েছে। কাগজের অফিস থেকে ওর ঠিকানা নিয়ে কোনও গুণগ্রাহী ওকে গিফ!ট পাঠিয়েছে। খুব স্বাভাবিক একটা চিঠি, ম্যাগাজিন, ছোট সিল!ড প্যাকেটে ফিল্ম আর ব্যাটারি।...মিনা জোভিয়াল স্বভাবের মেয়ে। কাগজে প্রথম ছবি বেরোতে খুব এক্সাইটেড। প্যাকেট খুলে নতুন পাওয়া ফিল্ম লোড করে ফেলল তার নিকরম্যাট ক্যামেরায়। নতুন ব্যাটারি ঢোকাল ফ্ল্যাশে। ঠিক করে নিল, গণেশ ফিরলে তারই ফটো তুলবে। সেইমতো সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে-

-ফোন করল গণেশকে। তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলল।

-মোটেই নয়। গণেশ আমাদের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে ঘটনাটা বাবা-কাকাকে জানায়। তারা ইনস্ট্যান্ট একটা ছেলেকে পাঠায় গিফট দিয়ে। গিফট পৌঁছে যাবার সময় হিসেব করে গণেশ নিজেই ফোন করে মিনাকে। জানতে চায়, বাড়ি ফেরার পথে কিছু আনতে হবে কিনা। মিনা তখন উচ্ছ্বসিত। বলে, ফিরলে ওকে সারপ্রাইজ দেবে। তারপর সেট-সেটিং রেডি করে। কোথায় গণেশ দাঁড়াবে, ব্যাকগ্রাউন্ড কী হবে, কীভাবে ছবিটা নেবে। এরপর সব ফটোগ্রাফার যা করে থাকে, মিনা সেটাই করতে গেল। দু-তিনটে টেস্ট স্ন্যাপ নেওয়ার জন্যে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ লাগিয়ে শাটার টেপে! ব্যস!... ঘণ্টাদেড়েক পরে গণেশ ফের ফোন করে বাড়িতে। ফোন বেজে-বেজে কেটে যায়। গণেশ সিওর হয়ে যায়। গণেশের মোবাইলের কললিস্টে সময় এবং নম্বর স্টোর হয়ে আছে। তা ছাড়া-

বলতে-বলতে মামা বাইরে তাকিয়ে বললেন,-বাবলু! ট্রেন থেমে আছে কেন?

-কিছু না। মনে হচ্ছে সিগন্যাল পায়নি। তারপর?

-হ্যাঁ, তা ছাড়া সেইদিন সরে পর ড্রাইভার রাজিন্দরকে ফোন করে গণেশ নিজের অফিসে ডেকে নেয়। যাতে মিনা বাইরে না বেরোতে পারে। তবে ক্রিমিন্যাল যত সতর্কই থাক, ক্রাইমে কিছু-না-কিছু চিহ্ন থাকেই। যেমন লেন্স-ক্যাপ, ক্যামেরার টুকরো। তারপর ছেঁড়া পলিপ্যাক, সাক্ষী তপন ভট!চায। তপনবাবু অকারণ ভয় পেয়ে চুপ করে ছিল। আগে সব বলে দিলে আমার নির্দেশে দীপাকে লুকিয়ে রাখার বাজে কাজটা পুলিশকে করতে হত না।... গণেশরা আরও একটা মারাত্মক ভুল করেছিল। তাড়াহুড়োয় ওদের কোম্পানির ফোল্ডারে ভরেই পাঠিয়ে দিয়েছিল গিফ!ট। এককোণে ছোট্ট করে ছাপা ছিল "বিজলানি মোটরস'।

-গণেশ স্বীকার করে নেওয়ায় সুবিধেই হল।

-ওর না করে উপায় নেই। হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস রাজকুমারকে ধরার জন্যে ছুটে আসতে পারতাম না।

সামনে বর্ধমান জংশন আসছে। জগুমামা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,-বাবলু চল! তোকে লোকটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।

ট্রেনের গতির উলটোদিকে আমরা হাঁটছি।

জেনারেল কোচ শেষ হওয়ার পর স্লিপার ক্লাস। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লোকজন। বাবলুমামা তীক্ষ্ণচোখে দেখছেন।

প্রায় শেষপর্যন্ত এসে গেলাম। কোথাও নেই।

-নেই তো রে। উঠেছে তো?

-ওঠার তো কথা। এখনও এ.সি. ক্যুপগুলো বাকি আছে।

সামনের করিডোর লকড। আর যাওয়া যাবে না। মামা বললেন,-বর্ধমান আসতে দে।

দুদিকে শহর, লোকজন, প্ল্যাটফর্ম। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেমে গেল। বর্ধমান। চটপট নেমে জগুমামা পরের কালো কাচঢাকা কামরার দরজা খুলে ফেললেন।

একেবারে প্রথম কুপেতেই মুখোমুখি। প্রৌঢ় আধশোয়া হয়ে ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। পাশে জলের বোতল। ছোট্ট একটা হ্যান্ডব্যাগ। বাবলুমামা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

-আরে বাবলুজি! আপ?

-আপকে পাস হি তো আয়া হুঁ।

সাচ!!-রাজকুমার চোখ বড় করলেন,-মেরা খুশনসিব! বইঠিয়ে। আপকে দোস্ত মুখার্জিসাব হ্যায় না? বোলিয়ে, কেয়া সেওয়া কর সকতা হুঁ?

লোকটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুখের মাংসপেশি একটুও নড়ছে না। অদ্ভুত!

হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ওষুধ বের করে মুখে দিলেন। বললেন,-কেয়া চাহিয়ে আপকো?

-আমরা সব জেনে গেছি মিস্টার বিজলানি। আপনার ভাইপো গণেশ সব স্বীকার করেছে।

-সাচ! বড়া নাদান লেড়কা। জরুকা গুলাম। ছোড়িয়ে! আপলোগ আব কেয়া চাহাতে হ্যায়?

-আমাদের সঙ্গে চলুন।

জগুমামার হাতে এখন রিভলভার উঠে এসেছে।

হুঃ হুঃ-হুঃ-হুঃ!-খুক-খুক করে হেসে উঠলেন রাজকুমার। বললেন,-আপ সায়েন্টিস্ট, ইয়া পুলিশ?...হঠাইয়ে, মেরে সামনে সে পিস্তল হঠাইয়ে। মুঝে বহোৎ ডর হ্যায়।

-কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না মিস্টার বিজলানি। উঠুন! চলুন।

-অর নেহি গয়ে তো?

-জোর করতে বাধ্য হব।

আবার হেসে উঠলেন রাজকুমার বিজলানি।

-সিনাজোরি! ত!-ত!-ত!!...মুখার্জিসাব, আপ ইতনা বড়া আদমি হোকর ভি.....ইয়ে কেয়া হ্যায়, মালুম হ্যায় আপকো?

মুখটা একটু হাঁ করে জিভ বার করলেন রাজকুমার।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর সপাটে আছড়ে পড়ল মামার বাঁ-হাতের প্রচণ্ড ঘুসি।

ছিটকে পড়ল বিপুল শরীরটা। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

—টুকলু। কুইক! ক্যাপসুলটা ওই কোণে। তুলে নে।

পুরো ঘটনাটা ঘটে গেল দশ সেকেন্ডের মধ্যে।

ডেঞ্জারাস লোক সঙ্গে সায়ানাইড ক্যাপসুল ক্যারি করছিল!—জগুমামা হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—আর একটু হলেই হাতের বাইরে চলে যেত।

শারদীয়া ২০০৩

আলেকজান্ডারের আংটি

১

লন্ডনে এখন বিকেল। ডোরব্রিজ দিয়ে হিথরো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে এসে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম। কোনও বিমানবন্দর যে এত প্রকাণ্ড হতে পারে, ধারণাই ছিল না। চতুর্দিকে অজস্র টারমিনাল আর অ্যারাইভাল পয়েন্ট, ডানদিক-বাঁদিক সর্বত্র চলমান সিঁড়ি, রেস্তোরা, ডিউটি ফ্রি শপ, ফোন বুথ, হাজার-হাজার মানুষে গমগম করছে। কত দেশের মানুষ, ইয়ত্তা নেই। প্রতি সেকেন্ডে কোনও-না-কোনও বিমান উড়ছে-নামছে।

থাই এয়ারওয়েজের বিমান আমায় বারো ঘণ্টা অভিভূত করে রেখেছিল। যাকে বলে সত্যিকারের 'উড়োজাহাজ'। দোতলা। একেক তলায় কম করে চার-পাঁচশো যাত্রী। মাঝে-মাঝে হাঁটার জায়গা, টয়লেট, টিভি, ক্যান্টিন। মিনিটে-মিনিটে ক্লান্তিহীন বিমান সেবিকারা পানীয় বা খাবার দিতে চেয়েছে।

ঘোষণা হচ্ছিল। ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে ফ্লাইট ইনফরমেশন ও যাত্রীদের জন্যে নির্দেশ ভেসে উঠছিল। এমবার্কেশন ফর্ম ভর্তি করে পাসপোর্টসহ নির্দিষ্ট লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। লাগেজ ট্রলিতে মালপত্র।

দুটো লাইন। একটি ইউরোপ-আমেরিকার নাগরিকদের। বাকিটা পৃথিবীর অন্য সব দেশের। এখানেও তফাত!

হঠাৎ কে একজন ডাকলেন,—টুকলু?

চমকে ফিরে দেখি, চেনা মুখ। দু-একজনের পিছনেই। এক সেকেন্ড লাগল। তারপরেই বললাম,—আরে, সুনীলবাবু!

—যাক, চিনতে পেরেছ তাহলে।

—কী যে বলেন! বাংলাদেশে আপনাদের নিয়ে যা কাণ্ড হল। এর মধ্যে ভুলে যাব? তবে হ্যাঁ, একটু কনফিউশন ছিল। ইদার সুনীল আচার্য অর মেছবাউদ্দিন আমেদ।

—তা যা বলেছ। তবে মেছবা এখন দাড়ি ছোট করে ফেলেছে। তফাত বোঝা যায়।...তুমি একা? তোমার মামা, আই মিন ডক্টর মুখার্জি আসেননি? গ্রেট ম্যান। উনি না থাকলে আমায় চলে-ফিরে বেড়াতে হত না।

—মামা এখন জার্মানিতে। সায়ান্স কনফারেন্সে। শেষ হলে এখানে চলে আসার কথা। আর আমার আসাটা 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া'। টিভিতে একটা ক্যুইজ কনটেস্ট হচ্ছিল। মোবাইল থেকে এস.এম.এস করে উত্তর পাঠিয়েছিলাম। দেখি লটারিতে নাম উঠেছে। পনেরো দিনের কনটিনেন্ট ট্যুর প্যাকেজ ছিল। আমি চেঞ্জ করে কলকাতা-লন্ডন-কলকাতা নিলাম।

—কেন গো? সুযোগটা ছাড়লে কেন? নিখরচায় ইওরোপ মহাদেশ দেখা হয়ে যেত।

—হ্যাঁ, সেটা মন্দ হত না। তবে এখানে আমার ন'মাসি থাকেন। মাসতুতো দাদার আবার বিয়ে তিন দিন পরে। ওদের ওখানেই থাকব।...

—ও। মজার ব্যাপার হল, আমার এদেশে আসাটাও অনেকটা তোমার মতো। লন্ডনের টেগোর সেন্টারে ভারত থেকে প্রতি বছর বিশিষ্ট মানুষরা এসে বক্তৃতা দিয়ে যান। টেগোর সেন্টার টিকিট পাঠায়, হসপিটালিটি দেয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওই দলে এবার ম্যানেজ করে নিয়েছি। নিজের পয়সায় তো ফরেন ট্যুর করা বেশ কঠিন।

যা বলেছেন।—আমি হেসে বললাম,—থাকছেন কোথায়? কোন হোটেলে?

সুনীল আচার্য বললেন,—টেগোর সেন্টারের নিজস্ব গেস্ট হাউস আছে। পরশু থেকে সেখানে থাকব। আজ-কাল থাকব বন্ধুর কাছে। ওর নিতে আসার কথা। বাইরে থাকবে।

আমাদের পাসপোর্ট এনডোর্স হয়ে গেছে। কথা বলতে-বলতে আমরা চলে এসেছি লাউঞ্জের শেষপ্রান্তে। কাচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সারি-সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

—তুমি কীভাবে যাবে? মাসি-মেসো আসবেন?

—আসতে চেয়েছিলেন। আমিই বলেছি, চলে যাব। ১৪০ নম্বর বাসে হ্যারো-উইল্ডস্টোন গ্যারাজ, লাস্ট পয়েন্ট। ওখানে পৌঁছে ফোন করলে মেসো নিয়ে যাবেন।

লাগেজ ট্রলি নিয়ে বাইরে বেরোতেই প্রচণ্ড ঠান্ডার কামড়! হাড় অব্দি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। শনশন হাওয়া। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ স্লেটের মতো কালো।

নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে। লন্ডনের আবহাওয়ার খেয়ালখুশির কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু শোনা আর দেখায় যে আকাশপাতাল তফাত।

সুনীলবাবুর বন্ধু এসে গেছেন। লম্বা-চওড়া মানুষ। হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ওভারকোট। দুজনে কোলাকুলি হল। তারপর সুনীলবাবু বললেন,—বিক্রম, মিট অর্ণব। তোমায় বাংলাদেশের এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? ওদের জন্যেই বেঁচে ফিরেছি।

বিক্রমবাবু একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন,—দিস ইস বিক্রম পুরোহিত। প্ল্যাড টু মিট য়ু।

ভদ্রলোকের গলা শুনে চমকে উঠেছি। অতবড় পুরুষালি শরীর থেকে বেরুচ্ছে লতা মঙ্গেশকরের গলা! চোখ বুঁজে শুনলে কেউ পুরুষ বলে বিশ্বাসই করবে না।

সুনীল বললেন,—বিক্রমের বউ বাঙালি। ও নিজেও কলকাতা থেকে কম্পিউটার কোর্স করেছে। ওদের দেশ পাঞ্জাবে, আরও স্পেসিফিক্যালি পাকিস্তান-পাঞ্জাবে। পার্টিশনের পর অমৃতসরে সেটল করে।...বিক্রম, তোমার বাড়ির নম্বরটা অর্ণবকে লিখে দাও। টুকলু, তোমার মাসিবাড়ির নম্বরটা আমায় দাও। ফোনে যোগাযোগ হবে।

বৃষ্টি সমানে হচ্ছে। বাতাসও একইরকম। হাওয়ার দাপটে দু-একটা ফোঁটা উড়ে এসে মুখে পড়ছে, শিউরে উঠছি। ছুরির মতো ধারালো ঠান্ডা, মনে হচ্ছে গর্ত হয়ে যাবে।

বিক্রম বললেন,—আপনি যাবেন কোথায়? কীভাবে?

আমি বললাম। উনি বললেন,—ভুল করেছেন। আপনি একা, এতবড় ব্যাগেজ। প্রথমবার এসেছেন! কাউকে আসতে বলা উচিত ছিল। হ্যারো বেশ দূর। এইরকম ওয়েদার, বাসে কখন পৌঁছবেন, ঠিক নেই। তার চেয়ে...প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, ক্যান য়ু অ্যাফোর্ড থার্টি পাউন্ডস? দেন আই ক্যান কল আ প্রাইভেট ক্যাব।

আমার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা! তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়লাম। বিক্রম রাস্তার ওপারে গেলেন।

ও কাকার সঙ্গে থাকে।—সুনীলবাবু বললেন,—কাকা প্রায় বত্রিশ বছর এদেশে। পণ্ডিত লোক। বিয়েথা করেননি। ভাইপোকে অসম্ভব ভালোবাসেন।

—বাবা-মা?

—বাকি সকলে দেশে। অমৃতসরে ওদের বেশ চকমিলানো কোঠি। রেগুলার যাতায়াত আছে। এই তো, বিক্রম বলেছিল, কাকা বোধহয় আজ সকালের ফ্লাইটে দেশে গেছেন।

প্রাইভেট ক্যাব নিয়ে এসে গেছেন বিক্রম। ছ'ফুট নিগ্রো ড্রাইভার। বেড়ালছানাকে ঘেঁটি ধরে তোলার মতো অবলীলায় ঢাউস লাগেজগুলো ডিকিতে ঢুকিয়ে নিল। আমি ওদের 'বা-ই' করে, জীবনে প্রথমবার ইষ্টনাম জপ করে চেপে বসলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেন্ট্রাল লন্ডন পেরিয়ে এসে পড়লাম খোলামেলা এলাকায়। তারপর দু-পাশে লন্ডনের বিখ্যাত কান্ট্রিসাইড। ছবির মতো ফার্ম হাউস-বাংলো-গমের খেত, মাঝে-মাঝে রাস্পবেরি-চেরি গাছ। দু-চোখ ভরে দেখছি। তবে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছি না। ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে তো?

আমাদের এক বন্ধু আমেরিকায় স্মাগলারের পাল্লায় পড়েছিল। নির্জন মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে সব ডলার কেড়ে নিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পর আবার একটু শহর-শহর অঞ্চল। ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলাম,—ইস দিস হ্যারো?

—নোও। দিস ইস উইম্বলে পার্ক।

গাড়ির মধ্যে রেডিওতে রুট ডাইরেকশন দেওয়া হচ্ছে। বিট্রিশ উচ্চারণ, অর্ধেক বুঝছি না।

একটু পরে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তার দু-ধারে বড়-বড় দোকান। দু-একটা ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানি রেস্তোরাঁ। সাইনবোর্ডের নীচে লেখা 'সাউথ হ্যারো'। একটু সাহস এল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে এল। বাঁদিকে মস্তবড় শেড। সারি-সারি বাস দাঁড়ানো। বাসগুলোর সামনে নম্বর ১৪০। যাক! হ্যারো-উইল্ডস্টোন এসে গেছি। ক্যাব থেমে গেল। ব্ল্যাক ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়াল,—গেট ডাউন প্লিজ।

কিন্তু কোথায় মেসো? কোথায় গাড়ি? আমি বললাম,—প্লিজ ওয়েট। আই'ল জাস্ট মেক আ কল।

রাস্তার ওপারে টেলিফোন বুথ। টেলিফোন কার্ড পাঞ্চ করে বোতাম টিপলাম। রিং হচ্ছে।...নো রিপ্লাই। বেজে-বেজে কেটে গেল।

শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ স্রোত নেমে গেল। এর মানে, বাড়িতে মাসি-মেসো কেউ নেই।

রাস্তার ওপার থেকে ভ্রু কুঁচকে ক্যাব-ড্রাইভার আমায় ডাকছে। ব্যাগেজ নামিয়ে দিয়েছে রাস্তায়।

আর কিছু করার নেই! এবার একা অপেক্ষা করতে হবে। আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘ কেটে গেছে। নীল আকাশ। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামছে। হাড়হিম শ্মশানের হাওয়া বইছে।

কপালে যা আছে হবে! ড্রাইভারকে টিপসসহ বত্রিশ পাউন্ড দিয়ে দিলাম। ও সাঁ করে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল।

দু-একজন লোক এখনও ফুটপাত দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে। প্রত্যেককেই মনে হচ্ছে, খারাপ লোক।

ঢাউস ব্যাগটা টানতে-টানতে একটু পিছিয়ে এলাম ১৪০ নম্বরের গ্যারাজের কাছে। হিথরো ফিরে যাব?

পাশে একটা ইরানি গ্রসারি শপ-কাম-ফোন বুথ। জিগ্যেস করলাম,—ডু ইউ নো বরোডেল অ্যাভিনিউ?

দুই মহিলা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর দুদিকে মাথা নাড়ল।

না:! আর ঝুঁকি নেব না। হিথরো যাওয়ার লাস্ট বাস পনেরো মিনিট পরে ছেড়ে যাবে। এয়ারপোর্টেই থেকে যাব। এবারও ফোন বেজে-বেজে কেটে গেল। নো চান্স।

দোকান থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছি। এখন আর শীতের অনুভূতি হচ্ছে না। ঘামছি।

হঠাৎ চোখে পড়ল, ওপারের রাস্তার জংশনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে এক মহিলা। উনিও চারিদিকে দেখছেন! ন'মাসি?

আমি এপার থেকে হাত নাড়ছি আর তারস্বরে বাংলায় চেঁচাচ্ছি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা দেখতে পেয়েছেন! গাড়ি টার্ন নিয়ে এপারে চলে এল।

আমি ছুটে গিয়ে গাড়ির কাছে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে মাসি বেরিয়ে এলেন,—টুকলু! মাথায় জবরজং টুপি পরে আছিস। চিনতেই পারিনি। আধঘণ্টা এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। লাগেজগুলো তুলতে-তুলতে বললাম,—তোমার ফোনটা বেজে যাচ্ছে। আজ আমি মরে যাচ্ছিলাম টেনশনে।

ন'মাসি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—স্যরি টুকলু! রিল্যাক্স। আমাদেরই ভুল হয়েছে। মোবাইল নম্বরগুলো তোকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তোর মেসোকে হঠাৎ ছুটতে হল হিথরোতে। বুবলাই অফিসে, বাড়িতে কেউ নেই।

—কেন? আমি তো বলে দিয়েছিলাম, যেতে হবে না। এই পর্যন্ত চলে আসব।

—তোর জন্যে নয় রে বাবা। ঘণ্টাতিনেক আগে জগু জার্মানি থেকে ফোন করল, বার্লিনের সেমিনার শেষ। এক সায়ান্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে দুটোর ফ্লাইটে আসছে। ব্যস! বিখ্যাত শালাকে আনতে জামাইবাবু ছুটলেন।

—জগুমামা!

সব কষ্ট ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

২

হু-হু করে হাওয়া বইছে। বাগানে শাল মুড়ি দিয়ে জগুমামার পাশে আমি। মামার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এখানে বাড়ির মধ্যে 'নো স্মোকিং'।

—আকাশ কেমন চকচকে নীল দেখেছ? ঠিক যেন ফ্লুরোসেন্ট কালার। এরকম নীল কোথাও দেখিনি।

—দেখবি কী করে? এখানে যে পলিউশনের ছিটেফোঁটাও নেই। ওই দ্যাখ, অত উঁচুতে প্লেনগুলো যাচ্ছে, পিছনে জেটের সাদা ধোঁয়া। মনে হচ্ছে নীলরঙের পাতায় সাদা পেনসিল দিয়ে কেউ দাগ টেনেছে।

সক্কাল থেকে মামা-ভাগ্নে কী বকবক শুরু করলে?—মেসো কাচের স্লাইডিং-ডোর টেনে বাগানে ঢুকলেন।

ওকে বলছিলাম, এদেশে স্বাস্থ্য আছে, জীবন আছে, টাকা আছে। কিন্তু প্রাণ নেই।—মামা একগাল হাসলেন।

—হোয়াট? হোয়াট ডু য়ু মিন টু সে?

বুঝলেন না?—মামা গোবেচারার মতো মুখ করলেন। মুখ টিপে হেসে বললেন,—এতদিন এ দেশে কাটিয়েও সারমর্মটা বোঝেননি? হায়! এখানকার জীবন ঘড়ির কাঁটা মেপে চলে। ডিসিপ্লিন, ফর্মালিটি ঝুড়ি-ঝুড়ি। ইচ্ছে করলেও স্লিপিং সুট পরে বাড়ির বাইরে পা দিতে পারবেন না। জোরে চেঁচাতে কিংবা হো-হো করে হাসতে পারবেন না। পারবেন, বলুন? কথায়-কথায় বলতে হবে 'স্যরি', 'থ্যাঙ্কিউ'। একেবারে শিকলে বাঁধা। অথচ এখানে ফ্রেশ এয়ার, ফ্রেশ ফুড, প্রচুর টাকা, হেলদি লং লাইফ। কিন্তু ওয়ার্মথ কোথায়? কোথায় প্রাণ?

মেসো একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,—কী করব জগু! তুমি তো জানো, আমি দেশেই থেকে যেতে চেয়েছিলুম। সব বেচেবুচে চলেই গেছলুম। কিন্তু পারলুম না তো! যাকগে, ওসব ছাড়ো। পরশু বুবলাইয়ের বিয়ে। ওদিনই হ্যারোর কমিউনিটি হলে রিসেপশন। দেশ থেকে তুমি আর টুকলুই আসতে পেরেছ। আর তুমি হলে গিয়ে মামা। তুমিই বরকর্তা, বুঝেছ!

—আমি? আমি তো কাউকে চিনি না।

—চেনার কোনও ব্যাপার নেই। নো নিড। তুমি শুধু বুবলাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে, রেজিস্ট্রেশন পেপারে —

মেসোর কথা শেষ হল না। ড্রইংরুমের টেলিফোন বেজে উঠল। মেসো 'ওয়ান মিনিট' বলে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

পরক্ষণেই তাঁর ডাক,—জগু, ইয়োর টেলিফোন। ডক্টর জন শেফার্ড।

মামা ফোনে 'ইয়েস' 'ওকে' 'অ্যাট ফোর' 'বাই' পরপর বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—ডক্টর শেফার্ড ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। নামকরা বিজ্ঞানী। ওর সঙ্গেই কাল জার্মানি থেকে ফিরেছি। আমার অনেকদিনের বন্ধু। আজ বিকেলে ওর অফিসে চায়ের নেমন্তন্ন। যাবি তো?

মেসো সঙ্গে-সঙ্গে উৎসাহিত গলায় বললেন,—ডক্টর শেফার্ডকেও ইনভাইট করো না পরশুদিনের পার্টিতে। সায়েবরা ইন্ডিয়ান ম্যারেজ পার্টি খুব এনজয় করে। আমাদের হ্যারো রোটারির অনেক সায়েব থাকবে।

মামা বললেন,—একটা কার্ড দিয়ে দেবেন। আচ্ছা চক্রবর্তীদা, বুবলাইকে দেখছি না যে! কাল রাতে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেল। আর ফেরেনি?

মেসো হেসে বললেন,—ও। তোমাদের বলা হয়নি, শ্রীমান একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। এই হ্যারোতে, টেন মিনিটস ওয়াকিং ডিসট্যান্স। মাসতিনেক উনি ওখানেই থাকছেন! সকালে নিজে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে খায়, দুপুরে অফিসে লাঞ্চ। রাতে অবশ্য মায়ের হাতের রান্না না হলে চলে না।

বললাম,—কেন মেসো? আলাদা থাকে কেন? আপনাদের এত সুন্দর বাড়ি, এতগুলো ঘর—আপনারা তো মোটে দুটো প্রাণী।

জগুমামা জবাব দিলেন,—এসব বুঝবি না রে। এটাই এদেশের কালচার। আঠারো বছর বয়েসের পর কোনও ছেলেমেয়েই বাপ-মা'র সঙ্গে থাকে না। উইক এন্ডে এসে দেখা করে যায়। বুবলাইয়ের শরীরে ভারতীয় রক্ত। তাই এত বড় পর্যন্ত একসঙ্গে থেকেছে, এখনও রোজ রাতে আসছে। মা-বাবার প্রতি অ্যাটাচমেন্ট আছে।

—ঠিক বলেছ! প্র্যাকটিক্যালি আমি আর তোমার ন'দিদি জোর করে ওকে দিয়ে ফ্ল্যাট কিনিয়েছি। ব্যাটা জন্মেছে এদেশে। এদিকে সর্বক্ষণ ভারত-ভারত করে হেদিয়ে মরছে। মাঝে যখন ইন্ডিয়া ট্যুর করতে গেল, ওর চিঠিপত্র পড়ে—

আবার ফোন বেজে উঠল। মেসো তুললেন,—হ্যালোউ, চাক স্পিকিং। ওকে, প্লিজ হোল্ড অন।...টুকলু, তোমার ফোন।

—আমার?...হ্যালো।

—গুডমর্নিং অর্ণব। আমি সুনীল আচার্য বলছি। কাল ঠিকঠাক পৌঁছেছিলে ?

—হ্যাঁ। জগুমামাও এসে পড়েছেন।

—তাই নাকি?...ফাইন। কখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে?...এক কাজ করো, তোমরা আমাদের এখানে চলে এসো! লাঞ্চ খেতে-খেতে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।...

এক সেকেন্ড ধরুন।—ফোনটা চেপে ধরে মামাকে বললাম,—সুনীল আচার্য। দুপুরে খেতে যেতে বলছে।...ওর বন্ধু বিক্রমের ফ্ল্যাটে। যাবে?

যেতেই পারি।—মামা বললেন,—তোমার মেসো একটু পরে পড়াতে বেরিয়ে যাবেন। ন'দি লাইব্রেরি চলে গেছে। এখানে গালে হাত দিয়ে বসে থাকার চেয়ে ঘুরে আসা যায়। তোরও হাজার বছরের পুরোনো লন্ডন খানিকটা দেখা হবে। ওখান থেকে আমরা স্ট্রেট ডক্টর শেফার্ডের ওখানে চলে যাব।

—হ্যাঁ সুনীলবাবু। আমরা যাচ্ছি। অ্যাড্রেস-লোকেশন বলুন।

—ভেরি সিম্পল। টিউবে বেকারলু লাইন ধরে প্যাডিংটন নামবে। নর্থ প্লাজার পরের রাস্তা। টু-এ প্রিড স্ট্রিট। ফ্ল্যাট নম্বর থ্রি। ফার্স্ট ফ্লোর। নেমপ্লেটে বিক্রমের কাকার নাম। অজয় পুরোহিত। চলে এসো।

আমি সামনের প্যাডে খসখস করে লিখে নিয়েছি। জগুমামা ঠিকানাটা দেখতে-দেখতে বললেন,—লন্ডন টিউবের একটা ম্যাপ দিন চাকদা।

চাকদা!—মেসো ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন,—আমায় বলছ?

—নিশ্চয়ই! একটু আগেই যে ফোন তুলে বললেন, 'চাক স্পিকিং'। আমি বাঙালিমতে 'দা' লাগিয়ে নিয়েছি। কত সুবিধে! সায়েবরা এজন্যেই এতদূর এগিয়েছে। জিভে যাই অসুবিধে হয়, পালটে নেয়। চক্রবর্তী চাক, গঙ্গোপাধ্যায় গ্যাঙ্গুলি...।

—উফ, থামো! সায়েবদের পিণ্ডি চটকাতে পারলেই হল! ম্যাপ দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো। তবে রাত আটটার মধ্যে—

আবার 'পিঁপিপ পিপ'...ফোন বাজছে। মেসো ফোন তুললেন,—হ্যালোউ, চাক হিয়ার।...ইয়েস...।

পরক্ষণে ওঁর মুখের রং পালটে গেল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। দু-চোখে উদ্বেগ, আতঙ্ক। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন,—হোয়াট?...হাউ ইট হ্যাপনড?...দেন?...ডু য়ু হ্যাভ কনসাল্টেড এনি লইয়ার?...ওকে, আই'ল সি।...ইয়েস, ইয়েস, আই নাও কল জলি, দেন লেট য়ু নো।...বি স্টেডি...বি স্টেডি...।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন মেসো। দু-হাতে মুখ চেপে রইলেন। সামলে নেবার চেষ্টা করছেন।

তারপর থেমে-থেমে বললেন,—বিশ্বনাথজি অ্যারেস্টেড। একটু আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে এসে তুলে নিয়ে গেছে।

—বিশ্বানাথজি কে?

—বুবলাইয়ের হবু শ্বশুর, সুনীতার বাবা। সুনীতা একমাত্র মেয়ে। সে জানেও না। সকালে কাজে বেরিয়ে গেছে। বাড়িতে ছিলেন শুধু বিশ্বনাথজি আর স্ত্রী রুক্মিণী। সুনীতার মা। বিশ্বনাথজিও বেরোবেন বলে তৈরি

হচ্ছিলেন। এইসময় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে এক গ্যাং পুলিশ এসে তাঁকে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

—আশ্চর্য! কারণটা কী?

—কিচ্ছু বলেনি। বলেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে যোগাযোগ করতে।

—ভদ্রলোক কি সার্ভিসে ছিলেন?

—না। একজন ব্রিটিশের সঙ্গে পার্টনারশিপে প্রাইভেট সিকিওরিটি নেটওয়ার্ক ছিল। বেশ বড় বিজনেস, লন্ডনে যথেষ্ট রেপুটেশন। বড়-বড় মার্কেট কমপ্লেক্স, স্কুল, হসপিটাল, মিউজিয়াম, জু সবখানেই ওদের সিকিউরিটির লোকেরা।

—কোম্পানিতে কোনও গোলমাল হল নাকি?

মেসো হতাশভাবে মাথা নাড়লেন,—জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না। জাস্ট বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু। পরশু বিয়ে...না:, বসে থাকলে চলবে না। ডেট পোস্টপন করতে হবে, লইয়ারকে কনট্যাক্ট করতে হবে...

আমি বললাম,—ওরা কি বাঙালি?

—না। গুজরাটি। প্যাটেল। য়ুনিভার্সিটিতে বুবলাইয়ের সঙ্গে আলাপ। মেয়েটা খুব ভালো। ফ্যামিলিটাও চমৎকার।...উঠি...দেখি...।

মামা বললেন,—আমরা তাহলে থেকে যাই? কী বলেন?

—না-না। তোমরা থেকে কী করবে? আমি তোমার দিদিকে ফোন করি...তারপর দুজনে...তুমি এক কাজ করো। আমার মোবাইল ফোনটা বরং তোমাদের সঙ্গে রাখো। জলির কাছে মোবাইল আছে। ওর নাম্বারটা নোট করে নাও। ইফ নেসেসারি, যোগাযোগ করে নেওয়া যাবে।

—বুবলাইকে জানাবেন না?

—ওকে এতক্ষণে সুনীতা জানিয়ে দিয়েছে।...তোমরা দেরি কোরো না। বেরিয়ে পড়ো।...

স্পষ্ট বুঝলাম, পারিবারিক এই সেনসিটিভ ব্যাপারে মেসো থার্ড পার্টির কোনও ভূমিকা দেখতে চান না। উনি খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছেন।

৩

কাচের বাইরে ছবির মতো সরে যাচ্ছে ইংলন্ডের বিখ্যাত 'কান্ট্রি-সাইড'। এদেরও গ্রাম, আমাদেরও গ্রাম, কত তফাত। সবুজ-হলুদ ফসলের খেত, মাঝে-মাঝে কান্ট্রি-হাউস, সিনেমায় দেখা রঙিন বাংলো। অনেক-

অনেক দূরে কখনও-কখনও আকাশছোঁয়া চিমনির সাদা ধোঁয়া আকাশে মিশছে। নীল-সাদায় কী অপূর্ব! পপলার-বার্চ-উইলো গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে রংবেরঙের পাতায় সেজে। শীত আসছে। আর কিছুদিন পরেই এদেশে শুরু হবে পাতা রঙিন হয়ে ওঠার উৎসব।

'মেট্রোপলিটান' টিউবের কম্পার্টমেন্টে আমরা দুজন মুখোমুখি বসে। জগুমামা তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে।

জলিমাসির বাড়ি থেকে ১৮৬ নম্বর বাসে হ্যারো-অন-হিলস টিউব স্টেশন। কলকাতার দমদম বা টালিগঞ্জের মতো এইদিকের স্টেশনগুলো মাটির ওপরে, 'সারফেস' দিয়ে ট্রেন চলে। স্টেশনগুলোর মধ্যে দূরত্বও অনেকখানি। উইম্বলে পার্ক পেরিয়ে গেল।

সক্কাল-সক্কাল মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। নিখরচায় সুযোগ পেয়ে বেড়াতে এলাম। দাদার বিয়ে! খাবদাব বেড়াব। ফুর্তি হবে। সব নিমেষে চৌপাট হয়ে গেল একটামাত্র টেলিফোনে! জগুমামার সঙ্গে আমি থাকলেই, কী জানি কী গ্রহের ফের, একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট বাঁধবে।

এখন এমন অস্বস্তি হচ্ছে! ভাবছি মামাকে বলব, মাসির বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকলে ভালো হয়। যতই হোক, আমরা আত্মীয়। দেশ থেকে এসেছি। আমাদের সামনে নিজেরা মন খুলে কথা বলতে পারবেন না। মেসো তো এখনই কেমন সিঁটিয়ে গেছেন।

ফিনলে রোড পেরিয়ে ট্রেন ঢুকে পড়েছে সুড়ঙ্গে। নেকসট স্টেশন বেকার স্ট্রিট। ওখানেই আমরা নামব।

স্টেশনে নেমে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তিরচিহ্ন দেওয়া 'হ্যামারস্মিথ অ্যান্ড সিটি লাইন' আর 'সার্কল লাইন'। একটা ওপরে, অন্যটা নীচে।

জগুমামা হেসে বললেন,—লন্ডনে মাটির তলায় বিভিন্ন গভীরতায় আলাদা-আলাদা লাইন। আলাদা-আলাদা রঙের ট্রেনের বগি! গোটা শহরের মাটির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গের জাল ছড়ানো আছে।

তারপর ম্যাপ দেখে বললেন,—সার্কলও যায়, হ্যামারস্মিথও যায়। চল, সার্কল লাইনই ধরি।

চলমান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে আমি হতবুদ্ধির মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। অজস্র সাদা-কালো-বাদামি মানুষ, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ওপর থেকে নীচে যাচ্ছে-আসছে। বড় চাতালটার একদিকে এক যুবক গিটার বাজাচ্ছে। সামনে সাদা কাপড় পাতা। সেখানে প্রচুর পেনি পড়ে আছে।

—কীরে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

—দেখছি।

—ওরা ভিখিরি। সব স্টেশনে পাবি। ভিক্ষে চাইবে না, সম্মানে বাধে। গান-বাজনা শুনে লোকে পয়সা দিয়ে যায়। ভালোই চলে যায়। কাজকম্ম করতে হয় না।

—প্রতি স্টেশনেই কী এতরকম লাইন?

—যেখানে ক্রসিং আছে, সেখানে অনেক জায়গায় পাঁচ-ছ'টা লাইনও আছে। এক লাইনের ট্রেন থেকে নেমে অন্য ট্রেন ধরে যাওয়া যায়। এই শহর জুড়ে দশরকম টিউব লাইন। এই দ্যাখ, ম্যাপে সব বোঝানো আছে।

কলকাতার মেট্রো নিয়ে বেশ গর্ব ছিল। এখন নিজেদের পিঁপড়ের মতো মনে হচ্ছে। এদেশে আরেকটা সুবিধে, আলাদা-আলাদা টিকিট কাটার দরকার নেই। একটা 'অল-ডে' কাটলে লন্ডনের সব যানবাহনেই চড়া যায়।

হলুদরঙের সার্কল লাইনের ট্রেনে চেপে প্যাডিংটন পৌঁছে গেলাম। ওপরে উঠে একটু ঘোরাফেরা করতে পেয়ে গেলাম ফ্ল্যাটটা।

বেল টিপতে দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক সুন্দরী তরুণী।

—সুনীল ভাইয়া। ওলোগ আ গয়ে।

সুনীল আচার্য মামাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন,—ডক্টর মুখার্জি! কতদিন পর! আসুন, আসুন!

আমরা ড্রইংরুমে বসলাম। বিক্রমও বেরিয়ে এসেছেন। সুনীলবাবু বললেন,—এই হল আমার বন্ধু বিক্রম। অর্ণবের সঙ্গে হিথরোয় আলাপ হয়েছে।...ইনি সেই গ্রেট সায়েন্টিস্ট, যার কথা কাল তোমায় বলছিলাম। কী খাবেন এখন, চা না কফি?

—একটা হলেই হল।...এখানে দেখছি অ্যাশট্রে আছে, ছাইয়ের গুঁড়োও আছে। স্মোক করা যাবে?

খান না! আমার চাচাজি তো খান। —খিল-খিল করে হেসে বিক্রম বললেন। ভদ্রলোকের কথাবার্তা, চালচলন পুরো মেয়েলি। এমনকী স্ত্রীর চেয়েও ওঁর গলা মিহি এবং সুরেলা।

জগুমামা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—তারপর সুনীলবাবু, কী খবর? আজ শুধু আড্ডা?

—যা বলেছেন। কাল সকালে টেগোর সেন্টারে শিফট করব।... আপনারা ক'দিন আছেন?

—অ্যাটলিস্ট ওয়ান উইক।...বাই দ্য বাই, বিক্রমবাবু, আপনি কোথায় আছেন? আই মিন, ইয়োর প্রফেশন?

—'মাইক্রোসোলাস'-এ আছি। সফটওয়্যার কোম্পানি।

—অ্যানথ্রোপলজির বইগুলো আপনার?

—না মশাই। সব চাচার। উনি তো অ্যানথ্রপলজিতে ডক্টরেট।

—আপনাকে বলা হয়নি ডক্টর মুখার্জি, অজয়চাচা খুব পণ্ডিত মানুষ। নৃতত্ত্ব বিষয়ে একজন অথরিটি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ওরিয়েন্টাল ডিভিশনের দায়িত্বে আছেন।

—তা-ই? বা:! তাহলে আজই হয়তো ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আজ বিকেলে ডিরেক্টর শেফার্ডের অফিসে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন।

মামা সিগারেটে টান দিতে-দিতে ঘরের একদিকের দেওয়ালজোড়া বইয়ের র‍্যাকগুলো ঘুরে দেখতে লাগলেন। দেওয়ালেও নানাযুগের প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মুখ।

—সুনীলবাবু, কাল যে বললেন, বিক্রমবাবুর কাকা দেশে গেছেন?

—ফোনে ভুল শুনেছিলাম। বিক্রমের বাবা ভারত থেকে এসেছিলেন। সপ্তাহখানেক হল ফিরে গেছেন।

ঘুরেফিরে সোফায় বসে চায়ে চুমুক দিলেন জগুমামা। বললেন,—অনেক হিস্ট্রির বইও দেখলাম। আপনি পড়েন?

বিক্রম দু-হাত নাড়িয়ে বললেন,—পাগল! সব কাকার। দিনরাত পড়েন। বই পেলেই পড়েন। যে-কোনও সাবজেক্ট হলেই হল।

—হ্যাঁ, তাই দেখলাম। ব্ল্যাক ম্যাজিকের বই আছে, অ্যালকেমিস্টের বই আছে। এমনকী ফিজিকসের বইও আছে।...আপনার মিসেস কী করেন?

—আমাদের একই কোম্পানি। শি ইস অলসো মাই কলিগ।

—ফাইন! আজ বন্ধুর অনারে দু-জনেই ছুটি নিয়েছেন।...

সেন্টার টেবিলের ওপর একটা ঢাউস বই পড়ে ছিল। মামা পাতা উলটোতে-উলটোতে কথা বলছেন।

সুনীল আচার্য বললেন,—বাংলাদেশের ঘটনাটায় কিন্তু বেশ থ্রিল ছিল। সেই যে মাঝরাতে আমায় উঠিয়ে নিয়ে গেল—।

—কেন, তার আগে? জগুমামাকে আর আপনাকে 'ভুলা'য় ভুলিয়ে রেখেছিল?

ব্যস! বাংলাদেশের গল্প শুরু হয়ে গেল।...জগুমামা অবশ্য ওই মোটা বইটা পড়ে চলেছেন। মাঝে-মাঝে মন্তব্যও করছেন আমাদের আড্ডায়।

এরপর লাঞ্চ। পাঞ্জাবি নানারকম পদ, দু-তিনরকম মাংসের পদ। খেয়ে উঠতে-উঠতে প্রায় তিনটে।

হাতমুখ ধুয়ে মামা তৈরি। বললেন,—এবার বেরোব। চারটের মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম পৌঁছতে হবে।

সার্কল লাইন ধরে 'নটিং হিল গেট' স্টেশন। সেখান থেকে সেন্ট্রাল লাইনে 'টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড'।

অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে একটু হাঁটলেই গ্রেট রাসেল স্ট্রিট। তার মুখেই অপার গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজপ্রাসাদের মতো ব্রিটিশ মিউজিয়াম। কত কথা শুনেছি। এবার চাক্ষুষ দেখব।

মেইন গেট দিয়ে ঢুকছি, একজন প্রহরী আমাদের আটকাল।

—আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

—কেন? পাঁচটা পর্যন্ত তো খোলা।

—হ্যাঁ, সেটাই নিয়ম। আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশেষ কারণে। ভিজিটরস আর নট অ্যালাওড।

—কিন্তু আমাদের যে ডক্টর শেফার্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—স্যর দেখা করবেন না। অল অ্যাপয়েন্টমেন্টস আর ক্যানসেলড। সরি ফর দি ইনকনভিনিয়েন্স।

—আশ্চর্য! আজ সকালে উনি নিজে ফোন করে আমাদের আসতে বলেছেন।

তাই? —কৌতুকের হাসি খেলে গেল প্রহরীর পাথুরে মুখে,—আপনার নাম? কোত্থেকে আসছেন?

ফ্রম ইন্ডিয়া।—জগুমামা কোটের পকেট থেকে নিজের নেমকার্ড বের করে দিলেন,—আপনি কাইন্ডলি এই কার্ডটা ডক্টর শেফার্ডকে দিন। তারপর উনি যদি দেখা না করেন, চলে যাব। প্লিজ।

লোকটি কার্ড হাতে নিয়ে দেখল। মুখের পেশিগুলো সামান্য নড়ল। বলল,— ওয়েট করুন। আমি আসছি।

মিনিট তিনেকের মধ্যে প্রায় ছুটতে-ছুটতে এল সে। অতি বিনীতভাবে বলল,—প্লিজ ডু কাম। একসট্রিমলি সরি স্যর। ডোন্ট মাইন্ড স্যর। ভুল হয়ে গেছে।

আমাদের নিয়ে গেল ডিরেক্টরের ঘরে। ঘর না বলে হলঘর বলাই ভালো। প্রচুর কর্তাব্যক্তি বসে আছেন। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে বসে থাকা সাদা চুলের মানুষটি যে জন শেফার্ড, একসেকেন্ডে বোঝা গেল। উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন,—প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ডক্টর মুখার্জি! উই আর জাস্ট পাজলড। প্লিজ টেক ইয়োর সিট।

কী হয়েছে ডক্টর শেফার্ড?—মামা বসতে-বসতে বললেন।

—একটা দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য অ্যান্টিক চুরি হয়ে গেছে মিউজিয়াম থেকে। আজ সকালে নজরে পড়েছে। কবে খোয়া গেছে, জানি না। কী করে উদ্ধার হবে, তাও জানি না!

—জিনিসটা কী?

—আলেকজান্ডারের আংটি!

৪

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ডক্টর জন শেফার্ডের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে।

হ্যাঁ ডক্টর মুখার্জি, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আংটি! জেড পাথর কেটে তৈরি।—আগের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন শেফার্ড। তারপর বললেন,—আপনি তো এর আগেও এই মিউজিয়ামে এসেছেন।

দেখেছেন, কত রিচ কালেকশন! প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন থেকে শুরু করে কী নেই এখানে! আমাদের পূর্বপুরুষরা সারা পৃথিবী থেকে তিলতিল করে দুষ্প্রাপ্য সব কিউরিও এনে জড়ো করেছেন। নেবুসাডনেজারের মুকুট, হান রাজাদের জুয়েলারি, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তর তরবারি...সব আছে। একমাত্র এখানেই আছে। তার মধ্যে থেকে শুধু আলেকজান্ডারের আংটিটাই...একমাত্র ওইটাই...।

—আংটিটা কি শোকেসে ছিল?

—অবশ্যই। আজ তো নয়, অ্যাট লিস্ট গত একশো বছর ধরে একজিবিট হচ্ছিল। অন্যান্য কিউরিওর সঙ্গে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ দেখে গেছেন।

—আংটির আশেপাশে অন্যান্য যেসব অ্যান্টিক ছিল, সেগুলো ঠিক আছে?

—এখনও পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে। ওরিয়েন্টাল গ্যালারির ইন্ডিয়া হলে ওর পাশে ছিল চন্দ্রগুপ্তর তরবারি বা কিং নন্দর গলার হার। সব ঠিক আছে। একমাত্র ওই বস্তুটাই—।

—এক মিনিট! আলেকজান্ডার তো গ্রিসের মানুষ। ইন্ডিয়া হল-এ আলেকজান্ডারের আংটি কেন?

—কারণ ওটা পাওয়া গেছিল ইন্ডিয়া থেকে। ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে।

—স্ট্রেঞ্জ! আলেকজান্ডার খ্রিস্টজন্মেরও আগের মানুষ। তাঁর আংটি পাওয়া গেল ভারত থেকে। ইস দিজ ফ্যাক্ট?

এটা কী বলছেন ডক্টর মুখার্জি?—বেশ আহত হলেন ডিরেক্টর। বললেন,—আমরা, ব্রিটিশরা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর না হয়ে কোনও কাজ করি না। নিশ্চয়ই ওই আংটির পাথরের কার্বন টেস্ট করা হয়েছে! ভুল তথ্য দেব আমরা?

সরি, সরি।—জগুমামা তাড়াতাড়ি শুধরে নিলেন। বললেন,—আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। লজিক্যালি বুঝতে চেয়েছি। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।...আমায় পুরো ব্যাপারটা একটু বলবেন? মানে কখন, কীভাবে প্রথম জানা গেল, আংটিটা মিসিং?

ওই পয়েন্টেই আমরা টোটালি কনফিউসড।—ডিরেক্টর শেফার্ড বললেন,—ঠিক কবে 'আসল আংটিটা' মিসিং হয়েছে, জানি না। কারণ শো-কেসের মধ্যে অবিকল ওরকম একটা 'আংটি' রাখা ছিল। সাধারণ পাথরে তৈরি একটা ডুপ্লিকেট। কাচের বাইরে থেকে কোনও তফাত বোঝা যায় না। জানতে পারতামও না, যদি না 'মান্থলি ক্লিনিং'-এর সময় ওটাকে হাতে নিয়ে দেখা হত!

জগুমামা অস্ফুটে বললেন,—বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত চোর।

—অ্যাবসলিউটলি। আমারও তাই মনে হয়েছে। কাল আমি আপনার সঙ্গেই ফিরেছি। সোমবার, মানে কাল ছিল মিউজিয়ামের ছুটির দিন। 'মান্থলি ক্লিনিং'-এরও দিন। রাতে ফোন করলেন আমাদের কিউরেটর

অজয় পুরোহিত। জিগ্যেস করলেন, আজ অফিসে আসছি কি না। বললাম, 'হ্যাঁ! কেন?' উনি বললেন, 'এলে বলব।' আজ সকালে আপনাকে ফোন করে চলে এসেছি। তখনও কিচ্ছু জানি না। এসে শুনলাম!

—কে প্রথম আইডেনটিফাই করলেন?

—কলিন উইলসন। মেইনটেন্যান্স ইন-চার্জ।..এখানে উইলসন, ডক্টর পুরোহিত সকলেই আছেন।...ইনি ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি, আমার বিশেষ বন্ধু।

হ্যালো!—জগুমামা সৌজন্য-হাসি হেসে বললেন,—অজয়জি, আমরা একটু আগে আপনার বাড়ি থেকেই আসছি। আপনার ভাইপো বিক্রমের বন্ধু সুনীল আচার্য আমাদেরও খুব পরিচিত।

রিয়্যালি! অজয়জি চোখ বড় করে বললেন,—তবে ব্যাপারটা কিন্তু খুব কনফিডেন্সিয়াল। ওরা কিছু জানে না।

ডোন্ট ওরি!—জগুমামা বললেন,—মিস্টার উইলসন! এবার আপনি বলুন তো, ঠিক কীভাবে ডিটেকট করলেন?

আমি ওরিয়েন্টাল গ্যালারির ক্লিনিং সুপারভাইজ করছিলাম।—উইলসন বললেন,—বড়-বড় কিউরিওগুলো সাব-অর্ডিনেট স্টাফরা সাফাই করছিল। শোকেসের জিনিসগুলো আমি বরাবর নিজে ক্লিন করি। ছোটখাটো জিনিস, হাত থেকে পড়ে যদি চোট খায়, ভেঙে যায়। এইরকমভাবে পরপর করতে-করতে হঠাৎ ওই 'আংটিটা' হাতে তুলে 'লিনেন' দিয়ে মুছতেই মনে হল, আরে! এ তো অনেক হালকা লাগছে! তখন ভালো করে নজর করে দেখি, সাধারণ স্টোনে তৈরি নকল জিনিস! কিন্তু দেখতে এক্কেবারে একরকম। অন্তত কাচের বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

—জাস্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন। ছোট-ছোট কিউরিওগুলো কাচ তুলে পরিষ্কার করা হয়?

—হ্যাঁ।

—অন্যগুলোতে এইরকম কোনও রিপ্লেসমেন্ট হয়নি, আপনি সিওর?

—হ্যাঁ। কারণ আজ ডিরেক্টর স্যর এসেই আমাদের বিশেষজ্ঞ টমাস ক্রু জকে দিয়ে ওরিয়েন্টাল গ্যালারির সব অ্যান্টিকগুলো পরীক্ষা করিয়েছেন।

—অন্য গ্যালারিগুলোতে তো এরকম কোনও ছোট অ্যান্টিক সরিয়ে নকল জিনিস রাখা থাকতে পারে।

হতে পারে।—ডিরেক্টর বললেন,—আজ সারাদিন ধরে সেই কাজই চলেছে। একসপার্টদের একটা টিম পুরো মিউজিয়ামের সবক'টা গ্যালারির সমস্ত কিউরিও পরীক্ষা করছেন। এখনও পর্যন্ত খবর পেয়েছি, অন্য সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

গুড।—জগুমামা বললেন, মিউজিয়ামের সিকিওরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কী?

ডিরেক্টর বললেন,—মিউজিয়ামের ভেতরে প্রাইভেট সিকিওরিটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। দে আর ওয়েল ইকুইপড উইথ লেটেস্ট আর্মস অ্যান্ড গ্যাজেটস। মিউজিয়াম চত্বর এবং আশেপাশের এলাকার দায়িত্ব লন্ডন পোলিস, আই মিন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের।

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওরিয়েন্টাল গ্যালারির ইন্ডিয়ান হল-এ যেতে চাই। একজ্যাক্ট স্পটটা দেখব। অ্যাকচুয়ালি আলেকজান্ডার অ্যান্ড-ইন্ডিয়া মিলিয়ে ব্যাপারটা আমায় খুব কৌতূহলী করছে।

সিওর ডক্টর, উইথ প্লেসার!—ডিরেক্টর বললেন,—আপনার ইন্টারোগেশন আমাকেও খুব সারপ্রাইসড করেছে। মনে হচ্ছে, আপনি বিজ্ঞানী নন, ডিটেকটিভ!...চলুন, চলুন।...আপনারাও যেতে পারেন।

দু-তিনবার লিফট বদল করে আমরা পৌঁছে গেছি ওরিয়েন্টাল গ্যালারির মস্তবড় ইন্ডিয়া হল-এ। পরপর তিনটে হল। অসাধারণ! প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ঢোকার মুখেই মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার দুটি মূর্তি। তারপরে মাঝে-মাঝে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন। বুদ্ধ-মহাবীর-অজন্তা-ইলোরা, কী নেই!

হল-এর দেওয়ালের পাশ দিয়ে সারি-সারি কাচের শো-কেস। ডিরেক্টর আমাদের নিয়ে গেলেন পশ্চিমদিকের কোণের শো-কেসের কাছে।

—এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখছেন, এখানেই ছিল আলেকজান্ডারের আংটি। নকলটা কাল সরিয়ে দিয়েছি।

জগুমামা বললেন,—এখন কি কাচ তোলা যাবে?

প্রশ্নই ওঠে না!—পাশ থেকে কলিন উইলসন বললেন,—একেকটা জোন ধরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সার্কিট চালু আছে। বিশেষ-বিশেষ জায়গায় সুইচ আছে। সুইচ অফ করলে তবেই কাচ উঠবে। তাছাড়া সমস্ত শো-কেসে বার্গলার অ্যালার্ম দেওয়া আছে। কাচ তোলার চেষ্টা করলেই সাইরেনের মতো আওয়াজ শুরু হয়ে যাবে। নীচে সিকিওরিটির হেড অফিসেও পৌঁছে যাবে শব্দ।

—অর্থাৎ চোর জানত, কোথায়-কোথায় সার্কিট ব্রেকার সুইচ আছে। আচ্ছা, সার্কিট কি চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকে?

—সিওর। শুধু তাই নয়, রাউন্ড দ্য ক্লক প্রতিটি হলঘরে আলো এবং এয়ারকন্ডিশনিং মেসিন চালু থাকে। চালু থাকে বার্গলার অ্যালার্মও।

—সিকিওরিটির লোক কোথায় পোস্টিং থাকে? প্রত্যেক হল-এ? মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর?

—না। মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত ভিজিটরকে বের করে দেওয়া হয়। সিকিওরিটি এজেন্সির লোকেরাই করেন। তারপর আমাদের স্টাফরাও বেরিয়ে যান। কোনওরকম সন্দেহ হলে সিকিওরিটির

লোকেরা তাদের সার্চও করতে পারেন। এরপর সমস্ত হলগুলো তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই তালা থাকে সিকিওরিটি রুমে অফিসার-ইন-চার্জের কাছে। সিকিওরিটি গার্ডেরা সারারাত ধরে টহল দেন করিডোর ধরে।

—অর্থাৎ মিউজিয়াম বন্ধ থাকার সময়ে চুরি হওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ সেটাই হয়েছে। মিউজিয়াম খোলা থাকাকালীন কোনওভাবেই কাচ তুলে কোনও কিউরিওপিস বার করা সম্ভব নয়।

রাইট স্যর।—উইলসন বললেন,—আমাদেরও মনে হয়েছে, বন্ধ থাকাকালীন দুষ্কৃতীরা ওটা সরিয়েছে।

অজয়জি এতক্ষণ চুপ ছিলেন। এবার বললেন,—মিস্টার উইলসন, আমাদের সিকিওরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের মোস্ট ভাইটাল পার্টটাই বলেননি।

সবাই ঘুরে তাকালেন।

—এই মিউজিয়ামের প্রত্যেক হল-এর কোণে-কোণে ক্লোজ সার্কিট ডিজিট্যাল ক্যামেরা আছে। রাউন্ড দ্য ক্লক ক্যামেরা অন থাকে। অটোমেটিক ছবি উঠে যায়। স্টোর হয় মাদার কম্পিউটারে। তাই তো উইলসন?

সরি স্যর, এক্সট্রিমলি সরি।—উইলসন লজ্জিতভাবে বললেন,—আমি সত্যিই ভুলে গেছি।...হ্যাঁ, ওই মাদার কম্পিউটারে হার্ড ডিস্কের যা ক্যাপাসিটি, তাতে মোটামুটি একমাস পর্যন্ত ছবি ধরে। তারপরে পুরোনো ছবির ওপর নতুন ছবি 'রিরাইট' হয়ে যায়।

তবে তো একমাসের মধ্যে যদি এই চুরিটা হয়ে থাকে, তবে দেখতে পাওয়া যাবে।—জগুমামা বললেন, —এবং সেটাই হয়েছে। আগের 'মান্থলি ক্লিনিং'-এর পরে।

রাইট স্যর!—এখনই তাহলে কম্পিউটার চেক করা দরকার।

বলতে-বলতে উনি এগোতে যাচ্ছিলেন। ডিরেক্টর শেফার্ড বললেন,—উইলসন। ব্যস্ত হবেন না। আমাদের মাথাতে না এলেও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মাথায় এসেছে। তারা আজ এসেই কম্পিউটার থেকে সমস্ত ছবি সিডি-রমে কপি করে নিয়ে গেছে।..সিকিওরিটি এজেন্সির দুই কর্তাকেও অ্যারেস্ট করেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

জগুমামার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। মামা বললেন,—ডক্টর শেফার্ড। একটা কথা জিগ্যেস করব? সিকিওরিটি এজেন্সির মালিকদের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

—অফকোর্স। দুজনকেই আমার ভালো লোক মনে হয়েছে।

—মালিকদের একজন কি ইন্ডিয়ান? মিস্টার বিশ্বনাথ প্যাটেল?

মুহূর্তে জন শেফার্ডের মুখ হাঁ হয়ে গেল। বললেন,—আপনি কী করে জানলেন?

—আন্দাজে ঢিল মেরেছি, লেগে গেছে। সবচেয়ে ট্র্যাজিক ব্যাপার হল, যে বিয়েটা অ্যাটেন্ড করতে এসেছি...আমার দিদির ছেলের বিয়ে। ঠিক ছিল বিশ্বনাথজিরই মেয়ের সঙ্গে। পরশুদিন। সব অ্যারেঞ্জমেন্ট

কমপ্লিট। ম্যারেজ ডেট ডেফার করা ছাড়া উপায় নেই।

মাই গড।—দু:খী গলায় বললেন ডিরেক্টর,—সো সরি। কিন্তু আমরা নিরুপায়। কিছু করার নেই। এতবড় একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেল! সিকিওরিটি এজেন্সি তো দায়ী থাকবেই।

—সে তো বটেই। ও নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আইন আইনের পথে চলবে। আমার শুধু একটাই অনুরোধ।

—ওহ সিওর। প্লিস ডোন্ট হেসিটেট। বলে ফেলুন।

জগুমামা বললেন,—এই 'ঐতিহাসিক আংটি' চুরির রহস্য কি আমার মতো করে তদন্ত করতে পারি? আমার একটাই ইন্টারেস্ট, অপরাধী ধরা পড়লে এবং আংটি উদ্ধার হলে বিশ্বনাথ প্যাটেল ছাড়া পাবেন। আমার ভাগ্নে অনির্বাণের বিয়েটা তাহলে সুনীতার সঙ্গে হতে পারবে।

—অবশ্যই। আমি খুব খুশি হব। আমায় কী করতে হবে, শুধু বলুন।

—আপনি আপনার মিউজিয়ামে সবাইকে একটু বলে দেবেন, আমার সঙ্গে তাঁরা যেন কোঅপারেট করেন। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ছবিগুলো কম্পিউটারে দেখব। গত একমাসের। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে আমার কথা একটু বলে দেন। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সাহায্য আমার দরকার হবে।

—সিওর।...স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কমিশনার অ্যালবার্ট ট্রুম্যান আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড। বলে দিচ্ছি।...

—আরেকটু বাকি আছে। আমার দিদির বাড়ি অনেকটা দূর। হ্যারো অন হিলস-এ। যাতায়াতের সমস্যা হতে পারে। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা। ওখানে এখন মাঝরাত। আপনি তো জানেন, কীরকম সফিস্টিকেটেড জায়গা। যদি কাছাকাছি কোনও গেস্ট হাউস পেতাম—।

—সিওর! আজ থেকেই থাকবেন?

—হ্যাঁ। দিদির বাড়িতে একটা ফোন করে দেব। কাল সকালে দিদির বাড়ি গিয়ে ব্যাগেজ নিয়ে চলে আসব।

ডক্টর শেফার্ড নিজের ঘরের চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন,—এখনই ব্যবস্থা করছি। আমাদের নিজস্ব গেস্ট হাউস আছে।

শেষ অনুরোধ, ডক্টর শেফার্ড।—জগুমামা বললেন,—আপনাকে বিরক্ত করছি, নিজেরই খারাপ লাগছে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে দরকার। আলেকজান্ডার সম্পর্কে বই চাই। মিউজিয়ামে নিশ্চয়ই 'এনসাইক্লোপিডিয়া' আছে। আর চুরি যাওয়া 'আংটি' সম্পর্কে সমস্ত তথ্য চাই। কবে, কীভাবে, কোত্থেকে ওটা সংগৃহীত হয়েছিল, কে করেছিলেন...সব।

৫

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে...

চোখ একটু জড়িয়ে এসেছিল। উঠে বসলাম।

—মামা! এ তো রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে...'। হঠাৎ?

—হ্যাঁরে। বৃদ্ধঋষি সব কিছুতেই ছড়িয়ে আছেন ওঁকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবা যায় না। আলেকজান্ডার পড়তে-পড়তে ঠিক ওই দুটো লাইন বেজে উঠল মনের মধ্যে। ছবিটা কল্পনা করে দ্যাখ! যুদ্ধ উন্মাদ এক আর্য তরুণ উন্মাদ কলরব করতে-করতে ছুটে আসছে। মরুভূমি, হিমালয়, নদ-নদী সব পেরিয়ে। সে পৃথিবী জয় করতে চায়। থামবে না, কিছুতেই থামবে না।

আমি মামার দিকে চেয়ে আছি।

জগুমামা ফের বললেন,—মাত্র তেত্রিশ বছরের জীবন! তার মধ্যেই য়ুরোপ, মধ্যপ্রাচ্য জয় করে চিনের বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত করে এসে দাঁড়াল সিন্ধুনদের তীরে। সে কত বছর আগের কথা। প্রায় দু-হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ বছর। পারস্যের দারিয়ুসও উড়ে গেছে বাচ্চা ছেলেটার সামনে।...আসলে ওর জিনের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল খ্যাপামি। বাবা রাজা ফিলিপ, মহা যুদ্ধবাজ। ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি। আলেকজান্ডার যখন ছোট, বাবা একেকটা দেশ জয় করে দেশে ফিরে উৎসব করছেন। পুত্র মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের কাছে লেখাপড়া শিখতে-শিখতে আনমনা হয়ে যাচ্ছে। অ্যারিস্টটল একদিন জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে বাছা'? কিশোর জবাব দিল, 'আমার বসে-বসে আঁক কষতে ভালো লাগে না। কবে যে যুদ্ধে যাব।' অ্যারিস্টটল বললেন, 'আরটু বড় হয়ে যেও।' সে বলল, 'দু-র! বড় হতে-হতে আর কোনও দেশই বাকি থাকবে না। বাবা পৃথিবীর পুরোটাই জয় করে ফেলবে।' বোঝ ব্যাপারটা! মা ওলিম্পিয়াসও ছিলেন বাউন্ডুলে-পাগলি। ছেলে অন্যরকম হবেটা কী করে?

আমি বললাম,—এই আড়াই হাজার বছর পরেও মানুষের যুদ্ধের নেশা একটুও কমেনি মামা। আলেকজান্ডারের সঙ্গে বুশের কি মিল নেই?

—ঠিক বলেছিস। তবে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এসে আলেকজান্ডার খুব শিক্ষা পেয়েছিল। পুরু তখন পঞ্জাব-গন্ধারের বিস্তীর্ণ উপত্যকার শাসনকর্তা। যথেষ্ট সৈন্যবল। আলেকজান্ডার পুরুকে হারিয়ে দিল বটে,

কিন্তু বিস্তর গ্রিকসেনা মরল, জখম হল। পুরুর বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার নিজেও চমৎকৃত। ওই কাহিনি তো পড়েছিস?

—কোনটা?

—ওই যে, আলেকজান্ডারের কাছে যখন পরাজিত পুরুকে নিয়ে আসা হল, আলেকজান্ডার তাকে জিগ্যেস করেছিল, 'তুমি আমার কাছে কীরকম ব্যবহার আশা করো?' পুরু ঘাড় সোজা করে বলেছিল, 'রাজার কাছে রাজার মতো ব্যবহার।' এটা কতটা সত্যি জানি না। তবে ইতিহাস বলছে, আলেকজান্ডার খুব খুশি হয়ে পুরুকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে ফৌজ ঘুরিয়ে চলে যায়।

—হ্যাঁ পড়েছি। ওই আংটি সম্পর্কে কী পেলে সেটা বলো।

—একটা মিসিং লিঙ্ক রয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নথিপত্র বলছে, আঠারোশো ঊনসত্তর সালে ব্রিটিশ কর্নেল জোনাথন রাইট পশ্চিম পাঞ্জাব, বালুচিস্তান সিন্ধু প্রদেশে অভিযান চালান। ওখানে তখন ছোট-ছোট গোষ্ঠী ছিল। পার্বত্য উপজাতি ছিল। তারা খুব স্বাধীনচেতা, কারও বশ্যতা মানতে নারাজ। সেইসময় লারকানা প্রদেশের এক ছোট রাজার বাড়িতে লুঠপাট করার সময় ওই দুষ্প্রাপ্য আংটি পায়।

—রাজার নাম পেয়েছ?

—গোষ্ঠীর নাম রয়েছে। কর্নেলের তথ্য অনুযায়ী, ধর্মে ওরা হিন্দু ছিল। নিজেদের 'পৌরব' রাজপরিবারের বংশধর হিসাবে দাবি করত।...তারপর 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইটা ঘাঁটতে গিয়ে দেখছি, আলেকজান্ডারের সঙ্গে যে-যে ইন্ডিয়ান রাজার মোলাকাত হয়েছিল, তাদের পদবি ধরেই বলা হত। বাবাও পুরু, ছেলেও পুরু। গ্রিকরা বলত, পোরাস। সংস্কৃতে পৌরব, প্রাকৃতে পুরু। অর্থাৎ মেইন পুরুকে আমরা সিনিয়র পুরু বলতে পারি। তবে চেনাব, ঝিলম, শতদ্রু নদীর তীরে তখন অনেক পুরু পরিবার রাজত্ব করত। সিনিয়র পুরুর সব ভাই-বেরাদর।

—এ তো রাহুল সাংকৃত্যায়নের থিয়োরি। ইন্দ্র কোনও একজন দেবতার নাম নয়, খুব শক্তিশালী এক আর্য গোষ্ঠীর নাম!

—ঠিক তাই। ব্যাপারটা সেকালে ওইরকম ছিল।

—কিন্তু ওই আংটিটা যে আলেকজান্ডারের, এই ইনফর্মেশন এল কোত্থেকে?

জগুমামা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মেসোর দেওয়া মোবাইল ফোন 'পিঁপ-পিঁপ' করে উঠল। আমি ধরতেই ওপাশ থেকে অচেনা গলা,—ডক্টর মুখার্জি?

বললাম,—হু'স স্পিকিং?

বিট্রিশ অ্যাকসেন্টে জবাব এল,—দ্যাটস নান অব ইয়োর বিজনেস। তুমি ওর নেফিউ, বুঝেছি। শোনো, তোমার আঙ্কেলকে বলে দিও, বেড়াতে এসেছে বিদেশে, বেড়িয়ে যেন ফিরে যায়! এটা ইন্ডিয়া নয়। একজন ইন্ডিয়ান মরে গেলে কারও যাবে-আসবে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কেসটার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা যা করার করুক। উনি বিজ্ঞানী মানুষ, রেসপেকটেবল ম্যান, ওনার আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না! মাঝখান থেকে এনিথিং মে হ্যাপেন।

বলেই ফোনটা কট করে কেটে দিল। আমার শরীর ঝিমঝিম করছে। এগারোটা বাজে। লন্ডনে এই নিশুতি রাতে কে প্রাণের হুমকি দিচ্ছে?

জগুমামা আমার মুখের রং পালটানো দেখে একসেকেন্ডে বুঝে ফেলেছেন। নির্বিকারভাবে বললেন,—যাক, সিওর হওয়া গেল!

—ক-কী?

—এক, এই চুরির র‍্যাকেটে মিউজিয়ামের লোক ইনভলবড। ডক্টর শেফার্ডের সঙ্গে কথা বলার সময় ওদের কেউ অবশ্যই ছিল। দুই, সে আমার আগের কীর্তিকলাপ জানে। তিন, সে ভয় পেয়েছে। চার, আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

—মামা! লোকটা বলল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইনভেস্টিগেশন করে করুক। ডক্টর মুখার্জিকে আগ বাড়িয়ে ঢুকতে মানা করো।

—তার মানে, সে কতখানি কনফিডেন্ট যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও তাকে ছুঁতে পারবে না!

—মামা, আমি বলি কি—

—না, বোলো না! যদি ক্রিমিন্যাল ধরা না পড়ে, তোমার দাদার বিয়ে আটকে যাবে। বিশ্বনাথ প্যাটেলকে জেলে পচতে হবে। ফ্যামিলিটা রুইনড হয়ে যাবে।

আমি চুপ।

—শোনো, মাথা থেকে দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দাও। জলে নেমেছ, সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে হবে। কী জিগ্যেস করেছিলে, মনে আছে?

—হ্যাঁ। ওটা যে আলেকজান্ডারের আংটি, তার প্রমাণ কোথায়?

—গুড কোয়েশ্চন। কর্নেল রাইট লিখছেন, লারকানার রাজপ্রাসাদে অন্যান্য অনেক দেবদেবীর সোনা-রুপোর মূর্তির সঙ্গে সে ওই আংটিটাও পায়। প্রাসাদের ঠাকুরের সিংহাসনেই রাখা ছিল। রাজার লোকজন কাকুতিমিনতি করে আংটিটার জন্য। তারাই জানায় ওই আংটি মন্ত্রপূত। দু-হাজার বছর আগে বিদেশি রাজা

আলেকজান্দার তাদের পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিল। ওই আংটি ছিল বলে তাদের এতদিন কোনও ক্ষতি হয়নি। ওরা আংটিটিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে।

—সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, দুই সহস্রাব্দ আগে মহারাজ পুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার খুশি হয়ে নিজের হাতের আংটি খুলে পরিয়ে দেন পুরুকে। মিত্রতার চিহ্ন হিসেবে। তাই তো?

—রাইট। ব্রিটিশরা তারপরেও কনফিউজড ছিল আংটির মেটিরিয়াল নিয়ে। জেড পাথরে তৈরি। জেড পাথরের ব্যবহার তখন চিন ছাড়া পৃথিবীর কোথাও প্রচলিত ছিল না। সেইসময় চিনে জেডপাথর সোনা-হিরে-চুনি-পান্নার চেয়েও দামি। এই জায়গাটায় আমরা এইভাবে জুড়তে পারি। ইতিহাসে দেখছি, সে সময় চিনের পশ্চিমপ্রান্তে ছিল 'ঝাও' সম্রাটদের আমল। আলেকজান্ডার কারাকোরাম দিয়ে বাঁ-দিকে বেঁকে প্রথমে চিন আক্রমণ করে। 'ঝাও'রা নতজানু হয়ে সন্ধি করে নেয়। আলেকজান্ডার তখন বাহিনী ঘোরায় সিন্ধু উপত্যকার দিকে!

—তখন মিত্রতার স্মারক হিসেবে আলেকজান্ডারকে 'ঝাও' সম্রাটরা জেড পাথরের তৈরি নানান গয়না, মূর্তি, বাসনকোসনের সঙ্গে ওই আংটি দিয়েছিল। আর সেটাই হাত ঘুরে চলে আসে পুরুর আঙুলে।

জগুমামা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন,—ব্রিলিয়ান্ট! তুই চাকরিতে না ঢুকলে বলতাম, ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে ফ্যাল।...হবে, তোর হবে।

হবে কি না কে জানে, কিন্তু আগামী কয়েকদিন আমাদের কপালে কী আছে, জানি না! জগুমামা কীরকম একগুঁয়ে মানুষ, হাড়ে-হাড়ে জানি। থ্রেটনিং পেলে ওঁর আরও রোখ চেপে যায়। আমার কানে এখনও বাজছে লোকটার কথা—বেড়িয়ে যেন ফিরে যায়। এখানে একজন ইন্ডিয়ান মরলে কারও কিছু যাবে-আসবে না।

উফ, দেখো কাণ্ড!—মামা আবার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকালেন,—চিয়ার আপ মাই বয়! কত মারাত্মক সিচুয়েশন আমরা ট্যাকল করেছি। লোকটার ফোন নাম্বারটা লিখে নে। যদিও মোবাইলে স্টোর হয়ে আছে। তারপর আরামসে ঘুমিয়ে পড়। ...গুডনাইট।

৬

বিবিসি নিউজ মহাসমারোহে ইরাকযুদ্ধ দেখাচ্ছে। সাঁ-সাঁ করে প্লেনগুলো উড়ে গিয়ে বোমা ফেলে আসছে...ভেঙে পড়ছে ঘরবাড়ি...বিস্ফোরণ, ধোঁয়া...মা বাচ্চাকে নিয়ে ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন...।

অদ্ভুত! এই পাশবিক দৃশ্য বিবিসি 'লাইভ' দেখাচ্ছে। ব্রিটিশরা পছন্দ করছেন? সাদ্দাম যদি দোষ করেও থাকে, ইরাকের মানুষ তো কিছু করেনি!

জগুমামা বাথরুমে। আর আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি এসে যাবে। আমরা বেরিয়ে পড়ব।

সকালেই মামার সঙ্গে কথা হয়েছে শেফার্ডের। কাল রাতের হুমকি-ফোনের কথা জানিয়েছেন মামা। শেফার্ড জানিয়েছেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাঁকে ফোন নম্বরটা দেওয়া হয়েছে। তিনি সাবধান করেছেন, হুটহাট যেন দরজা না খুলি।

অর্থাৎ লন্ডনে এসেও শান্তি নেই।

ঠিক তখনই কলিংবেল বেজে উঠল।

—হু'স দেয়ার?

—বুবলাই। অনির্বাণ।

দরজার বাইরে আমাদের দু-দুটো ঢাউস ব্যাগেজ নিয়ে বুবলাইদা। পাশে একটি মেয়ে।

গুড মর্নিং টুকুল।—বুবলাই বলল,—সুনীতা মিট মাই কাজিন অর্ণব।

হাই!—সুনীতার মুখ গম্ভীর।

জগুমামা তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন। শোবার ঘরের দিকে চলে গেলেন। দু-মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। সুনীতা এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,—আঙ্কল! আপনি আমাদের বাঁচান! মা পাগলের মতো করছে। সোসাইটিতে মুখ দেখাতে পারছি না।...আঙ্কেল। প্লি-জ।

চোখ মুছতে লাগল। খুব কষ্ট হচ্ছে ওদের জন্য।

মামা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—সুনীতা মাই বেবি, প্লিজ বি স্টেডি। তুমি তো শুনেছ, আমি এখানে থাকছি, নিজে থেকে ডিটেকশনে থাকতে চেয়েছি। আই'ল ট্রাই মাই বেস্ট।...একটা কথা আমায় বলো, এই চুরি হওয়ার আগে বাবা তোমাদের কিছু বলেছিলেন?...এনি হিন্ট?

না:!—সুনীতা শূন্যচোখে তাকাল,—বাবা তাঁর কাজের ব্যাপারে বাড়িতে কিছুই বলতেন না। এভরি মর্নিং উনি আর আর্চার আঙ্কল নিজেদের বিজনেস নিয়ে অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলতেন।

—মিস্টার আর্চার মানে ওনার পার্টনার? ওঁকেও কি অ্যারেস্ট করেছে?

—হ্যাঁ। একই সঙ্গে। কবে যে বেল দেবে—!

বলতে-বলতে সুনীতা হঠাৎ থেমে গেল। চোখ কুঁচকে জগুমামার দিকে তাকিয়ে বলল,—হ্যাঁ আঙ্কল। প্রায় দশ-বারোদিন আগে একটা ফোন এসেছিল সকালে। বাবার সঙ্গে ফোনে খুব তক্কাতক্কি হল। ফোন রেখে দিয়ে বাবা নিজের মনে বলেছিলেন, 'ডিসগাস্টিং। যত্তসব অ্যাবসার্ড লজিক।' আমরা জিগ্যেস করেছিলাম,

'কার ফোন?' বাবা বললেন,—'ডিরেক্টর। কী যে বলেন, মাথামুণ্ডু নেই।...আমায় বোঝাচ্ছেন, ব্রিটিশরা অন্য দেশ থেকে গত দুশো বছরে যা কিছু ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে এসেছে, ওদের উচিত সেসব এখন ফেরত দিয়ে দেওয়া। এজন্যে জনমত তৈরি করতে হবে।'...ননসেন্স টক! সাহেবদের কাঁচকলা। কোহিনুর নিয়ে দু-দেশে এত হই-চই হল, কোনও লাভ হয়েছে?...'

জগুমামার চোখে আলো ঝিলিক দিল। বললেন,—তার মানে ডিরেক্টর চান...?

কথা শেষ হল না। আবার কলিংবেল।

—হু'জ দেয়ার?

—স্যার, শোফার। জিরো জিরো টু এইট।

—ওকে। প্লিজ ওয়েট।

বুবলাই একটু অবাক হয়ে তাকাল। বললাম,—পাসওয়ার্ড। কাল রাতে যা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে—।

অমনি বুবলাই বলল,—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মামা, কাল রাতে বাড়িতে তোমার এক বন্ধু ফোন করেছিলেন।

—বন্ধু! কে?

—দলবীর সিং। বললেন, উনি খবর পেয়েছেন, তুমি লন্ডনে এসেছ। তোমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার চাইলেন। আমি বাবার সেল নাম্বারটা দিয়ে দিলাম। যোগাযোগ করেছিলেন?

জগুমামা হাসলেন। বললেন,—দলবীর সিং নামে কাউকে আমি আদৌ চিনি না। এতক্ষণে পরিষ্কার হল, এই সেল নাম্বার স্কাউন্ড্রেলটা পেল কোত্থেকে!...যাকগে চলো। বেরোতে হবে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছি। আমাদের পাশে শোফার। বুবলাইয়ের ফোর্ড গাড়ি রাস্তার ওপারে পার্ক করা। ওরা আমাদের হাত নেড়ে রাস্তা পার হল। ওদের গাড়ির পাশে আরেকটা সাদা জাপানি নিশান। শোফার সায়েব সেদিকে আঙুল দেখাল,—সার, আসুন।

রাস্তাঘাট ফাঁকা-ফাঁকা, গাড়ি-টাড়িনেই। এদিকের ফুটপাতের গায়ে একটা 'লন্ডন ট্যাক্সি' দাঁড়িয়ে। দুদিকে তাকাতে-তাকাতে যেই আমরা ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমেছি, অমনি এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল!

আমি শুধু গাড়ির গর্জন শুনলাম! চোখের পলকে প্রচণ্ড জোরে আমাদের দুজনকে ধাক্কা মেরেছে আমাদের শোফার, দুজনে ছিটকে গিয়ে পড়েছি দুদিকে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে এসেছে কালো অস্টিন ট্যাক্সিটা! স্পিড সামলাতে পারল না। প্রচণ্ড শব্দ হল। পাশের ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে মেরেছে ট্যাক্সিটা। ওদিকে এক বৃদ্ধ সায়েব লাঠি নিয়ে এগোচ্ছিলেন। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেছেন। লাঠি ছিটকে পড়েছে দূরে। ভদ্রলোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। ল্যাম্পপোস্ট একদিকে হেলে পড়েছে। কাচের টুকরো রাস্তায় ছড়িয়ে। ট্যাক্সিটা এক সেকেন্ডও দেরি করেনি। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

দেখলাম, আমাদের 'শোফার' সায়েবের হাতে উদ্যত রিভলভার। ড্রাইভারের পাশের আরোহীকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি করল। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়েছে ট্যাক্সির উইনড্রো-স্ক্রিন।

কেউ ঘায়েল হল কি না জানি না, ট্যাক্সিটা ঊর্ধ্বশ্বাসে স্পিড বাড়িয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

আমাদের শোফার বাঁ-হাতে মোবাইল ফোন তুলে কাউকে কিছু জানাচ্ছে। বোধহয় ট্যাক্সির নাম্বার।

ইতিমধ্যে রাস্তার ওদিক থেকে উদ্বিগ্নমুখে ছুটে এসেছে বুবলাই-সুনীতা। জগুমামা নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওরা দুজন আমায় টেনে দাঁড় করাল। বিশ্বাসই হচ্ছিল না, সত্যি এখনও বেঁচে আছি!

সায়েব কাঁচুমাচু মুখে বলল,—সরি স্যার! ভাবতে পারিনি, শেষ পর্যন্ত লন্ডন ট্যাক্সিতে ক্রিমিন্যাল উঠবে।

নো ইস্যু মিস্টার!—জগুমামা কৃতজ্ঞভাবে বললেন,—থ্যাঙ্কিউ সো মাচ। আপনার জন্যেই রক্ষা পেয়েছি। তবে আফশোস, ওকে ধরা গেল না!

—ধরা পড়বে স্যর। কন্ট্রোলে জানিয়ে দিয়েছি।

—ট্যাক্সিটা ধরা পড়বে। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো লোকগুলো গাড়ি কোথাও দাঁড় করিয়ে পালিয়ে যাবে। তাই না?

রাইট সার।—শোফার চিন্তিতমুখে বলল,—আপনাদের সিকিওরিটির জন্যে আরও প্লেন ক্লোথড পুলিশ চাই। জানিয়ে দিয়েছি।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে হুটার বাজাতে-বাজাতে আলো ঘোরাতে-ঘোরাতে অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশ ভ্যান এসে পড়েছে। অবাক হয়ে দেখলাম, আধমিনিটের মধ্যে পড়ে থাকা বৃদ্ধকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকিয়ে দিল। পরক্ষণেই অ্যাম্বুলেন্স স্টার্ট দিল। ভদ্রলোকের পায়ে চোট লেগেছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

পুলিশ অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল আমাদের শোফার। নীচুগলায় কিছু বলছে। অফিসার আমাদের কাছে এসে বললেন,—সরি স্যার। কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাদের এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছি।

আমার গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ। কনকনে ঠান্ডাতেও ঘামে ভিজে গেছে অন্তর্বাস, সার্ট-প্যান্ট।

জগুমামা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে অস্ফুটে বললেন,—দে আর ট্রিমেন্ডাস ফাস্ট। রাত এগারোটায় ফোনকল। সকাল দশটার মধ্যে অ্যাকশন স্টার্ট।

ঠিক এই সময় আমার পকেটের মোবাইল ফোন পিঁপ-পিঁপ করে উঠল। ডিরেক্টর এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেলেন? কত এফিসিয়েন্ট ওরা!

—হ্যালো!

কেঁপে উঠলাম। কালকের সেই সায়েবি গলা,—গুড লাক। এবারের মতো বেঁচে গেলে। পরেরবার মিস হবে না।...লাস্ট রিকোয়েস্ট, রাতের ফ্লাইট ধরে দেশে ফিরে যাও।

আমার জবাব দেওয়ার শক্তি নেই। মাথা টলমল করছে, শরীর অসম্ভব ভারী মনে হচ্ছে। ফোনসহ হাতটা মামার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মামা বললেন,—ইয়েস! ডক্টর মুখার্জি হিয়ার।

তারপরেই তাঁর মুখের পেশি শক্ত হয়ে গেল। চাপা গলায় বললেন,—ওকে, ওকে।...ট্রাই এগেইন। উই আর অ্যাকসেপ্টিং ইয়োর চ্যালেঞ্জ।...নো-নো।...ইটস অলরাইট।

শোফার-সায়েব ভেতর থেকে জলের বোতল নিয়ে এসেছে। ঢকঢক করে গলায় ঢাললাম, ঘাড়ে-মুখে ছেটালাম। একটু স্বস্তি এল।

বুবলাই বলল,—মামা, আমরা কি যাব তোমাদের সঙ্গে?

প্রশ্নই নেই। তোরা ইমিডিয়েট চলে যা!—মামা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন। তারপর কী ভেবে আবার বললেন,—সুনীতা, তুমি ক'দিন কাজে যেও না। ফোনে জানিয়ে দিও।...বুবলাই, তুইও এ-ক'দিন মা-বাবার কাছেই থাকিস। কোনও প্রয়োজন হলেই জানাবি। ইন এনি প্রবলেম। ওকে?

—স্যর, এখন কি যাবেন? নাকি একটু রেস্ট নিয়ে...।

নট অ্যাট অল।—জগুমামা বললেন, স্ট্রেট স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হেড অফিস।

৭

—আমার মনে হয়, এটাই এই চুরির ঘটনায় মোস্ট ইমপর্টান্ট কোয়েশ্চেন।

কমিশনার অ্যালবার্ট ট্রুম্যান একদৃষ্টে মামার দিকে তাকিয়ে আছেন।

—ওই অ্যান্টিকের আশেপাশে ওর সমসাময়িক কিংবা আরও আগের কালের অজস্র দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ বস্তু ছিল। অন্যগুলো অপরাধী নিল না, এমনকী নেওয়ার চেষ্টাও করল না। শুধু মাঝখান থেকে আলেকজান্ডারের আংটিটা তুলে নিল। কেন?

—রাইট ডক্টর মুখার্জি। ইটস রিয়্যালি আ মিস্ট্রি।

—এর পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে। সো ফার আই গেস, এটা সাধারণ চুরি নয়! ওই আংটির সঙ্গে চোরের পার্সোনাল রিলেশনশিপ রয়েছে। যার জন্যে সে নিজে বা লোক লাগিয়ে এই কাজ করেছে।...তারপর যাতে ধরা না পড়ে, তার জন্যে আমাদের হুমকি দিচ্ছে, মেরে ফেলার চেষ্টা করছে।

—হাও ইস ইট পসিবল? প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের আংটির সঙ্গে এই কালের কোনও মানুষের সম্পর্ক থাকে কীভাবে?

—রাইট মিস্টার ট্রুম্যান।—এটা একমাত্র হতে পারে নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গা থেকে। যেমন আমরা ভগবানকে দেখিনি, অথচ বিশ্বাস করি। তেমনই কেউ যদি মনে-মনে বিশ্বাস করে সে আলেকজান্ডারের বংশধর, নিতে পারে। কিংবা পুরুর বংশধর, সেও নিতে পারে। এমনকী চিনদেশের কোনও রাজফ্যামিলির মানুষ, যে বিশ্বাস করে সে 'ঝাও' সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, সেও চুরি করাতে পারে। যেহেতু ওটা অরিজিন্যালি চিন দেশের জিনিস।

—সরি টু সে ডক্টর, ইট ইস ভেরি লাউড থিঙ্কিং! এইধরনের কোনও বিশ্বাস টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরির লোকের মধ্যে থাকা সম্ভব?

—মানুষের মন খুব বিচিত্র। সেখানে যখন কোনও ফিক্সেশন হয়ে যায়, সেটাকেই মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে। স্পেশালি পুরোনো রাজফ্যামিলির লোকেদের মধ্যে এই ধরনের কমপ্লেক্স অনেক সময়ে কাজ করে।

একটু থেমে বললেন,—আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করুন মিস্টার ট্রুম্যান। অপরাধী জানে, কেসটা 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' হাতে নিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ইনটেলিজেন্ট পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। তাতে তার আপত্তি নেই। সে সিওর, ধরা পড়বে না। কিন্তু যখনই সে জানতে পেরেছে, আমি এর মধ্যে ঢুকেছি, সঙ্গে-সঙ্গে আমায় টার্গেট করেছে। তার মানে বিজ্ঞানী ছাড়াও আমার যে অন্য একটা পরিচয় রয়েছে, এ ব্যাপারে সে ওয়েল অ্যাওয়ার।

ট্রুম্যান চিন্তিতমুখে মাথা নাড়লেন। বললেন,—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন ডক্টর মুখার্জি?

—হ্যাঁ, করছি। আমি নিশ্চিত, চুরির ব্যাপারে মিউজিয়ামের কোনও মানুষ জড়িত। আপনি আজকেই মিউজিয়ামের স্টাফদের মধ্যে গ্রিক, ভারতীয় বা চিনা অরিজিনের লোকেদের লিস্ট তৈরি করুন।

—ওকে। আর কিছু?

—ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার একমাসের ছবির সিরিজ আপনার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট দেখেছেন। কোনও ইরেগুলারিটি পেয়েছেন?

—না! দাঁড়ান, আমি সিডিটা নিয়ে আসতে বলি। আপনিও দেখুন।

—থ্যাঙ্কিউ। আমি আরেকটা ব্যাপার জানতে চাই।

বলেই টেবিলের ওপর থেকে সাদা কাগজ টেনে নিয়ে জগুমামা পেন দিয়ে একটা ম্যাপ এঁকে ফেললেন।

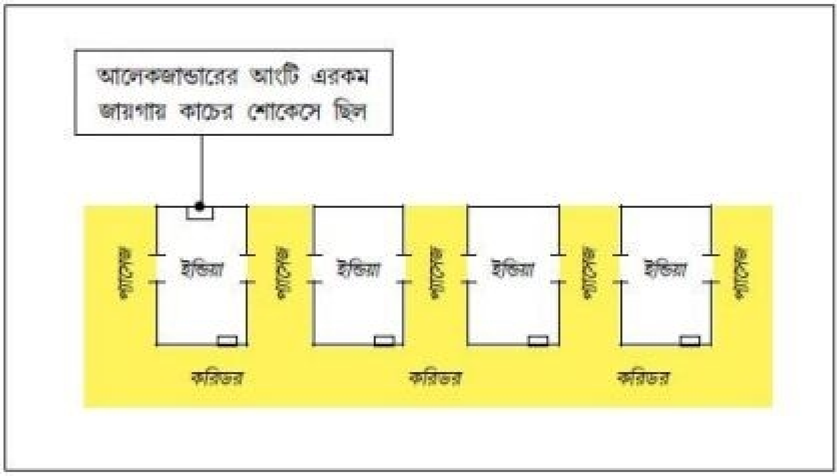

কমিশনারের ঘরে ঢুকলেন ব্যাজ-লাগানো উচ্চপদস্থ এক পুলিশকর্তা এবং তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সম্ভবত কম্পিউটার একসপার্ট। উনি সিডি ঢুকিয়ে দিলেন কমিশনার সায়েবের কম্পিউটারে।

মামা ম্যাপটা দেখিয়ে বললেন,—মোটামুটি এই হচ্ছে ওরিয়েন্টাল গ্যালারির ইন্ডিয়া হলগুলো। ইন্টারকানেক্টেড বাই প্যাসেজ। রাতে কি শুধু হলগুলো বন্ধ থাকে? প্যাসেজে সিকিওরিটির লোক টহল দেয়? ক্যামেরা কি শুধু হলঘরগুলোতে আছে?

—ইয়েস ডক্টর মুখার্জি।—মিস্টার হার্ডি, ঠিক বলছি তো?...সরি, আপনার সঙ্গে আলাপ করানো হয়নি। ইনি টমাস হার্ডি, ডেপুটি কমিশনার। এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার।

হ্যালো। —জগুমামা বললেন,—আমরা ইন্ডিয়া হলগুলোর ওই ঘরটার ছবিই দেখব তো, যেখানে আলেকজান্ডারের আংটি ছিল?

অবকোর্স।—হার্ডি বললেন,—কম্পিউটারেই আলাদা-আলাদা স্টোর হয়।...তবে স্যার, আমরা বেশ কয়েকবার দেখেছি, কোনও সন্দেহজনক কিছু পাইনি। তবু আপনি যদি দেখতে চান—।

—হ্যাঁ, প্লিজ ।

কম্পিউটার স্ক্রিনে ছবি ভেসে উঠেছে রাতের জনশূন্য হলঘরের। আলো জ্বলছে, পরপর ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে।

মামা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে।...একই ছবি, বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে।...মামা বললেন,—ফাস্ট ফরওয়ার্ড করুন তো!

অ্যাসিস্ট্যান্ট মাউস ক্লিক করলেন। এবার ছবিগুলো খুব দ্রুত আসছে...ঘরের ছবি... একইরকম...বিভিন্ন অ্যাঙ্গলে....ঘরের ভিতরে জনপ্রাণী নেই...।

বাঁ-হাতের ওপর চিবুক রেখে মামা নিষ্পলকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন।...স্তব্ধ হলঘরে শুধু ঘড়ির শব্দ—টিক-টিক...!

হঠাৎ বলে উঠলেন,—স্টপ! স্টপ!

সবাই হকচকিয়ে গেছি। স্ক্রিনে ছবি থেমে আছে।

—মাঝে দু-রাতের ছবি ওঠেনি?

—ওয়াট? স্যর, কী বলছেন বুঝতে পারছি না। এখানে পরপর একমাসের প্রত্যেক রাতের সব ছবিই রয়েছে।

নো-নো ও!—মামা সবেগে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন,—সব রাতের ছবি নেই। আশ্চর্য! আপনারা ভালো করে দেখুন!

হার্ডি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন মামার মুখের দিকে। মাথামুন্ডু কিছু বুঝছি না।

জগুমামা বললেন,—মিউজিয়ামের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাগুলো ডিজিট্যাল, তাই তো?

—হ্যাঁ স্যর।

—ডিজিট্যাল ক্যামেরার অ্যাডভান্টেজ জানেন তো? টাইমার সেট করা থাকলে 'ডেট অ্যান্ড টাইম' ছবির নীচে উঠে যায়। এখানেও উঠেছে। মিস্টার হার্ডি, ভুলে যাবেন না, আপনি পৃথিবীর সেরা পুলিশবিভাগের একজন অফিসার। প্রতিটি ছবির ফ্রেমের নীচে সময় ও তারিখ রয়েছে। এবার দেখেছেন?

হার্ডি বোবা।

মামা ফের বললেন,—একটু রিওয়াইন্ড করে নিয়ে আসুন। হ্যাঁ, এই দেখুন। ১০ অক্টোবরের পর ১৩ অক্টোবর। একই ছবি। ডেট না দেখলে আলাদা করার উপায় নেই। মাঝের দু-রাত কোথায় গেল?

হার্ডির চোয়াল ঝুলে পড়েছে। বিপন্ন চোখে তাকাচ্ছেন অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে। সে তাড়াতাড়ি বলল,—না স্যর, আছে, আছে। আমিই স্যর ভুল করেছি। মধ্যে খানিকটা অংশ পুরো ব্ল্যাক ছিল। তাই আমি স্যর ভেবেছি, ওই জায়গার ফিল্ম ডিফেকটিভ ছিল। ক্যামেরা নিজেই রিজেক্ট করেছে। সেই ভেবে স্যর, ওই অংশটা এডিট করে বাদ দিয়েছি।

সর্বনাশ!—জগুমামা চেঁচিয়ে উঠলেন,—এডিট করেছেন? রাশ প্রিন্ট কোথায়?

—স্যর, মাস্টার কপিতে আছে।

কমিশনার উত্তেজনায় ধমকে উঠলেন,—যান! যান! নিয়ে আসুন।

জগুমামা বিড়বিড় করে বললেন,—লেট আস হোপ, হি উইল গেট ইট।

টমাস হার্ডি পাথর হয়ে বসে আছেন। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এরকম ধাক্কা কল্পনাও করেননি।

জগুমামা উঠে কম্পিউটারের কাছে গেলেন। মাউস দিয়ে একটু রিওয়াইন্ড করে ১০ তারিখের ছবি ফিরিয়ে আনলেন। বললেন,—মিস্টার ট্রুম্যান, ভালো করে হলঘরটা লক্ষ করুন। সব দেখেছেন?...এবার তেরো তারিখের ছবিটা দেখুন। কোনও তফাত দেখলেন?

কমিশনার সিট থেকে উঠে দাঁড়লেন। উত্তেজনায় তাঁর গলা কাঁপছে,—মাই গড! গার্ড-এর ম্যানিকিন কোথায় গেল?

—দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। কিন্তু আসলে ম্যানিকিনটা বরাবর ছিল কি?...এই দেখুন, আমি পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ৮ তারিখের ছবি। কোথায় গার্ডের ম্যানিকিন? এই যে ৯। ম্যানিকিনটা দেখা যাচ্ছে। ৯ তারিখে এল, ১৩ তারিখে নেই?

একমিনিট ডক্টর মুখার্জি।—ট্রুম্যান বললেন,—আগে মিউজিয়ামের ডিরেক্টরকে ফোন করে জেনে নিই।...হ্যালো! ট্রুম্যান স্পিকিং। জাস্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন। তোমার মিউজিয়ামের ওই ইন্ডিয়া হল-এ কোনও ম্যানিকিন ছিল?...রয়্যাল গার্ডের?...আমি ধরছি...ওয়াট? ছিল না? শিট! ছবিতে যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! তারপর আবার ভ্যানিশ!...বিশ্বাস না হয়, নিজে দেখে যাও।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন,—শুনলেন তো? গার্ডের কোনও ম্যানিকিন থাকার কথাই নয়।

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বললাম,—একটু ডিস্টার্ব করছি। রয়্যাল গার্ড মানে?

—ও, তুই তো এখনও দেখিসনি। ব্রিটেনের রানির নিজস্ব রক্ষীবাহিনী আছে। তারা বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ পাহারা দেয়। বিচিত্র তাদের বেশ, ওই ছবিতে যেমন দেখলি। শতাব্দীর পর শতাব্দী একইরকম। চোখ দেখা যায় না, এমন নাক পর্যন্ত টুপি। তারা প্যালেসের বাইরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। আট ঘণ্টা পরপর 'চেঞ্জ অব গার্ড' হয়। তখন বোঝা যায়, ওরা মানুষ। এমন নিখুঁত স্ট্যাচু হয়ে থাকে, মনে হবে যেন মূর্তি। এদের দেখতে সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে। এরা হল রয়্যাল গার্ড।...ন্যাচারালি সবাই ধরে নিয়েছিলেন, মিউজিয়ামের আকর্ষণ হিসেবে ওই 'রয়্যাল গার্ড'-এর ম্যানিকিন নতুন বসানো হয়েছে। ম্যানিকিন বুঝলি তো? কলকাতাতেও দেখবি, বড়-বড় শাড়ি-জামার শোরুমে পুরুষ-মহিলার প্রায় জীবন্ত মূর্তি উইন্ডোতে বসানো থাকে।

ইতিমধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে এসেছেন। হাতে একটা সিডি। 'মাস্টার সিডি'টা ঢুকিয়ে দেওয়া হল কম্পিউটারে।

সিডি চলছে। আমাদের সবার চোখ স্ক্রিনে। কিন্তু কোনও তফাতই নেই আগেরটার সঙ্গে। শুধু ছবি একটু অপরিষ্কার, আর সব হুবহু এক।

সহকারী নিচুগলায় হার্ডিকে বললেন,—একই স্যর।

১০ অক্টোবরের ছবি শেষ হল। অমনি গোটা স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। কুচকুচে কালো। কম্পিউটার কিন্তু চলছে, সিডি ড্রাইভে সবুজ আলো দপদপ করছে।

দমচাপা উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে আছি। স্ক্রিনে অথৈ অন্ধকার। শেষই হচ্ছে না।...সত্যিই কি এই ক'দিন ফিল্ম গোলমাল করছিল?

জগ্গুমামা বললেন,—মনিটরের ব্রাইটনেস আর কনট্রাস্ট একটু বাড়ান।

এবার অন্ধকার একটু ঝাপসা হল। এককোণে একটা আলোর বিন্দু না?

আমরা টানটান। আলোর বিন্দুটা একটু-একটু বড় হচ্ছে। জানলার আউট লাইন। জানলা খুলছে? আলোটা নড়ছে, ঘুরছে।

হলঘরে বাইরের আলো ঢুকেছে, মনে হচ্ছে। হল-এর খিলান, দেয়ালের কোণ-খাঁজে সরু-সরু রেখা। জানলা দিয়ে কালো একটা অবয়ব ঢুকছে ভেতরে।

ভেতর থেকে কেউ পেন্সিলে টর্চ দেখাচ্ছে। ছোট্ট আলোর বৃত্ত। আবছা দুটো মূর্তি ঘোরাফেরা করছে ভিতরে।

স্ক্রিনের ওপর সবাই ঝুঁকে পড়েছেন।...টর্চধারী সিগন্যাল দিয়ে আগন্তুককে নিয়ে এসেছে শোকেসে। মাঝে-মাঝে আলোর ফোঁটা চলকে পড়ছে কাচের ওপর।

টর্চের ফোকাস এবার সরাসরি আলেকজান্ডারের আংটির ওপর! হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আংটিটা। একটা হাত কাচ তুলল। কবজি পর্যন্ত আরেকটা হাত ঢুকল আংটির দিকে।...আংটিটা মুঠোয় ধরেছে...ব্যস! আলো নিভে গেল। মিশমিশে অন্ধকারে ভরে গেল কম্পিউটারের স্ক্রিন।

অন্য অ্যাঙ্গল থেকে আরেকটা ক্যামেরা এবার ধরেছে...অবয়ব চলে যাচ্ছে জানলার দিকে...বাইরে বেরিয়ে গেল...রাস্তার আলোয় ছায়ামূর্তিকে বোঝা যাচ্ছে...জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে ভেতরের সহযোগী...য-যা:! আবার সব অন্ধকার।

এরপরেও কিছুক্ষণ স্ক্রিন কালো। তারপরের ছবি আবার স্বাভাবিক।

ঘর জুড়ে পিন-পড়া স্তব্ধতা। মুখ ঢেকে বসে আছেন ডেপুটি কমিশনার টমাস হার্ডি। কমিশনার ট্রুম্যান উত্তেজনা কমাতে বাঁ-হাতের আঙুলে টোকা মারছেন টেবিলে।

জগুমামা বললেন,—রিওয়াইন্ড করে প্রথম যেখানে হাতটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে নিয়ে যান।...হ্যাঁ, এইখানে। এবার পরপর ছবিগুলোর 'স্টিল প্রিন্ট' দিন। হাত কাচ তুলছে, শোকেসে ঢুকছে, আংটিটা তুলছে, মুঠোয় ভরছে...এই পর্যন্ত।

আমি এখনই প্রিন্ট নিয়ে আসছি।—কম্পিউটার-সায়েব চটপট উঠে দাঁড়াল। সিডিটা বের করে ফেলেছে।

কোথায় যাচ্ছেন?—জগুমামা অবাক হয়ে বললেন,—কোথাও যেতে হবে না। এই তো দেখছি, এখানে কালার প্রিন্টার আছে।

—না স্যর, এখানে ডিজিটাল প্রিন্ট হবে না। নীচের তলায় সব ব্যবস্থা আছে।

—বলছি তো, কোনও দরকার নেই। অর্ডিনারি প্রিন্টে কাজ চলবে। ফুল সাইজ প্রিন্ট দিন।

ছেলেটা খুব অনিচ্ছার সঙ্গে প্রিন্টগুলো বের করছে। জগুমামা দেখছেন আর মাথা নাড়ছেন। এগিয়ে দিচ্ছেন কমিশনার সায়েবের দিকে। মোট দশটা প্রিন্ট।

—থ্যাঙ্কস। এবার মাস্টার সিডি বের করে আমায় দিন। কম্পিউটার অফ করে দিতে পারেন।

সিডিটা জগুমামার হাতে তুলে দিয়ে যুবক বলল,—আমি তাহলে যাই স্যর?

এত তাড়া কীসের? বসুন।—জগুমামা তাকালেন কমিশনার সায়েবের দিকে। দু-জনের চোখে-চোখে কী কথা হল জানি না, কমিশনার ফোন তুলে কিছু বললেন। একমিনিটের মধ্যে পাঁচজন পুলিশ ঘরে ঢুকে স্যালুট ঠুকল। সোজা এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে। কাঁধ ধরে টেনে তুলছে।

—এটা কী হচ্ছে স্যর? অ্যাই! কাঁধ ছাড়ো।

—তোমায় অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। আংটি চুরির কনস্পিরেসিতে ইনভলভ থাকার জন্যে। পুলিশ কোর্টে তোমার বিচার হবে।...ওর পকেট থেকে সেলফোন বা রিভলভার...যা পাবে, সব বের করে নেবে। ওকে এমন জায়গায় নিয়ে আটকে রাখো, যাতে কেউ জানতে না পারে যে ও কাস্টডিতে আছে। কোনও ফোন এলে বলবে, অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে।...ইজ দ্যাট ওকে, ডক্টর মুখার্জি?

—টুহান্ড্রেড পার্সেন্ট।

লোকটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশরা। জগুমামা দীর্ঘনি:শ্বাস ফেলে বললেন,—ভাবা যায়! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও সর্ষের মধ্যে ভূত!... মিস্টার ট্রুম্যান, এইমুহূর্তে আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে। এক, আজ রাতে অপারেশন চালিয়ে আসল অপরাধীকে ধরতে হবে। দুই, ডক্টর শেফার্ডের সঙ্গে কথা বলে কাল আমাদের ইন্ডিয়া যাওয়ার ফার্স্ট ফ্লাইট ধরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রেফারেবলি লন্ডন-দিল্লি ফ্লাইট।...ইট উইল বি স্ট্রিকটলি কনফিডেন্সিয়াল।

—আপনারা কালই দেশে ফিরে যাবেন?

—নোও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলেকজান্ডারের আংটি এখন ইন্ডিয়ায়। পাচার হয়ে গেছে। অপরাধীকে জেরা করলে স্বীকারও করবে। তখন জানা যাবে, ভারতের কোথায়, কার হেফাজতে ওটা এখন গচ্ছিত আছে। কিন্তু অত রাতে তো আর ভোরের প্লেনের টিকিট পাবেন না।

—আপনি এতটাই সিওর?

জগুমামা হাসলেন।—আমার ক্যালকুলেশন তাই বলছে।

ঝুঁকে পড়লেন কমিশনারের দিকে। ফিসফিস করে দুজনের মধ্যে কিছু কথা হল। এদিক পর্যন্ত পৌঁছল না। শুধু শুনলাম, ট্রুম্যান বলছেন,—দ্যাটস গ্রেট।...ফাইন!...আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।...

—ওকে দেন?...লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। চল টুকলু।

—সে কী? আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে যান। য়ু আর আওয়ার অনারেবল গেস্ট।

—থ্যাঙ্কিউ মিস্টার ট্রুম্যান। গেস্ট হাউসে অর্ডার দেওয়া আছে।

আমাদের সাদা 'নিশান' এসে থামল গেস্ট হাউসের সামনে। ড্রাইভারের পাশে দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ। তারা আগে নেমে দরজা খুলল।

লক্ষ করলাম, আমাদের গাড়ির ঠিক পিছনে এসে থেমেছে একটা পুলিশভ্যান। ভিতর থেকে সাত-আটজন পুলিশ বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। ওরা চতুর্দিক দেখছে।

ওদের মধ্যে থেকে দুজন এগিয়ে গেল গেস্ট হাউসের দিকে। বাকিরা আমাদের কর্ডন করে রয়েছে।

বুঝলাম, কমিশনার সায়েব আমাদের বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না।

গেস্ট হাউসের মেন গ্রিলগেট বন্ধ। গেটের পর ছোট উঠোন পেরিয়ে ছ-তলা বাড়ি।

গেটের পাশে কলিংবেল। আমরা গেট থেকে প্রায় বারো ফুট দূরত্বে। একজন পুলিশ কলিংবেলে আঙুল ঢোকাল।

সঙ্গে-সঙ্গে—বু-ম-ম-ম...! আকাশফাটা বিস্ফোরণ! অজস্র কেউটের মতো লাফিয়ে উঠল আগুনের লালচে ফণা! অন্তিম আর্তনাদ!

আমার সর্বাঙ্গ আগুনের উত্তাপে ঝলসে গেল! গড়িয়ে পড়েছি গাড়ির বনেটের ওপর।

ছিন্নভিন্ন দেহগুলো রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে। রাজপথ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কী মর্মান্তিক দৃশ্য। অসহ্য!

'ওঁয়া-ওঁয়া'...! পুলিশের সাইরেন। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

আমাদের ওই অবস্থাই হত, ওরা না থাকলে। জগুমামা কোথায়? দাঁড়িয়ে মুখ মুছছেন, চোখ বন্ধ। মামা এমনিতে খুব কঠিন। কিন্তু অসহায় মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না।

৮

উইন্ডোর বাইরে চকচকে নীল আকাশ। কোনাকুনি সমান্তরাল রেখায় লাল সূর্য। নীচে থোকা-থোকা সাদা তুলোর ঢেউ। মেঘের অথৈ সমুদ্র। তার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে আমাদের খেলাঘর, হাসিকান্নায় ভরা পৃথিবী।

পঞ্চাশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের পেল্লায় বিমান। প্রায় বারোশো যাত্রী।

ঠিক পাশে জগুমামা। চশমা কপালে তোলা। চোখ বন্ধ।

—মামা।

—উঁ।

—শরীর খারাপ লাগছে?

—নারে। শরীর ঠিক আছে। মনকে বশে আনতে পারছি না। যতবার কিছু ভাবতে চেষ্টা করছি, ততবার কাল দুপুরের ছবিটা ভেসে উঠছে। উ:, কী রক্ত! ভুলতে চেষ্টা করছি, পারছি না।

—ভোলা অসম্ভব। দু-দুটো ইয়ংম্যান। কয়েক সেকেন্ডে শেষ! শুধু একটা আংটির জন্যে। কী সাংঘাতিক! তুমি-আমি যখনই কোনও রহস্যে জড়িয়ে পড়ি, কেউ-না-কেউ মারা পড়বেই। আমাদের ওপর নিশ্চয়ই কোনও অভিশাপ আছে।

—দুর বোকা! যত বাজে কুসংস্কার। আসলে আংটিটা হয়ে গেল উপলক্ষ্য, জেদ-ক্রোধ আর প্রতিহিংসা হয়ে উঠল মেন ফ্যাক্টর। ইন্ডিয়ান হয়ে আমরা ব্রিটিশ পুলিশকে সাহায্য করছি, ওরিজিন্যালি যেটা ভারতের সম্পত্তি ছিল, সেটা ব্রিটিশদের আবার ফেরত দিয়ে দেওয়ার জন্য তদন্ত করছি, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। ওর চোখে আমরা মীরজাফর। তাই সবরকম চেষ্টা করেছে আমাদের খতম করতে।

—হ্যাঁ, তাই দেখলাম। কাল রাতে যখন ওদের অ্যারেস্ট করে আনা হল, অজয় পুরোহিতের চোখ দেখেছিলে? রাগে-ঘৃণায় ফেটে পড়ছে, পারলে আমাদের ছিঁড়ে খায়!

—ও যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, আংটির ন্যায্য মালিকানা ওদের। ওরাই রাজা পুরুর বংশধর। পুরোহিত। ইংরেজরা লুঠ করে নিয়ে এসেছিল। সুতরাং যেভাবে হোক, ফেরত নিয়ে যেতে হবে। এ একধরনের মানসিক রোগ। ইতিহাসের চাকা যে পিছনদিকে ঘোরানো যায় না, এটা ওকে কে বোঝাবে? ওর সাবজেক্ট অ্যানথ্রপলজি। পড়তে শুরু করল ভারতীয় রাজারাজড়ার কাহিনি। 'মহারাজাস অব ইন্ডিয়া'। অবাক হয়েছিলাম, হঠাৎ এই বই পড়ছে কেন? স্রেফ কৌতূহল, নাকি রাজফ্যামিলির সঙ্গে ওদের সত্যি কোনও কানেকশন আছে?...

সত্যি, কাল সারাদিন জুড়ে যেন সাইক্লোন বয়ে গেছে। সক্কালবেলায় আমাদের ওপর প্রথম অ্যাটেম্পট। তারপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কমিশনারের ঘরে টানা চার ঘণ্টা ইনভেস্টিগেশন, ফেরার সময় ওই মর্মান্তিক ঘটনা। এরপর ছোটাছুটি, হাসপাতাল।...ছাড়া পেয়ে আবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সদর দফতর। ঠিক সাতটায় আচমকা বাড়ি এবং মিউজিয়ামে হানা দিয়ে তুলে আনা হয়েছিল ডক্টর অজয় পুরোহিত, ভাইপো বিক্রম ও তার বউ রেশমিকে। প্রায় একই সময়ে টেগোর সেন্টার থেকে নিয়ে আসা হল সুনীল আচার্যকে। এই আইডিয়াটাও মামার। সুনীলবাবু পুরোহিতদের বাড়িতে থাকবেন। ফোন ধরবেন। দেশ থেকে যদি ফোন আসে, সুনীলবাবু বলবেন, ওরা তিনজন দুদিনের জন্যে হঠাৎ বাইরে বেড়াতে গেছেন। সুনীল আচার্যকে বিক্রমের বাবা-মা সবাই চেনেন, সন্দেহ করবেন না। সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারকেও রাখা হয়েছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ওদের আনার পর শুরু হল ম্যারাথন ইনটারোগেশন। সে দেখার মতো ব্যাপার! ঘর ভর্তি অজস্র মেশিন, কম্পিউটার, ক্যামেরা, নানারঙের আলো। ছ'জন স্পেশালিস্ট অফিসার ঘিরে রয়েছেন।

এর মধ্যেই বারবার ফোন আসছিল সেলফোনে। বুবলাই করল। ন'মাসি করলেন। সব শেষে ভারত থেকে বাবা। কিছুটা শুনেছেন। তবে আমরা যে ইন্ডিয়া যাচ্ছি, সেটা কাউকে বলিনি।

অবশেষে রাত এগারোটায় 'ব্রেক' করলেন 'ওরিয়েন্টাল গ্যালারির' কিউরেটর ডক্টর অজয় পুরোহিত। ঠিক তার আগেই জগুমামা 'ব্রহ্মাস্ত্র' প্রয়োগ করেছেন। সেই রাতের ভিডিও স্ক্রিনিং করতে-করতে একজায়গায় ছবি থামিয়ে জিগ্যেস করেছেন, 'এই হাতটা চিনতে পারেন ডক্টর পুরোহিত? আপনার ডান হাতটা একবার দেখান তো!'

ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় তোলা ভিডিও-র ওই মোক্ষম জায়গাটা, যেখানে পেনসিল টর্চের আলোয় স্পষ্ট, একটা হাত কাচ তুলছে, অন্য হাত মুঠোয় ভরে তুলে আনছে আলেকজান্ডারের আংটি। হাতটার কবজির পরেই লম্বা কাটা দাগ। ডক্টর পুরোহিত প্রথম রিফ্লেক্সে সঙ্গে-সঙ্গে হাত লুকোনোর চেষ্টা করলেন! তারপর এলিয়ে পড়লেন সোফায়। একে-একে স্বীকার করে নিলেন।

এয়ার-হোস্টেস পাইন্যাপেল জুস দিয়ে গেছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম,—মামা, ডক্টর পুরোহিতকে কখন তোমার প্রথম সন্দেহ হল?

—মিউজিয়াম থেকে ফিরতে রাতে যখন প্রথম থ্রেটনিং-কল এল। তুই সবচেয়ে ভালো জানিস, আমাদের লন্ডনের ল্যান নাম্বার বাইরের লোকেদের মধ্যে জানতেন মাত্র তিনজন—ডিরেক্টর, বিক্রম ও সুনীল। তুই হিথরোয় দিয়েছিলি বিক্রম-সুনীলকে, আমি জন শেফার্ডকে। শেফার্ড আর সুনীলবাবু সকালে ফোনও করেন। আমরা বিক্রমদের বাড়ি হয়ে মিউজিয়ামে যাই। ওখানে বিক্রমের কাকার সঙ্গে আলাপ হল। অজয় সে কথা বাড়িতে জানাতে সুনীল নিশ্চয়ই আমাদের সম্পর্কে ভালো-ভলো কথা বলে। ওরা ভয় পেয়ে গেল। এবং

ভুল করল। দলবীর সিং নামে এক ভুয়ো বন্ধুর পরিচয় দিয়ে বুবলাইয়ের কাছ থেকে আমাদের জিম্মায় থাকা চক্রবর্তীদার সেলফোন নাম্বার নিল। ফোন করে ভয় দেখাল আমাদের। অন্য কোনও সোর্স হবে কী করে? লন্ডনে আমাদের তো কেউ চেনেই না।

—কিন্তু প্রথম দিন নিজেই যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার কথা বললেন। উইলসন ভুলে গেছিলেন।

—গুড অ্যাক্টিং! আমাদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে। অজয় জানত, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কম্পিউটার-অ্যানালিস্ট এসে সিডি কপি করে নিয়ে গেছে। তাকে ওর সেটিং করা আছে, ফিল্ম নষ্ট হয়ে গেছে বলে এডিট করে রাখবে। ফিল্মে ধরা পড়বে না। ফোনে বলছিল না, 'পুলিশ তদন্ত করে করুক, তোমার মামা যেন এরমধ্যে না থাকেন।'...তাছাড়া বিশ্বনাথ প্যাটেলকে ডিরেক্টর নয়, উনিই ফোন করে 'ফেরত দেওয়া উচিত' বলেছিলেন। প্যাটেল জেরার সময় পুলিশকে সে কথা বলেছিলেন। পুলিশ বিশ্বাস করেনি।

—কিন্তু ওইরকম নিশ্ছিদ্র সিকিওরিটির চোখ এড়িয়ে হলঘরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছল কী করে? হলগুলো সব বন্ধ। বাইরে রক্ষী টহল দিচ্ছে। সিকিওরিটির লোককে হাত না করতে পারলে কী করে পৌঁছবে?

—বিশ্বনাথজিকে ফোন করে সেই চেষ্টাই করেছিল। বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু কাজ হল না। তখন দুর্দান্ত একটা মতলব আঁটল!

আমি হতভম্ব হয়ে শুনছি। জগুমামা বললেন,—প্রথম কথা অজয় বহুদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চাকরি করছে। জানত, মিউজিয়ামের যেখানে ইন্ডিয়া হলগুলো, সেটা পিছনদিক। সবচেয়ে দুর্বল নিরাপত্তা। গ্যারাজ আছে, গাড়ি পার্ক করা থাকে। লোকজন কেউ থাকে না। ওই হল-এর একটা জানলা বেছে নিল। তার লক আলগাভাবে খুলে রাখল। এদিকে আবার করল কী, বাকিংহ্যাম প্যালেসের 'রয়্যাল গার্ড'দের মধ্যে থেকে একজন রিটায়ার্ড গার্ডকে খুঁজে বের করল। যার কাজ, সকাল থেকে ম্যানিকিন অর্থাৎ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা। ওই হলের এককোণে। লোকে মনে করবে, মোমের তৈরি ম্যানিকিন! দ্রষ্টব্য হিসেবে এনে রাখা হয়েছে। দুদিন দাঁড়াবার চুক্তি হল। প্রথম দিন রিহার্সাল। পরদিন ফাইনাল অপারেশন। লোকটার কাজ, মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হল-এ যখন তালা দিয়ে দেবে, সে 'জীবন্ত' হয়ে উঠবে। সার্কিট সুইচগুলো অফ করবে। আলো নেভাবে। জানলা খুলে দড়ির মই ঝোলাবে। পুরোহিত তার আগেই গ্যারাজ দিয়ে উঠে দোতলা পর্যন্ত এসে অপেক্ষা করবে। তারপর মই বেয়ে ওপরে উঠে আসবে।...জানলা দিয়ে ঢুকে পড়বে হল-এর ভেতরে।

—ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরাগুলো অফ করল না কেন? তাহলে তো ধরা পড়ত না।

—অফ করার উপায় নেই বলে। সেন্ট্রালি অপারেটেড।

—বাপরে! কী ইন্টেলিজেন্স। একটা কথা বলো, তুমি কী করে অত সিওর হচ্ছিলে, আংটিটা ভারতে ফেরত চলে গেছে? আগে থেকে টিকিট পর্যন্ত কাটিয়ে রাখলে।

—মনে নেই, বিক্রম বলেছিল, বাবা এদেশে এসেছিলেন। সপ্তাহখানেক আগে দেশে ফিরে গেছেন! ওরা তো ভাবতে পারেনি, 'মান্থলি ক্লিনিং'-এর সময় উইলসনের হাতে নকলটা ধরা পড়বে। যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বানিয়েছিল। সাধারণ চোখে আসল-নকল তফাত করা যায় না।

একসকিউজ মি। ভেজ অর নন-ভেজ?—এয়ার-হোস্টেস ট্রলি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

নন-ভেজ।—মামা বললেন,—এবার খেয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। টাইম-জোন ক্রস করব, আমরা পুবে যাচ্ছি। হিসেবমতো আট ঘণ্টা লাগলেও ঘড়ির কাঁটায় তেরো ঘণ্টার ফারাক হবে। দিল্লি পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে।

—আমরা কি রাতে অমৃতসর পৌঁছচ্ছি?

—না-না। দিল্লি থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার। পাকিস্তান বর্ডারের কাছে। ওভারনাইট ট্রেন জার্নি। কাল ভোরে অমৃতসর।

—খুঁজে পাবে তো? বিজয় আংটিটা কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন, সেটা তো অজয় বলতে পারেননি।

দেখা যাক।—জগুমামা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন,—শেষ পর্যন্ত যদি না পাই, তবে পুলিশি দাওয়াই দিতে হবে। কালকে পট্টনায়েককে বলে রেখেছি। সব ব্যবস্থা করা থাকবে। আজ পৌঁছে না হয় আর একবার কথা বলে নেব।

৯

এসি-ফার্স্ট ক্লাসের ঠিক সামনে অপেক্ষা করছিলেন। সাদা সাফারি, সাদা পাগড়ি, চোখে রিমলেস চশমা। দু-হাতে বড় কাগজে ইংরেজিতে ছাপা—ডক্টর জে. বি. মুখার্জি।

আমরা পা বাড়াতেই উনি এগিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন,—গুড মর্নিং ডক্টর মুখার্জি। দিস ইজ দলবীর সিং, এস. পি., অমৃতসর সিটি। অ্যাট ইওর সার্ভিস।

'খচ' করে উঠল! সেই রাতে বুবলাইকে মামার বন্ধু পরিচয় দিয়ে ফোন করেছিল 'দলবীর সিং' নামেরই এক ব্যক্তি। জগুমামার দিকে তাকাতে উনি হেসে বললেন,—একেই বলে কাকতালীয়!

দলবীর বাংলা বুঝতে না পেরে হিন্দিতে বললেন,—কিছু বলছেন সারজি?

—না। আপনার নামের কোনও এক বদমাশ ফোন করেছিল লন্ডনে।...এনিওয়ে, প্রোগ্রাম সব সেট করা আছে?

—হাঁ জি। কাল থেকে বাড়ির চারপাশে প্লেন ড্রেসড পুলিশ পোস্টিং আছে। আমার নিজস্ব ফোর্স। কোনও ঘটনা ঘটেনি।...এখন কি সিধা ওখানে যাবেন?

—হ্যাঁ।...একসট্রা ফোর্স নিয়ে নিন। লেডি পুলিশ রাখবেন। আমরা বাড়িতে ঢোকার পরপর সব ঢুকে পড়বে।...বাড়িতে মোট ক'জন?

—বাবা-মা, দুই ছেলে, দুই বউ, চারটে বাচ্চা। দারোয়ান নিয়ে মোট তিনটে কাজের লোক। টোটাল তেরো জন।...আসুন সারজি। গাড়ি রেডি।

অমৃতসর শহর ছাড়িয়ে দিল্লি রোড। ফাঁকা রাস্তায় আরও দশ-বারো মিনিট ড্রাইভ। প্রথমে ইয়ুথ হোস্টেল। তারপরেই হাইওয়ের ওপর সাদা পাথরের বিরাট বাড়ি। সামনে অনেকখানি জমি নিয়ে বাগান। লোহার ফটক।

ঘড়ি দেখলাম। সবে সকাল সাতটা।

পরপর দু-তিনবার জোরালো হর্ন। একজন ধুতি-কুর্তা পরা মাঝবয়েসি লোক ফটকের ওপারে এসে দাঁড়াল।

—কাকে চান?

—বিজয়জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—একঘণ্টা পরে আসুন। বড়বাবু ঘুম থেকে ওঠেননি।

—বলো, আমরা লন্ডন থেকে আসছি। অজয়জি, বিক্রমজি কিছু জরুরি কাগজ পাঠিয়েছেন! পরে আর আসতে পারব না।

ফটক বন্ধ রেখে লোকটা দ্রুত বাড়ির ভেতরে চলে গেল। একমিনিটের মধ্যে একইরকম গতিতে বেরিয়ে এসে ফটক খুলে পাশে দাঁড়াল। আমাদের গাড়ি বাগান পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে এসে দাঁড়াল।

গলা পেলাম,—রামেশ্বর, সাহাবদের ওপরে নিয়ে এসো।

বাঁ-দিকের সিঁড়ি দিয়ে রামেশ্বরের পিছু-পিছু আমরা দোতলায় উঠলাম। পোর্টিকোর ওপর তিন-চারটে গার্ডেন চেয়ার পাতা। ইজিচেয়ারে সাদা ধপধপে গোঁফ-চুলের ভদ্রলোককে দেখে চোখ বুঁজে বলে দেওয়া যায় ইনিই বিক্রমের বাবা বিজয় পুরোহিত। বাপ-ছেলের মুখে খুব মিল।

—বসুন।...আপনাদের নাম?

—আমি জগবন্ধু মুখার্জি। ও আমার ভাগ্নে অর্ণব। ইনি আমাদের লোকাল ফ্রেন্ড।

দলবীরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিজয় বললেন,—আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি।...যাকগে, জরুরি কী দেবেন, দিন। বিক্রম পাঠিয়েছে?.....ওরা কোথায় বলুন তো? কাল রাতে ফোন করেছিলাম, ওর এক বন্ধু ধরেছিল। বলল, ওরা সবাই বেড়াতে গেছে।

মামার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল।

—উনি আর কিছু বলেননি?

—না:! কী হয়েছে?

—ওহো! আপনাকে বলতে খারাপ লাগছে।...আলেকজান্ডারের আংটি, যেটা মিউজিয়াম থেকে চুরি গেছিল, তার তদন্তে আপনার ভাই অজয় পুরোহিত দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ওরা হোল ফ্যামিলি অ্যারেস্টেড।

কী! —মুহূর্তে সোজা হয়ে বসেছেন বৃদ্ধ। দু-চোখ উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে,—অজয়কে ধরেছে? ওর কাছে আংটি পেয়েছে?

—না। তবে অজয়বাবু দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেও দিয়েছেন, আংটি কোথায়!

—বলে দিয়েছে? কী বলেছে?

বলতে-বলতে হঠাৎ আঙুল তুলে বললেন,—আপনারা-আপনারা কারা? কোত্থেকে এসেছেন? বলুন তো? শিগগির বলুন। আমি ছেলেদের ডাকছি। অনিল! মুকেশ! জলদি ইধার আও! ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব রিভলভার আছে!

জগুমামা হেসে উঠলেন। বললেন,—কোনও লাভ হবে না বিজয়জি। আপনার বাড়ির মধ্যে প্রতিটা ঘরে পুলিশ ঢুকে পড়েছে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। ওরা কাউকে নড়াচড়া করতে দেবে না। আপনি ডাকলেও কেউ আর আসতে পারবে না!

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। বিজয়ের তর্জন থেমে গেছে। নিশ্চল, নির্বাক। চক্ষুদুটি জ্বলছে খাঁচায় বদ্ধ বাঘের মতো।

—আমরা তৈরি হয়েই এসেছি বিজয়জি। আপনি বৃদ্ধ মানুষ, আপনাকে টানাহ্যাঁচড়া করতে চাইছি না। আংটিটা দিয়ে দিন। কোনও অশান্তি হবে না।

আংটি! —অস্ফুটে বললেন বিজয়,—আংটি আমার কাছে আসছে কোত্থেকে? আমি আংটির কথা জানিই না!

জগুমামা আবার হাসলেন। বললেন,—তাই? আপনার ভাই যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে জানিয়েছেন, দাদাকে দিয়ে ওই আংটি ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—বাজে কথা, ঝুট বাত! আমি আনতে যাব কেন?

—ওই আংটিকে ওরিজিন্যালি আপনাদের ফ্যামিলি প্রপার্টি বলে মনে করেন, তাই। তাই না এত কাণ্ড! শুনুন, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি তাহলে দিচ্ছেন না?

—আমার কাছে নেই তো দেব কী করে?

—বেশ। আমরা খুঁজে দেখছি। যদি খুঁজে না পাই, তারপর পুলিশ যা করার করবে। কথা কীভাবে বের করতে হয়, পুলিশ খুব ভালো জানে।

বিজয় পুরোহিত কোনও জবাব দিলেন না।

জগুমামা কয়েকমুহূর্ত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—চলুন দলবীরজি।

তিনতলা অট্টালিকা। ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এসে পৌঁছেছি বিজয় পুরোহিতের শোবার ঘরে। ঠিক পরেই ঠাকুরঘর।

—মনে হয় ঠিক জায়গায় এসে গেছি।

আগাগোড়া গোলাপি মার্বেল দিয়ে তৈরি ঠাকুরঘর। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ধূপ-অগরুর সৌরভ ছড়িয়ে আছে। পুবদিক জুড়ে দেবদেবীর অধিষ্ঠান। পরপর হনুমান, কৃষ্ণ, গণেশ, কার্তিক, অষ্টভূজা দুর্গা, রাম-সীতা, বৈষ্ণোদেবী। সবার মধ্যমণি মা লক্ষ্মী। প্রায় ৫ ফুটের দেবীমূর্তি। রুপোর তৈরি, সর্বাঙ্গে বহুমূল্য সব অলঙ্কার। বোঝা যায় লক্ষ্মী মাতা এই পরিবারের কুলদেবী।

জগুমামা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন লক্ষ্মীদেবীর দিকে। বিগ্রহের বাঁ-হাতের সোনায় মোড়া ঝাঁপির ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এবং উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—পেয়েছি! পেয়েছি!

স্থানকাল ভুলে ছুটে গেলাম। মামার হাত থেকে আংটিটা ছিনিয়ে নিয়ে তালুর মধ্যে রেখে দেখছি। এই সেই দুর্লভ আংটি। জেড পাথরের কারুকার্য করা। আড়াই হাজার বছর বয়েস। ঝাও রাজা পরেছেন! আলেজান্ডার পরেছেন! পুরু পরেছেন! তারপর.....কত শতাব্দী-সহস্রাব্দ পার হয়ে গেছে। এখনও অবিকল। অতীত যেন কথা বলছে!...আমার হাতের মুঠোয়! ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে উঠছে।

দলবীর জগুমামার দু-হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছেন,—সারজি, হোয়াট আ গেস! আপকে বারে মে বহোত শুনা থা। আভি মুঝে বিসওয়াস হুয়া। লেকিন সারজি, ক্যায়সে আপ ইতনা কনফার্ম থা, কে উও আঙ্গুঠি ইধারই মিলেগা?

সিম্পল লজিক মিস্টার সিং।—জগুমামার মুখে উজ্জ্বল হাসি। বললেন,—যুগ-যুগ ধরে এই ফ্যামিলি ওই আংটিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে এসেছে। ওরা বিশ্বাস করত, এই আংটিটাই ওদের বংশের সুখসমৃদ্ধির

প্রাণভোমরা। তারপর উনিশ শতকে ইংরেজরা লুঠ করে নিয়ে গেল ওদেশে। ফের যখন অদ্ভুত যোগাযোগে ওদের উত্তরসূরি বিলেতে বসে জানতে পারল, ওরা এর আসল মালিক, তখন খেপে উঠল যে-কোনও মূল্যে তাকে চুরি করে ভারতে নিজেদের কাছে এনে রাখার। শেষ অবধি সেটাও যখন সম্ভব হল, তখন এমন একটা 'শুভ' জিনিস এনে কোথায় রাখে মানুষ? বাড়ির সবচেয়ে পবিত্রস্থান ঠাকুরঘরে। প্রায় দেড়শো বছর আগে যে ঠাকুরঘর থেকেই উঠিয়ে নিয়ে গেছিল ইংরেজরা।...কিন্তু ঠাকুরঘরে খোলাখুলি জায়গায় এখন রাখা যায় না। কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। তাহলে কোথায়? কুলদেবী লক্ষ্মীর বিগ্রহের বাঁ-হাত জড়িয়ে আছে ঝাঁপিকে। বিশ্বাসীদের কাছে এই ঝাঁপি সমৃদ্ধির প্রতীক। যথেষ্ট নিরাপদ স্থানও বটে।

দলবীর সিং পুরো বোবা।

—মামা, খবরটা দেবে না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।—দ্যাখ কাণ্ড! উত্তেজনায় ভুলেই গেছি। মিস্টার সিং, আপনার সেলফোনটা একটু দেবেন? লন্ডনে এখনই জানাতে হবে।

প্রথমেই ডায়াল করলাম ন'মাসির বাড়ি। বাজছে। কী ব্যাপার? বেজে যাচ্ছে, ধরছে না কেন? ওহো, তাই তো! এখন তো লন্ডনে ভোর সাড়ে চারটে। প্রথম দুবার বেজে-বেজে কেটে গেল। তৃতীয়বার বুবলাই এসে ধরেছে। ঘুমে জড়ানো গলা।

—হ্যালো, বুবলাইদা? টুকলু। মামার সঙ্গে কথা বলো।

বুবলাই! হাই বুবলাই!—জগুমামার গলায় এখন উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ছে,—উই হ্যাভ মেড ইট! অ্যাট লাস্ট! আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আংটি এখন আমাদের সঙ্গে। বাবা-মা, বউ-শাশুড়ি সবাইকে খবর দে। তোর শ্বশুরকে আজকেই পুলিশ ছেড়ে দেবে।...সুতরাং...ইয়ংম্যান! শেষপর্যন্ত তোমার বিয়ে হচ্ছে! ধুতি-পাঞ্জাবি পরা প্র্যাকটিস করো। আমরা কাল সকালে পৌঁছে যাচ্ছি।...বরকর্তার স্পেশাল গিফট চাই-ই চাই!

শারদীয়া ২০০৪

আরবি পুঁথি রহস্য

রবিবারের বিকেল। জগুমামা বলছিলেন একবার সায়েন্স সিটি যাবেন। হালফিল নতুন অনেক কিছু হয়েছে। ডিরেকটর বারবার যেতে বলেছেন। আজ অডিটোরিয়ামে একটা সেমিনারও আছে। সবে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি। হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো হাজির হলেন অনন্ত সরখেল। চোখেমুখে বিশ্বজয়ের তৃপ্তি।

ধপ করে সোফায় বসে বললেন,—দিদিকে দিয়ে এলুম। খেয়ে দ্যাখো। এ জিনিস অন্য কোথাও পাবে না। তেওয়ারি থেকে গরম-গরম ভাজিয়ে আনলুম।

তারপর এদিক-ওদিকে তাকিয়ে,—স্যার কোথায়?

—ঘরে।

—আশ্চর্য ছেলে! খবর দাও। ডাক্তারবাবুকে স্যারের সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলুম।...ডাক্তারসায়েব! দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন! এ আমার নিজের বাড়ি।

সঙ্গের ভদ্রলোক এতক্ষণ একটু সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বসলেন।

সুদর্শন অভিজাত চেহারা। ক্লিন শেভড। রিমলেস সোনালি চশমা। সাদা সাফারি স্যুট। বয়েস ষাটের আশেপাশে।

জগুমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন,—অনন্তবাবু। কেমন আছেন?

—স্যার! দেখা হলে বলেন, 'কেমন আছেন'! বুড়োটা বাঁচল কি মরল, খবরও নেন না। কলকাতায় এলে জানতেও পারি না।

—সবে কাল রাতে এসেছি।

—সে তো স্যার, দিদির কাছে শুনেছি। টুকলুটা এত গাছ-ইয়ে হয়ে গেছে স্যার, কিচ্ছু বলে না! মাঝে ফোন করেছিলুম। জিগ্যেস করলুম, 'স্যারের কোনও খবর আছে?' জবাব দিল, 'ভালো আছেন।' বুঝুন! একবারও বলল না, আপনার কলকাতায় আসার কোনও প্রোগ্রাম আছে কিনা।

—খামোকা আপনি ওর ওপর রাগ করছেন। আমার লেটেস্ট রিসার্চ চলছিল 'অ্যান্টি-একসপ্লাসিভ ডিভাইস' নিয়ে। বিস্ফোরক নিস্ক্রিয় করার যন্ত্র! আমরা যতই নিষ্ক্রিয় করার যন্ত্র আবিষ্কার করছি, সন্ত্রাসবাদীরা ফাঁকফোঁকর খুঁজে আরও আধুনিক বের করে ফেলছে। পরশু রাতে কাজটা শেষ হয়েছে। কাল চলে এসেছি। আসলে এধরনের গবেষণায়, কবে শেষ হবে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না যে!

—কিছু মনে করবেন না স্যার, টুকলুর ব্যাপারে আপনি সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্র।

জগুমামা হেসে ফেললেন। বললেন,—ধৃতরাষ্ট্র হব কী করে মশাই! আমি হলাম গিয়ে ওর মামা।

তাহলে স্যার কিছু মনে করবেন না, আপনি হলেন গিয়ে শকু—যযা:!—তাড়াতাড়ি জিভ কাটলেন। বললেন,—যাগ্গে, যাগ্গে। তার চেয়ে আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ডাক্তার ইউনুস আলি। পার্ক সার্কাসে থাকেন। ওই এলাকার সবাই একডাকে চেনে। ডাক্তারসায়েব, টুকলু আর স্যারকে তো চিনেই ফেলেছেন। মামা-ভাগ্নে। ওই যে দিদি। ইনি জামাইবাবু।...পিকলু কোথায়?

বেরিয়েছে।—মা টেবিলে সিঙাড়ার প্লেট দুটো রাখতে-রাখতে বললেন।

গরম থাকতে-থাকতেই সদগতি করা যাক।—জগুমামা একখানা সিঙাড়া তুলে মুখে দিলেন। বললেন,—আপনি কি জেনারেল মেডিসিন?

জি।—ডাক্তার বললেন,—এম.ডি. করেছি জেনারেল মেডিসিনে। এফ.আর.সি.এস.-এ অবশ্য ই.এন.টি. স্পেশালাইজেশন ছিল। তবে প্র্যাকটিস করি না।

—স্যার, ডাক্তারসায়েবের অন্যরকম ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। সেই বিষয়েই কথা বলতে এসেছেন।

জগুমামা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

—ওরা হলেন লক্ষ্ণৌর নবাবের বংশধর।

আচ্ছা!—সোজা হয়ে বসেছি।

জি, ডক্টর মুখার্জি।—সলজ্জ হেসে ডাক্তার বললেন,—আমরা আওধের শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের বংশধর। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ নবাবের ক্ষমতা কেড়ে নিল। তাকে এনে তুলল মেটিয়াবুরুজে। শুধু

তাকে নয়, তার সঙ্গে এল নবাবের জ্ঞাতিগুষ্টিরা। তারপর যখন ১৮৫৭-য় সিপাই মিউটিনি হল, ব্রিটিশরা ধরে নিল, নবাব এতে গোপনে মদত দিয়েছেন। বন্দি করা হল ফোর্ট উইলিয়ামে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জ্ঞাতিগুষ্টি অবশ্য মেটিয়াবুরুজেই ছিল।...

একমিনিট ডক্টর আলি।—জগুমামা বললেন,—টুকলু, বল দেখি কোথায় আছে ওয়াজেদ আলি শাহের কথা? সেই বিখ্যাত ডায়ালগ—'যব ছৌড় চলে লখনৌ নগরী...'।

বাবা হেসে বললেন,—তুমিও যেমন! টুকলু বলবে কী করে? সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা যখন রিলিজ করে, ও জন্মায়নি। শতরঞ্জ কে খিলাড়ি। কাহিনি লিখেছেন মুন্সি প্রেমচাঁদ। যেমন গল্প, তেমনি ছবি। অলস নবাবের ভূমিকায় সঞ্জীবকুমার আর দাবার সঙ্গী সৈয়দ জাফরি। বচ্চনের ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েস।...ডক্টর আলি, আপনি সেই নবাবের বংশধর, ভাবতে অদ্ভুত লাগছে।

ঠিক বলেছেন জামাইবাবু।—জগুমামা বললেন,—আমারও সেম রিঅ্যাকশন হল। বলুন, ডক্টর আলি!

ডাক্তার বললেন,—সিপাই বিদ্রোহ লক্ষ্ণৌ শহরে ভয়ংকর চেহারা নিয়েছিল। ক্ষিপ্ত সিপাইরা সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। ৮৭ দিন ইংরেজদের রেসিডেন্সি ঘিরে রেখেছিল। প্রায় হাজার দুয়েক ইংরেজকে খুন করে। তারপর বিদ্রোহ যখন নিভে এল, ইংরেজ প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। বন্দি সিপাইদের দাঁড় করাল কামানের সামনে। আর তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল নবাবের আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে। তখন আমাদের বাকি সব জ্ঞাতিগুষ্টি পালিয়ে গেল লক্ষ্ণৌ ছেড়ে। আমার দাদাজির দাদাজি, অর্থাৎ ঠাকুরদার-ঠাকুরদা পালিয়ে এলেন লক্ষ্ণৌ থেকে। এলেন কোথায়? ব্রিটিশ তালুক এই কলকাতাতেই। প্রথমে রাজাবাজারে, সেখান থেকে পার্ক সার্কাস। জমি কিনে বাড়ি বানালেন।

—তার মানে আপনারা ওয়াজেদ আলি শাহের ডিরেক্ট ডিসেনডেন্ট নন?

তা কেন?—ডক্টর আলির নীলরক্তে বোধহয় খোঁচা লাগল। একটু ক্ষুণ্ণগলায় বললেন,—আমরা সকলেই ওরিজিন্যালি পারস্যের লোক। ওয়াজেদ আলি শাহের পূর্বপুরুষ সুজা-উদ্দৌল্লা, আসফ-উদ্দৌল্লা। আমারও তাই। যাদের কীর্তি বড়া ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া। তারপর বংশ বেড়েছে, ডালপালা ছড়িয়েছে। আমার দাদাজির দাদাজি ওয়াজেদ আলি শাহের সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

—বুঝেছি। বলুন।

—লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার সময় যা কিছু হিরে-জহরত সোনাদানা ছিল, সঙ্গে নিয়েই পালিয়ে আসেন আমাদের পূর্বপুরুষ।—ইউনুস আলি ধীরে-ধীরে বলতে থাকেন,—সেইসব বেচেবুচে জমি-বাড়ি করেছেন, সংসার চালিয়েছেন। ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন, বিয়ে-শাদি দিয়েছেন। আমরা নবাবি সোনাদানা চোখেও দেখিনি। মেমেন্টো-স্যুভেনির যাই বলুন, একটাই রয়ে গেছে।

বলতে-বলতে কাপড়ের দোকানের পলিপ্যাকে মোড়া একটি বেশ ছোট কাঠের বাক্স বের করে টেবিলে রাখলেন ডক্টর ইউনুস আলি।

বাক্সটা দেখতে মোটাসোটা বইয়ের মতন। লম্বায় ৮, চওড়ায় ৬, ২১/২ ইঞ্চি পুরু বাক্সের গায়ে পারসি কারুকাজ, লতাপাতার বাহারি নকশা।

বইয়ের মলাট ওলটাবার মতো ওপরের ডালা খুলে ফেললেন ডক্টর ইউনুস আলি। অবাক হয়ে দেখলাম, ভিতরে জীর্ণ প্রাচীন এক পুঁথি। ঠিক মাপে-মাপে বসানো। পুঁথির ওপরে সোনার জলে তিনটি আরবি সংখ্যা। আমাদের চেনা। ৭৭৭। ইসলামের পবিত্র সংখ্যা।

জগ্গুমামা বললেন,—নিশ্চয়ই ধর্মগ্রন্থ।

ডক্টর আলি মাথা নাড়লেন,—হ্যাঁ। কয়েকশো বছর ধরে এইভাবেই রাখা আছে আমাদের হেফাজতে। পরবের দিনে বের করা হয়। সামনে রেখে নামাজ পড়েন বাড়ির সবাই।

জগ্গুমামা বইসুদ্ধু বাক্সটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। বললেন,—এই বাক্স নিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছে বুঝি?

ইউনুস আলির চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। বললেন,—ঠিক ধরেছেন ডক্টর মুখার্জি। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের বাড়ির কেউ একজন বাক্সটা বের করে নিয়ে যায়। কী দেখে, জানি না। আবার রেখে দিয়ে যায়। পরশু সকালে ব্যাপারটা আমি খেয়াল করি।

—কোথায় থাকে বাক্সটা?

—আমার ঘরে একটা পুরোনো সিন্দুক আছে। তালাচাবি নেই। ভিতরে এই বাক্স আর বাতিল দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া কিছুই নেই। পরশু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, সিন্দুকের পাল্লা আধখোলা। আমার সন্দেহ হল। সিন্দুক খুলে বুঝলাম, বাক্স যেখানে রাখা ছিল, সেখানে নেই। একটু সরে গেছে। আরও নিশ্চিত হলাম, অদ্ভুত আরেকটা জিনিস পেয়ে।

বুকপকেট থেকে একটা পিকচার পোস্টকার্ড বের করে সামনে রাখলেন ডক্টর আলি। পোস্টকার্ডের একদিকে এক অচেনা দেবীমূর্তির ছবি। অন্যদিকে গাঢ় সবুজ রঙের একটি পাতা আঠা দিয়ে সাঁটা। তলায় ইংরেজি হরফে লেখা—Mr. Y. Ali, 17 Dilkhusha Street, Kolkata 700017।

এ তো দেখছি আপনার নাম-ঠিকানা লেখা!—জগ্গুমামা অবাক।

হ্যাঁ। সেটাই আশ্চর্য! কে পাঠাল, কেন পাঠাল, কিছুই বুঝতে পারছি না।—ডক্টর আলি বললেন,—এই পোস্টকার্ড কোথায় ছিল জানেন? বাক্সের মধ্যে, বইয়ের ঠিক ওপরে। তার মানে, বাক্সটা যে রাতে তুলে নিয়ে গেছিল, সে-ই পোস্টকার্ডটা রেখে গেছে।

জগুমামা পোস্টকার্ডটা দেখছেন। সবুজ পাতার গায়ে হাত বুলোচ্ছেন। কোনও বিশেষ গাছের পাতা। পোস্টকার্ড ওলটালেন। তারপরেই বলে উঠলেন,—এ আবার কী?

অচেনা দেবীমূর্তির ঠিক নীচে কালিতে লেখা 30 days only।

—আমিও দেখেছি ডক্টর মুখার্জি।

হুঁ।—জগুমামা অস্ফুটে বললেন,—এর একটা মানে অবশ্য হতে পারে। কেউ আপনাকে হুমকি দিচ্ছে। আর 'মাত্র তিরিশ দিন তোমার মেয়াদ'!

কিন্তু কেন?—ইউনুস আলির মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। বললেন,—আমি তো কারও ক্ষতি করিনি ডক্টর মুখার্জি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, আমার এলাকার বহু গরিব মানুষকে আমি বিনিপয়সায় ট্রিটমেন্ট করি। ভিজিট নিই না, ওষুধপত্র দিই। এলাকার নানান সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অরগ্যানাইজেশনের সঙ্গে—

—অত বলার দরকার নেই ডক্টর আলি। কয়েকটা বিষয়ে শুধু জানতে চাইছি।

—বলুন।

—আপনার পার্কসার্কাসের বাড়িতে কি শুধু আপনার ফ্যামিলি থাকে?

—নাহ! গোড়াতেই বলেছি, আওধ থেকে কলকাতায় এসে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। ঠাকুরদার-ঠাকুরদা। প্রথমে একতলা, তারপর দোতলা, তারপর তিনতলা হল। যত বংশ বেড়েছে, ফাঁকা জমিতে নতুন লাগোয়া বাড়ি হয়েছে। মূল বাড়ির নম্বর ১৭। পরবর্তীকালের বাড়িগুলো ১৭/১, ১৭/২...—এরকম করে সাতটা বাড়ি। সবগুলোই গায়ে-গায়ে। সবই আমাদের জ্ঞাতিদের।

—সতেরো নম্বর বাড়িতে শুধু আপনারাই থাকেন?

—আমরা মানে আমার ঠাকুরদার বংশধররা। ঠাকুরদার দুই ছেলে। আব্বা আর চাচা। আব্বার দুই ছেলে। চাচার তিন। মোট পাঁচটা ফ্যামিলি থাকি এই বাড়িতে। আমিই সবার বড়।

—বেশ। আপনার ছেলেমেয়ে?

—এক ছেলে এক মেয়ে। আমার বেগমের অনেকদিন এন্তেকাল হয়েছে। ক্যান্সার হয়েছিল। ছেলেমেয়ে তখন ছোট। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আয়ার্ল্যান্ডে থাকে। বাড়িতে আমরা দুজন। বাপ-ছেলে।

—ছেলে কী করছে?

—ব্যবসা। মেডিসিন স্টকিস্ট।

—বাবার লাইনে এল না?

নাহ।—ডাক্তার আলি শ্বাস ফেলে বললেন,—ছেলের পড়ালিখায় তত ইন্টারেস্ট নেই।

—আরেকটা প্রশ্ন। বাড়ির সকলেই নবাব ফ্যামিলির। এই বাক্সটা আপনার কাছে থাকে কেন?

—বংশ পরম্পরায় বড়ছেলের কাছে থাকবে, এমনই কানুন করে গিয়েছিলেন আমার দাদাজির দাদাজি। আমাদের ফ্যামিলি বড়তরফ। বলতে পারেন আমরা কাস্টডিয়ান। অধিকার অন্যদেরও আছে। সেজন্যেই এত চিন্তায় পড়ে গেছি! এত বচ্ছর আছে, কেউ কুনজর দেয়নি! হঠাৎ এ সব কী হচ্ছে? সরখেলদা দোস্ত লোক। ওনার কাছে আপনার কথা সবসময় শুনি। তাই পরামর্শ নিতে চলে এলাম।

বেশ করেছেন।—জগুমামা একটা সিগারেট ধরালেন। একটু থেমে বললেন,—বাক্সের মধ্যে ওই অদ্ভুত কার্ডটা এল কী করে, এটাও রহস্য। কে পাঠাল? কেন পাঠাল? আচ্ছা ডক্টর আলি, এই পুঁথি আপনাদের কেউ কি কখনও পড়ে দেখেছেন?

না।—ডক্টর আলি বললেন,—আমাদের এই জেনারেশনের কেউ তেমন আরবি জানে না। তবে আমাদের ফোরফাদাররা আলবাত জানতেন। তারা যখন এত যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন, এ বই সাধারণ হতে পারে না। ইট মাস্ট বি আ স্যাক্রেড বুক।

জগুমামা কী যেন ভাবছেন। বললেন,—এই বই-বাক্স আর পিকচার পোস্টকার্ডটা একদিনের জন্যে রেখে যেতে পারেন?

ইউনুস আলি অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন,— মানে...পোস্টকার্ডটা আপনার কাছে রেখে যাব, ঠিক করেই এসেছি। কিন্তু এই বই...মানে...বোঝেনই...আমাদের ধর্মগ্রন্থ...পারিবারিক...

বুঝেছি ডক্টর আলি।—জগুমামা মৃদু হেসে বললেন,—কিন্তু দুটো ইন্টার-রিলেটেড। বইয়ের ওপর পাওয়া গেছে এই কার্ড। সাধারণ ধর্মগ্রন্থ, যত প্রাচীনই হোক, এর অ্যান্টিক ভ্যালু কত হবে? তার মানে এর মধ্যে অন্য কোনও স্পেশালিটি আছে। সেজন্যেই কোনও লোভী লোকের দৃষ্টি পড়েছে। সেটা জানতে হলে বা আপনার ওপর কোনও বিপদ আসছে কিনা সতর্ক হতে হলে এই বই-বাক্স আমার দরকার।...নাও ইটস আপ টু য়ু।...

২

সামনে খবরের কাগজ। পাশে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ। কাগজ থেকে মুখ না তুলে বাবা বললেন,—টুকলু, অফিসে ছুটির অ্যাপ্লিকেশন করে দাও।

—অ্যাপ্লিকেশন করব? কেন? একদিনের ব্যাপার। কালকে গিয়ে লিখে দেব।

কালকে? হুঁ:—বাবা অদ্ভুত আওয়াজ করলেন,—ওই আনন্দে থেকো না বাবাজীবন। পরিস্থিতি যা বুঝেছি, মিনিমাম দশদিনের ধাক্কা।

—দশদিন!

—বেশি ছাড়া কম নয়। অনন্ত সরখেলের নবাব-ডাক্তার খুব সোজা ব্যাপার নিয়ে আসেনি। তোমার সরকারি চাকরি নয়, তাই ঝুঁকি নিও না।

—কিন্তু হঠাৎ করে—

—সে তুমি বুঝবে, কী গ্রাউন্ডে ছুটি চাইবে। দরকার পড়লে জগু তোমার অফিসের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কাল কত রাত অব্দি জানি না, জগু কম্পিউটারে নেট খুলে বসেছিল। আড়াইটে নাগাদ বাথরুমে যাচ্ছিলাম। ওর ঘরে আলো জ্বলছিল। উঁকি মেরে দেখেছি।

—মামা নেট খুলে বসেছিলেন? ইন্টারনেটে কি আরবি ভাষা শেখা যায় নাকি?

—ও: টুকলু! মাঝে-মাঝে তুই এমন ডাম্বহেডেড হয়ে যাস!

জগুমামা ঘর থেকে ফিটফাট হয়ে বেরোচ্ছেন। হেসে বললেন, —এর মধ্যেই পিকচার পোস্টকার্ড ভুলে গেলি?

—পিকচার পোস্টকার্ড? মানে দেবীমূর্তি?

—ইয়েস! একদিকে দেবীমূর্তির ছবি, অন্যদিকে টাটকা সবুজপাতা। দেবীর নাম কী জানিস? ভারি অদ্ভুত। মামাকোকা! 'চিবচা'দের দেবী। খুঁজতে-খুঁজতে মায়া-সভ্যতায় চলে গেলাম।...ব্যস। পেয়েও গেলাম। চল-চল। ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন।

—কিন্তু আমার অফিসে একটা অ্যাপ্লিকেশন...

—ও ঠিক আছে। দীপেন এখন তোদের একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর না? ফোন নম্বর দিস। বলে দেব।...

ঠিক ন'টায় বেরিয়ে পড়েছি। যাচ্ছি আরবি ভাষার প্রবীণ অধ্যাপক ড. মোকতার হোসেনের বাড়ি। তপসিয়ায়।

ফাঁকা রাস্তা। একটু আগে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশ। স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে বাইপাসে এসে পড়লাম।

স্টিয়ারিং-এ আমি। মামা পাশে। বললাম,—একটু আগে কী এক দেবতার কথা বললে? ওই পিকচার পোস্টকার্ডের। কোকোমামা?

ধ্যাৎ!—মামা হেসে উঠলেন,—তুই তো দেখছি এরপর দেবতাকে জগুমামা বানিয়ে দিবি। দেবীর নাম মামাকোকা। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় একদল রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি টিকে আছে, যারা নিজেদের

প্রাচীন বিশ্বাস, পুজো আচ্চা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের বলা হয় চিবচা সম্প্রদায়। ওদের শুভকাজের দেবী হচ্ছেন মামাকোকা। যেকোনও কাজে বেরোবার আগে ওরা মামাকোকার কাছে প্রার্থনা করে। 'মামা' মানে মা—মাদার।

—তার মানে কোকামা?

—হ্যাঁ। কোকা কী জানিস তো? একধরনের গাছ। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর জন্মায়। আদিবাসীদের কাছে খুব পবিত্র আর প্রিয়। কোকাপাতা চিবোলে শরীরে বেশ চনমনে ভাব হয়। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা না খেয়েও প্রচুর পরিশ্রম করা যায়।

—এই কোকা থেকেই কি কোকে—

—রাইট! কোকেন। কোকা পাতাকে প্রসেসিং করে নিষিদ্ধ ড্রাগ কোকেন তৈরি হয়। কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড। সাদা পাউডার। কলম্বিয়া হচ্ছে সারা পৃথিবীতে কোকেন-তৈরিতে সবার ওপরে। ড্রাগ মাফিয়াদের তালিকাতেও একনম্বর। তবে কী জানিস, কোকা থেকে কোকেন তৈরি এবং কোকেন নেওয়ার রীতি কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে পাঁচহাজার বছরের পুরোনো। সেই মায়া সভ্যতার সময় থেকে। পরে সাদা চামড়ার লোকেরাও কোকেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

—আমাদের দেশেও দিব্যি ছড়িয়ে পড়েছে। ক'দিন আগে কাগজে পড়লাম এক নেতার ছেলের কীর্তি। নিয়মিত কোকেন নেয়।

—ছড়িয়ে পড়ছে শুধু নয় রে, মহামারীর মতো ছড়াচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ এমন নেশা, একবার ধরলে মাকড়সার মতো চুষে-চুষে খায়। বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

—তাহলে কি পোস্টকার্ডের সবুজ পাতাটা—

—ঠিক ধরেছিস। আমি নিরানব্বুই পার্সেন্ট সিওর, ওটা কোকাগাছের পাতা। বাকি এক পার্সেন্টের জন্যে আজ বিকেলের দিকে সায়েন্স কলেজে যাব।

—অর্থাৎ ওই পিকচার পোস্টকার্ড যারা পাঠিয়েছে—

—ইয়েস! তারা কোকেন স্মাগলিং-এর ড্রাগ মাফিয়া!

তপসিয়ার মোড়ে পৌঁছে গেছি। গাড়ি থামিয়ে জগুমামা নেমে সাইকেল রিকশাচালককে ঠিকানা জিগ্যেস করছেন। ওরাই মোস্ট ডিপেন্ডেবল। গলিঘুঁজির নাড়িনক্ষত্র সবচেয়ে ভালো জানে।

এইসময় মোবাইল বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—টুকলু? শিগগির স্যারকে দাও।

—কেন, কী হয়েছে?

—আ:! দাও তো! ডোন্ট কিল টাইম! ডেথ!

—মৃ-মৃত্যু? ধরুন। মামা!

টুকলু, বাঁ-দিকে ঢুকে প্রথম ডানদিকের গলি।—জগুমামা গাড়িতে বসে ফোন ধরলেন,—হ্যালো, বলুন।...কী?...কখন?...কী হয়েছিল?...ও:, তাই বলুন।...না-না, এর সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?... আশ্চর্য! বোঝান।...আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি।...আরে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। বলছি তো, নিয়ে যাব।...একটা থেকে দেড়টা।...হ্যাঁ ওখানেই থাকুন।...

ফোনটা কেটে দিয়ে বললেন,—রাব্বিশ! কুসংস্কারের ডিপো!

—কী হয়েছে? কে মারা গেছে?

—ডাক্তারের চাচা। জাফর আলি। অনেক বয়েস হয়েছিল। আশির ওপর। ভুগছিল। আজ ভোরে মারা গেছেন। সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল ডেথ। হলে হবে কি, সঙ্গে-সঙ্গে মনের মধ্যে কুসংস্কার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। ওই পবিত্র ধর্মীয় বই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, তাই কাকা মারা গেলেন! বোঝ ব্যাপারটা। একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ, অথচ মনের মধ্যে সুপারস্টিসন গিজগিজ করছে। অনন্ত সরখেলকে সকাল থেকে ফোন করে-করে পাগল করে মারছে। জানাজা বেরোবে বিকেলে, তার আগে ওটা ফেরত চাই।

—কী করবে?

—ফেরত দিয়ে দেব। এখান থেকে সোজা পৌঁছে যাব। তার আগে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে।...এই মসজিদ। এখানেই রাখ। বাড়িটা পেছনে।

অধ্যাপক মোকতার হোসেনের বয়েস ষাটের ওপর। ধবধবে সাদা চুল, আজানুলম্বিত দাড়ি। মেহেদি-মাখানো। সবুজ সিল্কের লুঙ্গি, সাদা পিরাণ। চোখে সোনালি ফ্রেম চশমা। মেঝেয় গদির ওপর রঙিন ফরাস পাতা। ঘরের চতুর্দিকে আলমারি। আরবি, ফার্সি বইয়ে ঠাসা।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বই পড়ছিলেন। পাশে কর্ডলেস ফোন। আমরা আদাব জানালাম। ঈষৎ মাথা নুইয়ে আমাদের বসতে বললেন। বই বন্ধ করলেন।

—অধ্যাপক আচার্য পাঠিয়েছেন তো? বলুন, কী জানতে চান।

জগুমামা কোনও কথা না বলে ফোলিও ব্যাগ থেকে পবিত্র পুঁথি-বাক্সটি এগিয়ে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে হোসেনের চোখ বড় হয়ে গেল।

—আইব্বাপ! এ তো বহোত পুরানা কিতাব। কোথা থেকে পেয়েছেন?

মামা সংক্ষেপে ইউনুস আলির কথা বললেন। তারপর বললেন,—আমরা এর মধ্যে কী লেখা আছে, জানতে চাই। এটা কি কোরান শরিফ?

বাক্স থেকে জীর্ণ পুঁথিটি বের করে এনেছেন অধ্যাপক হোসেন। পিছন থেকে পাতা উলটে পড়তে শুরু করেছেন। দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন,—নেহি।

—তবে? কী লেখা?

—হাদিস বোঝেন? যাকে আপনারা ধর্মের বিধান বলেন। নবাব বংশের একজন ইমানদার মুসলমানের কী-কী নিয়ম রোজকার জীবনে মেনে চলা উচিত, পরপর সেইসবই লেখা আছে। নবাবের কোনও মৌলভি লিখে গেছেন। কোরান-এর হাদিস তো আছেই, সঙ্গে আরও কিছু যোগ করা হয়েছে। যেমন—

—যেমন?

—যেমন বংশের বড়ছেলে সিংহাসনে বসবে। নবাবের সম্পত্তি সে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। ভাগ পাবে বাকি ভাইরাও। তাদের বঞ্চিত করা চলবে না।

—আর কিছু?

আর?—একটু থমকালেন অধ্যাপক হোসেন। বইয়ের পৃষ্ঠা উলটিয়ে শেষদিকে পৌঁছে গেছেন। বললেন, —আর রয়েছে জ্ঞাতিগুষ্টির সম্পত্তির খতিয়ান। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার সময় এদের কতগুলি প্রাসাদ-অট্টালিকা ছিল, আশেপাশের গ্রামে-গ্রামে কত জমি-জায়গীর ছিল, বেগমমহলে কত-কত সোনাদানা অলংকার ছিল, তার একটা ফিরিস্তি।

বাড়ি-জমির তালিকার এখন কোনও দাম নেই।—জগুমামা বললেন,—তারপর প্রায় তিনশো বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে ইংরেজ শাসনে কেটেছে প্রায় দুশো। জুয়েলারি সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কি?

আলাদা করে কিছু নেই।—হোসেন বললেন,—তবে বোঝা যাচ্ছে, যা ছিল সঙ্গে ছিল। সোনাদানা সঙ্গে নিয়ে ওরা দেশ ছেড়েছিলেন।

—ডক্টর আলি কাল এ কথাই বললেন। ওইসব জুয়েলারিই ছিল ওদের সম্বল। ওগুলো বেচেবুচে ওদের নতুন জমি-বাড়ি হয়েছে, সংসার চলেছে।

—হোসেন সায়েব। এটা একটু পড়ে দিন তো!

হঠাৎ মামা শার্টের বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ বের করে মেলে ধরলেন।

প্রাচীন তুলোট কাগজ। বিবর্ণ হলদেটে। একপিঠে একটা ম্যাপ আঁকা। অন্যপিঠে আরবি হরফে বেশ কিছু লেখা।

মুহূর্তে টানটান হয়ে বসলেন মোকতার হোসেন। উত্তেজিতভাবে বললেন,—এ-এটা...কোত্থেকে পেলেন? কিতাবের ভিতরে?

—পরে বলছি। তার আগে বলুন, কী লেখা আছে।

—হ-হিরে! ডায়মন্ড! সাত-সাতটা হিরে। ফ্যামিলির সিক্রেট প্রপার্টি। দেশ ছাড়ার আগে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন।

—রেখে এসেছিলেন! কোথায়?

—লক্ষ্ণৌয়ে।

—লক্ষ্ণৌয়ে! লক্ষ্ণৌর কোথায়?

বড়া ইমামবাড়ার ভুলভুলাইয়ায়।—হোসেন রুদ্ধশ্বাস গলায় বললেন,—এই দেখুন। ছবি। বিরাশি ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ-দিকের কুঠুরির দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটা বাক্স। হিরেগুলো রয়েছে তার মধ্যে। ওই বাক্সের চাবি রাখা আছে একতলার কবরস্থানের ডানদিকের কুলুঙ্গির খোপে।

—প্লিজ হোসেনসায়েব! ইংরেজিতে পুরোটা লিখে দিন! কোনওকিছু বাদ দেবেন না।

জগুমামা নিজেও উত্তেজিত। চোখদুটো ঝিলিক দিচ্ছে। কতকটা নিজের মনে বললেন,—আমার সন্দেহটা মিলে গেল। এতবচ্ছর বাক্সটা নিশ্চিন্তে খোলা সিন্দুকে পড়ে রইল! কেউ ছুঁয়ে দেখল না। হঠাৎ কেন নজর পড়ল? নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে ওর ভিতরে।

—তার মানে যে বাক্সটা ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তার কাছে হিন্টস নিশ্চয়ই ছিল।

অবশ্যই। নইলে শুধু-শুধু কেন নিতে যাবে! শুধু তাই নয়,—মামা একটু থেমে বললেন,—যে বাক্সটা নিয়েছিল, সে এই লুকোনো কাগজটা আগেই বের করে দেখে ফেলেছে।

—দেখে ফেলেছে?

—হ্যাঁ। দেখেছে, ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে বা পড়িয়েও ফেলেছে ।

—সে কী! কী করে বুঝলে?

—এই দ্যাখ, নতুন ভাঁজের আবছা দাগ। যে এই কাগজ দেখেছে, ভাঁজ করে যথাস্থানে রাখার সময় সতর্ক ছিল না। পুরোনো গভীর ভাঁজের সঙ্গে মিলিয়ে ভাঁজ করেনি।

ভালো করে লক্ষ করতে চোখে পড়ল।

—বাক্সের মধ্যে কোথায় ছিল কাগজটা? কাল দেখলাম না। ইউনুস সায়েবও জানেন না।

—জানবেন কী করে? বাক্সের ভিতর সিক্রেট চেম্বারে রাখা।

বলতে-বলতে জগুমামা বাক্সের তলার দিকে আলতো চাপ দিলেন। খুট করে শব্দ হল। একটা পাল্লা সরে গেল। চোরাখুপরি।

অধ্যাপক হোসেন ইংরেজিতে লিখে যাচ্ছেন। জগুমামা ঘড়ি দেখছেন। প্রায় বারোটা বাজে।

লেখা শেষ। মামা উঠে দাঁড়িয়েছেন। ইংরেজি লেখাটা বুকপকেটে, মূল কাগজ সযত্নে ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিলেন যথাস্থানে। পুঁথিবাক্সে। বললেন,—বহোত সুকরিয়া হোসেনসায়েব। একটু তাড়া আছে। চলি। কী হয়, পরে জানাব।

বেরিয়ে এসেছি। মামার সঙ্গে হনহন করে হাঁটছি।—কাগজটা ঢুকিয়ে দিলে যে? ম্যাপটা লাগবে না?

—কাল রাতেই কম্পিউটারে স্ক্যান করে নিয়েছি। লেখাসুদ্ধু।

৩

অবাক হয়ে দেখছিলাম। বাড়ি না বলে হাউজিং কমপ্লেক্স বলা ভালো। মাঝে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাঙ্গণ বা উঠোন। সাতটা বাড়ি ইংরেজি ইউ-আকৃতি নিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। প্রত্যেকটা বাড়ি পাশের বাড়ির গায়ে লেপ্টে আছে। প্রত্যেক তলায় এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত টানা জাফরি-কাটা বারান্দা চলে গেছে। যেখানে-যেখানে ফাঁক, সেখানে ঝুলন্ত ব্রিজ। সবক'টি বাড়িই দেখতে একরকম। সাবেক পারসীয় নির্মাণশৈলী। একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি মসজিদ।

বাড়ি খুঁজে পেতে একটুও সময় লাগেনি। দিলখুসা স্ট্রিটে ঢুকে প্রথম যে চায়ের দোকানে জিগ্যেস করেছি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলেছে,—নবাব বাড়ি? সোজা এগিয়ে যান। সামনেই।

একজন যোগ করেছেন,—আজকে ও বাড়ির বড় আব্বা মারা গেছেন। সেখানেই যাচ্ছেন?

বোঝা গেল, অভিজাত পরিবারটিকে মহল্লার মানুষ সম্ভ্রমের চোখে দেখেন।

খানিকটা এগোতে রাস্তার ধার ঘেঁষে সারি-সারি গাড়ি। তার মধ্যে দু-তিনটে লালবাতি-লাগানো গাড়িও চোখে পড়ল।

লোকের ভিড়ে থইথই উঠোন। বেশিরভাগ মানুষের মাথায় রুমাল বা টুপি। পরিবারের লোক বা বন্ধু।

সেই ভিড়ের ভিতর থেকে আমাদের অতি পরিচিত মুখ ছুটে আসছিলেন। আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখে মনে হল, সাহারায় মরুদ্যান পেলেন।

—আসুন স্যার, আসুন! এসো টুকলু।

—ডাক্তারসায়েব কোথায়?

—বাড়িতে। পাগলের মতো করছেন।

—কেন?

—স্যার, ওই বাক্সটার জন্যে। এক কথা বলছেন, 'ওই বাক্স বাড়ির বাইরে গেছে, তাই এরকম ঘটল।'...বাঁচালেন স্যার। আপনারা না আসা পর্যন্ত ওরা বেরোতে পারছিল না। মানে ডাক্তারসায়েবই আটকে দিচ্ছিলেন।

—কেন? ওই বাক্সটাকেও কবর দেবে নাকি?

—না-না। তা নয় স্যার। ওটা বাড়িতে ফেরত না আসা পর্যন্ত উনি কোনও কাজ করতে চাইছেন না। কোথায় স্যার?

—আনিনি তো!—এখনও কাজ শেষ হয়নি।

—মরেচে!

ঝটিতি অনন্ত সরখেল অ্যাবাউট-টার্ন করলেন। মুখ ঝুলে গেছে।—যাওয়া যাবে না। পালিয়ে চলুন স্যার।

—পালাব কেন? চলুন, বুঝিয়ে বলি।

—কিস্যু বোঝানোর নেই স্যার। অতবার বললুম, শুনলেন না স্যার। খানদানি রক্ত। রেগে গেলে পুরো সেন্স-আউট! তখন—

—সরখেল চাচা। চলে যাচ্ছেন নাকি?

পিছন থেকে একটি ছেলে ডাক দিল। অনন্তবাবু স্ট্যাচু। বিড়বিড় করলেন,—য-যা। হয়ে গেল।

মুখে প্রাণপণ হাসি টেনে বললেন,—না-না। যাচ্ছি না। যাব কেন? এনাদের একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে...স্যার, এ হচ্ছে গিয়ে ডাক্তারসায়েবের ভাইপো মজনু। ওনার ন্যাওটা।

আসুন।

অনন্ত সরখেলের দশা খুবই মর্মস্পর্শী। যেন কালীঘাটের পাঁঠা, হাঁড়িকাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ডক্টর ইউনুস আলি দোতলায় নিজের ঘরে বসে ছিলেন। আমাদের দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—বসুন। আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। মজনু বেটা, মেহমানদের চা-পানির ইন্তেজাম করো।

ইঙ্গিত স্পষ্ট। কায়দা করে ভাইপোকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

—আপনার ছেলে কোথায়? নীচে? একটু আলাপ করতাম।

—নেই। কাল রাতে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গেছে। খবর দিয়েছি। ফিরে আসছে।...বাক্সটা এনেছেন?

—হ্যাঁ।...একাই গেছে?

—না। আমার দুই জ্ঞাতিভাইয়ের দুই ছেলে ওর সমবয়েসি। খুব বন্ধু। তিনজনে গেছে।

—আপনাদের এই ব্যাপারটা খুব ভালো লাগল ডক্টর আলি। সব ফ্যামিলি মিলিয়ে যেন একটাই খানদান।

—একেবারে ঠিক বলেছেন ডক্টর মুখার্জি। ছ'পুরুষ আগের একটা পরিবার বেড়ে-বেড়ে অনেক ডালপালা। প্রত্যেকের আলাদা কিচেন। আবার সবক'টা ফ্যামিলিকে নিয়ে মস্তবড় জয়েন্ট ফ্যামিলি। আনন্দে-দু:খে উৎসব-পরবে সবাই একসঙ্গে। এমনকী বেশিরভাগ বিয়ে-শাদিও হয় নিজেদের মধ্যে।

—চমৎকার। আপনাদের এখানে ঢুকে লম্বা-টানা বারান্দা দেখে আমার প্রথমেই একথা মনে হয়েছে।

—হ্যাঁ। এই সতেরো নম্বরের সাতবাড়ির সব বাসিন্দার সব ঘরে যাওয়ার অবারিত দ্বার।...বাক্সটা দিন ডক্টর মুখার্জি। মজনু এসে পড়বে।

অনন্ত সরখেলের গোলগোল চোখের সামনে জগুমামা ব্রিফকেস খুললেন। বাক্স বের করে তুলে দিলেন ডক্টর আলির হাতে। উনি তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের কোণের প্রাচীন সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

মজনু ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একজন কাজের লোক। ট্রেতে চা-বিস্কিট-জল।

—দোতলায় শুধু আপনিই থাকেন?

—না। অন্য পোরশনে আমার ভাই থাকে। আমার ভাগে চারটে ঘর। এটা আমার শোওয়ার ঘর। পাশের ঘরে ছেলে থাকে। একটা ঘর বন্ধ। প্রথম ঘরটা ড্রয়িংরুম।

—একটু ঘুরে দেখব?

—নিশ্চয়ই। আগে চা খেয়ে নিন।

চা খেতে-খেতে মামা আলিসায়েবের ঘর দেখছিলেন। দেওয়ালে বড়-বড় অয়েলপেন্টিং। পূর্বপুরুষদের। মক্কার কাবা মসজিদের ছবি। পুরোনো দিনের লক্ষ্ণৌ শহরের ছবি। কারুকাজ করা পালঙ্ক। শ্বেতপাথরের টেবিল।

মামা বললেন,—এইসব ছবি দেখলে অদ্ভুত অনুভূতি হয়। মনে হয়, আপনার পূর্বপুরুষরা আপনাকে দেখছেন, নজর রাখছেন। তাদের আশীর্বাদ আপনার ওপর পড়ছে।

—ঠিক বলেছেন। রোজ সকালে চেম্বারে বেরোবার আগে ওঁদের সামনে দাঁড়াই। শক্তি পাই।

—আজ তেমনই একজন চলে গেলেন। আপনার বড়চাচা। আপনাদের ফ্যামিলির সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষ।

—হ্যাঁ। বৃদ্ধ তো বটেই। তবে সবার বড় নয়। ওনার আগের জেনারেশনের একজন এখনও জীবিত। সম্পর্কে আমার ঠাকুমা। সবাই ডাকে 'বুড়ি দাদি'।

—আপনার ঠাকুমা—? বাব্বা! নিশ্চয়ই অনেক বয়েস।

—হ্যাঁ। একশো বছরের আশেপাশে। তবে এখনও শক্ত। আস্তে-আস্তে হাঁটাচলা করতে পারেন।

কাপ রেখে জগুমামা উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন,—ওনার সঙ্গে পরে একদিন আলাপ করে যাব। নিশ্চয়ই পুরোনো আমলের অনেক কথা, ফ্যামিলির ইতিহাস, বলতে পারবেন।

জরুর।—ডাক্তার আলি বললেন,—বুড়ি দাদির স্টকে যে অনেক কাহিনি! ছবির মতো বলে যান। মাথা এখনও পরিষ্কার। শুনতে বসলে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়। ফার্স্ট ওয়র্ল্ড ওয়র দেখেছেন। তখন আট বছর বয়েস।

—চলুন। ঘরগুলো দেখে নিই।

পাশের ঘর ভেজানো ছিল। দরজা খুলে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। ইউনুস তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে ফ্যান চালিয়ে দিলেন। অপ্রস্তুতভাবে বললেন,—আমার ছেলে ইউসুফের ঘর। আজকালকার ছেলেরা এত অগোছালো! বলেও কিছু হয় না। তার ওপর সবসময় জানলা-দরজা বন্ধ করে রাখবে।

এই ঘরের পরিবেশ অন্যরকম। ছোট্ট একটা খাট। মাথার দিকে দুটো তাকিয়া বালিশ। খাটের অর্ধেকের বেশি অংশে কাগজপত্র, জামাপ্যান্ট স্তূপীকৃত। জামাকাপড়ের আলমারি আধখোলা। কুর্তাপাজামা চেয়ারের ওপর। বড় টেবিল। একদিকে কম্পিউটার। টেবিল-ভরতি ফাইল কাগজপত্র। পাশের ছোট র‍্যাকে ওষুধ-কোম্পানির নাম লেখা পরপর ফাইল। ক্যাবিনেটের ওপর টিভি, নীচে স্টিরিও।

জগুমামা ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। দু-একটা কাগজ তুলে আবার রেখে দিলেন। বললেন,—এখন ইন্টারনেট হয়ে কত সুবিধে হয়ে গেছে। চিঠিপত্র, অর্ডার সব ই-মেলে যাচ্ছে, আসছে। পোস্টে হারানোর বা দেরি হওয়ার ভয় নেই।

আমি বিছানার ওপর ছড়িয়ে থাকা কাগজ-ফাইল দেখছি। সবই ওষুধ কোম্পানির। অনন্ত সরখেল জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। উঠোনে শেষযাত্রার তোড়জোড় হচ্ছে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এক যুবক। তার চোখমুখ দিয়ে রাগ ফুটে বেরুচ্ছে। সে চেঁচিয়ে উঠল,—এ কী আব্বা! কী হচ্ছেটা কী? আমার ঘরে বাইরের লোক!

না-মানে...,—ডক্টর ইউনুস আলি থতমত খেয়ে বললেন,—তুমি তো ছিলে না! আমি ওয়েট করেছি। একটা বিশেষ ব্যাপারে বাধ্য হয়ে...এনারা আমার বিশেষ পরিচিত। ওদের—

তোমার পরিচিত তো কী হয়েছে?—একধমকে বাবাকে থামিয়ে দিল যুবক,—তাই বলে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দেবে! আমার প্রাইভেসি নেই?...নীচের থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।...

প্লিজ ইউসুফ!—জগুমামা বললেন,—কুল ডাউন। আপনার আব্বা একটা সমস্যায় পড়ে আমাদের ডেকেছেন। আমরাই ওনাকে বলেছিলাম, এই ঘরটা—

আপনারা বলার কে?—যুবক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল,—হু হেল আর য়ু? আপনারা কারা, আমি চিনি না। চিনতেও চাই না। যে-ই হোন, বাপছেলের লাফড়ার মধ্যে ঢুকবেন না। আব্বা, তোমায় বলছি, প্লিজ গেট লস্ট ফ্রম মাই রুম উইদ ইয়োর ফ্রেন্ডস!

'ঝপ' করে নিস্তব্ধতা নেমে এল। দমবন্ধ-করা অস্বস্তিকর পরিবেশ। আড়চোখে দেখলাম, দরজার বাইরে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়ে গেছেন। জগুমামা থমথমে মুখে স্থির। কী করব, বুঝতে পারছি না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কি ঠিক হচ্ছে? অনন্ত সরখেল জানলার পাশ থেকে একপা-একপা করে দরজার দিকে এগোচ্ছেন। ডক্টর ইউনুস আলির অবস্থা সবচেয়ে করুণ। ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

এইসময় ভিড় ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তিন-চারজন যুবক। কুর্তা-পাজামা, মাথায় টুপি। এসেই জাপটে ধরল ইউসুফ আলিকে।

—এই! এই! কী হচ্ছে ইউসুফ! তুমি ভুলে গেছ ওনারা আমাদের মেহমান! তাদের বেইজ্জত করছ?

—আজ বাড়িতে এইরকম পরিবেশ। দাদাজির ইন্তেকাল হয়েছে। তার মধ্যে তুমি এমন করছ? ছি:-ছি:!

—মাথা ঠান্ডা করো! জানাজায় চলো। সবাই অপেক্ষা করছে।

ইউসুফ সমানে গজরাচ্ছে। অস্ফুটে বিড়বিড় করছে। চোখদুটো টকটকে লাল। যুবকরা ওকে জড়িয়ে ধরে টানতে-টানতে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল। যেতে-যেতে একজন আবার চেয়ারের ওপর থেকে কুর্তা-পাজামাটাও উঠিয়ে নিল।

ওরা বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকে পড়লেন মধ্যবয়েসি কয়েকজন পুরুষ। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ওঁদের একজন জোড়হাত করে দাঁড়ালেন জগুমামার সামনে।—এ বাড়ির তরফ থেকে আপনাদের কাছে মাফি চাইছি। ইউসুফ বাচ্চা ছেলে। আপনার বেটার সমান। ও গুসসায় বেওকুফি করে ফেলেছে।

জগুমামা তাঁর হাত ধরলেন। বললেন,—না-না। কিছু মনে করিনি। ওর রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। ওর ঘরে ওকে না জানিয়ে আমরা ঢুকেছি। এটা ঠিক হয়নি। ডাক্তারসায়েবও বুঝতে পারেননি।...ডক্টর আলি, এবার আমরা যাই। পরে কথা হবে।

আর একমুহূর্তও নয়। তিনজনে সোজা গাড়িতে। অনন্ত সরখেল স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

—তোমার কেমন লাগল নবাব-বাড়ি?

—ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখানে আসার দরকার ছিল।

—ছেলের রিঅ্যাকশন দেখলে? আমার মনে হল, বাপ-ছেলের সম্পর্ক ঠিক স্বাভাবিক নয়।

নয়ই তো। তবে বাবা কি ধোয়া-তুলসী পাতা?—জগ্গুমামা বললেন,—লোভ কারও কিছু কম নেই। তুই একটা শব্দ মনে রাখিস তো! পেড্রোমায়া। পি-ই-ডি-আর-ও-এম-এ-ওয়াই-এ।

—তোমার কি ধারণা, হিরে এখনও আছে? এই আড়াইশো বছরে আর কেউ চেষ্টা করেনি?

—করতেই পারে। চান্স ফিফটি-ফিফটি। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বলতে পারিস, উই আর চেজিং দ্য ওয়াইল্ড গুজ। বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছি। বাট উই হ্যাভ নো অপশান।

—তার মানে, লক্ষ্ণৌ যেতে হবে?

—অফকোর্স। সেলফোনটা দে। দুটো ফোন করতে হবে। অনন্তবাবু, আপনি কি যাচ্ছেন?

—হ্যা:! এরকম প্রশ্ন করার কোনও মানে হয় স্যার? এই কেসটা আমি আনলাম। আমি যাব না?

—বুঝলাম। ট্রাভেলসকে বলে দিই কালকের এয়ার-টিকিট কেটে ফেলতে হবে। আর...আর অমিতাভ...ওর ফোনটা হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

—অমিতাভ? অমিতাভ সিনহা? তোমার আই.এ.এস. বন্ধু? যিনি দিল্লিতে পোস্টেড?

—গুড। তোর ঠিক মনে আছে, দেখছি। এখন উত্তরপ্রদেশ সরকারের হোম সেক্রেটারি!

৪

শুয়ে-শুয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'ভৌতিক সমগ্র' পড়ছিলাম। অনন্ত সরখেল রিমোট নিয়ে পুটপুট করে টিভির চ্যানেল পালটে যাচ্ছেন। কী দেখতে চাইছেন, কে জানে। জগ্গুমামা ঘরে ঢুকলেন।

—এখনও শুয়ে আছিস? ন'টা বাজে। ঠিক দশটায় গাড়ি এসে পড়বে। ডিনারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

অনন্তবাবু বাথরুমে ঢুকে গেলেন। মামা বললেন,—ক'বার হল?

—ঘণ্টায় তিনবার। তুমি তো জানো, এটা পুরোনো অভ্যেস। উত্তেজনা হলেই ঘন-ঘন 'বড় বাইরে' যান। চিন্তা কোরো না, সাড়ে ন'টার মধ্যে ডাইনিং হলে পৌঁছে যাচ্ছি। অমিতাভ আঙ্কলের বাড়ি গেছিলে?

—হ্যাঁ। আপ্যায়নের ঠেলায় অস্থির। না খাইয়ে ছাড়বে না। অতিকষ্টে ছাড়া পেয়েছি।

মামা বেরিয়ে গেলেন।

কলকাতা থেকে দুপুর বারোটার লক্ষ্ণৌ ফ্লাইট ছাড়ল প্রায় তিনটে নাগাদ। প্যাসেঞ্জার এত কম, ভয় হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত ফ্লাইট না বাতিল হয়ে যায়।

আমৌসি এয়ারপোর্টে আমাদের জন্যে চমক অপেক্ষা করছিল। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে ঢোকার মুখে দেখি, চারজন সাদা সাফারি স্যুটেড ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের হাতে সুদৃশ্য প্ল্যাকার্ড। ওপরে লেখা

'ওয়েলকাম। ড. জগবন্ধু মুখার্জি। অনারড গেস্ট, গভর্নমেন্ট অব উত্তরপ্রদেশ।'

এরপর আমাদের আর কিছুই করতে হয়নি। ওঁরা আমাদের বোর্ডিং পাসগুলো নিয়ে নিলেন। ভি.আই.পি. লাউঞ্জে বসলাম মিনিট পাঁচেক। সেখান থেকে লাল-বাতি লাগানো এ.সি. গাড়ি। সামনে হুটার লাগানো পাইলট ভ্যান।

এই সরকারি অতিথিশালায় পৌঁছতে লেগেছে বড়জোর দশ মিনিট।

অনন্ত সরখেলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ছিল সারাক্ষণ। একবার শুধু বলেছেন,—ভাবা যায় না স্যার! টাইমলাইফ একসপেরিয়েন্স!

হ্যাঁ। লাইফটাইম।—জগুমামা মুচকি হেসে বলেছেন,—তবে কি জানেন, এই লালবাতি গাড়ি, হুটার-পাইলট পেতে-পেতে এমন একটা লালবাতি-টেম্পারামেন্ট হয়ে যায়, তখন আচমকা সব বাদ হয়ে গেলে সহ্য করা খুব কঠিন। মনে হয়, পৃথিবী শূন্য। আমার এক সহপাঠী দশবছর মন্ত্রী ছিল। তৃতীয়বার নির্বাচনে হেরে গেল। মন্ত্রীত্ব গেল। তখন তার যে কী অবস্থা, চোখে দেখা যায় না! দেখতে-দেখতে শুকিয়ে গেল।

—অমিতাভ সিনহার অবশ্য সে ভয় নেই।

—এখন নেই। কিন্তু পনেরোবছর পর যখন রিটায়ার করবে, তারপর?

গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার। জনাপাঁচেক পুলিশ-অফিসারও হাজির। নামতেই স্যালুট।

অনন্ত সরখেল বুক চিতিয়ে সবার আগে। ডান হাত একটু ওপরে। গার্ড অব অনারের ভঙ্গি।

অতিথিশালার বাইরে-ভিতরে কী সুন্দর। ঠিক রাজপ্রাসাদ। ফ্লোর জুড়ে ওয়াল-টু-ওয়াল দামি কার্পেট, মেহগনি কাঠের চকচকে পালিশ ফার্নিচার, নি:শব্দে সপ্লিট এসি চলছে।

জগুমামা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেননি। মুখ-হাত ধুয়ে সাফসুতরো হয়ে বেরিয়ে গেছেন বন্ধুর কাছে।

আজ রাত দশটায় আমাদের অপারেশন।

সওয়া ন'টা নাগাদ রেডি হয়ে নীচে নামলাম। কনফারেন্স হল থেকে মামার গলা পাচ্ছি। দরজার বাইরে দুজন গার্ড। ভিতরে দশ-বারোজন।

মামা বললেন, আয়। অমিতাভ, এই যে আমার ভাগ্নে অর্ণব। আর এরা এই রাজ্যের এক-এক স্তম্ভ।

পরিচয় হল। সাদা প্যান্টশার্টের সুদর্শন হোম-সেক্রেটারি বসেছেন মধ্যমণি হয়ে। জগুমামার পাশে। হেসে বললেন,—বোসো। জগুর কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি।

জগুমামা বললেন—যে কথাটা বারবার বলতে চাইছি, আমরা কোনওরকম এনকাউন্টারে জড়াব না। পুরো অপারেশন স্মুথলি অ্যান্ড সাইলেন্টলি করতে হবে।

আপনি কি কোনও অ্যাডভার্স ইনসিডেন্ট অ্যাপ্রিহেন্ড করছেন? —পুলিশের ডিজি বললেন।

—হতে পারে। যারা এই গুপ্তধনের খবর আগে পেয়ে গেছে, তারা হয়তো শহরে ঢুকে পড়েছে। দে উইল অলসো ট্রাই।

—যদি কিছু না পান?

কথাটা বললেন উলটোদিকের কোণে বড়া ইমামবাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। তাঁর পাশেই কুর্তা-পাজামা পরা ট্রাস্টি বোর্ডের এক সদস্য, ইমামবাড়া-ভুলভুলাইয়া যার নখদর্পণে। সে-ই আমাদের গাইড।

—সে সম্ভাবনাও আছে। হতে পারে, প্রতিপক্ষ আগে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিংবা, অনেক-অনেক কাল আগেই বাক্সসুদ্ধু সব লোপাট হয়ে গেছে। তবু, এতবড় একটা ব্যাপার জেনে ফেলে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

দরজায় উর্দি পরা বাবুর্চি এসে দাঁড়িয়েছে। হোম-সেক্রেটারি বললেন,—তোমাদের ডিনার রেডি।

দশটাতে লক্ষ্ণৌ শহর বেশ ফাঁকা। একটা-দুটো পানের, কাবাব-বিরিয়ানির দোকান খোলা।

গোমতী পেরিয়ে ইমামবাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি কয়েক মিনিটের মধ্যে।

দূ-রে বিশাল ফটক দেখা যাচ্ছে। উলটোদিকের ঝুপড়ি দোকানপাট ঝাঁপবন্ধ। মিটমিটে রাস্তার আলো।

চারজন আগে-পিছে হাঁটছি। তিনজন এবং কুতুবুদ্দিন আহমেদ। আমাদের গাইড।

অনন্ত সরখেল নিচুগলায় বললেন,—পুলিশ নেই?

—সব আছে। একদল আগে ঢুকে পড়েছে। বাকিরা ঘিরে রেখেছে।

কুতুবুদ্দিন লম্বা-লম্বা পা ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেলেন। দাঁড়ালেন ফটকের সামনে। ফটক সামান্য ফাঁক হল। তার পিছনে-পিছনে ঢুকে পড়লাম। নি:শব্দে বন্ধ হয়ে গেল প্রধান দরওয়াজা।

আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না লুকোচুরি খেলছে। চওড়া পথ চলে গেছে ইমামবাড়ার পাহাড়ের মতো সৌধ পর্যন্ত। দুপাশে ফুলের আবছা-আবছা ঝোপঝাড়। তফাতে-তফাতে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তিরা। এরা সব পুলিশ।

অনন্তবাবু আফশোসের সুরে বললেন,—অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না হে! লক্ষ্ণৌ এসে চোরের মতো ইমামবাড়া যাচ্ছি। এর চেয়ে খারাপ কী হতে পারে?

পৌঁছে গেছি ইমামবাড়া ঢোকার মুখে। কুতুবুদ্দিন বললেন,—আগে ওপরে না নীচে?

—নীচে। কবরের কাছে। তবে—

কথা শেষ হওয়ার আগেই দু-দুটো পোর্টেবল লাইট জ্বলে উঠল। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দুজন কালো স্যুট পরা মানুষ এগিয়ে এলেন।

ঢুকে পড়েছি ইমামবাড়ার সেই প্রসিদ্ধ হলঘরে। আলো-আঁধারে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই শিহরন জাগছে। অনেক উঁচুতে গম্বুজাকৃতি বিস্ময়কর খিলান। সামান্য পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ওপরে কারুকার্যময় চাঁদোয়া, চারিদিকে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা সমাধিস্থল। পাশাপাশি দুটো কবর।

অনন্তবাবু বললেন,—দুটো কেন?

—একটা নবাব আসফ-উদৌল্লার। পাশেরটা বেগমের। দুজনে পাশাপাশি ঘুমোচ্ছেন।

হুঁ।—মামা বললেন,—এর ডানদিক বলতে ঠিক কোন জায়গা বোঝাচ্ছে?

কুতুবুদ্দিন একটা লাইট নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়ালেন। বললেন,—এই হচ্ছে হিসেবমতো ডানদিক।

—কিন্তু এখানে দেওয়াল কোথায়? দেওয়াল ছাড়া কুলুঙ্গি থাকে কী করে?

কুতুবুদ্দিন একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর আবার এগিয়ে গেলেন সমাধির কাছে। ডানদিকের ঘেরা শিকগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে আলো ধরছেন।

হঠাৎ একটা ছোট্ট খাঁজ!

হাত ঢুকিয়ে দিলেন। চাপা উল্লাসে বলে উঠলেন,—ডক্টর মুখার্জি! এই যে!

অদ্ভুত দেখতে একটা কাঠের চাবি।

—তার মানে ওই বাক্সও আছে নিশ্চয়ই?

—তার কোনও মানে নেই। চাবি ছাড়া ওই বাক্স খোলা যায় না, তবে ভাঙা যায়।...চলুন।

বাইরে বেরিয়ে পাশ দিয়ে সিঁড়ি। বেশ খাড়া। কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে উঠে যাচ্ছেন কুতুবুদ্দিন।

অনন্ত সরখেল হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—আর কত?

—মোট ৮৪ ধাপ। আমরা উঠব ৮২ ধাপ পর্যন্ত। সবে ৩০ ধাপ উঠেছি।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পোর্টেবল লাইটের আলো যতটুকু ছড়াচ্ছে, ততটুকুই দেখা যাচ্ছে।

সিঁড়ির দু-পাশে সারি-সারি ছায়াময় প্রকোষ্ঠ। এগুলো সব নাকি দেখতে একইরকম। একবার ঢুকে পড়লে ঘুরে মরতে হবে। এরই নাম ভুলভুলাইয়া।

ওপর থেকে একচিলতে আলো এসে পড়েছে। প্রায় ছাদ পর্যন্ত এসে গেছি।

কুতুবুদ্দিন আলো হাতে দাঁড়ালেন।

—কোনদিক?

—বাঁ-দিক।

একইরকম অলিন্দ। ছোট-ছোট খুপরি। যতটা আলো যাচ্ছে, ততটাই দেখা যাচ্ছে।

ডানদিকে নামলে ওপর থেকে উপাসনালয় দেখা যায়।—কুতুবুদ্দিন বললেন।

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু এই দিকে যে পরপর ঘর, দেওয়াল। সবগুলোতেই কুলুঙ্গি।

—সিঁড়ি থেকে সবচেয়ে কাছের যে-ক'টা কুঠুরি দেখছি সেগুলো দেখি।

প্রথম কুঠুরির কুলুঙ্গিতে হাত ঢোকালেন কুতুব। নাহ। পরের কুঠুরি। এখানে দেওয়ালে দুটো খোপ। প্রথমটায় হাত ঢোকালেন। নাহ।

দ্বিতীয়বার হাত ঢোকালেন। পুরো হাত ঢুকে গেল।

—আরিব্বাস! এ যে অনেক গভীর।

জগুমামা আলো ধরলেন। বুক ঢিপঢিপ করছে। ভিতরে যদি সাপখোপ থাকে!

কুতুবুদ্দিন হাতের সঙ্গে শরীর-মাথাও বেশ খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

তারপরেই বলে উঠলেন,—হাতে একটা কিছু ঠেকছে!...লাঠি-টাঠি কিছু একটা পেলে—

—সরুন! সরুন! আমি চেষ্টা করি। আপনার চেয়ে আমি লম্বা। আপনি আলো ধরুন।

উত্তেজনায় রোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

মামার দুই হাত, শরীরের অর্ধেকটা ঢুকে গেছে ভিতরে।

কয়েক সেকেন্ড! লম্বা নিশ্বাস পড়ল। নিজেকে বের করে এনেছেন। দু-হাতে ধরা একটা চ্যাপটা ছোট বাক্স।

বড়-বড় শ্বাস টানছেন। কিন্তু চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে।

কুতুবুদ্দিন রুদ্ধশ্বাসে বললেন,—এই নিন চাবি। খুলে ফেলুন।

না:!—জগুমামা মাথা নাড়লেন।—এখন এই পর্যন্ত! আগে বের হই। যা কিছু, গেস্টহাউসে হবে।

ঠিক এইসময় আক্রমণ হল।

ডানদিক থেকে লাফ দিয়ে পড়ল তিনটে কালো পোশাক পরা মূর্তি। দুজন মামাকে জাপটে ধরল। একজন বাক্সটা হ্যাঁচকা টান মেরে ছিনিয়ে নিল ।

মামা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

দু-তিন সেকেন্ডের জন্যে হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। পরমুহূর্তে বহুদিন আগে শেখা কুং-ফু কাজে লেগে গেল। দু-জোড়া লাথিতে দুজন দু-দিকে ছিটকে পড়ল। বাকিজন দৌড় দিয়েছে লম্বা অলিন্দ বেয়ে। কুতুবুদ্দিন তার পিছনে ছুটে গেলেন।

লোকটা হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পিছনে কুতুবুদ্দিন। তবে খুব বেশিদূর যেতে পারল না। উঠে এল অনেকগুলো কালো-মূর্তি।

মিনিট দেড়েকের মধ্যে সংঘর্ষ শেষ। প্রহরীরা এগিয়ে এসে বাক্সটা মামার হাতে তুলে দিল।

তবে একটা পোর্টেবল হ্যান্ডলাইট মেঝেয় পড়ে চুরমার। এখনও তার ঝনঝন আওয়াজের প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

জগুমামার চশমা ছিটকে পড়েছিল। আলোয় খুঁজে পাওয়া গেল। ভাঙেনি, এই রক্ষে!

পড়ে গিয়ে মামার হাতে-পায়ে অল্প চোট লেগেছে। একটু নড়বড় করছেন। বড়-বড় নিশ্বাস ফেলছেন। অপ্রত্যাশিত এই সংঘর্ষের জন্যে তৈরি ছিলাম না।

আমাদের চতুর্দিকে রক্ষী-বলয়। সামনে আলো, পিছনে আলো। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি।

—এরা কারা, আপনারা বুঝতে পেরেছেন?

হ্যাঁ।—একজন পুলিশ বললেন, প্রাইভেট সিকিওরিটির লোক মোট পাঁচজন ছিল। সবক'টাকেই ধরা গেছে।

বোঝা গেল।—মামা আস্তে-আস্তে বললেন,—নিজেরা ঢুকতে পারেনি। আগে থেকেই সিকিওরিটির গার্ডদের টাকা খাইয়ে তৈরি করে রেখেছিল। আজকে না এলে আর বাক্স পাওয়া যেত না। হাপিস করে ফেলত। আজ রাতে সবক'টাকে লকআপে ভরে রাখুন। কাল ভোরে ইন্টারোগেশন শুরু করবেন। জানতে হবে, কারা ওদের কাজে লাগিয়েছে।

—এখন সোজা গেস্টহাউস সার?

—হ্যাঁ। হোম-সেক্রেটারিকে একটু ধরে দিন। কথা বলব।

হঠাৎ খেয়াল হল, তাই তো! অনন্ত সরখেলের কোনও খবর নেই। শেষে পাওয়া গেল সিঁড়ির গোড়ায়। চিৎ হয়ে পড়ে আছেন।

কাছে কোথাও রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল।

৫

—হ্যালো। ক্যান আই টক টু হোম-সেক্রেটারি? আই অ্যাম ডক্টর জেবি মুখার্জি, কলকাতা। হিজ ফ্রেন্ড।...ওকে।...

—কে, অমিতাভ? আমি জগু।

—হ্যাঁ, শরীর ঠিক আছে। তেমনকিছু হয়নি। একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের আজকেই কলকাতা ফিরতে হবে।

—একটু আগে অনন্ত সরখেলের মোবাইলে হঠাৎ একটা ফোন এসেছিল। ডক্টর ইউনুস আলির বাড়ি থেকে।

—ইয়েস, দ্যাট নবাব ফ্যামিলি। যাদের পুঁথি, যাদের হিরে। যিনি ফোন করেছেন, তিনি জানালেন আলিসায়েব গতকাল রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেরিব্রাল মতো হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। সকালে একটু ভালো আছেন। বারবার আমাদের কথা বলছেন। দেখা করতে চাইছেন। বলছেন, জরুরি কথা আছে।...

—না, না। যিনি ফোন করেছেন, ওই ফ্যামিলির ছেলে। বিরাট ফ্যামিলি। আমাদের যেটুকু আলাপ, ওই ডাক্তারের সঙ্গে। আর কাউকে তেমন চিনি না।

—হ্যাঁ। তুই তিনটে ফ্লাইটের টিকিটের ব্যবস্থা কর। ঠিক আছে?

—আর একটা কথা। কাল রাতে যারা অ্যারেস্ট হল, সেই লোকগুলোকে কি জেরা করা হয়েছে? এখনও কোনও রিপোর্ট পাইনি।

—ওকে, ওকে। আমরা গেস্টহাউসেই আছি।

জগুমামা ফোন রেখে বললেন,—যাই। চানটান সেরে নিই। চারটেয় ফ্লাইট। বেরিয়ে পড়তে হবে। পুলিশের কর্তারা এলে খবর দিস।

—তুমি যে সকালে বেরিয়ে গেলে, কাজ হল?

হ্যাঁ।—মামা বললেন,—লছমিগণেশ জুয়েলারির বুড়োকত্তার কাছে গেছিলাম। গণেশ মাহেশ্বরী। এ শহরের একনম্বর জহুরি। আশির ওপর বয়েস। হিরেগুলো অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

—কী বললেন?

—কী যে বললেন, বুঝতে পারলাম না।—জগুমামা গম্ভীর। বললেন,—এই জাতের হিরে উনি নাকি আগে কখনও দেখেননি। তাই দাম আন্দাজ করতে পারছেন না। তবে অনেক পুরোনো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কলকাতায় ফিরে ফের পরীক্ষা করাতে হবে।

অন্যমনস্কভাবে জগুমামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কাল রাতে শুতে-শুতে তিনটে বেজে গেছে। তারপরেও অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি।

আমরা ফিরে দেখি, গেস্টহাউস গমগম করছে। সবাই অপেক্ষা করছেন। সকলের সামনে কুতুবুদ্দিন প্রাচীন চাবি ঘুরিয়ে গুপ্তধনের বাক্স খুললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

—ওয়াহ!

নরম রেশমি গদিতে সাতটা হিরে। পাশাপাশি শুয়ে। তাদের গা দিয়ে তীব্র দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হীরকখণ্ড যে জ্বলে, প্রথম দেখলাম।

অনেকেই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। হঠাৎ ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান একটা প্রশ্ন তুলে দিলেন। হিরেগুলোর মালিকানা কাদের? এককালে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের জ্ঞাতি-পরিবার এখানে লুকিয়ে রেখে গেছিলেন, এটা ঠিক। কিন্তু তখন তো ইমামবাড়া ট্রাস্টিবোর্ড হয়নি। আইন অনুযায়ী এখন এই সৌধের সবকিছুর মালিক বোর্ড। হিরেগুলো পাওয়া গেছে সৌধের ভিতর থেকে। তাহলে কী হবে?

আইনি প্রশ্ন। জগুমামা বলেছেন, আপাতত বন্ড সই করে নিয়ে যাচ্ছেন । হোম সেক্রেটারি গ্যারান্টার থাকবেন। ইউনুস ফ্যামিলিকে এখন দেবেন না। দেখাবেন। তারপর আদালত যা নির্দেশ দেবে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে।

দরজায় ঠক-ঠক-ঠক।

—কাম ইন।

দুজন পুলিশ অফিসার ঢুকলেন।

—মামা। ওরা এসে গেছেন।

—আসছি।

অফিসার দুজন বললেন,—সার, ওরা স্বীকার করেছে।

—কী বলেছে?

—বলেছে, পালুয়া ওদের প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। কাল রাতে পালুয়ার দলবল নিয়ে ইমামবাড়ায় ঢোকা ঠিক ছিল। কিন্তু বিকেল থেকে পুলিশ ঘিরে রাখায় ঢুকতে পারেনি। তখন সেলফোনে ওদের নির্দেশ দেয়, যে করে হোক, বাক্সটা হাতিয়ে নিতে। দু-লাখ টাকা ক্যাশ দেবে।

—পালুয়া কে?

—পুরো নাম পালোয়ান সিং। লক্ষ্ণৌয়ের মাফিয়া ডন।

—ধরতে পেরেছেন?

—না সার। এখন গা ঢাকা দিয়েছে। তবে ধরে ফেলব সার।

—ধরুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমরা আজ কলকাতা ফিরছি। আপনারা রেগুলার হোম-সেক্রেটারিকে রিপোর্ট করবেন।

—ওকে সার।...

*

আমরা এখন আবার আমৌসি বিমানবন্দরে। কয়েকমিনিটের মধ্যেই প্লেন ছাড়বে। অনন্তবাবুর মোবাইল বেজে উঠল।

—কলকাতার ফোন। ধরব স্যার?

—ধরুন।

—হ্যালোউ।...হ্যাঁ।...না। এখনও লক্ষ্ণৌতে আছি।...না-না, যাচ্ছি। পৌঁছে যাচ্ছি।...এই তো প্লেনে উঠছি।...ওনাকে চিন্তা করতে মানা করবেন। সোজা ওনার কাছে যাব।...নিশ্চয়ই।

ফোন বন্ধ করে বললেন,—ডাক্তারসায়েবের বাড়ি থেকে ফোন। উনি নার্সিংহোমে ভয়ানক ছটফট করছেন। ওর নাকি এখনই আমাদের সঙ্গে খুব দরকার।...টেলিপ্যাথি নাকি স্যার?

—কী প্যাথি জানি না। এত আর্জেন্সি কীসের, বুঝছি না।

বিমান উড়ল আকাশে।...

ট্যাক্সিতে লাগেজ ঢুকিয়ে তিনজনে বসেছি। বাইরে সন্ধে নেমেছে।

জগুমামা বললেন,—সোজা পার্ক সার্কাস। রাজারহাট ধরুন। বাইপাস দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে।

পোদ্দার ইনস্টিটিউট পেরিয়ে ভি. আই. পি. ছেড়ে বাঁ-দিকের রাজারহাটের রাস্তায় ঢুকে পড়ল ট্যাক্সি।

ঝাঁ চকচকে ফাঁকা রাস্তা। দু-দিকে কমপ্লেক্স। কিছু-কিছু অর্ধসমাপ্ত। নতুন 'নিউ টাউন' গড়ে উঠেছে।

ট্যাক্সি উড়ে চলেছে। প্রবল হাওয়ার ঝাপটা। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

—বাক্সটা কি লাগেজে রেখেছ?

—কী যে বলিস! সঙ্গে আছে। আমার ব্রিফকেসে। ডক্টর আলিকে দেখাতে হবে না?

—উনি যদি রেখে দিতে চান?

—চাইলেই তো হবে না। আমি বন্ড দিয়ে এসেছি। হোম-সেক্রেটারি গ্যারান্টার। আগে আদালতে ফয়সালা হোক, হিরেগুলো কাদের প্রপার্টি। বুঝিয়ে বলব।

দু-পাশে বড়-বড় জলাশয়। দূরে-দূরে স্কাইস্ক্র্যাপার তৈরি হচ্ছে। সাঁ-সাঁ করে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে।

—মামা, এই পুঁথির রহস্যটা মোটামুটি সলভ হল। কিন্তু ওই পাতা আর কী যেন 'মামা কো...কো'...সেই যে দেবী, তার পোস্টকার্ড? তার নীচে লেখাটা।...ব্যাপারটা কিছু এগোল?

—আবছা-আবছা আঁচ পাচ্ছি। দুটোর মধ্যে কোথাও অবশ্যই মিসিং-লিঙ্ক আছে। তোকে সেদিন বলেছিলাম, 'পেড্রোমায়া'। মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডক্টর আলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে বলেছিলে? রাতে তোমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলাম।

—ওটা একজনের ই-মেল আইডি। ওই ই-মেলে—

ঘ্যাঁ-চ-চ—!! প্রচণ্ডজোরে ব্রেক কষল আমাদের ট্যাক্সি। মামার কথা শেষ হল না। অনন্ত সরখেলের মাথা ঠুকে গেল উইন্ডস্ক্রিনে।

রাস্তাজুড়ে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে তিনটে টাটাসুমো।

আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দশ-বারোজন যুবক ঝুপঝুপ করে নেমে এল গাড়িগুলো থেকে।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যে ওরা ট্যাক্সি ঘিরে ফেলেছে। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। ড্রাইভার এবং অনন্তবাবু ঠকঠক করে কাঁপছেন।

লম্বামতন একজন জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ ঢুকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল,—ওটা দাও।

—কী?

—দ্বিতীয়বার জিগ্যেস করলে চালিয়ে দেব। পাশের খালে তোমাদের লাশ পড়ে থাকবে।

জগুমামা আশ্চর্যরকমের নির্লিপ্ত। বললেন,—তোমরা সিওর, আমাদের কাছে আছে?

যুবকটি কোনও উত্তর দিল না। শুধু বলল,—আমাদের তাড়া আছে। দশ গুনব। এক... দুই...তিন...।

—আ:, দাঁড়াও! বের করার সময় দেবে তো!

সিটের পিছন থেকে ব্রিফকেস টেনে আনলেন। খুললেন। বাক্সটা বের করে আনলেন। যুবক হাত বাড়াচ্ছিল, ইশারায় থামালেন। ওঁর বুকপকেট থেকে সেই কাঠের চাবি বেরোল। চাবি ঘুরিয়ে বাক্সটা খুললেন। সঙ্গে-সঙ্গে আবার চোখ ঝলসে গেল।

চাবি এবং বাক্স তুলে দিলেন যুবকের হাতে।

মুহূর্তের মধ্যে গাড়িগুলোর এঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল। অন্য যুবকরা উঠে পড়েছে গাড়িতে। দলনেতা বাক্স হাতে উঠে পড়েছে। গাড়িগুলো গর্জন করে মিলিয়ে গেল আলো-আঁধারিতে।

পাথরের মতো বসে আছি। বোধবুদ্ধি অসাড়! এত পরিশ্রম সব হাতছাড়া। কয়েকশো বছর আগের দুর্লভ সম্পদ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কোটি টাকায়।

জগুমামা গাড়ি থেকে নেমে গেছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমনে ধোঁয়া ছাড়ছেন। বাইরে কোনও প্রকাশ নেই।

কতক্ষণ কেটে গেছে, জানি না। যেন অন্য জগৎ থেকে ফিরে এলাম। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, আমাদের বিহারি ড্রাইভার এবং অনন্ত সরখেল দুজনেই অসাড়। মামা কোথায়? ওই তো। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই নে।—সামনের সিটের তলা থেকে একটা বোতল বের করে দিলেন,—ওদের চোখে-মুখে জল দে। তবে জ্ঞান ফিরলেও এই মক্কেল আর গাড়ি চালাতে পারবে না। তোকেই বসতে হবে।

কয়েকমিনিটের মধ্যে ওই দুজনকে পিছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।...কারও মুখে কোনও কথা নেই। গাড়ি ছুটে চলেছে।

সল্টলেক বাইপাস কানেক্টরের কাছে এসে পড়েছি। আস্তে-আস্তে বললাম,—ডক্টর আলি কোন নার্সিংহোমে আছেন?

—আগে ওর বাড়ি চল। সেখান থেকে খোঁজ নিয়ে যেতে হবে।

—সব নিয়ে গেল মামা? কিছুই করতে পারলাম না।

—কিছু করার ছিল কি? শুধু-শুধু চারটে ডেডবডি চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকত।

সতেরো নম্বর দিলখুসা স্ট্রিটের নবাব-বাড়ির উঠোনে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে দিয়েছি। পিছনের দুজন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঢুকে পড়লাম বাড়িটায়। বাইরে যারা ঘোরাফেরা করছিল, অবাক চোখে আমাদের দেখছিল। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিল। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা।

দোতলার ডানদিকে ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজা। কলিংবেল টিপলাম।

—ইয়েস?

—ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি।

দরজা খুলে দাঁড়ালেন স্বয়ং ইউনুস আলি। অবাকগলায় বললেন,—আপনারা লক্ষ্ণৌ...লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসেছেন?

জগুমামা আমার দিকে তাকালেন। নিচু গলায় বললেন,—বুঝলি! কীরকম ট্র্যাপে ফেলে আমাদের টেনে আনল।...ডক্টর আলি, আপনি চেম্বার যাননি?

—গেছিলাম। জলদি চলে এসেছি। শরীরটা ঠিক ফিট লাগছিল না। আসুন, ভেতরে আসুন।

—না ডক্টর আলি। আজ রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে আসব। চলি। গুডনাইট।

ওঁকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জগুমামা তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করলেন সিঁড়ি দিয়ে। একবার মুখ ফিরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলাম, ইউনুস আলি থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—টুকলু। টুকলু!

—ক-কে? কে?

উঠে বসেছি ধড়মড় করে। দু:স্বপ্ন দেখছিলাম। জগুমামাকে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে একদল দুর্বৃত্ত। চিৎকার করতে চেষ্টা করছি। গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না।

—আমি। রেডি হয়ে নে। এখনই বেরোতে হবে।

—এখনই! কেন?

—খারাপ খবর আছে।

—খারাপ খবর?

—হ্যাঁ। হাতমুখ ধুয়ে আয়। বলছি।

মাথা গুলিয়ে গেল। স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি। খারাপ খবরের আর বাকি আছে কি?

চোখেমুখে বেশ ক'বার জল ছেটানোর পর মাথা ছাড়ল। কালকে সারাটা দিন কীভাবে যে কেটেছে! কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না পরশু রাতের ওই ঘটনা।

জগুমামা যথারীতি শক্ত। কীভাবে যে এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নেন, বুঝে উঠতে পারি না।

কাল সকালে গিয়েছিলাম ডক্টর ইউনুস আলির বাড়ি। ডক্টর আলি কিছুই জানতেন না। মামা যখন সহজগলায় পরপর ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মুখের ওপর নানারকম রং ফুটে উঠছিল। সবশেষে যখন এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার অভিজ্ঞতা বলেছিলেন, তখন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে ছিলেন।

একটু পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছেন,—তাহলে তো যা হওয়ার সব হয়ে গেছে। আমাদের ফ্যামিলির প্রপার্টি চিরদিনের মতো হাতছাড়া।

—হ্যাঁ। আপাতত তাই।

—আপাতত বলছেন কেন?

—পৃথিবীতে কোনও কিছুই যে শেষ কথা নয় ডক্টর আলি। পরশু রাতেই হাইয়েস্ট লেভেলে সি.বি.আই., পুলিশ, কাস্টমসকে জানিয়ে দিয়েছি। এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার লোক আমি নই।

—থ্যাঙ্ক য়ু। দেখুন, যদি কিছু পজিটিভ হয়।

—ডক্টর আলি, আমি একটু বুড়ি দাদির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বুড়ি দাদি! কেন?

—আপনিই সেদিন বলেছিলেন, আপনাদের পরিবার সম্পর্কে উনি অনেককিছু জানেন। পুরোনো আমলের কথা।...উনি হয়তো ফ্যামিলি প্রপার্টি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন।

—দাদি বোধহয় এসব কিছু জানেন না। কখনও বলেননি।

—হয়তো জানেন না। হয়তো কিছু-কিছু জানেন। কথা বললে বুঝতে পারব। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাদের এই এপিসোড ওনাকে জানাব না। একটা কথা বলে রাখা ভালো—

জগুমামা একটু থেমে বলেছেন,—আমি টু-হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর, আপনার ফ্যামিলির লোক এই ঘটনায় জড়িত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জগুমামাকে নিয়ে ডক্টর ইউনুস আলি গেছেন পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণার কাছে। একান্তে মামা কথা বলেছেন। আমি ততক্ষণ ঘুরে-ঘুরে দেখেছি আশ্চর্য নবাব-মঞ্জিল। এর প্রতিটি ইট-বালি-দেওয়ালে আড়াইশো বছরের ইতিহাস।...

মুখ মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এসেছি। মামা ড্রইংরুমে ফোনে কথা বলছেন।

—হ্যাঁ, বাড়ির নম্বর সতেরো। দিলখুসা স্ট্রিট।...সবাই চেনে।...সঙ্গে একজন ডাক্তার দিয়ে পাঠাতে হবে।...আমার নাম যেন কোনওভাবে একসপোজ না হয়।...একটু সিনিয়র ঠান্ডা মাথার অফিসার পাঠিও।...ঠিক আছে।...আমরা আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।...

মামা ফোন নামিয়ে বললেন,—জয়েন্ট কমিশনার বাণীব্রতকে বলে দিলাম।

—কী হয়েছে মামা?

—মৃত্যু! আনন্যাচারাল ডেথ। ডক্টর আলির একমাত্র ছেলে ইউসুফ আজ ভোররাতে মারা গেছে। অনন্ত সরখেলকে উনি জানিয়েছেন। আমি চাই, পোস্টমর্টেম হোক।

আমি হতভম্ব।

দোতলার দরজা হাট করে খোলা। ঢোকার মুখে উঠোনে কিছু ভারাক্রান্ত মুখ। আর আরামকেদারায় যে মানুষটি নেতিয়ে পড়ে আছেন, একদিনের মধ্যেই কী মর্মান্তিক পরিবর্তন। বাজপড়া গাছের মতো বিবর্ণ চেহারা। ডক্টর ইউনুস আলি।

জগুমামা পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর হাতে হাত রাখলেন,—শক্ত হোন ডক্টর আলি। বাস্তবকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

পলকহীন চোখে তাকালেন আলি। চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এল। রুদ্ধগলায় ফিসফিসিয়ে বললেন,—বাচ্চাটা চলে গেল!

অসহনীয় পরিবেশ। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছি। মামা সামনের চেয়ারে বসেছেন। একটু পরে বললেন,—আপনি ডাক্তার। তাই জিগ্যেস করছি। হঠাৎ কী হয়েছিল?

শূন্যদৃষ্টিতে ডক্টর আলি বললেন,—রেসপিরেটরি ফেলিওর।

এইসময় মজনু উদভ্রান্তের মতো ঘরে এসে ঢুকল।

—বড়চাচা! বড়চাচা! পুলিশ এসেছে।

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে বসলেন ডক্টর আলি।

—পুলিশ! পুলিশ কেন?

কেউ কিছু বলার আগেই চার-পাঁচজনের দলটি ঘরের মধ্যে। সাদা পোশাকের তিনজন। একজন উর্দিপরা। সম্ভবত লোকাল থানার ওসি। তিনিই খুব বিনীত গলায় বললেন,—ডাক্তারসায়েব, রাগ করবেন না। আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। লালবাজার থেকে ফোন এসেছিল। এখান থেকে কেউ কমপ্লেন করেছে, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। আমাদের ডাক্তারবাবুও এসেছেন।

—কমপ্লেন করেছে! আচ্ছা!—যান। দেখে আসুন। পাশের ঘরেই আছে।

চোখে হাত ঢাকা দিয়ে এলিয়ে পড়লেন ইজিচেয়ারে।

জগুমামা আস্তে-আস্তে উঠে ওই দলটার সঙ্গে পাশের ঘরের দিকে এগোলেন। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, অনন্ত সরখেল এসে পড়েছেন। এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ইউসুফের শরীর শুয়ে আছে খাটে। মনে হচ্ছে, যেন ঘুমোচ্ছে। পাশে মোবাইল ফোন। ডাক্তার আস্তে-আস্তে গিয়ে ওর চোখের পাতা টানছেন। কানের লতি, নখ, হাতের পাতা দেখছেন। নিচুস্বরে বললেন,—শরীর নীল হয়ে গেছে।

—আপনি কী মনে করছেন? মৃত ছেলেটির বাবা কিন্তু একজন নামকরা ডাক্তার।

—জানি। তবু যখন কমপ্লেন হয়েছে, তখন পোস্টমর্টেম হওয়া দরকার। কোনও বিষক্রিয়ায় মৃত্যু কিনা, জানতে হবে।

ভিড় করে থাকা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আপত্তির গুঞ্জন উঠল। নবাব-ফ্যামিলির ছেলের মৃতদেহ কাটাছেঁড়া হবে, মেনে নিতে পারছেন না। বেশ কয়েকজন হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের কোণে একটা পলিথিনের প্যাকেট পড়ে ছিল। চট করে নিচু হয়ে জগুমামা পকেটে পুরলেন। টেবিলের কম্প্যুটারের নীচে কীসব ঘাঁটাঘাঁটি করছেন।

যে দলটি বেরিয়ে গেছিল, তারা আবার ঘরে ঢুকল। ডক্টর আলিকে দুদিক দিয়ে ধরে আনছে। ইউনুস আলির চোখ টকটকে লাল! জলে টলটল করছে।

অবরুদ্ধ গলায় বললেন,—ওকে নিয়ে যেতেই হবে? কোনও রাস্তা নেই? ভেবে দেখুন, আমাদের খানদানের ইজ্জত...সব বাইরে বেরিয়ে যাবে...ডক্টর মুখার্জি, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন...।

—কী বলব, বলুন। আপনার ফ্যামিলি থেকে কমপ্লেন হয়েছে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

—বিষক্রিয়া!—হ্যাঁ, আলবাত বিষক্রিয়া। ড্রাগ পয়জনিং কজড রেসপিরেটরি ফেলিওর। দিস ইজ কলড অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথ। অ্যাম আই রাইট ডক্টর?

পুত্রশোকে ইউনুস আলির কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে? ডাক্তার মাথা নাড়লেন,—রাইট সার।

ইউনুস আলি ধীরে-ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন,—আপনারা কি ভাবছেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? না:! বড় কষ্ট!...আমি সত্যি কথা বলছি। চেষ্টা করেছিলাম, পাপ ঢাকা দিতে। খানদানের ইজ্জত বাঁচাতে। পারলাম না। ভাই-ভাতিজা, তোমরা আমায়, এই বদনসিব বাপকে মাপ কোরো।...যখন কাপড় পুরো খুলে নেওয়া হয়, নাঙ্গা মানুষের কোনও শরম থাকে না। আমারও নেই। হ্যাঁ, সবাই শুনে নিন, আমার আওলাদ ইউসুফ সুইসাইড করেছে। ওভারডোজ ড্রাগ নিয়েছে। আপনারা জানেন না, বদলোকের পাল্লায় পড়ে ইউসুফ পুরো বিগড়ে গেছিল। রোজ কোকেন নিত। আমার কাছে টাকা নিত। অনেক-অনেক টাকা। তবু বাজারে তার অনেক দেনা হয়ে গেছে।

বলতে-বলতে থামলেন ইউনুস। দম নিলেন। উঠে আসা আবেগ চাপা দিলেন। বললেন,—ড্রাগের নেশা সর্বনাশা। কমানো যায় না। বেড়ে চলে। ড্রাগ-অ্যাডিক্ট ইচ্ছে থাকলেও বেরিয়ে আসতে পারে না। ইউসুফের তাই হচ্ছিল। শেষ হয়ে যাচ্ছিল। অনেক বুঝিয়েছি, বকেছি। শুধরোতে পারিনি। ওর ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে। চারদিক থেকে দেনায় ডুবে গেছে। রোজ রাতে শুতে যাওয়ার আগে ওর জন্যে আল্লার কাছে দোয়া মাঙতাম। কিছুতেই কিছু হল না।...

ইউনুসের গলা বুঁজে এল। আবার দম নিয়ে বললেন,—কাল ভোররাতে গোসলখানায় যাচ্ছিলাম। ওর ঘর থেকে জোরে-জোরে শ্বাস টানার শব্দ। উঁকি মেরে দেখি, ও খাবি খাচ্ছে। বাতাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। ছুটে গেলাম। ওকে ঠেলছি, ডাকছি...ও সাড়া দিচ্ছে না। শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। ঘর থেকে ছুটে গিয়ে ইনজেকশন নিয়ে এলাম। আপনি জানেন ডাক্তার, ডেরিফাইলিন আর এসকরলিন লাইফ-সেভিং ড্রাগ। পুশ করলাম।...নাহ! তখন দেরি হয়ে গেছে। বাপের চোখের সামনে ছটফট করতে-করতে বেটা মরে গেল।

হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন ইউনুস আলি।

—নিয়ে যান! ওকে নিয়ে যান!

বলতে-বলতে পায়ে-পায়ে দাঁড়ালেন ছেলের কাছে। মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বিড়বিড় করে বললেন,—বেটা, ঘুমো। আরামে ঘুমো।

তারপর টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলেন।

সবাই চোখ মুছছে। কয়েকজন চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

জগুমামা বললেন,—অনন্তবাবু আপনি ডক্টর আলির কাছে থাকুন।

ঘর ফাঁকা হয়ে এসেছে। দুজন লোক ঢুকল স্ট্রেচার নিয়ে। পুলিশের দুজন ইউসুফের কুর্তা-পাজামা সার্চ করলেন। ওরা ডেডবডি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

জগুমামা বিছানা থেকে ওর সেলফোন তুলে নিলেন। টেবিল থেকে কিছু কাগজ নিলেন। সব একজায়গায় জড়ো করছেন। ওয়েস্ট পেপার-বক্স থেকে একটা ডিসপোসিবল সিরিঞ্জ-নিডল তুললেন। দুটো অ্যাম্পুল।

আমি আলমারি খুলে ফেলেছি! পরপর প্যান্টশার্ট ঝুলছে। চাবিবন্ধ লকার। চাবি গেল কই? ধ্যুস! আলমারির গায়েই ঝুলছে। পরপর দু-তিনটে ঘোরাতে ঠিক লেগে গেল।

লকারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি। বেশ গভীর। সব টেনে-টেনে বের করে আনছি। টাইপিন, সোনার বোতাম, আংটি। বাপস—পাঁচশো টাকার বান্ডিল! পঞ্চাশ হাজার টাকা! আবার একটা ওয়ালেটে বেশকিছু বিদেশি মুদ্রাও রয়েছে। এত দেনা যার, এত টাকা তার লকারে? কিছু কার্ড, মেমেন্টো ছড়ানো।

এ কী? সেই অদ্ভুত পিকচার পোস্টকার্ড।

একদিকে দেবীমূর্তির ছবি, অন্যদিকে একটা পাতা আটকানো। পাতাটা অনেক পুরোনো। কালচে হয়ে গেছে।

—মামা, এটা দেখেছ? ভেতরে ছিল।

—খুব স্বাভাবিক। অঙ্ক মিলে যায়।

—কিন্তু এর নীচে কিছু লেখা নেই। শুধু একটা নাম সই করা।

—নিয়ে আয়।...এই দ্যাখ। সই আছে। পেড্রোমায়া। মনে পড়ছে?

পুলিশ অফিসার বেরিয়ে গেছিলেন। ফিরে এসে বললেন,—সার, খোঁজ নিয়ে জানলাম, ডাক্তারসায়েবের বাড়িতে দিনরাতের একজন কাজের লোক আছে। ওর সঙ্গে কথা বলবেন?

—উহুঁ। এখানে নয়। সোজা লালবাজার নিয়ে চলুন। এখন কিছু বলবেন না। ঠিক বেরোবার মুখে তুলবেন।

আমি আলমারির তাকগুলো হাতড়ে চলেছি। সবগুলো দেখা হয়ে গেছে। শুধু নীচের তাক বাকি। এই তাকে থরে-থরে সাজানো আছে নানা রং, নানা ডিজাইনের কুর্তা-পাজামা, চুস্ত-পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি।

দেখতে-দেখতে—এ কী! চেঁচিয়ে উঠেছি,—মামা! পেয়ে গেছি।

—কী?

—এই দ্যাখো! সেই হিরের বাক্স!

জগুমামার মুখেও আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই নিভে গেল।

—এ তো খোলা রে!

যা ভেবেছেন, তাই। রেশমের গদি ফাঁকা।

জগুমামা নিজেকেই যেন সান্ত্বনার সুরে বললেন,—যাক, বাক্স তো পেয়েছি। অ্যান্টিক হিসেবে এর মূল্যও কম নয়। খুঁজে দ্যাখ, যদি কাঠের চাবিটা পাস।

৭

আমাদের গাড়ি লালবাজারের প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময় পুলিশ-রক্ষী যেভাবে নম্বর মিলিয়ে নিলেন, বুঝলাম আগে থেকে সব বলা আছে। গাড়ি পার্ক করিয়ে ওঁরাই নিয়ে এলেন যুগ্ম-নগরপাল বাণীব্রত মিত্রর ঘর পর্যন্ত।

বাণীব্রত হাত বাড়িয়ে দিলেন,—এসো জগুদা! বোসো। তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

—সে তো জানি। নইলে এই রবিবারে তোমরা বড়কত্তারা কেউ এদিক মাড়াও নাকি?

—খবর্দার! এরকম বদনাম দিও না। দরকার পড়লে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করতে হয়। চা, না কফি?

—কফিই হোক। কিন্তু ডক্টর আলি কোথায়? তাঁকে দেখছি না।

—পার্ক সার্কাস থানার ও.সি. নিয়ে আসতে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বেন।

বলতে-বলতে দরজা ফাঁক হল। ওসি ঢুকে স্যালুট দিলেন। পিছনে ইউনুস আলি। সঙ্গে ভাইপো মজনু।

মাঝের একদিনে অনেকখানি সামলে উঠেছেন ডাক্তার আলি। বিধ্বস্ত ভাব কিছুটা কেটেছে। কাল দুপুরে বডি দিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধের মধ্যে গোর দেওয়া হয়েছে ইউসুফকে।

ইউনুস ও মজনু বসেছেন। পাশে অনন্ত সরখেল। জগুমামা-আমি। থানার ওসি বেরিয়ে গেছেন।

তাহলে শুরু করি, কেমন?—জগুমামা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন,— নিজেদের মধ্যে এই বসাটার তেমন কোনও দরকার ছিল কিনা, জানি না। তবু গত পাঁচদিন ধরে যে ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে, সেই স্রোতের মধ্যে কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া প্রশ্ন, কিছু-কিছু জায়গায় ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। আমি তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। কোথাও ফাঁক থেকে গেলে বা বুঝতে না পারলে প্লিজ , ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

নিশ্চয়ই।—বাণীব্রত বললেন।

—আজ ঠিক এইটথ ডে। গত রবিবার বিকেলে ডক্টর আলি একটা বাক্সের মধ্যে রাখা আরবি পুঁথি নিয়ে অনন্তবাবুর সঙ্গে আমাদের বাড়ি যান। পুঁথির ওপরে রাখা ছিল একটা ছবির পোস্টকার্ড। একপিঠে সবুজ পাতা, অন্যপিঠে অচেনা দেবীমূর্তির ছবি। নীচে হাতে লেখা—'থার্টি ডেইস ওনলি'। রাইট ডক্টর আলি?

—জি।

—দুটোই সেদিনের মতো নিজের হেফাজতে রেখে দিই। ভাবতে থাকি, কেন চোখ পড়েছে এই পুঁথির ওপর? কী লেখা আছে? এতকাল খোলা সিন্দুকে পড়েছিল, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। তবে কি বাক্সতে কোনও রহস্য লুকোনো আছে? রাতে খুঁজতে-খুঁজতে পেয়ে গেলাম চোরাখুপরি। সেখানে তুলোট কাগজে একটা ম্যাপ। সেও লেখা আরবিতে। তবে কি কোনও গুপ্তধনের হদিশ? পরদিন আরবির অধ্যাপক মোকতার হোসেনের কাছে গিয়ে বোঝা গেল, আমার সন্দেহ ঠিক। পুঁথিতে তেমন কিছু না থাকলেও ওই কাগজের মানচিত্রে লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়ায় বিশেষ জায়গায় লুকোনো হিরের বাক্সের সন্ধান আছে। টুকলু, আমাদের একটা যাচ্ছেতাই ভুল হয়ে গেছে। অধ্যাপকসায়েবকে পরে কিছু জানানো হয়নি। আজই জানাতে হবে।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আরেকটা ব্যাপারও বুঝে যাই, আমার আগে অন্য কারও হাতে এই কাগজ পৌঁছেছে। ভাঁজ দেখে। কে সে? কী করে জানল এই পবিত্র বাক্সের মধ্যে এমন দারুণ খবর আছে?

ডক্টর আলি, আমি বুড়ি দাদির কাছে কেন গিয়েছিলাম, জানেন? এই জন্যে। দেখলাম, দাদি এসব ব্যাপার কিছু না জেনেও এতকাল মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস গোপনে পুষে রেখেছেন যে পবিত্র বাক্সে কিছু-না-কিছু আছে। তার মানে, আপনার পরিবারের আর কারও মনে দাদির কাছ থেকে এই বিশ্বাস ছড়িয়েছে। যার টাকার খুব দরকার। পাগলের মতো টাকার জন্যে যে হন্যে হয়ে উঠেছে।

তবে কি ওই পাতা-লাগানো পোস্টকার্ড এসেছে তারই কাছে? সোমবার আপনার বাড়ি গিয়ে যখন ইউসুফের ঘরে ঢুকলাম, অদ্ভুত কিছু ই-মেলের প্রিন্ট আউট দেখে আমার সন্দেহ গভীর হল। ইউসুফ কি কোনও চক্রে জড়িয়ে পড়েছে? ইউসুফ ঘরে ঢুকে ওইরকম বিশ্রী আচরণ করতে সন্দেহ আরও পোক্ত হল। ওর চেহারা, চোখের কোণে কালি, হাতের শিরা বেরোনো...সব ড্রাগ-অ্যাডিক্টের সিম্পটম।

তখন ওরাও প্রস্তুত হচ্ছিল লক্ষ্ণৌ যাবে বলে। ইনফ্যাক্ট, সোমবার সকালেই হয়তো রওনা হত, যদি না ডক্টর আলির চাচা মারা যেতেন। ওরা নিশ্চয়ই সন্ধের ট্রেন ধরে। আমরা পরদিন দুপুরে প্লেনে পৌঁছে যাই। অমিতাভ হোম-সেক্রেটারি থাকায় সিকিওরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ব্যাপক। ওদের রাতে ইমামবাড়া ঢোকার প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। তবু শেষ চেষ্টা করল গার্ডদের টাকা খাইয়ে ওই বাক্স ছিনতাই করার। পারল না।

হ্যাঁ, ভালো খবর, লক্ষ্ণৌয়ের মাফিয়া ডন পালুয়া গতকাল ধরা পড়েছে। সে স্বীকার করেছে, কলকাতার ইউসুফ আলি তাকে এই কাজের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিল।

—তুমি কিন্তু বলোনি মামা, ইউসুফের ই-মেলের প্রিন্ট-আউট দেখে তুমি কী সন্দেহ করেছিলে?

—ঠিক, ঠিক। বাদ পড়ে গেছে। হ্যাঁ, ওই ই-মেল থেকে এবং পিকচার পোস্টকার্ড থেকে নেট সার্চ করে এবং 'পেড্রোমায়া'কে ই-মেল করে জানতে পারি, ওরা হচ্ছে কলম্বিয়ার কোকেন পাচারের এক বিশাল এজেন্সি। সারা পৃথিবীজুড়ে ওরা কোকেনের কোটি-কোটি ডলারের নিষিদ্ধ ড্রাগ-পেডলিং চালায়। ইউসুফ তার পূর্বভারতের ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ নেয়। পেড্রোমায়ার সিম্বল 'মামাকোকা'। মায়াসভ্যতায় কোকেনের দেবী, আর কোকেনের সোর্স টাটকা কোকা-পাতা।

ইউসুফের পকেটে জলস্রোতের মতো টাকা আসতে শুরু করে। কাঁচা, নোংরা টাকা। ওষুধের ডিস্ট্রিবিউশান ব্যবসার বারোটা বেজে গেল। নিজে ড্রাগ নিতই, তার সঙ্গে যুক্ত হল অন্ধকারে ঢুকে পড়ার সবরকম সর্বনাশা নেশা। জুয়া, রেস, সাট্টা, বেটিং! সঙ্গে ঢালাও ফূর্তি। জুটে গেল সঙ্গীসাথীও। ডক্টর আলি, কিছু মনে করবেন না, আপনার বৃহৎ নবাব-পরিবারে এখনও ইউসুফের সেইসব দোস্ত-বেরাদররা গা ঢাকা দিয়ে আছে।

উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল নিষিদ্ধ আনন্দের এই অন্ধকার দুনিয়া উপভোগ করতে-করতে হঠাৎ একদিন ইউসুফ আবিষ্কার করল, সে খাদের কিনারে। ওই কোকেন এজেন্সি 'পেড্রোমায়া' বেশ কয়েক লক্ষ টাকা পাবে। কোকেন আসা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে ই-মেলে টাকার তাগাদা। তারপর ডেডলাইন জানিয়ে ওই পিকচার-পোস্টকার্ড। শেষ পোস্টকার্ডে ওরা বুঝিয়ে দিল তিরিশ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা না পেলে ওরা ইউসুফকে খতম করে দেবে।

—সেটাই কি তাহলে ঘটল?

—না। তার আগেই ইউসুফ চলে গেছে।...বলা ভালো, মুক্তি পেয়েছে। আসলে একদিকে ড্রাগ পাচ্ছে না, কেনার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে কয়েক লক্ষ টাকার চাপ। ইউসুফ দিশেহারা। আব্বা কত আর দেবেন? এইসময় ওর মনে পড়ল, বুড়ি দাদির বিশ্বাসের কথা। ও লুকিয়ে-লুকিয়ে রাতে শুরু করল বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি। করতে-করতে একদিন ও পেয়ে গেল চোরাকুঠুরি, তুলোট কাগজ।

আবার সুদৃশ্য ট্রেতে করে ধোঁয়া-ওঠা গরম কফি আর বিস্কিট নিয়ে এল বেয়ারা। জগুমামা কফির কাপ টেনে নিলেন। চুমুক দিয়ে তৃপ্তির শব্দ করলেন, আ:! গলা শুকিয়ে গেছিল।

—হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌতে যখন পালুয়াকে দিয়েও ওদের প্ল্যান ফেল করল, ওদের কলকাতার কাউন্টার পার্টকে দিয়ে আমাদের ট্র্যাপে ফেলা হল। হঠাৎ করে জানানো হল, ডক্টর আলি অসুস্থ। আমাদের সঙ্গে জরুরি কথা

বলতে চান। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ফলো করা হল। গ্যাং রেডি ছিল। বেহাত হল হিরের বাক্স। পরশু ইউসুফের আলমারি থেকে শেষপর্যন্ত বাক্সটা পাওয়া গেছে। হিরেগুলো অবশ্য নেই।

হিরে কি সত্যিই ছিল?—এতক্ষণ পরে হঠাৎ বলে উঠলেন ডক্টর ইউনুস আলি।

মানে?—অনন্ত সরখেল বলে উঠলেন,—কী বলছেন ডাক্তারসায়েব? নিজের চোখে দেখেছি মশাই!

—আশ্চর্য! এ কথা উঠছে কেন? হিরে না থাকলে মামা সাতসকালে লক্ষ্ণৌয়ের জুয়েলারি মার্চেন্টের কাছে যাবেন কেন? আমাদের ওপর অ্যাটাক হবেই বা কেন?

কুল ডাউন!—জগুমামা আমাদের দুজনকে হাত তুলে থামালেন। তারপর শান্তগলায় বললেন,—টুকলু, ডক্টর আলির প্রশ্নটা ফলো করার চেষ্টা কর। বাক্সের মধ্যে কি সত্যি-সত্যিই হিরে ছিল? নাকি অন্যকিছু? তাই তো, নাকি ডক্টর আলি?

না, মানে, আমি ঠিক ওকথা,—ইউনুস আলি থেমে গেলেন।

—ভেরি পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নটির জন্যেই বেচারি ইউসুফের সামনে কোনও পথ খোলা ছিল না। মারা যাওয়া ছাড়া।

হি কমিটেড সুইসাইড।—ডক্টর আলি আবার আস্তে-আস্তে বললেন।

আপনি কাল সবার সামনে বলেছেন। অত্যধিক ওভারডোজে ড্রাগ ওর শরীরে ঢুকেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও তাই বলছে। স্টমাকে, ব্লাডে প্রচুর কোকেন।—জগুমামা বললেন,—যখন ওই বাক্স খুলে 'হিরে'গুলো হাতে পেল ইউসুফ, আনন্দে আত্মহারা। সেটা বৃহস্পতিবার। সে ছুটে গেল জহুরির কাছে। বেচতে। লক্ষ্ণৌতে আমায় যা শুনতে হয়েছিল, ওকেও তাই শুনতে হল কলকাতায়। ওগুলো হিরে নয়। অত্যন্ত দামি বেলজিয়াম কাচকে হিরের কাটিং-এ কাটা। অবশ্যই অ্যান্টিক। সেই হিসেবে দাম ধরলেও পঞ্চাশ হাজারের বেশি নয়। নকল হিরে বিক্রির ওই টাকার বান্ডিলটা আমরা পেয়েও গেছি ওর আলমারি থেকে।

বাড়িতে ফিরে আসে ইউসুফ। ভয়ংকর উত্তেজিত। তার ধারণা, আসল হিরে ছিল। আমরা সরিয়ে ফেলেছি। বাবার সঙ্গে সেই রাতে ছেলের তুমুল ঝগড়া বাধে। ইউসুফ বাবাকে বলে, যে লোকগুলোকে উনি ঢুকিয়েছেন এ বাড়িতে, তারা কালসাপ। খানদানের সম্পত্তি চুরি করছে।...ঠিক বলছি ডক্টর আলি?...না-না, আপনি অযথা টেনসড হবেন না। পুলিশ কাস্টডিতে আপনাদের যে কাজের লোকটি আছে, সে সব বলে ফেলেছে।

—আর কিছু বলেছে কি?

—নাহ। ব্যস, এটুকুই ইউসুফের শেষ কথা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি আসল হিরে না উদ্ধার হয়, বাবাকেও সে ছাড়বে না! তারপর তীব্র হতাশায় ঘরে ঢুকে শেষ কোকেনের পাউচ খুঁজে বের করে। তার হাত-পায়ে তখন খিঁচুনি ধরেছে।...

—তারপর?

—তার আর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা। হেমন্তর ওই বিখ্যাত গানটার প্রথম লাইনের মতো।

মামা থামলেন। কফিতে লম্বা চুমুক দিলেন। সকলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন,—শেষ কথাটি সবচেয়ে ভয়ংকর! বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, কোনও উপায় ছিল না। একদিকে এতবড় খানদানের মান-ইজ্জত-গর্ব, অন্যদিকে বখে যাওয়া ছেলে!

সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন ডক্টর আলি,—কী বলতে চাইছেন আপনি?

—একটাই তো কথা ডক্টর আলি। আমি আপনার ওপর যথেষ্ট সিমপ্যাথেটিক। আপনার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে আমিও হয়তো তাই করতাম। আপনি নিজেই বলুন।

—কী বলব? সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা বলছেন!

—অসম্ভব! এই দেখুন। ইউসুফের ঘর থেকে ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে। ইউসুফের শরীরে ইনজেকশন অন্য কেউ নিশ্চয়ই দেয়নি! সিরিঞ্জের মধ্যে ডেরিফাইলিন এসকরলিন নয়, পাওয়া গেছে কোকেন। হ্যাঁ, ডক্টর আলি, কোকেন। পাওয়া গেছে একগ্রাম কোকেনের খালি একটা পাউচ। একগ্রাম কোকেন একসঙ্গে কারও শরীরে ঢুকলে মৃত্যু নিশ্চিত।

ডক্টর ইউনুস আলি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। বসে পড়লেন। চোখের দৃষ্টি পালটে গেছে। সকলেই বোবা।

জগুমামা ধীরেসুস্থে প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেটটা খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাতটা বড়-বড় হিরে!

—না-না। আপনারা ভুল করবেন না। আমরা নই, ডক্টর আলির পূর্বপুরুষরা সুরক্ষিত রাখার জন্যে, অন্যদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে এই আসল হিরেগুলো সরিয়ে রেখেছিলেন ওই বাক্সেরই অন্যজায়গায়। ওপরে রাখা ছিল নকল। ঠিক যেমনি করে রাখা ছিল তুলোট কাগজের ম্যাপটা। আমি সেইদিন সকালে বাক্সের পাশের চোরাখুপরি থেকে এগুলো বের করে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছিলাম। আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল, এত সহজে প্রতিপক্ষ আমাদের ছাড়বে না।

শোঁ-শোঁ শব্দে এসি চলছে। তবু দমবন্ধ গুমোট লাগছে। তাকাতে পারছি না ডক্টর ইউনুস আলির দিকে। বাবা হয়ে...না! মেনে নেওয়া যাচ্ছে না!

জগুমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন,—চলি বাণী। নাও ইটস ইওর পার্ট টু ডিসাইড। চলি ডক্টর আলি।

—হিরেগুলো কী করবেন জগুদা?

—ওগুলো আপাতত আমার হেফাজতে থাকবে। ট্রাস্টি বোর্ড, না নবাব-ফ্যামিলি, কে ওদের মালিক, আদালত বলুন। তাকেই দিয়ে দেব।

শারদীয়া ২০০৬